॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — বৈশাখ
১ম সংখ্যা — ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ

২য় সংখ্যা — ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — আষাঢ়

৩য় সংখ্যা — ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — শ্রাবণ

৩য় সংখ্যা — ১৩৭৩

✽ মৌচাকের নিয়মাবলী ✽

১। **মৌচাকের** বার্ষিক চাঁদা—৫·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক—২·৫০ নয়া পয়সা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য—০·৪৫ নয়া পয়সা। বৈশাখ মাস হ'তে বর্ষ আরম্ভ। যে কোনও মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। কোন সংখ্যা না পেলে সেই মাসের **২০ তারিখের** মধ্যে জানাতে হ'বে, নচেৎ উক্ত সংখ্যা পরে পাওয়া যাবে না। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হ'লে পূর্ব-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জানাতে হ'বে। চিঠি-পত্র এবং মনিঅর্ডার কুপনে সব সময়েই **গ্রাহক নম্বরের** উল্লেখ থাকা চাই। গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ না থাকলে চাঁদা জমা করা হয় না। নতুন গ্রাহক হলে '**নতুন**' কথাটির উল্লেখ থাকা দরকার।

৩। লেখা পাঠাতে হ'লে সকল সময়েই নকল রেখে পাঠাতে হ'বে। উপযুক্ত ডাক-টিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হয় না। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে সে লেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। **এজেন্সীর জন্য** ৫৲ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয় এবং কমপক্ষে ৫ কপি ক'রে পত্রিকা নিতে হয়। বর্ষশেষে বিক্রিত কপির হিসাব ও অবিক্রীত কপি ফেরৎ পাঠাতে হয়। কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — ভাদ্র

৫ম সংখ্যা — ১৩৭৩

Kantharol
ক্যালকেমিকো-র
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ক্যান্থারল (রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক)

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ | আশ্বিন
৬ষ্ঠ সংখ্যা | ১৩৭৩

৪৭শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

কার্তিক
১৩৭৩

সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
ফাউণ্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুারিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
ুলেখা
য়ার্কস্ লিমিটেড
লেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — অগ্রহায়ণ

৮ম সংখ্যা — ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ

৯ম সংখ্যা

পৌষ

১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ মাঘ
১০ম সংখ্যা ১৩৭৩

সুলেখা
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
প্রতিদিনের
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুর্যারিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
সুলেখা
ওয়ার্কস লিমিটেড
লেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

॥ সূচীপত্র ॥

৪৭শ বর্ষ — ফাল্গুন
১১শ সংখ্যা — ১৩৭৩

হরিৎ-রাজ্যে হরিণকুল

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৭শ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৭৩ [১ম সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কে মধুকর বনে-বনে রটায় সুসংবাদ
সকল ফুলেই মধু আছে কেউ পড়েনি বাদ।
হোক না সে-ফুল গন্ধবিহীন
হোক না অধম দীন অকুলীন
হোক না ঘেঁটু মাদার শিমুল ঘাসবুনো জঙ্গল
হোক না বেলি জুঁই চামেলি গোলাপ শতদল।

বিরূপ কালো বিষফুলেরও গহন গোপন কোষে
মধু আছে, তাও সে নেবে পরম পরিতোষে।
চয়ন করে কণায় কণায়
সূক্ষ্ম স্নেহের আলিপনায়

গড়ে তোলে তিলে-তিলে আনন্দ-মৌচাক
পরের তরে জীবন ধরে সমান অংশভাক।

কে মধুকর লোকে-লোকে ছড়ায় আশীর্বাদ
সব মানুষেই মধু আছে কেউ পড়েনি বাদ।
কেউ হেথা নয় তুচ্ছ হেয়
সব হৃদয়ই উপাদেয়
জ্যেষ্ঠকেও পাবার পরে কনিষ্ঠকে চায়
প্রাসাদ ঘুরে দীনহীনের কুঁড়ে ঘরে যায়।

সকল ফুলই প্রস্ফুটিত আমরা ফুটিনি,
মধু-র মেলায় সব এসেছে আমরা জুটিনি।
আমাদের সব অন্য কথা
জটিল মনের কৃপণতা
অঙ্ক কষি হিসেব মেলাই বন্ধ রাখি ঘর
গুঞ্জরিয়া যায় ফিরে যায় মধুর সদাগর।

ওরে এবার দ্বার খুলে দে, আসবে নিয়ে ঠিক
সাত সমুদ্র অষ্ট প্রহর নয় গ্রহ দশ দিক।
তোদের সুধার অংশ দে না
নইলে যে তার ক্ষোভ মেটে না,
তোদের দিয়ে পূরণ করুক যেটুক আছে ফাঁক
উঠুক গড়ে বিশ্বনীড়ে অখণ্ড মৌচাক ॥

খাদ্য-সংকটে তোমরা কি করতে পার?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বহুকাল পরে কলকাতায় গেছি; বইয়ের দোকানে বসে আছি। হঠাৎ চোখ পড়লো রাস্তার ওপারে; ফুটপাথে বিরাট একটা 'কিউ', অর্থাৎ সারি বাঁধা লোক দাঁড়িয়ে। রাস্তা চলবার জন্য জানি। কিন্তু কলকাতার রাজপথে চলা দায়—হয় দোকান, নয় 'কিউ'। 'কিউ'-এর ভিড় দেখেছি সিনেমার সামনে। কিন্তু আমি যে 'কিউ' দেখলাম সেখানে কোনো প্রেক্ষাগৃহ নেই। বই-এর দোকানের মালিককে শুধোই—এ 'কিউ' কি জন্য?

তিনি বললেন, 'চালের জন্য লোকে লাইন দিয়েছে;—দেড়টার থেকে দাঁড়িয়ে আছে সব, পৌনে পাঁচটায় দোকান খুলেছে। কাগজে পড়ি খাদ্যাভাব—আমাদের শহরেও খাদ্যাভাব—গ্রামেও খাদ্যাভাব! এ সমস্যার আংশিক সমাধানে মৌচাকের পাঠক-পাঠিকারা কতটা সাহায্য করতে পারে—তা' ভাবা যাক্।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে—খাই কেন? দেহের পুষ্টির জন্য না রসনার তৃপ্তির জন্য? এর উত্তর দুটোই সত্য। দেহের পুষ্টির জন্য রোজ কড্‌লিভার অয়েল খেতে পার—কিন্তু রসনার তৃপ্তি হয় না বলে, তা খেয়ে মানুষ বাচে না। কিন্তু রসনার তৃপ্তির জন্য খাওয়ার অভ্যাস হলে—যার জন্য খাওয়া, অর্থাৎ দেহ—সেই শেষকালে যায় বিগ্‌ড়ে। তখন রসনার শত তৃপ্তিকর খাদ্য সামনে ধরলেও মুখ আর লালায়িত হয় না। তাই শরীরটার জন্য খাওয়া—কিন্তু খাওয়ার জন্য শরীর যারা ভাবে, তারা শেষ পর্যন্ত ঠকে। তোমাদের জন্মদিনে, বাড়িতে বিবাহাদি উৎসবে যে পরিমাণ খাদ্যের আয়োজন হয়, তা গৃহস্থের বা নিমন্ত্রণকর্তার ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যই হয়ে থাকে। কলকাতায় প্রতিদিন কত শত মণ ছানা আসে—জানো কি কলকাতার আশেপাশে বিশ ক্রোশ জায়গার মধ্যে গ্রামের শিশুরা এক ফোটা দুধ খেতে পায় না কেন জানো? আমরা অপরিমিত মিষ্টান্ন খাই; আমার প্রশ্ন—সে কি দেহের পুষ্টির জন্য, না রসনার তৃপ্তির জন্য—ঠিক করে বলতে পারো? তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কলকাতায় দুধের কী টান! হরিণঘাটা দুধ সরবরাহ করতে পারছে না; অথচ দোকানে-দোকানে ছানার চাই। আর আমরা যারা সন্দেহ রসগোল্লা এবং নানা নামের মিষ্টান্ন খাই—সে কি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য? নিশ্চয়ই নয়। দুধ চাই কলকাতার ও গ্রামের শিশুদের জন্য—তাদের মুখের দুধ কেড়ে এনে আমরা জন্মদিন, বিবাহাদি উৎসব করছি, 'আরও দিই আরও দিই' বলে মিষ্টান্ন কত নষ্ট করি দেখেছ তো? এখন বলো কোনটা শ্রেয় ও কোনটা প্রেয়। আমাদের লোভের জন্য বহু সহস্র শিশু দুগ্ধাভাবে থাকে কিনা খোঁজ নেবে কি?

আর একটা সমস্যার কথা শোন। চাল নেই, এখন উপায় কী? কেবল বাড়িতে বসে ালাগালি করলে এবং শুনলে ও 'কিউ'-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে? । তো সম্ভব নয়। এই বাহাত্তুরে বুড়োর কথা শুনবে? বলবো? শোন তবে। আমি ভাত ই মাড়সুদ্ধ—কুকারে করি—বহু বৎসর থেকে খাচ্ছি। জানো কি তোমরা—যে-চালের পরিমাণ বহার করো, আমার তা থেকে প্রায় সিকি কম লাগে—অর্থাৎ তোমাদের রান্নাঘরে খানে এক সের চাল লাগে, আমাদের ঘরে সেখানে লাগে তেরো ছটাক—অর্থাৎ প্রত্যেক সেরে নছটাক কম। এটা গল্প করছি না। তা ছাড়া যেটুকু খাই তা'তে তাগদ বেশি—পুষ্টি বেশি। ইটুকু পড়েই হয়ত এক দিদিমণি মুখ বাঁকিয়ে বলছেন, 'আমরা কি গরু, যে মাড় খাবো?' উত্তরে লি—কী করবো দিদিমণি—বাঁচতে হলে, শরীরকে মজবুত করতে হলে মাড়-ভাত খেতে হবে, াকৃলাসুদ্ধ আটার রুটি চিবিয়ে খেতে হবে, ছাতু জল দিয়ে মেখে লঙ্কা নুন দিয়ে খেতে হবে, আখের ড় খেতে হবে, চিড়ে ভিজিয়ে লেবু নুন দিয়ে সাঁটতে হবে—তবেই না তাগদ বাড়বে। ময়দার াউরুটির উপর মাখনের গন্ধ দিয়ে খাবে তো? পাউরুটি তো খাও—বলতে পারো না শাদা রুটি ইনে—'ব্রাউন ব্রেড্' চাই। বাঁচতে হবে, লড়তে হবে, দেশ রক্ষা করতে হবে—তাই বলছি বল রসনার তৃপ্তির কথা ভেবো না—শেষকালে সেই রসনাই বিদ্রোহী হবে।

মাংস নিশ্চয়ই খাও—কিন্তু কী ভাবে খাও? তাকে অতিসিদ্ধ করে, মশলাপাতি দিয়ে একটা তি সুখাদ্য 'কারি' বানাও—মুখরোচক অবশ্য—লিখতে-লিখতেই আমার জিবে জল আসছে। কিন্তু 'দিন সে খাদ্য পেটে সইবে? সুতরাং সেটাও ভাবতে হবে তোমাদেরই—কারণ তোমাদের উপরই মাজ-সংসারের ভার পড়বে কয়েক বৎসরের মধ্যে এবং শরীর মজবুত করতেই হবে, এই অভাব ভিযোগের মধ্যেই।

মুরগীর ডিম খায় না এমন ছেলেমেয়ে দেখা যায় খুব কম। কিন্তু ক'টা বাড়িতে মুরগীপালনের যবস্থা আছে। গ্রাম বা আধা-শহরে যেখানে জায়গা প্রচুর—সেখানে মুরগীপালন শক্ত কাজ নয়; কিন্তু শহরের মুরগীপালন শুনলেই তোমরা হেসে উঠবে—বলবে, 'এখানে কোথায় 'রান্' পাবো—নিজেদেরই নড়বার জায়গা নেই।' তা হলে বলি—খুব শক্ত কাজ নয়। আজকাল বিজ্ঞানীরা লছেন ছোট খুপরির মধ্যে মুরগীপালন করা যায়, অবশ্য সেজন্য নানারকমের খাদ্যাদি দিতে হয়। সটা তোমরা স্থানীয় পশু-চিকিৎসকের কাছ থেকে অনায়াসে জেনে নিতে পারবে—অবশ্য তাঁরা দি উৎসাহী হন, তবেই সাহায্য পাবে। এ বিষয়ে বই আছে—বাবা বা দাদাকে বলো, খোঁজ করে নে দেবেন। তা যদি করতে পারো তো ঘরে বসেই ডিম পাবে—আর টাকায় চারটা-পাঁচটা ডিম কিনে খেতে হবে না। এ করতে খুব বেশি জায়গা লাগে না—আমার এক বন্ধু পাইকপাড়ায় নিজের

ছোট বাড়িতে এইভাবে মুরগীপালন করেন। ব্যবসায়ের জন্য যারা করবে—তাদের কথা ছেড়ে দাও—গবর্মেণ্ট বড় বড় 'পোলট্রি' খুলেছেন।
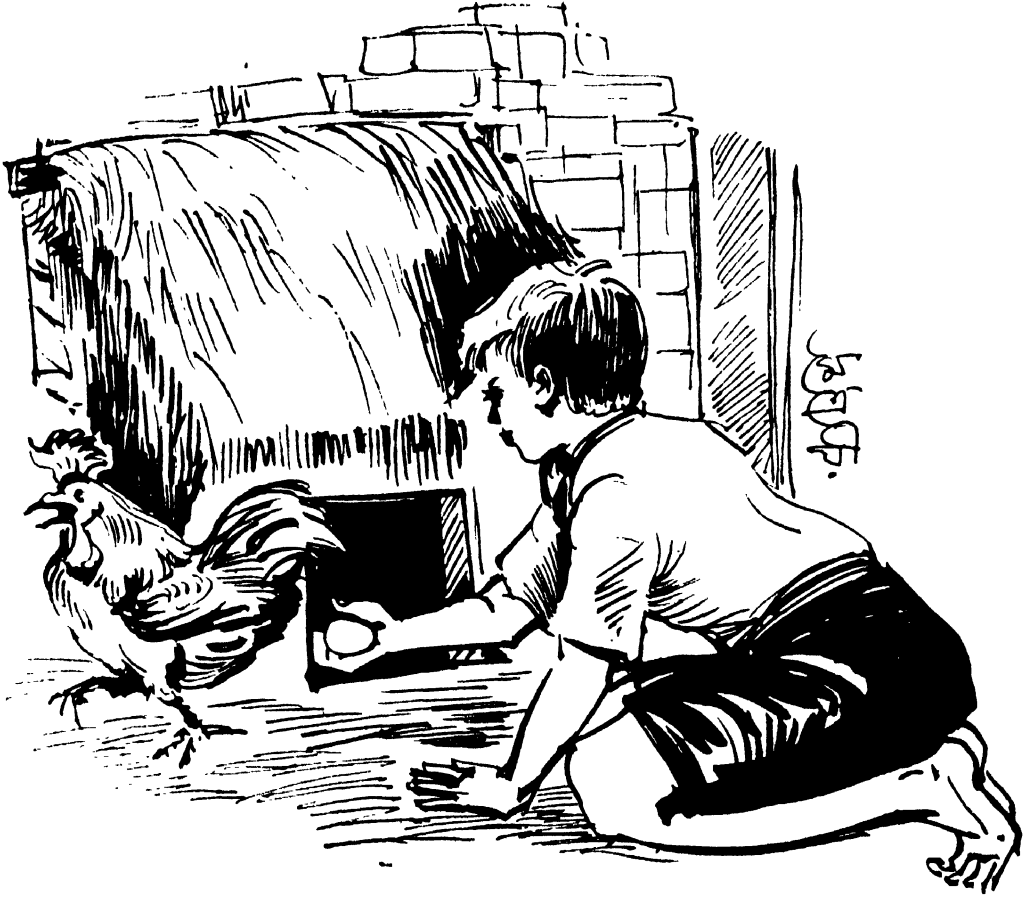
আর একটা কথা বলি শোন। সেটা হচ্ছে তরিতরকারী উৎপাদন। বাজারে গিয়ে দেখবে কত গ্রাম থেকে লোকে নানারকম আনাজ এনেছে; গ্রামে জায়গা আছে তাই লোকে শাক-সব্জী বুনতে পারে; কিন্তু শহরে? মহাযুদ্ধের সময়ে লনডনের বিখ্যাত পার্কগুলি চ'ষে সব্জী লাগিয়েছিল—এখন আবার সেসব জায়গা ফুলের ও পাতা-বাহারে গাছে পূর্ণ হয়ে গেছে। দরকার হলে কলকাতায় তা করতে হবে বৈকি! সেকথা বড়রা ভাববেন—এখন তোমরা কিছু করতে পার কিনা—তাই দেখা যাক। তোমবা কি জানো জলের উপর তরকারীর চাষ হয়? এই বিদ্যাকে বলে 'হাইড্রোপ-নিকস্'। তোমাদের কলেজে পড়া দাদা, কাকাদের শুধোও—তারা যেন তাঁদের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনে ও বুঝে এসে তোমাদের জলের উপর 'চাষ' করার বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন। ছাদের

ৃপর, জানালার ধারে, ছোট ছোট অগভীর টব-এ কিছুটা তারের জাল, করাতগুঁড়ো ও কয়েক কমের রাসায়নিক সংগ্রহ করতে পারলেই পরীক্ষা করতে পার। দাদাদের বলবে হাইড্রোপনিকসের পর যে একটা ছোট ইংরেজী বই আছে—সেটা এনে তোমাদের বুঝিয়ে দেন—পরীক্ষা করে দেখই া। আমি নিজে করিনি—আমার পড়া-বিদ্যা থেকে তোমাদের উপদেশ দিলাম।

এতক্ষণ যে এতোগুলো কথা তোমাদের বললাম—তার কারণ কি বলতে পারো? তোমরা যাতে ামাদের থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পার—তার জন্যেই বলছি। শুধু গবর্মেণ্টকে গাল পাড়লে তো াট ভরবে না—কী ভাবে এই খাদ্য সমস্যায় তুমি সাহায্য করতে পার—তার কথা ভাবতে হবে; ারণ বাঁচতে হবে শুধু নয়—উদ্বৃত্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে! সেই উদ্বৃত্ত শক্তি দিয়ে দেশের ক্রদের রুখতে হবে। শুধু বেঁচে থাকার প্রশ্ন নয়—তার থেকে বড় প্রশ্ন—শক্তিমান্ হয়ে বেঁচে থাকতে ব এবং কাজ করতে হবে। যেদিন মা'কে বুঝাতে পারবে মাড়-ভাত, ছাতু, চিড়ে খেয়ে শরীর ় হয়—সেদিন খাদ্য-সমস্যা দূর না হোক, কিছুটা কমাতে পারবে।

মহানন্দা

শ্রীঅতীন বসু

ছোট্ট নদী মহানন্দা চলছে কেমন ধেয়ে
অবাক হয়ে দেখছি আমি চেয়ে,
প্রশ্ন করি নদী, তুমি কোথায় পেলে জল?
বল্লো নদী, কলকলিয়ে আমার সাথে চল।
জন্ম আমার হিমালয়ে, সেথায় করি বাস
বিশেষ বলার নেইকো অবকাশ।
পাহাড় বেয়ে মনের সুখে লাফিয়ে পড়ি নীচে
লজ্জা করে কেউ দেখে বা পিছে।
প্রশ্ন করি, বলো নদী, কোথায় তোমার শেষ?
বল্লো নদী, বহু দূরে সাতমাণিকের দেশ।

নাসিকা-বিচিত্রা

শ্রীঅত্রি মুখোপাধ্যায়

আরে আরে, শুনে যা' না ভজহরি বিশ্বাস,
সড় সড় করে নাক ? ডাকে নাক ফোঁসফাঁস ?
তাই বুঝি আরে রামো ! চাস্ নাক ঝাড়তে ?
নাকে দড়ি দিয়ে চাস্ ছেলেটাকে মারতে ?

উন্নাসিক বলে সবে বুঝি তারি জন্য ?
নাক-কান-কাটা নাকি ? নাকি দোষ অন্য ?
নাকছাবি চুরি করে কাটে নাক বরাবর ?
নাকা-নাকা কথা শুনে জ্বলে যায় অন্তর ?

বলে নাকি ছেলে তোর কথা নাক বাচিয়ে ?
নাকি সুরে কথা ক'য়ে মারে তোকে নাচিয়ে ?
নাকে-মুখে-চোখে কথা তবু তার গেল না ?
হায় হায় ভগবান ! নাক কানও ম'লে না ?
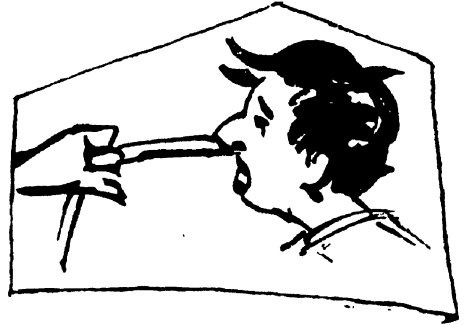
মেয়েটার নাক বোঁচা
কি যে তোর আপসোস !
আর নাক ছিলো নাকি ?
নাক-খ্যাঁদা রাক্কোস !

আহা আহা, আসো কেন
তেড়ে নাক উঁচিয়ে ?
দেয়নি যে ভগবান,
ভালো নাক যাচিয়ে ।

খ্যাঁদা নাক, বড়ি নাক,
ছিলো নাক চেপ্টা—
মোটা নাক, বাঁশি নাক,
কাকাতুয়া শেষটা !

কি বলিস ? নয় তোর
কোনটা পছন্দ ?
গরুড়ের নাকটা কি
ছিলো এত মন্দ ?

দাঁড়া দাঁড়া যাস নে, নাক কেন সিঁটকাস ?
নাক দেখি খুব তোর ! পচা মাছ খুব খাস ।

নাকে-' নাম্ দিয়ে খাস্, খাস্ নাক ডুবিয়ে,
তারপরে ঘুম যাস্, নাক-ফাক ডাকিয়ে ।
নাকে নাকে খাচ্ছিস নাকানি ও চোবানি ?
যা যা তুই বাড়ী যা না, কিছু বাকী রাখিনি ।*

* নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশ-অপেক্ষী "কথার কথা" গ্রন্থটি থেকে ব্যবহারগুলি সংগৃহীত ।—অ. ম

জয় হিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গত বছর আমরা কাশ্মীরের যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। বিদেশীরা বার বার বলেছে—হিন্দুরা লড়াই করতে পারে না। এই কথা প্রচার করে আমাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিতে পারলে তাদের লাভ আছে। তেতাল্লিশ কোটি মানুষ যদি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তাহলে এশিয়া ও আফরিকায় বিদেশীদের শোষণ চালানোর অসুবিধা হবে। বিদেশীদের কলমে ভারতের ইতিহাসও সেইভাবে লেখা হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা দেখেছি ভারতবাসী শুধু মার খাচ্ছে। হিন্দুরা যে অনেক ক্ষেত্রে মার দিয়েছে, সে-কথা বড়-একটা দেখা যায় না। ইউরোপে একটা প্রবাদ আছে—মিথ্যা কথা বার বার মানুষকে শোনালে মানুষ সেটাকেই সত্য বলে মনে করে। আমাদের দেশে বিদেশীরা সর্বদা সেই নীতি চালিয়েছে।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস আলেকজাণ্ডারের ভারত সাম্রাজ্যের অংশটুকু পেয়েছিলেন। কিন্তু সে অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে রাজত্ব করা তাঁর অদৃষ্টে ঘটেনি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে লড়াই করে গান্ধার পার করে দেন। সেলুকাস শেষ অবধি নিজের মেয়ে হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিয়ে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেন, যেন আর কোন দিন চন্দ্রগুপ্তের দিক থেকে কোন ভয়ের কারণ না ঘটে। মৌর্য সম্রাটের প্রচণ্ড শক্তিমত্তার পরিচয় জানার জন্য পণ্ডিত মেগাস্থিনিসকে সেলুকাস পাঠিয়েছিলেন মগধের রাজসভায়। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে যা কিছু দেখেন তাতেই বিস্মিত হ'ন। তাঁর লেখা বিবরণ এখন আর পাওয়া যায় না, অন্যান্য গ্রীক বই থেকে তার খানিক খানিক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের নেই। আমাদের অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে নষ্ট হয়েছে, তাতে হয়তো অনেক রাজা-মহারাজার কাহিনীও লুপ্ত হয়েছে। তবু কিছু কিছু যা জানা যায়, তা-ও কম গৌরবের নয়।

পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ভারতের মাদুরার এক রাজকুমার সিংহল দ্বীপে এক অভিযান করেন। তাঁর নাম পাণ্ড্য। সিংহলে তখন রাজত্ব করতেন রাজা মিত্রসেনা। মিত্রসেনা যুদ্ধে হারলেন ও নিহত হলেন। পাণ্ড্য সিংহলের উত্তর-অঞ্চল দখল করে রাজা হয়ে বসলেন। (৪৩৩ খৃষ্টাব্দ) এই রাজবংশের রাজারা সাতাশ বছর সিংহল শাসন করেছিলেন।

পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় শ্বেত হুনেরা মধ্য এশিয়ায় খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সেখানে

তারা ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য জয় করে। তারপর তারা অগ্রসর হয় ভারতবর্ষ জয় করতে। গান্ধার পার হয়ে হূনেরা পঞ্চ নদে এসে পড়ে। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তখন মগধের সম্রাট। হূনদের নানা অত্যাচার ও অনাচারের সংবাদ পেয়েই তিনি দু'লাখ সৈন্য নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হন। স্কন্দগুপ্ত হূনসেনাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। তিনজন হূনরাজাকে বন্দী করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন। হূন অনাচার থেকে ভারতভূমি মুক্ত হয়।

ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে হূনেরা গান্ধারের রাজা হয়ে বসে। হূন সর্দার তোরামানা সিন্ধু নদ পার হয়ে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সেজন্য তিনি এক বিশাল সৈন্য প্রস্তুত করেন। সেই সৈন্যদলে শুধু রণহস্তীই ছিল দু' হাজার। চীনা পরিব্রাজক সুংউন তাঁর সভায় এসে তাঁর বিশাল সৈন্য দেখেছিলেন। তোরামানা সিন্ধু নদ তো পার হয়ে এলেন। এদিকে মগধ সম্রাট বুধগুপ্ত তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য তৈরী ছিলেন। প্রচণ্ড লড়াই হলো। পরাজিত হয়ে তোরামানা পিছু হটে গেলেন।

তোরামানার ছেলে মিহিরগুল এই পরাজয়ের শোধ তোলার জন্য আবার তৈরী হলেন। সৈন্য নিয়ে তিনি সিন্ধু নদ পার হলেন। লুঠতরাজ সুরু হলো। মালবের রাজা যশোধর্মদেব তাঁকে রুখলেন। মিহিরগুল তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। হেরে পালিয়ে গেলেন কাশ্মীর। তারপর এদেশে হূনদের আর কখনও সাড়া পাওয়া যায়নি।

সিন্ধুনদের মোহনায় দেবল নামে এক বন্দর ছিল। সপ্তম সতকের মাঝামাঝি সময় সেখানে চচ্ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। আরবরা বাণিজ্য করার জন্য সেখানে থামতো। একবার তারা রাজ্য বিস্তার করার জন্য দেবল আক্রমণ করলো। (৬৪৩ খৃষ্টাব্দ) চর্চ সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। আরব সেনাপতি পরাজিত ও নিহত হলেন। বোগদাদের খলিফা ওমর তখন মুসলিম রাজ্যের প্রধান। তিনি যখন খবর পেলেন যে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা হিন্দুস্থানে হেরে গেছে তখন তিনি অবাক হলেন। ইরাকের শাসনকর্তাকে পাঠালেন—'দেখে এসো সিন্ধুদেশ।' ইরাকের শাসনকর্তা সব দেখে-শুনে গিয়ে বললেন—প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য, সে দেশ দখল করা সম্ভব নয়।

তখনকার মতো খলিফা ওমর চুপ করে গেলেন। কুড়ি বছর পরে খলিফা আলি আবার সৈন্য পাঠালেন বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে। সেখানে পাহাড়ী জাতির বাস। তাদের ছোট ছোট রাজ্য। ফিকন অঞ্চলের পাহাড়ীরা সবাই একজোট হয়ে আরবদের প্রতিরোধ করলো। তাদের হাতে আরব সেনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাত্র কয়েকজন কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালালো (৬৬৩ খৃষ্টাব্দ)।

খলিফা আলি কিন্তু ছাড়লেন না। বিশ বছর ধরে তিনি পরপর ছ'বার সিন্ধু রাজ্য জয় করার জন্য সৈন্য পাঠান। কিন্তু কোনবারেই আরবেরা জয় লাভ করতে পারলো না।

অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজ সৈন্য পাঠালেন দেবল বন্দর দখল করার জন্য। সিন্ধুর রাজা তখন দাহর। সেনাপতি ওবেদুল্লা দাহরের হাতে শুধু মার খেলেন না, প্রাণও হারালেন।

ইরাক-শাসক তখন আর-এক সেনাপতিকে পাঠালেন। সেনাপতি বুদাইল। দাহরের ছেলে জয়সিংহ তখন সিন্ধুর রাজা। বুদাইল তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। একদিনের যুদ্ধেই ইরাক-বাহিনী নিশ্চিহ্ন হলো, বুদাইল নিহত হলেন।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় আরবেরা কাশ্মীর সীমান্তে কাংড়া উপত্যকা দখল করে বসলো। পাঞ্জাবেও তারা লুঠতরাজ স্থরু করলো। লালিতাদিত্য তখন কাশ্মীরের রাজা। বিশাল সৈন্য নিয়ে তিনি আরবদের তাড়া করলেন। পরপর তিনটি লড়াই হলো। আরবেরা তিনবারই পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এই সময় আরবরা দক্ষিণ ভারতে চালুক্য রাজ্যও আক্রমণ করে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তখন সেখানে রাজ্য করছেন। চালুক্য সেনাপতি অবনীজনাশ্রয় পুলকেশিন্ আরবদের প্রতিরোধ করেন। আরবরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য খুশি হয়ে সেনাপতিকে উপাধি দেন—অনিবর্তক-নিবর্তয়িতৃ।

নবম শতকে আরবের স্থলতান মহম্মদ ভারত আক্রমণ করেন। গুজরাট পার হয়ে এলেন রাজস্থানে। চিতোরের রাজদরবারে বলে পাঠালেন—'আমাকে বড় বলে মানো, কর দাও!' বাপ্পাবাড়লের প্রপৌত্র খোমান তখন মেবারের রানা। তিনি জবাব দিলেন—'তলোয়ার ধরে আগে শক্তির পরীক্ষা হোক্ কে বড়।' মহম্মদ এগিয়ে এলেন, খোমানের দলে এলেন রাজস্থানের ছোট বড় যত সামন্ত। রাজপুতদের সামনে আরবরা দাঁড়াতে পারলো না। মহম্মদ পালালেন। কিন্তু দেশে ফিরতে পারলেন না। খোমান পথের মাঝেই তাকে ধরে ফেললেন। বন্দী করে নিয়ে এলেন চিতোরে। মহম্মদ অনেক দিন চিতোরে বন্দী ছিলেন।

কুতুবুদ্দিন দিল্লীর স্থলতান হয়ে রাজস্থান আক্রমণ করেন। মেবারে তখন শাসনকাজ চালাচ্ছেন রাণী কর্মদেবী। কর্মদেবী দিল্লীর চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের বোন। থানেশ্বরের যুদ্ধে ভাই পৃথ্বিরাজ নিহত হয়েছেন, স্বামী নিহত হয়েছেন, বড় ছেলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেছে। মেজো ছেলে আছে বিদোরে, সেজো ছেলে গোরক্ষপুরে, আর ছোট ছেলে নেহাৎ নাবালক। কর্মদেবী কিন্তু ভয় পেলেন না। যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। চারিপাশের কুড়িজন সামন্ত নরপতি সৈন্য নিয়ে তাঁর

সঙ্গে যোগ দিলেন। রাণী কর্মদেবী সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। অম্বরের কাছে কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হলো। মেয়ে-সেনাপতি দেখে তিনি হাসলেন,—এদের হারাতে আর কতক্ষণ লাগবে? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি মিলিয়ে গেল। পাঠান বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, কুতুবুদ্দিন আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালেন। জীবনে আর তিনি রাজস্থান জয় করার চেষ্টা করেন নি।

কয়েক বছর পরে খিলজি বংশের এক সুলতান মেবার আক্রমণ করে। রাণা হামির তাঁকে বন্দী করে চিতোরের কারাগারে রেখে দেন তিন মাস। শেষে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হামিরকে দেন পঞ্চাশ লাখ টাকা, একশো হাতী আর আজমীর, রম্ভম্ভর, নাগোর ও সুত্তপুর।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে দিল্লীর আরেক সুলতান মেবার আক্রমণ করেন, কিন্তু হামিরের পৌত্র লাক্ষরাণার কাছে পরাজিত হন। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি গয়ার বিষ্ণুমন্দির ধ্বংস করতে যান। লক্ষরাণা চারিপাশের হিন্দুরাজাদের একত্র করে সুলতানকে বাধা দেন। সুলতানকে পরাজিত হয়ে ফিরতে হলো, তবে লক্ষরাণা সেই যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু সুলতান যে মার খেয়েছিলেন, তা ভুলতে পারেন নি, আর কোনদিন গয়ার মন্দির ভাঙতে আসেন নি।

আমাদের দেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমনি অনেক যুদ্ধজয়ের কাহিনী আছে। ভারতবাসী কোনদিনই ভীরু নয়। ভীরু হলে সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তারা এযুগে ইম্ফল আক্রমণ করতে সাহস করতো না।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়,
ছোটদের আর বড়দের
লিখেছেন কত ছড়া :
টক ঝাল আর মিষ্টি
নেনতা ও মিঠে-কড়া।

'উড়কি ধানের মুড়কি'—
আনলো নতুন সুর কি ?
'রাঙা ধানের খৈ'—
বেশ মজাদার বই ;
'ডালিম গাছের মৌ-'এর গন্ধে
দেশ জুড়ে হইচই !

ঝরা পাতা

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
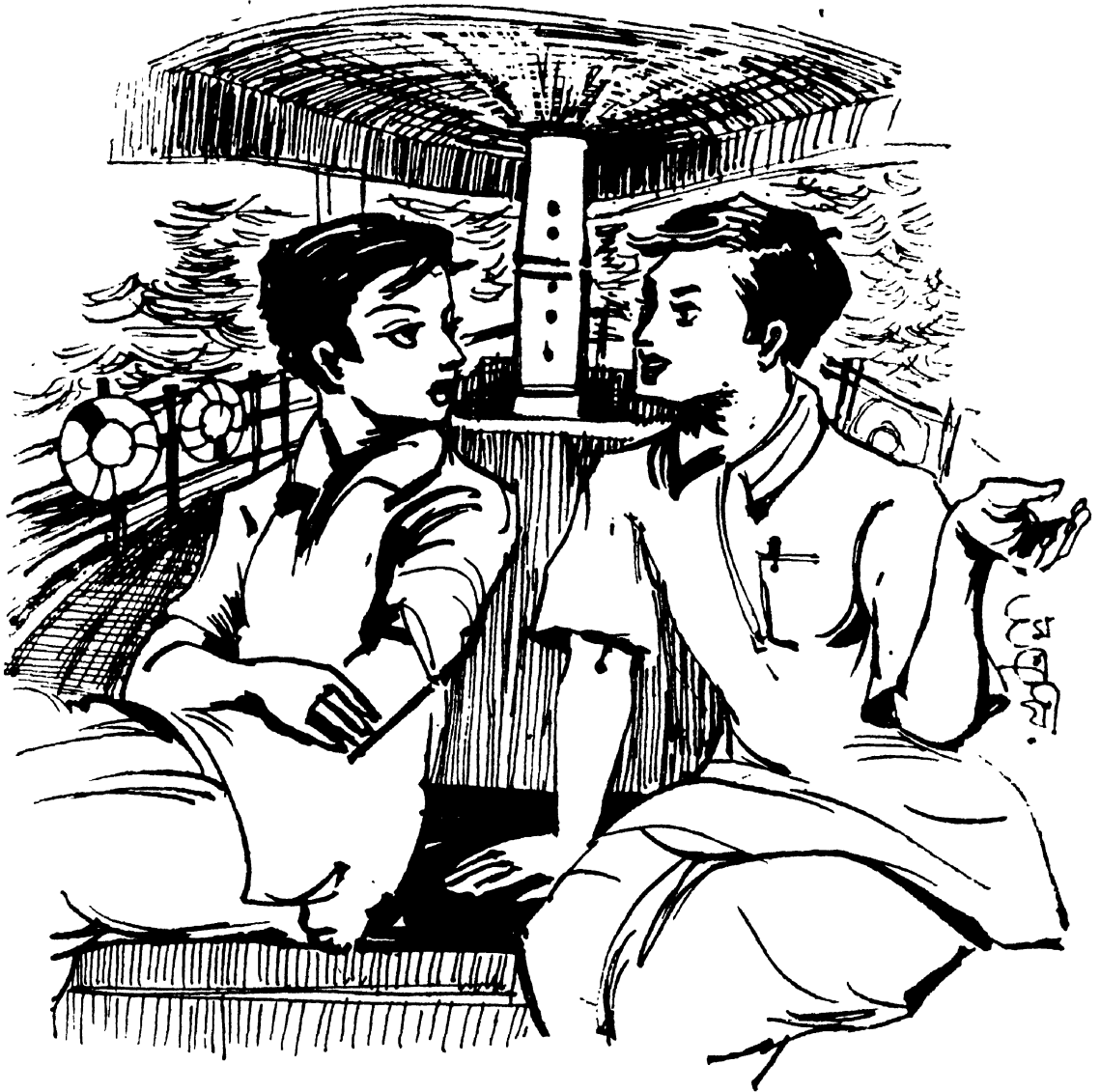
ফুটপাথের ধারে পুরানো বইয়ের দোকানের কাছে এলেই সুবিমলের কথা মনে পড়ে আমাদের কবি-বন্ধু সুবিমল। একই ক্লাসে পড়তাম আমরা ইস্কুলে।

ইস্কুলের হাতে-লেখা ম্যাগাজিনের সে ছিল সম্পাদক। গল্প লিখত। কবিতা লিখত। ছোটখাটো একটা উপন্যাসও লিখে ফেলেছিল ওইটুকু বয়সে। পড়াশুনায়ও মন্দ ছিল না।

মাইল দুয়েক দূরের একটা গ্রাম থেকে সে আসত। পরনে ছেঁড়াখোড়া ময়লা জামা-কাপড়। খালি পা। সারামুখের নীরবতার মধ্যে জ্বলত বড় বড় দুটি চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। পরীক্ষা শেষ হ'ল বেলা একটায়। একটা মাত্র পেপার ছিল সেদিন। বিকেলের দিকে মহকুমা শহর থেকে বাড়ি ফিরছি আমরা সদলবলে। খুঁজে খুঁজে সুবিমলকে পেলাম মোটর লঞ্চের পেছন দিকে। সে বসে আছে একান্ত একলা, জলের দিকে চেয়ে। লঞ্চ ছুটে চলেছে দ্রুতবেগে নদীর মধ্যে দিয়ে। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চুপচাপ বসে আছিস যে? ম্লান হাসি হেসে সে বলল, কেন, কি করব?—রাগ করে ঝাঁঝি দিয়ে বললাম, কুনো স্বভাব তোর আর কিছুতেই গেল না। কেন, করার কি কিছুই নেই? ওই ওরা কত গল্প করছে, গান গাইছে, কত প্ল্যান করছে—। আঙ্গুল দিয়ে লঞ্চের সামনের দিকে যেখানে আমাদের দলটি হুল্লোড়ে ফেটে পড়ছিল সেদিক দেখিয়ে দিলাম। বৃথা চেষ্টা। সুবিমলকে নড়ানো গেল না ওখান থেকে। সে তেমনি চুপ করে বসে রইল জলের দিকে চেয়ে।

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় লঞ্চ এসে থামল ওদের গাঁয়ের ঘাটে।

সূর্য তখন অস্ত গেছে। পশ্চিম আকাশের ঝিলিমিলি ছায়া পড়েছে নদীর বুকে। পাখীরা উড়ে যাচ্ছে কলকাকলীতে আকাশ পথ মুখরিত করে প্রায়ান্ধকার দিগন্তের পানে।

সুবিমল লঞ্চ থেকে নেমে গেল। সেই খালি পা। সাবান-কাচা একটা সাদা সার্ট গায়ে। এতদিন পরীক্ষার পরে রীতিমত ময়লা হয়ে গেছে। হাতে বইয়ের একটা ছোট্ট পুঁটুলি।

নেমে গিয়ে একবার ফিরে চাইল সে। মুখে সেই ম্লান হাসি। লঞ্চের সামনের দিকটায় আমরা সবাই দাঁড়িয়ে ছিলাম তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। ভেবেছিলাম, যাবার সময়ে সে কিছু বলবে। কিন্তু না, এবারও সে নীরব হয়ে রইল।

সুবিমলকে আমার সেই শেষ দেখা।

কলেজে পড়ার সময় কলকাতার রাস্তার ধারের বুকস্টলগুলিতে মাসিক সাপ্তাহিক কাগজে সুবিমলের গল্প কবিতা খুঁজে বেড়িয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে চাকরিতে ঢুকেও সে খোঁজার বিরাম ছিল না আমার। কিন্তু সুবিমলের লেখা কোথাও খুঁজে পেলাম না আজ পর্যন্ত। যুদ্ধ গেল। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ একে একে চলচ্চিত্রের মত এল, গেল। হায়! সুবিমলের কবিমনকে কি এর কোনটাই নাড়া দিয়ে যেতে পারল না?

আজও মনে পড়ে বাদলার দিনে ইস্কুলের জলের ঘরে আমাদের সাহিত্য-মজলিসের কথা।

সুবিমল কবিতা পড়ত, গল্প পড়ত। পড়ার ভঙ্গীটা ছিল তার অনন্যসাধারণ। সুরেলা গলায় চমৎকার উচ্চারণে তার পাঠ হয়ে উঠত অপূর্ব। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ধারা জলের ঘরের অদূরে বিশাল বাদাম গাছটার মাথায় ঝরে পড়ত। কালো মেঘে ঢাকা আকাশের ছায়া নামত পুব দিকের ছোট খালটার বুকে। পাঠ শুনতে শুনতে আমরা চলে যেতাম রূপকথার দেশে।

সুবিমলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আমাদের এত গর্বের এত আদরের সেই সুবিমল আজ কোথায় হারিয়ে গেল!

অফিস-ফেরত কলেজ ষ্ট্রিটের ফুটপাথের ধারে ধারে পুরানো বই খুজে বেড়াই। কে জানে, হয়ত কবি সুবিমল এখানেই কেথোও আত্মগোপন করে আছে। বই উল্টে দেখি, পাল্টে দেখি। কিনি বড় কম। দোকানী অপ্রসন্ন হয়।

ট্রামে উঠতে উঠতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। যাঃ, ওধারটা দেখা হ'ল না আজ। মুখচোরা সুবিমল হয়ত বা ওরই কোথাও বিবর্ণ ছিন্ন মলাটের আড়ালে নীরব হয়ে আছে।

আয় সখী তোর উকুন বেছে দি

শ্রীরবি গুপ্ত

এক যে আছে নোংরা মেয়ে—চান করে না কভু,
বকো-ঝকো তবু।
রাঙায় সদা লিপস্টিকে ঠোঁট, মুখভরা পাউডার—
মরি, আহা সাজের কি বাহার!
সবাই যখন পড়তে বসে—বলবে শুয়ে: 'সকাল হ'ল কি?'
আলসে এমন—দাঁত মাজে না যতই করো ছি—ছি—ছি!
বিদকুটে তার চলন-বলন, বিদকুটে তার হাসির ধরন—
বিছছিরি তার হাঁচি,
ভুলেও তোমরা কেউ যেও না, কেউ যেও না, তাহার কাছাকাছি!
সেদিন হ'ল কি: গাব গাছে যে পেত্নি আছে তার যে আছে ঝি
দেখতে পেয়ে বললে তারে: "আয় সখী তোর উকুন বেছে দি।"

পাকা চুল

শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান সকলের মাথায় অনেক পাকাচুল করে দেয় না কেন, তবে তো মুন্না টুকটুক করে পাকা-চুল বাছতে পারত! পাকাচুল বাছতে বড় ভাল লাগে ওর। কিছুকাল আগেও বাবা ওকে দিয়ে পাকা চুল বাছাত।

মনে আছে মুন্নার। বিশেষ করে ছুটির দিন দুপুরে খেয়ে যখন বাবা শুয়ে পড়ত, তখনই মুন্নার ডাক পড়ত।

মুন্নি, শুনে যাও একবার।

পাশের বাড়ির শিবানীর সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলা তখন যত জমেই উঠক না কেন, মুন্না ছুটে চলে আসত বাবার মাথার কাছে।

—পাকাচুল বাছব বাবা?

—হ্যাঁ, এই ডান দিকটায় বাছ।

চারটে এক পয়সা কিন্তু?

বাবা হেসে বলত,—না, আটটা।

মুন্না মাথা নেড়ে খাট চুল দুলিয়ে বলত,—আচ্ছা, ছ'টা। ছ'টা এক পয়সা।

বাবা চোখ বুজে হাসত।

মুন্নার হাত নিশপিশ করত, একটা করে পাকা চুল বাছত আর মুখখানা ওর হাসিতে ভরে উঠত। এক, দুই, তিন, গুণতে গুণতে বাছত। কি মজা লাগে পাকা চুল বাছতে। পাঁচ সাতটা কাঁচা চুলের ভেতর থেকে সাদা চুলটি দু'হাতের সরু সরু চার আঙুলে আলাদা করে নিয়ে, দু' আঙুলে চেপে ধরে টান। পট পট করে শব্দ হোত আর মুন্নার কালো চিকচিকে চোখের তারা দুটি আরও ঝিকমিকিয়ে উঠত।

এক-আধটা যে ফস্কে যেত না তা নয়, তবে খুব কম ফস্কাত। মুন্না ওস্তাদ বাছুনি, ওর মত পাকা চুল বাছতে কেউ পারে না। শিবানী, ঘটু, শম্পা, তানা, কত মেয়ে তো রয়েছে। একজনও ওর মত পটাপট পাকাচুল বাছতে পারে না।

বলতে কি, কারো মাথায় পাকা চুল দেখলেই ওর হাত নিশপিশ করে। হাতের আঙুলের ভেতর যেন পিঁপড়ের সুড়সুড়ির মত একটা সুড়সুড়ি লাগে। দু'হাতের আঙুল ডলতে ডলতে পাকা

চুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও অস্থির হয়ে ওঠে। স্কার্টের তলাটা এদিক-ওদিক করে বার বার নড়ে-চড়ে বসে। ভেতরে একটা ছটফটানী হতে থাকে। অস্থির হয়ে ওঠে মুন্না। মনে মনে ভাবে মিশমিশে কালো চুলের ভেতর দু'চারটে পাকা চুল থাকলে তাকে উপড়ে ফেলে দিতে কি আরাম! এ যেন সবুজ ঘাসের বাগানে হলদে রঙের শুকনো দূর্বার মত। শুকনো দূর্বা তুলে ফেলতে না পারলে বাগানের কোনো ছিরি থাকে না। শুধু কি তাই। বাগান থেকে শুকনো দূর্বা মচমচ করে তুলে ফেলতে যেমন একটা আরাম হয়, ও তেমনি একটি আরাম পায়। কালো মেঘলা আকাশে সাদা সাদা বকগুলো তাড়াতে কার না মজা লাগে। এ যেন একটা মজার খেলা।

শম্পা বলে,—দুর দুর, আমার পাকা চুল তুলতে ভাল লাগে না। তার চেয়ে বরং ঘামাচি মারতে ভাল লাগে।

মুন্না অবাক হয়ে হেসে বলে,—সে কি রে বোকা, ঘামাচি তো বাছতে হয় না। পাকাচুল বাছতেই তো মজা।

—ঘামাচিতে কেমন পুট পুট করে আওয়াজ হয়!

—পাকাচুলেও হয়। বেতো চুলে আওয়াজ বেশী হয়।

শম্পা তর্ক করে,—ঘামাচি পাকাচুলের মত হ্যাংলা নয়, বছরে মাত্তর একবার আসে, তাও গরম পড়লে। সকলের কাছে আসে না। ঘামাচির একটা মান-সম্মান আছে। এক একজনের উপর দয়া হয়, তার গায়ে ফুটে বেরোয়। পাকাচুল তো হেংলু। সক্কলের কাছেই আসবে।

মুন্না রেগে যায়,—যা যা, পাকাচুলের মান অনেক বেশী। মাথায় আসে, যেন মাথার মণি। আর ঘামাচি! দুর দুর, পায়ে বুকে পিঠে যেখানে-সেখানে এসে বসলেই হোল। একটা নিয়মকানুন নেই, কারো গায়ে এলো, কারো গায়ে এলো না, যেন পাগলা! কিছু ঠিকঠিকানা নেই, বসবার কোন জায়গা-বেজায়গা নেই। দু'চক্ষে দেখতে পারি না ঘামাচিকে।

শম্পা আরও রেগে বলে,—কিসের সঙ্গে কিসে! ঘামাচির ভেতের কেমন রস আছে, দেখতে কত সোন্দর।

—আর বলিস নি! মুন্না রেগে যায়। ঘামাচির আবার রূপ! হাতে করে নিয়ে দেখাতে পারিস? কৌটটায় পুরে রাখতে পারিস? পাকাচুল একটা জিনিস বটে! মাথা থেকে তোল, হাতে করে দেখ, কৌটায় জমিয়ে রাখো। পোড়ালে পুড়বে, ভেজালে ভিজবে, রাখাল থাকবে, জমালে জমবে। রাখ দিকিনি, একটা ঘামাচি দু'দিন জমিয়ে?

শম্পা রেগে-মেগে বলে,—যা যা তোর সঙ্গে আর কথা বলব না। আড়ি করে দিলুম।

—আড়ি তো আড়ি! ভারী বয়ে গেল।

শম্পার সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। কথা বন্ধ হোল তো হোল, তাই বলে পাকাচুলকে শম্পা যাচ্ছেতাই করে বলবে, তা চলবে না। ঘটু কিন্তু শম্পার মত এমন একচোখো নয়।

ঘটুর সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল শম্পাকে নিয়ে, মুন্না জানালো, শম্পার সঙ্গে ওর আড়ি হয়ে গেছে। কারণটাও জানাল। ঘটু সব শুনে ওর পুতুলের বেনারসী শাড়ীখানা সযত্নে ভাজ করতে করতে বললে,—তুইই সমান। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আছে, পাকা সবই ভাল, পাকা চুল ভাল, পাকা আম ভাল, পাকা তাল ভাল, পাকা বেল, পাকা লিচু সব ভাল।

মুন্না একগাল হেসে বললে,—তবে তুই বল একবার!

ঘটুর ওপর খুব খুশী হয়ে মুন্না বললে,—তোর মেয়ের বিয়েতে আমি আটআনা চাঁদা দোব ঘটু।

ঘটু মুখ গম্ভীর করে বললে,—তবে তো ভাই খুব উবগার হয়। গরীবের মেয়ে, পাঁচজনের কাছে চেয়ে-চিন্তে বিয়ে দিচ্ছি। তার ওপর আবার ছেলে পক্ষের মীতু বলেছে, গলার চার ছড়া পুঁথির হার চাই, কোথা থেকে কি করি!

মুন্না মনবেদনা জানাল,—তা তো বটেই, কথায় বলে মেয়ের বিয়ে!

এমনি করে আরো কয়েক মাস বেশ কাটল, একদিন হঠাৎ মুন্না দেখল, তার বাবার মাথায় আর একটা পাকাচুলও নেই।

রবিবার কিংবা অন্য কোন ছুটির দিন বাবা আর ওকে ডাকে না। পাকাচুল বাছতেও বলে না।

প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গেল, হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটল কি করে! রাতারাতি পাকাচুল সব কাঁচা হয়ে গেল!

তা হয় তো হবে, কাঁচাচুল যদি পাকতে পারে, তবে পাকাচুলও কাঁচিয়ে যেতে পারে। কাঁচা পাকা হলে পাকা কাঁচা হবে না।

আরো খানিকটা ভেবে দেখল, না, তা তো হয় না। কাঁচা আম পাকে, কিন্তু পাকা আম তো কখনো কাঁচা হয় না। এমন তো সে কখনো শোনেনি, দেখেও নি।

বাড়িতে পাকা আম এনে সে দেখেছে, পাকা আম পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কাঁচা হয় না।

তার বাবার চুল ফিরে আবার কাঁচা হবে কি করে? তবে কি পচে গিয়ে অমন কালো রং হয়ে গেল? তাই হবে।

একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করল—বাবা তোমার চুল কি পচে গেল?

—পচে গেল!—বাবা অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে।

মুন্না বললে,—তবে পাকা চুলগুলো কি হোল ?

—অ ! বাবা হাসল,—সব কাঁচা হয়ে গেছে।

মুন্না বাবার কথায় সামান্য প্রতিবাদ করল,—তা কি করে হয় ! পাকা আম তো কাঁচা হয় না, পচে যায়।

বাবা ওর দিকে তাকাল,—বেশ বলেছিস তো ! তোর বুদ্ধি আছে ! তবে হ্যাঁ, পাকা থেকেও কাঁচা হয়। পাকা আমের আঁঠি পুঁতলে তার আবার গাছ হয়ে কাঁচা আম হয়। বুঝলি ?

মুন্না ভাল করে বুঝল না। ওর মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। মুখ শুকনো করে সেখান থেকে উঠে গেল। বুঝল, আর কোন আশা নেই। হাত ওর যতই নিশপিশ করুক, আঙুল যতই সুড়সুড় করুক, পাকা চুল ও পাবে কোথায় ? আশেপাশের বাড়িতে দু' চারজন আছে বটে, কিন্তু তাদের সব চুল সাদা। শম্পার ঠাকুমা, ঘটুর পিসেমশাই, ওদের সব চুল সাদা। বাছতে গেলে কালো চুল বাছতে হয়। মন্দ নয়, অনেক শাদা চুলের ভেতর থেকে কালো চুল বাছতেও মজা হয়তো লাগত, কিন্তু যার বাছবে, সে ওকে চড়-চাপড় কসিয়ে না দেয়। কাঁচা চুল বাছতে গেলে লাগে। পাকা চুলে লাগে না।

উপায় তো আর কিছুই নেই।

মুন্না মন-মরা হয়ে গেল। ভাল করে ভাত খেতে পারে না। খিলখিলিয়ে হাসে না। দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করতে ভাল লাগে না। ভাল জামা পরতে ভাল লাগে না, বিষ্টিতে ভিজতে খারাপ লাগে, রোদের ভেতর বেরোতে মোটে আরাম লাগে না।

মোদ্দা কথা, মুন্নার আর কোন কিছুতেই কোন টান নেই, আরাম নেই।

সব সময় মন-মরা হয়ে রয়েছে। ফোঁস ফোঁস করে মাঝে মাঝে একটা কান্নার মত নিঃশ্বাস ফেলে। জানালার ধারে চুপ চাপ বসে থাকে।

জানালার ধারে বসে একটা বেড়াল দেখতে পেয়ে মুন্নার চোখ দুটো একটু খুশী-খুশী হয়ে উঠল। বেড়ালটা কালো, গায়ের জায়গায় জায়গায় কিছু সাদা লোম রয়েছে। যাক, পাওয়া গেছে ! মুন্না ছুটে বাইরে গেল। গলির আস্তকুড়ের কাছ থেকে বেড়ালটা ধরে নিয়ে এল। একেবারে কোলে করে। সোজা কলতলায় এনে বেড়ালটিকে জল ঢেলে চান করাল। মুখে বকর বকর করছিল,—তোকে মাছ দোব, কাঁটা দোব, মুড়ো দোব, লক্ষ্মী সোনা ! আদর করে বেড়লটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। কি সুন্দর ওর গা, কালো লোমের জায়গায় জায়গায় সাদা লোম। ওর গা-টা ঠিক একটা লম্বা মাথার মত। ভর্তি বড় বড় কালো চুল, জায়গায় জায়গায় পেকেছে ! হাতের আঙুল সুড়সুড় করছে মুন্নার। যেন এক হাজার কালো পিঁপড়ের সুড়সুড়ি। খুশীতে-হাসিতে অনেক দিন পরে

ওর মুখখানা ভরে উঠেছে। খুব যত্ন করে আদর করে বেড়ালটিকে ধুইয়ে-মুছিয়ে ঘরে নিয়ে কোলে করে বসল,—বোস, বেশ আরাম করে বোস, তোর পাকা চুল বেছে দিই। বলতে বলতে গোটাকতক সাদা লোম ধরে যেমন টান মারা,—ফ্যাঁস ফোঁস—করে বেড়ালটা ওর পায়ে খামচে রক্ত বার করে দিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাল।

—ওরে বাবা রে—বলে ভয়ে মুন্না চেঁচিয়ে উঠল।

মা তাড়াতাড়ি রান্না ঘর থেকে চলে এল।

—কি হোল রে?

মুন্না কাঁদতে কাঁদতে জানাল, বেড়াল খামচে দিয়েছে।

—কেন, বেড়াল-টেড়াল নিয়ে খেলা করতে যাস?

তুলো আয়োডিন লাগান হোল। চোখে জল নিয়ে মুন্না ভাবল, বেড়ালটা ভারী নেমকহারাম। এত করে আদর-যত্ন করে পাকা চুল বাছতে বসল, তা একটু চোক বুজে আরাম করে শুয়ে থাকবে, তা নয়—সাধে কি আর বেড়াল বলে! পাকা চুল বাছার মর্ম ওরা কি বুঝবে?

আবার মুন্নার মন খারাপ। দেহ খারাপ। খাওয়া-নাওয়া সব বন্ধ হয়ে এল।

এমনি এক সময়ে শিবানী একদিন ওদের ঘরে এল একটা মস্ত ছবির বই নিয়ে। মুন্নাকে ছবির বই দেখাবে। শিবানী ওদের চেয়ে বয়সে বড়। তাই মাঝে মাঝে শিবানী ওদের গল্প শোনায়, ছবি দেখায়, খেলা শেখায়, খেলায় কোন ভুল হলে শুধরে দেয়। শিবানী যা বলে ওরা মেনে নেয়।

আজও গল্প করে ছবি দেখিয়ে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে শিবানী উঠল।

বললে,—হ্যারে মুন্নি তুই তো চুল বাঁধতে পারিস, বেশ বড় বড় চুল হয়েছে। আয় তোর চুল বেঁধে দি, কিলিপ ফিতে আছে?

মুন্না বললে—তাকের ওপর মায়ের ফিতে আছে।

—ওই ফিতে দিয়ে বেঁধে দি, তোর মা অবাক হয়ে যাবে। বলে এক গাল হেসে শিবানী তাকের কাছে ফিতে খুঁজতে গিয়ে বলে,—হ্যাঁ রে কলপ রয়েছে কেন? তোর বাবা মাখে বুঝি? আমার বাবাও চুলে কলপ দেয়।

—কলপ কি? মুন্না অবাক হয়ে বলে।

—ধুর বোকা! কলপ জানিস না। মাখলে পাকা চুল কালো হয়।

মুন্না এগিয়ে গিয়ে শিশিটা হাতে নেয়।

এবার শিবানী চুল বাঁধতে চাইলে মুন্না বলে, সে আজ চুল বাঁধবে না। শিবানী চলে যায়।

মুন্না কলপের শিশিটা ফ্রকের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বাইরে এসে আস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়।

—'পাজী মেয়ে! কোথায় যাচ্ছিস তুই শিশি নিয়ে! দে শিগ্গির!'

পরদিন সকালে মুন্না পড়ছিল, ওর বাবা চান করে এসে তাকের দিকে তাকিয়ে ওর মাকে ডাকল, —ওগো শুনছ?

—কি? ওর মা ঘরে এল।

—আমার সেই ইয়েটা কোথায়?

কি?

মুন্নার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ওর বাবা বললে,—ওই যে ইয়ে—চান করে যেটা মাখি।

—কি করে বলব?

অনেক খোঁজাখুঁজি হোল। পাওয়া গেল না।

সেদিন মুন্না লক্ষ্য করল, বাবা অফিস থেকে ফেরবার সময় আবার একশিশি কলপ নিয়ে এসেছে। ভোর বেলা বাবা যখন কল ঘরে গেল, মুন্না সেটা ফ্রকের তলায় নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এল।

সেদিনও স্নানের পর চেঁচামেচি—ইয়েটা কোথায় গেল বল দিকিনি? কি আশ্চর্য ব্যাপার! বাড়িতে ভূতটুত আছে নাকি?

তন্ন তন্ন করে খুজেও পাওয়া গেল না। মুন্না চুপচাপ রইল। বাবার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখল, কালো চুলের মাঝে মাঝে লালচে পাকা চুল দেখা যাচ্ছে।

সেদিনও অফিস থেকে ফেরবার পথে আর এক শিশি কলপ নিয়ে এল ওর বাবা। পরদিন ভোরে ওটা পাচার করতে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা পড়ল মুন্না।

—পাজী মেয়ে! কোথায় যাচ্ছিস তুই শিশি নিয়ে! দে শিগ্গির।

মুন্না শক্ত করে শিশিটা ধরে রইল।—দোব না, আমি দোব না।

—শিগ্গির দে।

মা ওর কাছ থেকে শিশিটা জোর করে কাড়তে গেল। বাবা কলঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে মুন্নার হাত থেকে পড়ে শিশিটা ভেঙ্গে গেল।

মুন্না তখন কেঁদে চিৎকার করছে।—দোব না আমি, দোব না। আমি বাবার পাকা চুল বাছব।

ওর বাবা কোন কথা বলল না।

তারপর থেকে মুন্নার বাবা কোনদিন আর কলপ মাখেনি।

মুন্না মনের আনন্দে বাবা পাকাচুল বাছে এখনো।

লিমেরি

॥ ১ ॥

রাধামাধব চৌধুরী
রাজার পাটে নেই জুড়ি।
বেড়ায় এঁটে মেডেল বুকে,
লোককে দোলায় হাজার সুখে;
বাড়ি ফিরে খায় মুড়ি।

॥ ২ ॥

রমাকান্ত মজুমদার
গান শিখেছে চমৎকার।
তাই না শুনে বিয়ের রাতে
বউ পালাল অযোধ্যাতে;
ছুটে এল সাতটা ষাঁড়।

॥ ৩ ॥

এক যে ছিল জাদুকর
বিখ্যাত দেশদেশান্তর।
দেহ থেকে মুণ্ডু কেটে
অনায়াসে দিত এঁটে
জ্বরেই নিজের দেহান্তর।

॥ ৪ ॥

এক যে ছিল গণৎকার
বলত ভাগ্য পরিষ্কার।
পারত ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে
তাবিজ-পাথর-মাদুলিতে;
নিজের ভাগ্যে গুনাগার।

॥ ৫ ॥

শক্তিপদর ডাক্তারি;
নামেই অসুখ দেয় পাড়ি।
কাটাছেঁড়ায় তার সমান
কেউ নেই তার লাখ প্রমাণ;
জুড়তে গেলেই নেই নাড়ি।

জীব-বিদ্যুৎ কোষ

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

দুই শত বছর আগে ইটালি দেশের শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার গ্যাল্‌ভ্যানি তাঁর পরীক্ষাগারে লক্ষ্য করেছিলেন একটা মৃত ব্যাং-এর পা দুটো হঠাৎ নড়ে যায়। তাই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন জীব-কোষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে, এবং সেই বিদ্যুতের নাম দিয়েছিলেন অ্যানিম্যাল ইলেক্‌ট্রিসিটি। কিন্তু তাঁরই সমকালীন ইটালি দেশেরই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভোল্‌টা এই মতটাকে নাকচ করে দেন। তিনি বলেন এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করে দেন যে, বাইরের কোনো একটা অলক্ষ্য বিদ্যুতের শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্যাং-এর পা দুটো নড়ে। তিনি বললেন, যে জীবের দেহ বিদ্যুৎ-উৎপাদক নয়, বিদ্যুৎ-গ্রাহক বা বাহক (**conductor**)। সকলে তা মেনে নেন।

কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীরা আজ এই দু' শ বছর পরে ভোলটার মতটাকেই নাকচ করে গ্যালভ্যানির মতটাই বাহাল করছেন। এ যেন বিজ্ঞানের এক ডিগবাজী খেলা! প্রাণী থেকেও যে একদিন নিয়মিত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর কোনো মতদ্বৈধ নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা জানেন মানুষের পেশী এবং স্নায়ুর যে যুগপৎ কার্যাবলী, তা সংঘটনের কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া জানতে গিয়ে ইলেক্‌ট্রোড অর্থাৎ তড়িৎদ্বার ব্যবহার করা হয় আজকাল। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সিল-ভেনিয়ার ভ্যালি ফর্জে জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির মহাকাশ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ফলে একটা আশ্চর্য ভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা জানতে পারা গেছে। এই কোম্পানির বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ চিন্তার পর একটা অভিনব পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করেন। একটা ইঁদুরের পেটের মধ্যে দুইটা ইলেক্‌ট্রোড অতি দক্ষতা ও সন্তর্পণের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ইঁদুরটার কোন কষ্ট না হয় এবং ছট্‌ফট্‌ না করে। ইলেক্‌ট্রোড দুটোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল খুব সরু তার। পরিষ্কার বোঝা গেল ইঁদুরের দেহ থেকে ১৫৫ মাইক্রোওয়াট্‌ শক্তির বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই বিদ্যুৎ-ধারার শক্তিতে একটা বেতার প্রেরক যন্ত্রও চালানো হ'ল।

আর ডক্টর ফ্রেডারিক সিসলার নামক বিজ্ঞানী আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি করলেন কি, ইঁদুরের চেয়েও ক্ষুদ্র জীবে অর্থাৎ জীবাণুর পর্যায়ে তাঁর পরীক্ষা ও গবেষণা নিয়ে গেলেন। তিনি একটা টেস্ট টিউবের (পরখ-নল) মধ্যে সমুদ্রের নোনা জল ভরে নিলেন, তার মধ্যে এক ধরনের জীবাণু কিছু ছেড়ে দিলেন, যারা সমুদ্রের জলেই তাজা থাকে। তাদের খাদ্যরূপে অল্প পরিমাণ চিনি সেই জলে মিশিয়ে দিলেন। এইবার টেস্ট টিউবের মধ্যে এক জোড়া ইলেক্‌ট্রোড কায়দা করে বসিয়ে দিলেন। তখন দেখতে পেলেন সেই ইলেক্‌ট্রোড দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে

চলেছে। এই প্রবাহের দ্বারা ছোট্ট বাল্ব জ্বালানো এবং ট্র্যানজিস্টার রেডিও চালান সম্ভব হ'ল। এই জীবাণুর টেস্ট টিউবগুলি যদি বাড়ানো যায় এবং সবগুলি থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি একত্র করা যায়, তবে বিদ্যুৎ-শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে ঘরে ঘরে আলো জ্বালান, পাখা চালান ইত্যাদি চলতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

জীবাণুদের মূল্যবান পদার্থ এই চিনি না খাইয়ে, যে যে জীবাণু জঞ্জাল ও আবর্জনায় বৃদ্ধি পায়, সেই সব জীবাণু বেছে বেছে নিলে বিদ্যুৎ-উৎপাদনে খরচও লাগবে না। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রচুর কয়লার প্রয়োজন হয়। তাতে খুব খরচ পড়ে। তাছাড়া কয়লা সুদূর ভবিষ্যতে চিরদিনই পাওয়া যাবে কিনা তার স্থিরতা নাই। আর জল-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) সব জায়গায় উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। এক স্থান থেকে অন্যত্র তাকে বহন করে নিয়ে যেতেও অনেক খরচ লাগে। তাই এই সস্তায় উৎপাদিত জীব-বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ প্রচুর সম্ভাবনা-পূর্ণ।

আজকাল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ঊর্ধ্ব দিকে। অর্থাৎ মহাকাশপানে। আর জীবাণুকোষগুলি হাল্কা এবং ক্ষুদ্র বলে মহাকাশযানে সহজে বহন করা সম্ভব হবে। ব্যাপারটা বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকলেও, ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তড়িৎ-কোষ বাজারে ছাড়াও হয়েছে এবং ক্রেতার অভাবও হয়নি। নূতন কিছুর দিকে বিজ্ঞানীদের আশাপূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিতই থাকে সব সময়েই।

শ্রীনিশিনাথ সেন

সূয্যি-মামা দিনের বেলায়
চাঁদ-মামাটা কৈ ?
নেইকো দেখে ইচ্ছা করে
আমিই তবে হই।
রাত্রে দেখি চাঁদ-মামাকে
সূয্যি-মামা নাই,
ভাবি তখন ভাগ্যি আমি
চাঁদ হইনি তাই।

ঘট্‌তো মজা নইলে পরে
দেখ্‌তো সবাই মোরে,
বল্‌তো সবাই নকল মামা
আসল নয়তো ওরে !
আসল চাঁদকে দিনের বেলায়
কোথায় পাবে ভাই ?
পরের নিয়ে ফুর্তি করে
রাত্রি বেলায় তাই।

হারকিউলিসের শেষ অভিযা[ন]

শ্রীসুধীরকুমার করণ

[গ্রীক দেশের পৌরাণিক বীর হারকিউলিস, রাজপুত্র হয়েও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে ইউরিসথিয়াস নামক তাঁরই এক আত্মীয়ের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুক্তিপণ হিসাবে হারকিউলিসকে অনেক অসাধ্যসাধন করতে হয়েছিল। গ্রীক পুরাণে সেই সব রোমহর্ষক অসাধারণ কাহিনী বর্তমান। এ কাহিনীতে হারকিউলিসের সর্বশেষ অভিযানের কথা বর্ণিত হ'ল।]

শেষের কাজটি শুধু ভয়ংকর নয়, দেবতারও অসাধ্য। আসলে ঘটনাটি গোরু চুরির, কিন্তু সেই গোরুর অধীশ্বর সেরিয়ম নামক এক দানব। তার সব গোরুর রঙই লাল। একত্রে যখন চলে, মনে হয় রক্তসমুদ্র ঢেউ তুলে চলেছে। সংখ্যাহীন এই সব গোরুকে সব সময় পাহারা দিচ্ছে একটা ভয়ংকর কুকুর। তার দুটো মাথা। ওদিকে দানবের চেহারাও মৃত্যুর মত। তার তিন দেহ, তিন মাথা, ছয় হাত—ত্রিদেহী, ত্রি-আনন এবং ষড়্‌ভুজ।

ইউরিসথিয়াস জানতো যে ওখানে যারা যায়, তারা আর ফিরে আসে না। এমনিতে ওখানে যাওয়াই অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারলেও ফিরে আসা আর সম্ভব নয়।

সে এক প্রাণঘাতী যাত্রা। মরুভূমির পর মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হয়। হারকিউলিস চিন্তিত হয়ে পড়ল। আত্মশক্তিতে যতই বিশ্বাসী হোক না কেন, পরিজ্ঞাত মৃত্যুর মুখে কে যায়! কিন্তু দাসত্বের অপমান মৃত্যুর চেয়েও বেশী বলেই হারকিউলিসের যাত্রা হ'ল সুরু।

মরুভূমির সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো সে। আকাশে অ্যাপোলো—সূর্য, আগুন ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে; মরুভূমি অগ্নিময়! রৌদ্রদগ্ধ হারকিউলিস মৃত্যুপণ করেই এগিয়ে গেল। তৃষ্ণায় যখন তার কণ্ঠ বিশুষ্ক, জিভ থেকে যখন আর এক ফোঁটা রস আহরণ করা যায় না, তখন তৃষ্ণার্ত ক্রুদ্ধ হারকিউলিস সূর্যের দিকে কয়েকটা তীর নিক্ষেপ করল। এতে পরম বিবস্বান-সূর্যদেবের রোষাগ্নি বৃদ্ধি পাবারই কথা। সূর্যদেব কিন্তু হারকিউলিসের বীরত্বকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাই ক্রোধের পরিবর্তে তিনি পাঠিয়ে দিলেন এক স্বর্ণ-তরণী।

হারকিউলিস নিশ্চিন্ত হয়ে দানব-পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করল। মরুভূমি অতিক্রম করে তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল। ফলে, কুকুর ও দানবকে হত্যা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। রক্তবর্ণের গোরুগুলিকে সে ইউরিসথিয়াসের কাছে নিয়ে এল।

হারকিউলিস ভাবল, এইবার মুক্তি। আঃ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা; দাস নয়, মুক্ত। সবাই

ভাবল, হারকিউলিস এবার মুক্ত। ইউরিসথিয়াস ভয় পেল। হারকিউলিসকে মুক্তি দিলে তার নিজের প্রাণ আর নিঃসংশয় থাকবে না। তাই পাপিষ্ঠ রাজা ইউরিসথিয়াস হারকিউলিসকে ডেকে বললো—তুমি অনেক অসাধ্যসাধন করতে পেরেছ; তোমাকে আমি মুক্তি দিতে চাই; কিন্তু তার আগে আরও দুটি কাজ তোমার করণীয়।

হারকিউলিস বললো—আর দুটি কাজ করার কথা তো হয়নি। কথা ছিল, ন'বার তোমার আজ্ঞা পালন করলেই মুক্তি পাব।

ক্রুর ইউরিসথিয়াস বললো—ঠিকই, সেই কথাই ছিল, কিন্তু কথা ছিল সব কাজ তুমি একাই করবে। অথচ সেই নবশীর্ষা সর্প হত্যায় সময় তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের সাহায্য নিয়েছ। অগিয়ানের গোয়াল সাফ করতে গিয়ে, নদীর নালা কাটবার জন্য তুমি লোকজনের সাহায্য নিয়েছ। অতএব—

হারকিউলিসের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ক্রোধে বিচঞ্চল হয়ে বলল—আর কোন কিছু শুনতে চাই না। সেই দুটো কাজের পরিবর্তে আর দুটো কাজ করে দিচ্ছি। বল, কি করতে হবে।

ইউরিসথিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। হেসে বললো, আমি জানতুম, তুমি ভয় পাবার ছেলে নও। যাই হোক এবারে তোমাকে তেমন কিছু কঠিন কাজ করতে হবে না। শুধু হেস্‌পেরিডিসের উদ্যান থেকে তিনটি সোনার আপেল নিয়ে আসতে হবে।

হারকিউলিস জানে না কোথায় সেই উদ্যান; হারকিউলিস জানে না কি বিপদ সেখানে বর্তমান।

সেই দেব-উদ্যানের প্রহরী ভয়ংকর একটি শতমুখ ড্র্যাগন। বিনিদ্র চোখের আগুন ছিটিয়ে দিনরাত সেই বাগান পাহারা দিচ্ছে সে। নিজের মাথার মণির মত আগলে বসে আছে সর্বক্ষণ। নির্ভীক হারকিউলিস সেই বাগানের খোঁজে আবার অভিযাত্রী হ'ল। দৈত দানা রাক্ষস আর আরো সব ভয়ংকর প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই ক'রে, হত্যা ক'রে, অনেক দেশ-বিদেশ, নদী-নালা, বন-পাহাড় পেরিয়ে গদা হাতে চললো হারকিউলিস। কিন্তু বাগান কোথায়? সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াল সে। এই অশ্রান্ত পরিভ্রমণের ক্লান্তি তাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে এল। হারকিউলিস বুঝতে পারল, এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা।

একদল পরী তার এই অবস্থা দেখে, করুণা করে বললো,—'বুড়ো সাগর-মানুষ নেরিয়াসের কাছে যাও; সেই বুড়ো সব জানে; সেই-ই তোমাকে বলে দিতে পারবে, কোথায়—হেসপেরিডিসের বাগান।

ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হারকিউলিস চললো, নেরিয়াসের খোঁজে। শেষপর্যন্ত নেরিয়াসের সাক্ষাৎও সে পেল। বুড়ো তখন ঘুমোচ্ছিল সমুদ্রের শ্যাওলা প'রে। ওকে ধরবার চেষ্টা করে বারবার অকৃতকার্য হ'ল সে; এমনি পিচ্ছল তার শরীর। নিরুপায় হয়ে, ওকে বেঁধে রাখলো সে। কিন্তু তাতেই কি পরিত্রাণ আছে! বুড়ো সাগর-মানুষ আবার ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপী হতে পারে। হারকিউলিস নাছোড়বান্দা।

বুড়ো নেরিয়াস সন্তুষ্ট হ'য়ে ওকে স্বর্গোদ্যানের পথ বলে দিল। পশ্চিম সমুদ্রের পারে, এক দ্বীপে সেই উদ্যান। বললো,—'এই পর্যন্ত বলতে পারি বাপু, বাকীটা প্রমিউথিস বলতে পারে। মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করার জন্য দেবতারা ওকে ককেশাস পর্বতের একটা বরফ-ঢাকা চূড়াতে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন তিরিশ বছর হ'ল! বেচারী সেখানে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কুঁকড়ে, বরফে জমে, বেঁচে আছে মাত্র। শকুনি আর ঈগলপাখি ওর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

হারকিউলিসের খুবই দুঃখ হ'ল মনে এ সব কথা শুনে।

প্রমিউথিসের কাছে পৌঁছে দেখল, সত্যি প্রমিউথিস বাঁধা রয়েছে পাহাড়ের চূড়োয়, আর একটা হিংস্র পাখি তার মাংস খাবার লোভে তার মাথার উপর পাক দিচ্ছে। হারকিউলিস সাঁই করে তীর নিক্ষেপ করে পাখিটাকে নিহত করলো আর শেকল খুলে মুক্ত করলো প্রমিউথিসকে। দীর্ঘ দিন ধরে চিন্তায় চিন্তায় একাকীত্বে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল প্রমিউথিস। তার মুক্তিদাতাকে অভিনন্দিত করে বললো,—'অ্যাটলাস' পৃথিবী মাথায় ধরে আছে, তার কাছে যাও; সেই-ই একমাত্র, সেই বাগানে যেতে পারে, আর কেউ নয়।'

হারকিউলিস এবারে চললো আফ্রিকায়, অ্যাটলাসের কাছে। পথে আর এক বিপদ। মিশর দেশে ওকে বন্দী করা হ'ল, বলি দেবার জন্য। হারকিউলিস অবশ্য বেশ মজা উপভোগ করছিল ওদের কাণ্ড দেখে। তারপর পটপট করে বাঁধন-দড়ি ছিঁড়ে এক ঘুষিতে রাজার মাথা ফাটিয়ে, চললো গন্তব্যপথে।

অ্যাটলাসের কাছে এসে দেখলো, পৃথিবীর ভার সইতে না পেরে, ক্লান্ত অ্যাটলাস হাঁসফাঁস করছে।

দীর্ঘকায়, লৌহদেহী হারকিউলিসের দিকে তাকিয়ে অ্যাটলাস বললে,—'তুমি কে?' হারকিউলিস বললো, 'ভাই—আমি হারকিউলিস; তোমার কাছে এসেছি একটি আবেদন নিয়ে; একটু উপকার করবে।'

'বল, কি করতে পারি।'

সোনার আপেলের কথা বললো হারকিউলিস।

অ্যাটলাস বললো,—'তা'তো বুঝলুম, কিন্তু ধরিত্রীকে ধরে কে? ওকে তো আর কাঁধ থেকে নামিয়ে যেতে পারি না।'

হারকিউলিস বললো,—দাও আমার কাঁধে।

অ্যাটলাস হাসলো। বললো,—'এত সহজ হ'লে তো কথা ছিল না। আমি ছাড়া, কেউ পারবে না এ কাজ।'

হারকিউলিস বললো,—'দাও না আমার কাঁধে; দিয়ে দেখ না একবার।'

অ্যাটলাসকে বিস্মিত বিমূঢ় করে অনায়াসে সেই ভার বহন করলো সে।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অ্যাটলাস গেল দেব-উদ্যানে; নিয়ে এল সোনার আপেল। এল বটে, কিন্তু আর পৃথিবীর ভার বহন করতে রাজী হ'ল না। বললো, 'এর পর আমার বিশ্রাম। তুমিই—ধরাধর হয়ে থাকো।

বলে কি অ্যাটলাস! ভয় পেয়ে গেল হারকিউলিস। তারপর চালাকী করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলে, বললো,—'ঠিক আছে; এত কোন কাজই নয়; আমার তো বেশ ভালোই লাগছে পৃথিবী বহন করতে। তুমি শুধু একবার ধর, আমি মাথার পট্টিটা ঠিক ক'রে বেঁধে নিই—।'

স্থূলবুদ্ধি অ্যাটলাস অনায়াসে এই ফাঁদে পা দিল। হারকিউলিস চললো, আপেল নিয়ে।

ইউরিথিয়াসের দুষ্ট চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। চিন্তিত হ'ল। মানুষের কেন দেবতারাও অসাধ্য কর্ম করলো হারকিউলিস!

বললো,—'বেশ, বেশ খুব খুশী হয়েছি। এবারে চলে যাও পাতালে। সেখানে নরক দেখতে পাবে। নরকের তিন-মাথাওয়ালা কুকুর সেরবেরাস কে নিয়ে এস। মনে মনে বললো,—জীবন্ত মানুষ নরকে যেতে পারে না; অতএব যেতে হলে ওকে মরেই যেতে হবে।

হারকিউলিস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

যাত্রা করতেই হবে। এবারে দেবতারা অযাচিত ভাবে সাহায্য করলেন নির্ভীক বীর-কে। একজন দেবতা হারকিউলিসের সঙ্গী হলেন স্বেচ্ছায়। ভূত-প্রেত মৃতাত্মারা ওকে ভয় দেখাতে লাগলো। হারকিউলিস তরবারী নিষ্কোষিত করলো। সঙ্গী দেবতা বললেন, চলে এস, তরবারী দিয়ে ওদের হত্যা করা যাবে না। ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চল। নরক রাজ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হারকিউলিস দেখলো, ওর কয়েকজন পুরানো বন্ধু, কালো শৃঙ্খলাবদ্ধ। ওরা কেঁদে উঠে বললো,—'হারকিউলিস বাঁচাও আমাদের; নরক থেকে মুক্তি দাও।'

হারকিউলিসের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে ওরা সঙ্গী ছিল একদিন। ওদের দুরবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেল সে। নরকের অধিপতি প্লুটোর বন্দী ওরা।

একজনকে মুক্ত করলো হারকিউলিস ; কিন্তু আরেকজনকে মুক্ত করতে গেলে, সেই কালো এমনি কাঁপতে লাগলো যে, হারকিউলিস নিরুপায় হয়ে তাকে মুক্ত করার আশা ত্যাগ

'এগিয়ে গিয়ে দেখলো হারকিউলিস, কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে।'

ভাবছিল, কি করা যায়! ঠিক সেই মুহূর্তে প্লুটোর একটি যমদূতাকৃতি ষাঁড় ছুটে এসে আক্রমণ করলো হারকিউলিসকে। হারকিউলিসও সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের দুই শিঙ ধরে আছড়ে মারলো তাকে। ষণ্ড নিহত।

ছুটে এল ষাড়ের রাখাল ; রাখালবালক নয়, একজন যমদূত। সেও নিহত হ'ল। এরপর সেই অন্ধকার পাতালপুরীকে লণ্ডভণ্ড করতে করতে এগিয়ে চললো হারকিউলিস। হঠাৎ অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা পাহাড়কে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। বিভ্রান্তি দূর হতেই দেখলো পাহাড় নয়, স্বয়ং প্লুটো। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুহূর্তের জন্য হারকিউলিস শংকিত হ'ল, কিন্তু তারপর একটা মারাত্মক তীর ছুঁড়ে মারলো প্লুটোকে লক্ষ্য করে। প্লুটোর কাঁধে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল সেটি।

যন্ত্রণায় পাতালভেদী চীৎকার করে উঠলো প্লুটো।

তারপর বিনীতভাবে বললো,—'কি চাও তুমি ?'

'তোমার তে-মাথাওয়ালা কুকুর।' হারকিউলিস দৃপ্তভংগীতে জবাব দিল।

প্লুটো বললো,—'কোনরূপ হাতিয়ার ছাড়া শুধু হাত দিয়ে যদি কুকুরটাকে ধরতে পার তো নিয়ে যাও।'

এগিয়ে গিয়ে দেখলো হারকিউলিস, কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। কী বীভৎস চেহারা! তার দাঁতে বিষ, লেজে বিষ, গর্জনে মৃত্যু! কিন্তু সময়কে হাতের মুঠোয় রাখা চাই! হারকিউলিস বাঘের মত কুকুরটার গায়ে লাফিয়ে পড়লো, তিনটে মুখকে হাত চাপা দিয়ে এক নিমেষে ঘাড়ের উপর তুলে, সোজা নরক থেকে বেরিয়ে এল সে।

কুকুরটাকে দেখেই আতঙ্কে মৃতবৎ হয়ে গেল ইউরিসথিয়াস। তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। কণ্ঠ শুষ্ক। পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান। চীৎকার করে উঠলো ইউরিসথিয়াস। হারকিউলিস, তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত, শুধু ঐ বীভৎস কুকুরটাকে তুমি আমার সামনে থেকে এক্ষুনি নিয়ে যাও। এক্ষুনি—বলতে বলতে ইউরিসথিয়াস মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

ঈশপের গল্প

ঈশপের হিতোপদেশমূলক গল্পগুলি পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে এবং এই গল্পগুলি অমর হয়ে আছে। অথচ ও গল্পগুলি নাকি আসলে ঈশপের লেখা নয়। পণ্ডিতেরা বলেন, এই গল্পগুলি লিখেছিলেন বাব্রিয়াস। এই বাব্রিয়াস ছিলেন জাতিতে গ্রীকো-ইতালিয়ান এবং ঈশপ ছিল এক নিরক্ষর ক্রীতদাস। কোন কোন পণ্ডিত আবার বলেন, তা নয়—ঈশপ বলে কোন মানুষ প্রকৃত ছিল না, ওটি হ'ল বাব্রিয়াসের ছদ্মনাম।

আঁটুলগাঁয়ের বাঁটুল

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

সকালবেলা গরু ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরেই বাঁটুল বুঝতে পারলে ব্যাপার বেগতিক। মাসীমার চোখে জল, উনোনে আগুন নেই, আর উঠোনের ধান চড়াইপাখী খাচ্ছে।

'ভাত দে মামী।'

'ভাত নেই।'

'তবে মুড়ি দে।'

'মুড়ি নেই।'

'ভাত নেই মুড়ি নেই তাহলে আমি কি খেয়ে পাঠশালে যাব শুনি?'

'তোর মামাকে জিগ্যেস কর্ গে যা।'

বাঁটুল বুঝলে ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে। শুধু ত' বাঁটুল নয় বাঁটুলের মামা চরণ গাঙ্গুলীও তো এখনি ভাত খেতে আসবে।

এখন অঘ্রাণ মাস। ধানক্ষেতে পাকাধানের গন্ধ। মামা এখন সকাল থেকে রাত অবধি মাঠে থাকে আর কিষাণদের সঙ্গে ধান কেটে কেটে গাড়ী বোঝাই করে। তাই সকালবেলা একপেট ফ্যানভাত না খেয়ে সে বেরোয় না।

চরণ গাঙ্গুলীর চরণজোড়া চরণ নিজেই দেখেনি। তার কারণ হ'ল বাঁটুলের মামার ভুঁড়িটা বেজায় বড়, আর তেমনি ভারী। দুষ্টু ছেলেরা বলে চরণ গাঙ্গুলী নাকি ভুঁড়ির ওপর জাবদাখাতা রেখে হিসেব লেখে।

বড়রা বলে চরণ গাঙ্গুলী গয়না বাঁধা রেখে টাকা দেয় আর সোনা-দানা সব খেয়ে খেয়ে ওর ভুঁড়িটা ঐ অত বড়টা হয়েছে।

সোনাদানা খেতে মামাকে দেখেনি বাঁটুল, কিন্তু সকালবেলা একটি মস্ত থালায় পাঁচপোয়া চালের গরম ভাত তার চাই-ই চাই। ভাত খেয়ে, সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে গামছায় গুড় আর মুড়ি বেঁধে নিয়ে মামা ক্ষেতে যায়। সেই ভাত আজ রান্না হয়নি।

মামাতো বোন রাধী বলল, 'আজ কুরুক্ষেত্তর হবে, দেখে নিও।'

মামার ছেলে পদাই খাগের কলম কাটছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কে ভীমের দলে আর কে দুর্যোধনের দলে যাবে বল্ দিখি রাধী?'

রাধী আরো উৎসাহিত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময়ে মামা আর মামী বেজায় ঝগড়া জুড়ে দিলে। বাঁটুলের হকচকানি লেগে গেল। কেন না তার মামী এমন শান্ত, এমন ভালমানুষ, যে তার সঙ্গে কারোই ঝগড়া হয় না। মাঝে মাঝে শুধু আঁটুল গাঁয়ের যাত্রা ভাল না, মামীমার বাপের বাড়ী মোল্লাচকের পালাগান ভাল, তাই নিয়ে মামার সঙ্গে তাক-ধুমাধুম লেগে যায়।

আজকের ঝগড়া বাঁটুলকে নিয়ে, তাতেই বাঁটুল অবাক হয়ে গেল।

মামাকে দেখেই মামী চেঁচিয়ে উঠল, 'বলি ছেলেটাকে বলি দেবার ব্যবস্থা পাকা করে এলে ?'

বলি দেবার ব্যবস্থা! পদাই, বাঁটুল আর রাধী এ ওর দিকে চাইলে।

আশ্চর্য! চরণ গাঙ্গুলী এখন আর মেঘের মত গর্জে উঠল না। মোলায়েম গলায় বললে, 'বহরমপুরের চাঁদবদন ভট্‌চাজরা এত বড়লোক, এমন করে চাইছে…'

'চাইছে বলেই ভাগ্নেকে তুমি পুষ্যি দিয়ে দেবে ?'

পুষ্যি দিয়ে দেবে! বাঁটুলকে কেউ পুষ্যি নিতে চাইতে পারে এ হেন কথাতেই বাঁটুল চমৎকার!

রাধী বললে, 'হুঁ' পুষ্যি নিয়ে নেবে! পুষ্যি নিয়ে দেখুক না! বাঁটুল দাদা তিনদিনে ওদের হাড়মাস জ্বালিয়ে দেবে না ?'

'তা ছাড়া……' পদাই ফিস ফিস করে বললে, 'বাবা ত' সবাইকে বলে বাঁটলোটার কিস্যু হবে না, ছেলে নয় ত' কঁ্যাকড়া বিছে!'

বাঁটুল অবশ্য খুব অখুশী হ'ল না। তাকে কেউ পুষ্যি নিতে চাইছে, এই কথাটাতেই যেন তার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল।

'পুষ্যি দিলে যে ও রাজার হালে থাকবে গো! চাঁদবদন ভট্‌চাজ সায়েবদের সঙ্গে নীলের কারবার করে যাকে বলে ফেঁপে উঠছে ত'? ছেলে নেই, মেয়ে নেই! আরে, আমাকে এই বড় বড় ছানাবড়া খাইয়ে বলল, 'চরণ বাবু! আপনার ভাগ্নেটিকে যদি দেন!'

'ছানাবড়া খাবার লোভে তুমি বাঁটুলকে সেই ছেলেখেকো বুড়োর হাতে তুলে দেবে? ওখানে যে ছেলেকে পুষ্যি নেয় সেই যে মরে যায় গো! টপটপিয়ে মরে যায়, এ যে আমার নিজ কর্ণে শোনা গো! চাঁদবদন ভট্‌চাজের বড় বউটা যে এখনো পেত্‌নী হয়ে ওখানে আছে গো! চাঁদনীরাতে ধপধপে সাদা কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে ঘুঁটে দেয়!'

মামীমাকে কাঁদতে দেখে প্রথমে রাধী, তারপর পদাই, তারপর বাঁটুল তিনজনেই ফোঁপাতে সুরু করলে।

'তুমি যে দেখছি মহা গণ্ডগোল জুড়ে দিলে, অ্যাঁ! এ সব কি কথা? ছেলেটার মা নেই, আমার এই অবস্থা, বাপ খোঁজ নেয় না! কোথায় ভাবলাম ও সুখে-শান্তিতে থাকবে…'

মামীমা চোখ মুছে ফেললে। হঠাৎ শান্ত হয়ে বললে, 'কত টাকা পেয়েছ, অ্যাঁ?'

'টাকা?' চরণ গাঙ্গুলী উঠোনের চড়াই পাখীদের দিকে চাইলে। টাকার কথা যেন সে কস্মিন্‌কালেও শোনেনি।

'হ্যাঁ, টাকা! নিশ্চয় তুমি টাকা নিয়ে বাঁটুলকে পুষ্যি দিতে চলেছ। তোমাকে আমার চিনতে বাকি আছে কিনা!'

মামীমা আরো বললে, 'ওর বাবা তো আছে, আর সে কানপুরে না নাকপুরে রীতিমত সেপাইশালার বড়বাবু। তোমার মত মুনিষ তাড়ায় না, মাস গেলে মাইনে পায়। তার ছেলেকে তুমি দিয়ে দেবে কেন?'

'বাবা তো খোঁজখবর নেয় ভারী! মাঝে মাঝে কয়েকটা টাকা পাঠিয়েই…যাকগে! তোমার সঙ্গে কথা বলে আর…আজ একবার হাটে যাব মনে করছি…'

মামা রীতিমত পালিয়ে বাঁচল।

বাঁটুল নিঃশ্বাস ফেললে। পদাইকে বললে, 'মামা তামাক টানলে না দেখতে পেলি?'

'দেখলাম।'

'ব্যাপার বড় সোজা নয় রে পদা!'

'বুঝলাম।'

মামীমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বললে, 'গুড়মুড়ি খেয়ে তোরা পাঠশালে যা! রাধী লোহার হাতাটা নিয়ে ঘোষালবাড়ী যা, আগুন নিয়ে আর, উনোনটা জ্বাল্। আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।'

পাঠশালায় কিন্তু গেল না বাঁটুল আর পদাই। দু'জনে গিয়ে ঘোষালদের আমবাগানে বসল। পদাই গেল আম কুড়োতে, আ বাঁটুল চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল।

মা-কে তার মনে পড়ে না, একেবারেই না। তার যখন তিনমাস বয়স, তখনই মা মরে যায়।

বাঁটুলের বাবা গোপাল বাঁড়ুজ্জে বাঁটুলকে তার মামীমার কাছে রেখে পশ্চিমে চলে গেলেন চাকরী নিয়ে। দেশে তিনি আর আসেন নি বটে, তবে টাকা পাঠান, মাঝেমাঝেই পাঠান, বাঁটুল মামীর কাছে শুনেছে।

আরো শুনেছে, তার মা-র এত এত গয়না তার মামার কাছে আছে। শুনেছে তার বাবা

দেখতে সায়েবদের মত। এত এত মাংস খেতে পারে, আর ঘোড়া চড়ে বেড়ায়। আঁটুল গাঁয়ের ঘোষাল কর্তা সেবার তীর্থ করতে গয়া গিয়েছিলেন, আর কাশীতে নাকি বাঁটুলের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সেবার গাঁয়ে ভারী উপদ্রব হয়েছিল। ঘোষাল কর্তার ভাইপো-র বিয়ে, গ্রামের প্রতিটি বাড়ী থেকে বরযাত্রী গিয়েছিল।

বিয়ে হবে সেই পলাশীতে। বর তো এইটুকু একটা বারো বছরের ছেলে, তাকে নিয়ে সবাই নৌকায় উঠলে। মেয়েরা নদীর ধারে এসে শাঁখ বাজালে, উলু দিলে।

ঘোষাল কর্তা নিজে যেতে পারলেন না, বাতের ব্যথা। তবে নদীর ধারে এসে নৌকো দেখে বললেন, 'হালটা সেরে নিলে হ'ত না? এমন-তেমন হলে সামলাতে পারবে?'

'তা আর পারব না?' বুড়ো মাঝি একগাল হেসে বলেছিল, 'আমার ঠাইরদাদা এমনি ধারা ভাঙা হাল নিয়ে,—সে একশো বছর আগে গো! সেরাজের সঙ্গে সায়েবদের যে নড়াই হ'ল, সেই নড়ায়ের হাতীগুলো ভাঙা নৌকোতেই ঠাইরদাদা পার করেছিল।'

'তা বটে, তোমাদের হ'ল গিয়ে পাকা হাত, পাকা কাজ, তা কি আমি জানি না?'

'এ ভাগীরথীর জলের নাড়ী-নক্ষত্র আমার চেনা। এনাদের আমি শন্‌শনিয়ে নে' যাব, শন্‌শনিয়ে নে' আসব। বউ ঘরে তুলে দিয়ে তবে নতুন কাপড় নেব।'

মাঝি সকাল বেলা হাসিমুখে 'জয় মা ভাগীরথী, জল তোমার, বাতাস তোমার, আমরা তোমার পেরজা গো!' বলে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিল। ভাগীরথীর বুক দিয়ে সাঁ সাঁ করে নৌকো এগিয়ে গিয়েছিল।

আর ফিরে আসেনি। গোরাবাজারের ঘাটের কাছাকাছি জলের চোরাপাকে নৌকো যে কেমন করে তলিয়ে গিয়েছিল, যাত্রীরা যে কেমন করে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়েছিল, সে কথা এখনো, এই আঠারোশ' ছাপ্পান্ন সালেও সবাই বলাবলি করে। যদিও, এ ঘটনা দশ বছর আগেকার।

জলে ডুবে বেঘোরে মরে গেলে যা হয়, কয়েকদিন ধরে, আর গ্রামে ভূতের উপদ্রবের সীমা-সংখ্যা রইল না। ঘোষালরা বেশ ধনী লোক। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ী থেকেই একজন না একজন বরযাত্রী গিয়েছিল। প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ মারা গিয়েছে, তাই ভূতের ভয় পাওয়াটাও হয়তো স্বাভাবিক। আর এ কথা কে না জানে, সব সময়ে যদি মরা মানুষদের কথা ভাবো, তাহলে আলোছায়া দেখলেও চমকাবে, সব সময়ে ভয় পাবেই পাবে!

তা, ঘোষাল কর্তাকে সবাই বললে, 'তোমার ত' বেশ পয়সা আছে বাপু। তাছাড়া তোমাদের

বাড়ীর বিয়ের ব্যাপারেই এতগুলো লোক মরল। এদের পিণ্ড দেওয়া দরকার, আর গয়াতে গিয়ে এ সব করতে হলে যত টাকা দরকার তা আমাদের নেই।'

ঘোষাল কর্তা নিজেই বেদম ভয় পেয়েছিলেন। সেই জন্যে তিনি চটপট করে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এলেন। অবশ্য নৌকোডুবির পর ততদিনে একবছর কেটে গিয়েছে। তীর্থে বেরোবার ভাল সময় খুঁজে পেতে পেতে এই একবছর কেটে গেল।

সেই সময়ে, তীর্থে গিয়ে ঘোষাল কর্তা কাশীতে বাঁটুলের বাবাকে দেখেছিলেন। বাঁটুলের বাবা গোপাল বাঁড়ুজ্জে নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, বাঁটুল কেমন আছে, কত বড় হয়েছে, মামা মামীমা যত্ন করে কিনা।

বাঁটুল তখন চার বছরের ছেলে। আঁটুল গ্রাম তখনো ভবিষ্যতে বাঁটুল কি হবে তা জানতে পারেনি। সবাই জানত চরণ গাঙুলীর মা-মরা ভাগ্নেটা যেমন লক্ষ্মী, তেমন শান্ত।

সেই জন্যেই বোধহয় ঘোষাল কর্তা গোপাল বাঁড়ুজ্জ্যেকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে ভারী শান্ত, ভারী লক্ষ্মী।'

আর এখন? ঘোষালদের আমবাগানে বসে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাঁটুলের মনে হ'ল এখন ঘোষাল কর্তা বলেন, 'যদি জানতাম যে তেরো বছর বয়স হতে না হতে তুই এত বড় বিচ্ছু হবি, তাহলে কি আর কাশীধামে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথাটা বলি?'

এখন সব মনে পড়ছে বাঁটুলের। মামা তাকে পুষ্যি দিয়ে দিতে চায় মনে করলে দুঃখও হচ্ছে। সে তো এই আঁটুল গ্রাম ছাড়া কিছুই চেনে না। তাকেও সকলে আঁটুল গ্রামের বাঁটুল বলেই চেনে। কিন্তু তার মামাটিও সোজা লোক নয়। সে যদি ঠিক করে থাকে পুষ্যি দোব, তাহলে দেবেই। টাকার নামে চরণ গাঙুলী সব করতে পারে। শোনা যায় চরণ গাঙুলী যখন ছোট ছিল, তখন এই ঘোষালদের একটা বুড়ো হাতী ছিল, আর সেই হাতী অসুখ হয়ে মরে যায়।

চরণ নাকি ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার বাবাকে বলেছিল, 'ও বাবা, মরা হাতীর নাকি একলক্ষ টাকা দাম? তা চল না, হাতীটা কোথাও বেচে আসি?'

কথায় বলে—

মামা দিল দুধুভাতু দুয়োরে বসে খাই।
মামী দিল হুড়কো ঠ্যাঙা পালাই পালাই॥'

তা, বাঁটুলের বেলায় ব্যাপারটা একটু উলটে-পালটে গিয়েছে। মামীমার একটি ছেলে মরে গিয়েছিল তখন বাঁটুল এ বাড়ীতে আসে। চার বছর ধরে সে মামীমার আদর যত্ন একলা ভোগ করেছে। তারপর অবশ্য পদাই এসেছে, রাধীও এসেছে।

পদাইকে কি হিংসে করেছে বাঁটুল, মামীমার সঙ্গে রোজ ঝগড়া করত, 'তুমি ওর কাছে শোবে না, ওকে ঘুম পাড়াবে না। ও দুষ্টু, মুখ থেকে লাল ফেলে। অসভ্যের মত চেঁচায়।'

মামী বলত, 'তা বটে।'

'ওকে তুমি দিয়ে দাও না কেন? কত ভিখিরী, কত বোষ্টম আসে, তাদের দিয়ে দাও গে।'

'তাই তো দেব। ওর একটু হাত-পা হোক, তখন তাই দেব।'

তারপর অবশ্য বাঁটুলও বড় হয়ে গেল, আর আগেকার মত 'মা' বলে না মামীমাকে, 'মামীমা' বলে। তবু সে জানে মামীমা তাকে সত্যি ভালবাসে। মামীমা শান্ত, মুখবুজে কাজকর্ম করে, সাংসার দেখে। কিন্তু তার ওপর সত্যিকারের টানটা যেন মামার চেয়ে মামীমারই বেশী। হয়তো পুষ্যি দিয়ে দেওয়াটা খারাপ, নইলে মামীমা এত জোরে চেঁচাবে কেন?

সেদিন রাতে, বাঁটুল যখন খেতে বসেছে, তখন মামী এসে কাছে বসল। বাঁটুল এখনো নতুন পইতে হওয়া টাটকা বামুন, খেতে বসে কথা বলে না। মামী আস্তে আস্তে বলল, যা বলল তা শুনে বাঁটুল আরো অবাক। মুখ থেকে দুধের বাটি পড়ে যায় আর কি।

মামী বললে, 'দরকার হলে তুই তোর বাবার কাছে পালিয়ে যাবি কানপুরে। এটা ইংরেজীর ছাপ্পান্ন সাল। শুনতে পাই ইংরেজীর চুয়ান্ন সাল থেকে রেল চালু হয়েছে। তুই না হয় রেলে চেপে পালিয়ে যাবি?

তোর বাবা কোম্পানীর চাকরী করে, কত জানে-শোনে। তার ছেলে হয়ে তোকে·· না না, তুই পালিয়ে যা বাঁটুল। চাঁদবদন ভট্‌চাজ কি পুষবার জন্যে ছেলে চায়? সে···'

মামীমা যা বললে তা শুনে বাঁটুল শিউরে উঠল। (ক্রমশঃ)

একটি দিন সাড়ে তেইশ ঘণ্টা

১৯৩৫ সালের ২২ জুন আলাস্কার ফেয়ার ব্যাঙ্কস শহরে সূর্য অস্ত গেল সন্ধ্যা সাতটায় এবং তারপর আধ ঘণ্টা বাদে অর্থাৎ সাড়ে সাতটায় হ'ল সূর্যোদয়। সে দিনটা সেখানে কেউ বিছানায় শুয়ে ঘুমালো না—নেচে, গান গেয়ে, পাহাড়ে চড়ে, পিকনিক করে কাটালো। আপিস-আদালত বন্ধ রইলো; তার কারণ এক-নাগাড়ে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে না। সে দিনটি হয়েছিল সাড়ে তেইশ ঘণ্টা দীর্ঘ। পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনো কোথাও ঘটেনি।

বীর সাভারকর

শ্রীকৌশিক চট্টোপাধ্যায়

এক-একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের জীবন-কাহিনী রহস্য-উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর। সেই রকম একজন ব্যক্তি ছিলেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তার দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে বলছি।

সাভারকর তখন স্কুলের ছাত্র। বয়স চৌদ্দ-পনোরো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তার সহপাঠীরা মুগ্ধ হয়েছে।

এক রাতে বিনায়কের পিতা দেখলেন, প্রদীপের আলোয় নিবিষ্ট মনে পুত্র কি লিখে চলেছে, আর তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। পিতা কৌতূহলী হয়ে লেখা কাগজটি হাতে নিয়ে পড়লেন।

কিছুদিন আগে দু'জন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছে। বিনায়ক তাদের উদ্দেশে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে কবিতায়। কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি এবং বিদেশী শাসকদের প্রতি ঘৃণা! পিতা তাড়াতাড়ি কাগজটি কেড়ে নিয়ে মানা করলেন পুত্রকে এসব লিখতে। কারণ তিনি জানতেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা। কিন্তু বিনায়ক তবুও লিখত, লুকিয়ে লুকিয়ে।

এই স্কুল-জীবনেই আর একটি ঘটনায় বিনায়কের অদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাভারকরদের বাসস্থান নাসিক জেলায় সেবার ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিল। সে সাংঘাতিক রোগে অনেকের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু প্লেগের থেকেও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল পুলিশের অত্যাচার। যে বাড়ীতে প্লেগ হ'ত, খবর পেলেই পুলিশ রোগ নিরোধের নামে সে বাড়ীতে ঢুকে সব জিনিসপত্র ভেঙে-চুরে বাইরে ফেলে দিত। বিনায়কের পিতা প্লেগে আক্রান্ত হন। পুলিশ এসে রোগী হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। বিনায়কেরা তিন ভাই এক বোন। পুলিশ তাদেরও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। পিতৃমাতৃহীন বালকদের সে কি দুরবস্থা! বিনায়ক ও তার ভাই-বোনেরা শহরের প্রান্তে এক মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

বিনায়কের পিতা মারা গেলেন। আরো দুর্ভাগ্য—বিনায়কের ছোট ভাইটি ঐ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হ'ল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও বিনায়ক ধৈর্য হারায় নি। সে রোজ মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে হাসপাতালে ছোই ভাইয়ের খবর নিতে যেত এবং সন্ধ্যেবেলা অনেকখানি পথ হেঁটে আবার ফিরে আসত।

অল্প বয়সেই যে সব সৎগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বিনায়কের জীবনে, একটু বড় হয়ে সেগুলো আরো পরিস্ফুট হ'ল। তাঁর বুদ্ধি, বাগ্মিতা, আবেগময় উদ্দীপ্ত ভাষা, আন্তরিকতা, বিনায়ককে অতি অল্পকালের ভিতরেই কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক মহলের প্রিয় করে তুলেছিল। পুণায় ফারগুসান কলেজে পড়বার সময় তিনি বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন এক সংঘ 'অভিনব ভারত'। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। পরবর্তীকালে এই সঙ্ঘেরই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছিল লণ্ডন ও প্যারিসের ছাত্র মহলে। একদিকে পুলিশের নজর এড়িয়ে দল তৈরি করা, অন্য দিকে প্রকাশ্যে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করা—এ দুটোতেই সমান ওস্তাদ ছিলো বিনায়ক। কলেজে পড়বার সময় গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশে বিনায়ক সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। পুলিশের সদা-জাগ্রত দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, কি করে বিনায়ক ও তার সহকর্মীরা দলকে এত শক্তিশালী করে তুলেছিল, আজকে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

এত কাজকর্মের মধ্যে পড়াশুনাতে কিন্তু অবহেলা করেন নি বিনায়ক। কলেজের সব পরীক্ষাতেই ভালভাবে পাশ করলেন তিনি।

বি, এ পরীক্ষার আগে বিনায়ককে দেশের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করা, বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি ও গুপ্ত-সমিতির কাজ—তবু বিনায়ক সসম্মানে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের দলে ছিলেন বিনায়ক, তাই তাকে ডিগ্রী দেওয়া হ'ল না। কলেজের শিক্ষা শেষ করে আইন পড়তে বিনায়ক ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। লণ্ডনে এসেই ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তিনি তাঁর 'অভিনব ভারতের' এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই শাখার কাজ ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের ভিতর দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং গোপনে বোমা ও পিস্তল সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কাছে পাঠান।

এই লণ্ডনে থাকতেই ঘটেছিল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

একটি সভা বসেছে। স্যার কার্জান ওয়ালি ছিল ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ। তাকে হত্যা করে এক ভারতীয় যুবক, নাম মদনলাল ধিংরা। সেই উপলক্ষ্যে মদনলালের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। প্রস্তাব পড়ে ঘোষণা করলেন এবং সে-প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। সভাপতি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সমস্ত কক্ষ কাঁপিয়ে আপত্তি করল এক যুবক। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখেন, সে যুবক আর কেউ নয়,সভারকর। তিনি বললেন, "না, এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। আমি আপত্তি করছি। কেন না, স্যার কার্জান ওয়ালির হত্যার অপরাধে এক ভারতীয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তার বিচার এখনো হয়নি। সুতরাং তার সম্বন্ধে এখন কোন প্রস্তাব নেওয়া যায় না।

সমস্ত সভা থমথম করছে। এমন সময় কয়েকজন ইংরেজ গুণ্ডা সাভারকরকে প্রহার করেতে থাকে। কিন্তু সে আঘাত নীরবে সহ্য করে যান সাভারকর। কেননা তারা দলে ভারী। কিন্তু তার মুখে ঐ এক কথা—না, এ প্রস্তাব পাশ হতে দেব না।

তখন কয়েকজন ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ লাঠি দিয়ে সাভারকরের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। তার মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা অটল। না, এ প্রস্তাব পাশ হয়নি।

তখন তারা সাভারকরকে মারতে মারতে ঘাড় ধরে সভা থেকে বের করে দিলে।

এই ঘটনার পরেই সাভারকার ব্রিটিশ পুলিশের কুনজরে পড়ে। তারা তাঁর পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, তিনি যে-সব হোটেলে আশ্রয় নিতেন, ব্রিটিশ পুলিশ সেই সব হোটেলের ম্যানেজারদের তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিত। এমন দিনও গেছে, যখন এক হোটেল থেকে আর এক হোটেল আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছেন সাভারকর। তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায়, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি কিছু দিনের জন্য প্যারিস শহরে বিশ্রামের জন্য যান। এদিকে তখন ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কাজকর্ম খুব জোরালো ভাবে সুরু হয়েছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুলিশ সন্দেহ করেছিল এই সব কাজকর্মের পিছনে সাভারকরের উৎসাহ ও প্ররোচনা আছে। কিন্তু সাভারকর তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে। তাঁকে তারা ধরতেও পারছে না। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সাভারকরের কিছু কিছু সহকর্মী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। এই সংবাদে সাভারকর অত্যন্ত বিচলিত হন।

একদিন সাভারকর প্যারিসের এক পার্কে বসে আছেন। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। সামনে পুকুরের টলটলে জল। সাভারকার তার বন্দী সহকর্মীদের কথা ভাবছেন। হঠাৎ কে যেন মনের ভিতর বলে উঠলো—এ তুমি কি করছ! তোমার বন্ধুরা পুলিশের নির্যাতন ভোগ করছে, আর তুমি এখানে আরামে বসে আছ। ছিঃ!

সাভারকর তখুনি উঠে দাড়ালেন এবং লণ্ডনে যাওয়া স্থির করলেন। যদিও তিনি জানতেন, যে লণ্ডনে পৌছলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। তবুও তিনি চেয়েছিলেন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হতে।

কিন্তু সাভারকর ট্রেন থেকে নামতেই কয়েকজন ব্রিটিশ পুলিশ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে আদালতে উপস্থিত করা হ'ল। আদালত ঘোষণা করল যে, ভারতবর্ষে তার বিচার হবে।

জাহাজে করে সাভারকরকে ভারতবর্ষে পাঠানোর ব্যবস্থা হ'ল। ছোট্ট একটি কেবিনে সাভারকর বন্দী। কেবিনের সামনে সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী। বাথরুমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রহরী। সাভারকর খালি পালাবার উপায় চিন্তা করতেন। তার প্রথম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে—তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সহকর্মীদের ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবার লোক তিনি নন। এখন যদি তিনি পালাতে পারেন, তবে তাঁর সহকর্মীদের মনোবলকে অনেক বাড়িয়ে তুলবে।

জাহাজ এসে ফরাসী বন্দর মার্সাই-এ উপস্থিত হ'ল। ভেবে ভেবে একটা মাত্র উপায় সাভারকর খুঁজে পেলেন। বাথরুমের উপরে ছিল একটা বড় ফুটো। কোনরকমে একটি মানুষ সেখান দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। একদিন ভোরবেলা তিনি বাথরুমে চলে এলেন। রিভলবার হাতে প্রহরী দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। দরজা বন্ধ করে সাভারকর তাকালেন ওপরের দিকে। ফুটোটা বেশ খানিকটা উঁচুতে। সাভারকর প্রথম বার বেয়ে উঠতে গিয়ে পারলেন না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা সফল হ'ল। সাভারকর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখন—সমুদ্র। তিনি আর দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রহরীরা শব্দ পেয়ে রেলিং-এর কাছে এসে গুলি চালাল। সাভারকর ডুব দিয়ে দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে এগিয়ে চললেন। নৌকা নামিয়ে ব্রিটিশ অফিসাররা পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করার পূর্বেই সাভারকর বন্দরের মাটিতে পা রাখলেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এখন তিনি ফরাসী সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত। ব্রিটিশের কোন অধিকারই নেই তার অঙ্গ স্পর্শ করবার। বন্দরে উঠেই সাভারকর রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ফরাসী পুলিশকে দেখতে পেয়ে তার কাছে আত্মসমার্পণ করলেন। পিছন পিছন হইহই করতে করতে ইংরেজ পুলিশেরাও ছুটে এল। ফরাসী পুলিশের উচিত ছিল সাভারকরকে থানায় নিয়ে গিয়ে অফিসারের কাছে হাজির করা। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসারেরা ফরাসী পুলিশের সামনেই, সাভারকরকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হইচই শুনে কয়েকজন লোক হাজির হয়েছিল সেখানে। খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসী একটা কাগজেও ছাপা হ'ল। সাভারকরের বন্ধুরা এ ব্যাপারে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে নালিশ করেন। সেখানে অনেক তর্কাতর্কি হ'ল। পরে আদালত রায় দিল যে, সাভারকর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা বলে, তাকে বিচার করার ভার ব্রিটিশদেরই আছে।

বোম্বাইতে সাভারকরকে নিয়ে আসা হ'ল। বোমা ও পিস্তল বে-আইনি ভাবে দেশে আনা, এবং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের অভিযোগে সাভারকরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ

দেওয়া হ'ল। সে দণ্ডাদেশ শুনে এতটুকুও বিচলিত হলেন না সাভারকর। তিনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে 'বন্দেমাতরম্' বলে সে দণ্ড গ্রহণ করলেন। এটা যেন তার দেশ সেবারই পুরস্কার।

তারপর সুরু হ'ল একটানা সুদীর্ঘ কারাবাস। সে আর এক কাহিনী !

স্বাধীন ভারতের এক-দুই-তিন

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

এক-দুই-তিন
নাচ্‌বো তা-ধিন্‌-ধিন্‌
ভারত স্বাধীন হোলো, মোরা
নইকো পরাধীন।

দুই-তিন-চার
ভাবনা কি গো আর ?
স্বাধীন মনে বুক ফুলিয়ে
ঘুরবো চারিধার।

তিন-চার-পাঁচ
বাঁচার মত বাঁচ,
অনুকরণ করবো না আর
বিদেশীদের ধাঁচ।

চার-পাঁচ-ছয়
জয় শহীদের জয়,
স্বাধীন মোরা, তাই তো কারেও
করবো নাকো ভয়।

পাঁচ-ছয়-সাত
মিলাও হাতে হাত,
ভায়ে ভায়ে রাখবো না ভেদ,
থাকবো সাথে সাথ।

ছয়-সাত-আট
পড়বো মোরা পাঠ,
বিকালবেলা খেলবো সবাই,
ঐ তো খেলার মাঠ।

সাত-আট-নয়
জয় ভারতের জয়,
তিন-রঙা ঐ নিশান হাতে
ঘুরবো ভুবন-ময়।

আট-নয়-দশ
থাকৃবো না অলস,
মহাত্মাজী আর নেতাজীর
গাইবো মোরা যশ।

মেঠুড়ে

একটি কাপ চুরির খবর

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার 'জুলেস রিমেট ট্রফি' ইংলণ্ডের এক প্রদর্শনী থেকে চোরে চুরি করে। বিশ্ব কাপ শুধু ফুটবলের সবসেরা পুরস্কার নয়, সম্ভবতঃ সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কারও। নিখাদ পেটা সোনায় ট্রফিটি তৈরি। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার বিদায়ী সভাপতি ফ্রান্সের মঁসিয়ে জুলেস রিমেট কাপটি সংস্থাকে দান করেন। গঠন ও শিল্পনৈপুণ্যে ট্রফিটি দেখবার মতন। ইংলণ্ডে স্পোর্টস এবং ডাকটিকিটের যে প্রদর্শনী হচ্ছিল তার উদ্যোক্তাদের কিছুদিন আগে ট্রফিটি ধার দেওয়া হয়। ওয়েস্টমিনিস্টারের সেণ্ট্রাল হলে সাধারণের দেখার জন্যে ট্রফিটি রাখা হয়েছিল। রাত্তিরে সেই হলের দরজা ভেঙে চোর ঘরে ঢুকে ট্রফিটি চুরি করে। পরে একটা কুকুর চুরি যাওয়া ট্রফিটি আবার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে কিনারা করে দেয়, কিন্তু চোর এখনো ধরা পড়েনি। যাক মূল্যবান ট্রফিটি যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা কি!

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

মালয়েশিয়ার এক নম্বর ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় তান আইক হুয়াং সম্প্রতি অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান জয় করে বিশ্বের সবসেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর বহু খেলোয়াড়কে সম্প্রতি তান আইকের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। ডেনমার্কের খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস যিনি গত আট বছরের ভেতর ছ-বার অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে নতুন কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, তিনিও হার স্বীকার করেছেন তান আইকের কাছে।

ভারত থেকে সুরেশ গোয়েল ও দীনেশ খান্না এবার অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় যোগ দিয়েছিলেন। খান্নার অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অফুরন্ত দমের জন্যে অনেকেই আশা করেছিলেন, ইংলণ্ডে খান্না হয়তো বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারবেন। দীনেশ খান্না চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে না পারলেও দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। সেমি-ফাইন্যালে তান আইকের কাছে

১৫-৪ ও ১৫-৯ পয়েণ্টে খামাকে হার স্বীকার করতে হয়। ফাইন্যালে হুয়াং জাপানের মাসোয়া আকিয়ামাকে ১৫-৭ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে হারিয়ে সবসেরা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় এই খ্যাতি অর্জন করেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

৩১ তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। জাতীয় রেলওয়ে ও সার্ভিস দলের ভেতর খেলাতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। একদিন নয়, দু' দিনের ফাইন্যাল খেলা এবং দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে অতিরিক্ত সময় খেলানো সত্ত্বেও কোনো গোল না হওয়ায় দু' দলকে যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত দু' দলের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে টসে বিজয়ী রেল দল প্রথম ছ' মাস বিজয়ীর পুরস্কার 'রঙ্গস্বামী কাপ' নিজেদের অধিকারে রাখার সম্মান পায়। রেল দল এবার নিয়ে জাতীয় হকির ফাইন্যালে কোনোবার পরাজিত না হবার কৃতিত্বের সঙ্গে সাতবার বিজয়ীর সম্মান পেল। গত দশ বছরের ভেতর সাতবার দলটি জয়ের সম্মানও অর্জন করেছে।

জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের এবার ছিল দ্বাদশ অনুষ্ঠান। সারা ভারত থেকে চারশ'রও বেশি প্রতিযোগী এবারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এর ভেতর বাঙ্গালার প্রতিযোগী ও প্রতি-যোগিনীর সংখ্যা ছিল দু' শ চুয়াল্লিশ জন। বাঙ্গালা থেকে যোগদানকারী অধিকাংশ প্রতিযোগী এবারের প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বহু পুরস্কার এবং চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান লাভ করেন। '২২ ফ্রি রাইফেল থ্রি পজিশন অলিম্পিক ইভেণ্টে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে হরিচরণ সাউয়ের পর পর পাঁচ বছর প্রেসিডেণ্ট ট্রফি লাভ উল্লেখ করার মতন। বাঙ্গলার দুই কিশোরী কুমারী কণা বসু ও কুমারী শান্তা বিশ্বাসের কৃতিত্বও বিশেষ গৌরবের। কণা বসু এবারের প্রতি-যোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপের তিনটে ট্রফি সমেত এগারোটা স্বর্ণ, আটটা রৌপ্য, একটা ব্রোঞ্জপদক মিলিয়ে মোট কুড়িটারও বেশি পুরস্কার পান। শান্তা বিশ্বাস আটটা স্বর্ণ, পাঁচটা রৌপ্য, চারটে ব্রোঞ্জ পদক এবং লেডিজ প্রোনের চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি মিলিয়ে মোট আঠারোটা পুরস্কার পান। ২২ স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল থ্রি পজিশনে নতুন রেকর্ডের কৃতিত্বে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সোমেনকান্তি সেন ১২০০ ভেতর ১০৯২ স্কোর করে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো রাইফেল চালক এতো পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পারেন নি। স্পোর্টস যে পড়াশুনোর অন্তরায় নয় কণা বসু, শান্তা বিশ্বাস, সোমেনকান্তি সেন, অশোক চ্যাটার্জি, অমিতাভ চ্যাটার্জি প্রমুখ তার প্রমাণ দিয়েছেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুইলেনে জাতীয় ফুটবলের বাইশতম অনুষ্ঠানের সঙ্গে কেরালা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উৎসব একসঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। যাদের গোল অ্যাভারেজ ভালো, তারই ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাঙলা দল সেমি-ফাইন্যালের প্রথম ম্যাচে মহীশূরের কাছে ২-১ গোলে হেরে গিয়েও দ্বিতীয় ম্যাচে ২-০ গোলে জিতে ফাইন্যাল খেলার অধিকার পায়।

জাতীয় ফুটবলের বাইশবারের অনুষ্ঠানের ভেতর এগারোবারের বিজয়ী এবং ছ-বারের রানার্স বাঙ্গালাকে ফাইন্যালে হারিয়ে, অন্ধ্রের সন্তোষ ট্রফি লাভ বিশেষ কৃতিত্বের। অন্ধ্র এইবার নিয়ে তিনবার সন্তোষ ট্রফি লাভ করল। অন্ধ্র এর আগে আরো দু'বার জাতীয় ফাইন্যালে বাঙ্গালার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু কোনোবারই বাঙ্গালাকে হারাতে পারেনি। বাঙলা ও অন্ধ্রের ফাইন্যাল খেলা প্রথম দিন ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। বাঙ্গালা বিরতির সময় পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও খেলায় জিততে পারে না। দ্বিতীয় দিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উত্তেজনার ভেতর খেলে, অন্ধ্র বাঙ্গালাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়।

জাতীয় ফুটবলে এবার তিনজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেন। এঁরা হলেন রেলওয়ে দলের রাজেন্দ্রমোহন, সার্ভিসেস দলের ভূপিন্দার সিং ও বাঙ্গালার পরিমল দে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার পাঁচটা গোলের ভেতর পরিমল দে একাই চারটে গোল করেন।

জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

জলন্ধরে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ২৭তম অনুষ্ঠান সত্যিই মহারাষ্ট্রের কৃতিত্বকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখবে। কারণ, দলগত বা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বার্ণবেলাক কাপ (পুরুষ বিভাগ), জয়লক্ষ্মী কাপ (মহিলা বিভাগ) এবং রামানুজম কাপ (জুনিয়র বিভাগ) লাভ করা ছাড়াও, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার আটটা বিষয়ের ভেতর মহারাষ্ট্র লাভ করেছে ছ-টা বিষয়ে বিজয়ীর পুরস্কার। তা ছাড়া চারটে বিষয়ে রানার্সের পুরস্কারও পেয়েছেন মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়। পুরুষদের ফাইন্যালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন গৌতম দেওয়ান নিজ রাজ্যের ফারুক খেদাইজিকে হারিয়ে মোট ছ'বার ভারত চ্যাম্পিয়নের আখ্যা লাভ করেছেন। গার্লস ফাইন্যালে বাঙ্গালার মেয়ে রুপা মুখার্জীর বিজয়িনীর সম্মান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাইন্যালে সুমা জর্জ হার স্বীকার করেন রুপা মুখার্জির কাছে।

খোকার সাধ

ছোট্ট খোকন মায়ের কাছে
বলছে বারংবার,
লেখাপড়া শিখে হবে
মস্ত সে ডাক্তার।
ডাক্তারী-ব্যাগ ঝুলিয়ে হাতে
যাবে রুগীর বাড়ী,
দেখবে রুগী,
ওষুধ দেবে
নেবে না এক কড়ি।
টাকা বিনা চিকিৎসাতে
যারা মারা যান,
খোকন যাবে তাদের বাড়ী,
রাখবে তাদের প্রাণ।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

—

দুই বন্ধুর প্রথম দেখা

ভারী এক মজার ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে বাংলার দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের ছাত্র-জীবনে প্রথম আলাপের সূত্রপাত ঘটে। সেটাকে ঠিক মজার ব্যাপার বলা যায় না, আবার একদিক থেকে মজারও বটে।

এক কড়া মাস্টার মশাই-এর ক্লাস। সেই ক্লাসে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। মাস্টার মশাইটির নাম রামচন্দ্র মিত্র। মাস্টার মশাই-এর ক্লাসে সবাই চুপচাপ থাকে—বেদম প্রহারের ভয়ে অবশ্য। মাস্টার মশাই পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। তিনি বললেন—"পৃথিবীর আকার যে গোল তা শুধু ইংরাজী-সাহিত্য পড়েই বোঝা যায়। আগে যখন শুধু সংস্কৃত-সাহিত্য এদেশে ছিল, তখন অধিকাংশ লোকই এটা জানতেন না। আর যাঁরা জানতেন, তাঁরা জানতেন ইংরেজী-সাহিত্যেরই কল্যাণে।" কথাগুলো বললেন নতুন ভরতি হওয়া একটি ছাত্রের দিকে তাকিয়ে।

আজই সেই ছাত্রটি এসেছে এই স্কুলে। তার বাবা একজন নিষ্ঠাবান সংস্কৃত পণ্ডিত, আর রামবাবু অর্থাৎ যিনি পড়াচ্ছিলেন, তিনি সংস্কৃতকে পছন্দ করতেন না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। তখনকার

দিনে ইংরেজী শিক্ষকগণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের অবজ্ঞা রে চলতেন এবং পণ্ডিতরাও গায়ের ঝাল টাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতেন না। এই য়ে ছাত্রদের মধ্যেও ঝগড়া, রেষারেষি এবং নেক সময় হাতাতাতিও ঘটে যেত।

সেই কড়া মাস্টার মশাই নতুন ছেলেটিকে রও বললেন—"তোমার বাবা বোধহয় এই ক্তিটাকে মেনে নিতে পারবেন না।" ছেলেটি ছুই বললো না। বাড়ী ফিরে গিয়েই জামাকাপড় ড়ার প্রয়োজন মনে না করে, সরাসরি বাবার ছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা আমাদের স্কৃত-সাহিত্য কি পৃথিবীর আকৃতিকে গোল লনি?" বাবা উত্তর দিলেন—"কেন? সংস্কৃত-হিত্য চিরদিন বলে আসছে পৃথিবী গোল, এই খো না—" ব'লে সেই ছেলেটির বাবা একটি কও দেখালেন। শ্লোকটার মানে হ'ল হাতে টা আমলকি নিলে যেরকম গোল দেখায়, থিবী সেইরকম গোলাকার।

ছেলেটা তক্ষুণি একটুকরো কাগজে শ্লোকটা খে ফেলল এবং পরদিন স্কুলে গিয়ে সেই টার মশাইকে দেখাল আর বলল—"আপনি লছিলেন একমাত্র ইংরেজী-সাহিত্যই পৃথিবীকে ল বলে স্বীকার করেছে, কিন্তু আমার বাবা লেন না তা নয়, সংস্কৃতেও আছে এবং তিনি শ্লোকটাও আমায় দেখালেন। মাস্টার মশাই কটা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—"আমার হয় কথা বলার ভুল হয়েছিল, তোমার। পণ্ডিত মানুষ তিনি কি আর এ সামান্য ব্যাপারটাকে অস্বীকার করবেন? না না, তা কি হয়? আর তুমিই বা এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়ীতে বলতে গেছ কেন?" মাস্টার মশাই যখন ছেলেটিকে এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন আর একটি ছেলে ঐ নতুন ছাত্রটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কড়া মাস্টার মশাই-এর মুখের উপর কথা বলেছে, তাঁর সাহস তো বড় কম নয়! ছুটি হলে বাইরে আসতে সে ছেলেটি নতুন ছাত্রটিকে 'সেকৃহ্যাণ্ড' করে বললো—"তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাক?" ছেলেটি উত্তর দিল—"ভূদেব মুখোপাধ্যায়।" তখন সে তাকেও জিজ্ঞাসা করলো—"তোমার নাম কি ভাই?" ছেলেটি বললে—"আমার নাম? মধুসূদন দত্ত।"

হ্যাঁ, বাংলার সেই চিরবিখ্যাত দু'জন সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁদের এই ভাবেই হয় প্রথম মিলন।

শ্রীলপিতা বসু

—

বীর সাভারকর

ফরাসী বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়েছে। এই জাহাজে এক বিপ্লবী যুবক রয়েছেন এবং তাকে ঘিরে রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ। যুবকটিকে জাহাজে করে ভারতে পাঠান হবে এবং সেখানেই হবে তার বিচার।

ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। যুবক ধীরে ধীরে স্নানের ঘরে প্রবেশ করলেন। যুবক দেখলেন যে, স্নানের ঘরের ছাদে এক গর্ত রয়েছে এবং তার ঠিক পাশেই আছে একটি হুক। যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁর কোটটি সেই হুকটি লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। কাঁটায় লেগে কোটটি ঝুলতে লাগলো। যুবক সেইটি অবলম্বন করে গর্তের নাগাল পেলেন। এইবারে তিনি গর্তের ভিতর দিয়ে দেহটিকে বাইরে আন্‌লেন এবং পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

এদিকে লাফালাফির শব্দে প্রহরীরা স্নানের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকলো। পরক্ষণে তারা নৌকা নিয়ে যুবকটির পশ্চাদ্ধাবন করলো ধরবার জন্যে। যুবকটি কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন। বন্দরের উপরেই ডকের পাঁচিল। যুবক কোন রকমে সেই পাঁচিল পার হয়ে ফরাসী রাজ্যে পা দিলেন। এখানেও তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। তিনি ফরাসী পুলিশের সন্ধানে ছুটলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি এক পুলিশের জমাদারকে দেখতে পেয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। কিন্তু সেই ফরাসী জমাদার সে কথায় কান দিল না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইংরেজ প্রহরীর হাতেই সমর্পণ করলো।

যুবকটির বিচার হোল এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ দেওয়া হোল। কিন্তু তাঁকে যাবজ্জীবন জেল খাটতে হয়নি।

এই বিপ্লবী যুবকটি হলেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকর। দীর্ঘ আটাশ বছর জেল খাটার পর উনিশ শো সাঁইত্রিশ সালে তিনি মুক্তি পান এবং হিন্দু-মহাসভার পরিচালনার ভার নেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য যাঁরা অকাতরে নিজেদের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। সম্প্রতি তাঁর তিরোধান ঘটেছে।

শ্রীতিলক বাগচী

বিদ্যালয়-পত্রিকা

বিদ্যালয়ের পত্রিকাতে দিয়েছিলাম লেখা
মাস গেলো, বছর গেলো, পেলাম না তার দেখা।
নবম শ্রেণীর ছাত্রী আমি
নামটি আমার 'সুপ্রীতি'*
ম্যাগাজিনে পাঠাই লেখা
ছাপার কোন নেই নীতি।
দেখে শুনে বুঝে গেছি ইহাই সত্য সত্য
বিদ্যালয়ের ছাপাখানায় বোঝে না কেউ পদ্য!

শ্রীখুকু ব্যানার্জী

* লেখিকার ভাল নাম।

ঘটকর্পর
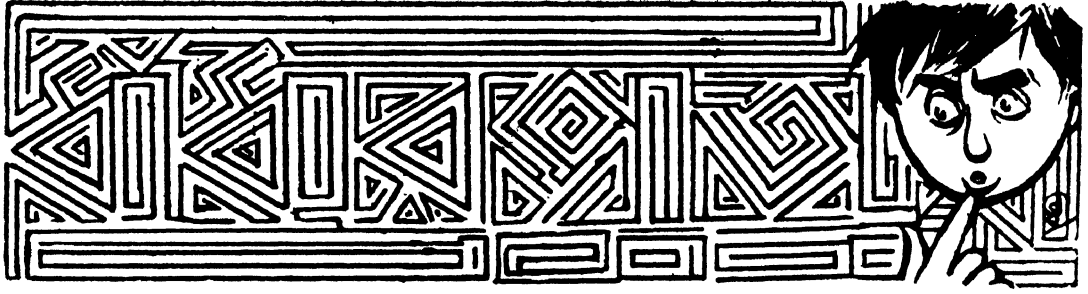
১। ন, ব, বি, ভ, ল, শা—এই ছ'টি অক্ষর দিয়ে একটি পিরামিড তৈরি করতে হবে। পিরামিডটিতে সর্বসমেত পাঁচটি ধাপ থাকবে এবং প্রত্যেক ধাপের শব্দগুলির একটি করে অর্থ থাকবে। প্রথম ধাপের শব্দটি হবে দুটি অক্ষরে। দ্বিতীয় ধাপের শব্দটিতে প্রথম ধাপের অক্ষর দুটির সঙ্গে আরও একটি অক্ষর যোগ হবে। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে শেষ ধাপে থাকবে ছ'টি অক্ষরের একটি বিশেষণযুক্ত শব্দ।

শ্রীকৃষ্ণা বসু (কলিকাতা)

—

২। লকলকে জিহ্বা নিয়ে সবার পিছু ধায়
এমন কিছু নাইকো ধরায় যাহা সে না খায়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস (কলিকাতা)

—

৩। তিন অক্ষরযুক্ত এমন একটি শব্দের নাম, করো, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে হয় খাবার জিনিস ; দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে হয় বাদ্যযন্ত্র। আর তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে হয় মারাত্মক কীট বিশেষ।

শ্রীসত্যশংকর সুর (তারাগুনিয়া)

৪। তিন অক্ষরে নাম তার দেখে ভয় যায়,
প্রথম অক্ষর গেলে কভু নাহি পায়।
দ্বিতীয় অক্ষর ছাড়ি কভু নাহি খাবে,
খাইলে অবশ্য তায় পরাণ যাইবে।

শ্রীছন্দা চক্রবর্তী (আসাম)

—

৫। দেখিতে সে লম্বোদর বিপরীত পাপী,
এমন কি বস্তু আছে বলো দেখি ভাবি।

শ্রীকরুণা বিশ্বাস (পুরী)

—

(আগামীবার উত্তর বেরুবে)

—

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। 'ক' ২। 'রোস্থন'-চৌকী ৩। এক জন দ্রব্য 'শেল' করে এবং একজন 'শেল' তদারক করে। এই 'শেল'-এর অর্থ ইংরেজী। ৪। কালি (এই কালির সাহায্যে গ্রন্থাদি ছাপা হয়ে পৃথিবীতে জ্ঞানালোক বিতরিত হয়।) ৫। ডিম। ৬। উঠপাখী।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন।)

উপনিষদের মণিমুক্তা—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮ রমানাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীনারায়ণচন্দ্র পোদ্দার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১'৩৫

আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে উপনিষদ একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন ও কি ভাবে মানুষ সেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করে নিজেদেরও ঈশ্বরতুল্য করে তুলতে পারে, সেই সব পরম জ্ঞানের কথাই আছে উপনিষদের মধ্যে। গ্রন্থকার এই উপনিষদের নানা শিক্ষণীয় বিষয় থেকে ছোটদের উপযোগী কয়েকটি কাহিনী এখানে গল্পচ্ছলে সুন্দর করে বলেছেন। এ থেকে দেশের ছেলেমেয়েরা সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, নিষ্ঠা সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারবে। সচিত্র এই গল্পগুলি ছোটদের সাহিত্যে একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল।

—

হট্ট জলদির দেশে—রণজিৎকুমার সেন। মোহন লাইব্রেরী, ৩৫এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীজীবনকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২'০০

রণজিৎকুমার সেন সব রকম লেখা লিখে থাকেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই বইটিতে কবিতা সহ নানা ধরণের গল্প, অনুবাদ ও রূপকথা আছে। গল্প, অনুবাদ ও রূপকথার সংখ্যা পাঁচটি এবং কবিতা আছে নয়টি। কবিতা ও গল্পগুলির প্রত্যেকটি পড়েই ছেলেমেয়েরা আনন্দ পাবে। গল্প ও কবিতার প্রত্যেকটিই সচিত্র এবং বইয়ের প্রচ্ছদপটটি দেখলেই ছোটরা খুশি হবে।

—

বোর্ডিং ইস্কুল—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে ডি, মেহরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩'০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের সাহিত্যে খ্যাতিমান। ছোটদের জন্যে অনেক গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ তিনি করেছেন। তাঁর এই 'বোর্ডিং ইস্কুল' নামক গল্পের বইটি বহুকাল আগে একবার প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি এর সঙ্গে নতুন আরো কয়েকটি গল্প সংযোজিত করে নতুন আকারে এটি আবার প্রকাশিত হওয়ায় আজকালকার ছেলেমেয়েরা সকলেই খুশি হবে। স্কুল, বোর্ডিং হাউস, মাস্টারমশাই আর সেই সঙ্গে ছাত্রদের নিয়েই এর প্রত্যেকটি কাহিনী শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, বড়রাও পড়ে খুশি হবেন। প্রত্যেকটি গল্পের ঘটনা যেমন হৃদয়স্পর্শী, তেমনি সহজ সুন্দর লেখকের ভাষা। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

—

বহু বাধা-বিঘ্ন ও অশান্ত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এলো নতুন বছর—এলো ১৩৭৩—।

নতুন বছরে মানুষ প্রার্থনা করে স্বস্তি, শান্তি, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দ জীবনের গতি। আজকের দিনে বারংবার এই কটি কথাই আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হোক—। 'নবজীবনের গাহিয়া গান—' আমরা যেন—নতুন বছরকে সঞ্জীবিত করতে পারি।

অনেক দিন পরে অনেক অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটিয়ে, সব বিদ্যায়তনগুলিতে আবার যথারীতি ক্লাস সুরু হলো। অনেকের পরীক্ষাও বিঘ্নিত হয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতির কথা না ভেবে এবার মন দিয়ে ক্লাস করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

নতুন বছরে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি—বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী হও, ন্যায় ও সত্যের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকুক।

মহাজীবন থেকে—

মস্ত বড় পণ্ডিত, এক কথায় বলতে গেলে বিদ্যাদিগ্‌গজ। দেশ জোড়া তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন—কাব্যশাস্ত্রে তার প্রগাঢ় অধিকার। শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণ সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। পণ্ডিত সমাজে সকলেই পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন তার নাম।

দেশের বিভিন্ন স্থানে যখনই কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে কোন সাংস্কৃতিক সভার অধিবেশন হয়, তখনই তাতে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এই পণ্ডিতপ্রবর। শাস্ত্রের মীমাংসা কিংবা সাহিত্যের কোনও খুঁটিনাটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কের লড়াই হবে, তাতে শেষ পর্যন্ত জয়লক্ষ্মী তারই গলায় পরিয়ে দেবেন জয়মাল্য। বিদ্যার বহর আর খ্যাতির পরিধি দুই-ই সমানে বেড়ে চলেছে তাঁর। আর্যাবর্ত, পশ্চিম ভারত, দাক্ষিণাত্য সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি। তাঁর শিষ্যদের সংখ্যাও অগণিত। গুরুর সাহচর্যে থেকে তাঁরাও দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান।

একবার ঘুরতে ঘুরতে পণ্ডিত ও তাঁর দলবল এসে উপস্থিত হলেন নবদ্বীপ শহরে। তখন মুসলমান রাজত্ব। তবু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলছে অব্যাহত। বাংলার প্রধানতম শিক্ষাকেন্দ্র হলো স্বনামধন্য নবদ্বীপ।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন-বার্তা নবদ্বীপের শিক্ষিত সমাজে সৃষ্টি করলো এক বিরাট আলোড়ন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন সেখানকার পণ্ডিত সমাজ।

নবদ্বীপের এক তরুণ টোলের অধ্যাপকের মনে কিন্তু সেদিন দেখা গেল না কোনো আলোড়নের চিহ্ন। প্রতিদিনকার কাজকর্ম যেমন চলে সেদিনও কোনো ব্যতিক্রম হলো না তাঁর। শিষ্যদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি—ভারতবিখ্যাত অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন নগরে। তাকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে আর আমাদের অধ্যাপক মশাই কিরকম নির্বিচার উদাসীন পুরুষ। কথাটা তরুণ অধ্যাপকের কানেও উঠলো। ছাত্রদের ডেকে বললেন, হ্যাঁ আগন্তুক পণ্ডিত সত্যিই বিদ্বান ব্যক্তি; তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে আমার ধারণা—তাঁর চরিত্রে বিদ্যা ও বিনয়ের কোনও সমন্বয় ঘটেনি। সুতরাং যতবড় বিদ্বানই হোন না কেন, ইনি নিতান্ত অহংকারী ও দুর্বিনীত। সুতরাং সত্যি কথা বলতে কি, এঁর সম্বর্ধনায় আমার তেমন উৎসাহ নেই। তবে হ্যাঁ, উনি যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহলে আমি সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবো।

দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত একদিন সত্যিই এলেন তরুণ প্রিয়দর্শী এই অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে। সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা—গঙ্গার তীরে উন্মুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত—তাঁকে ঘিরে তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্যমণ্ডলী। কাছেই বিনীতভাবে বসে আছেন তরুণ অধ্যাপক আর চতুষ্পাঠীর ছাত্ররা। কুশল আপ্যায়ন বিনিময়ের পর তরুণ অধ্যাপক বললেন, পণ্ডিতপ্রবর আপনার প্রতিভার কথা লোকমুখে শুনেছি; আজ যদি সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ পেলাম, তাহলে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।

পণ্ডিতপ্রবর বললেন: বেশ তো কী বিষয় আলোচনা তোমার অভিপ্রায়?

অধ্যাপক বললেন: আপনি পবিত্র পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে বসে আছেন—আপনার কাছে থেকে আপনার রচিত গঙ্গামহিমা স্তোত্র শুনতে চাই।

পণ্ডিতপ্রবর রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে নির্গত হতে লাগলো শ্লোকের অবিরাম ধারা—গেয়ে চললেন তিনি অপূর্ব স্তব-স্তুতির মালা। শব্দের ঝঙ্কারে, ভাবের বৈচিত্র্যে, সুরের গতিতে—ভরে উঠলো গঙ্গাতীরের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ। সৃষ্টি হলো অপূর্ব উন্মাদনা শ্রোতাদের মনে। প্রহরকাল উত্তীর্ণ হবার পর পণ্ডিত ক্ষান্ত হলেন—তাঁর চোখে-মুখে আত্মশ্লাঘার সুস্পষ্ট চিহ্ন—শ্রোতাদের মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

তরুণ অধ্যাপকটি এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন: পণ্ডিতপ্রবর, আপনাকে ধন্যবাদ!

শব্দশাস্ত্রের উপর আপনার অসাধারণ অধিকার। কাব্যরসও আপনার অধিগত। কিন্তু তাহলেও আমি সবিনয়ে বলবো, আপনার রচনার মধ্যে একটি শ্লোকে আমি ভাষা-বিজ্ঞান ও ছন্দ-লয়ের মাত্রা অতিক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক! প্রহরকাল ধরে স্বরচিত শ্লোকের পর শ্লোক নির্গত হয়েছে পণ্ডিতপ্রবরের কণ্ঠ থেকে—তারই মধ্যে একটি শ্লোকের মধ্যে ভাষাগত ত্রুটির উল্লেখ করছেন এই অধ্যাপক কি করে? পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বললেন: যিনি শ্রুতিধর তাঁর মনের পটে সব কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায়—তাই আমার সব ক'টি কথাই মনে রয়েছে।

তারপর পণ্ডিতের আগ্রহে সেই শ্লোকটি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা শুরু করলেন তরুণ অধ্যাপক—প্রতিটি কথা, প্রতিটি পংক্তি, বিশ্লেষণ করে দেখালেন কোথায় কি ভাবে ত্রুটি ঘটেছে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, কোথায় ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে যথাযথ নিয়ম পালিত হয়নি।

পণ্ডিত অধোমুখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। অধ্যাপকের বক্তব্য যথার্থ, তাঁর যুক্তি অকাট্য। তিনি এগিয়ে এসে দু' হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে, আলিঙ্গন করলেন তরুণ অধ্যাপককে, আর বললেন: আমি নিজের বিদ্যা সম্পর্কে অহঙ্কার বোধ করেছি এতদিন, আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার সেই অহঙ্কার চূর্ণ হলো।

বিদ্যাগর্বী দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্টকে সেদিন পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকটির কাছে—তিনি বাংলার গৌরব নিমাই পণ্ডিত ভবিষ্যতের শ্রীচৈতন্যদেব।

চিঠির উত্তর—

শর্মিষ্ঠা ও শাশ্বতী বসু, কোলকাতা; **সুচরিতা, সুবিনীতা রায়**, (ময়ূরভঞ্জ) **অনির্বাণ ও অত্রি, অনীতা, কথাকলি, শ্রীরূপা ও নন্দিনী**—চিঠি পেয়েছি।

শুভেচ্ছাসহ
মধুদি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০·৪৫ প

১৩৭৩ সালের 'মৌচাক পুরস্কার' বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রহণ করছেন।

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৭শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৭৩ [২য় সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

কোথ থেকে এত মধু
পায় মৌচাক ?
কোথ থেকে ভাই ?
বসে ভাবি তাই।
সোনালী রোদের বোনা
গলানো সোনা
ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিরাই
তুলে আনে ফুলেদের
সব সোনাটাই ?

সকালে সূর্য ওঠে
সে কি মৌচাক ?
আকাশ জুড়ে কি শুনি
ভোমরার ডাক ?
লতায় পাতায় ঘাসে
ফুলেদের রাশে রাশে
আলোর মধু কি ভাসে ?
নেই কোথা ফাঁক !
মধুর জগতে হাসে
মধু থাক থাক।

কোথ থেকে এত মধু
আসে ভাবি তাই।
সূর্যের মৌচাকে
ঝরে মধু রোদ,
ফসলে ফসলে ফলে
রসের রসদ।
আকাশের ফাঁক কি···
তারাদের ঝাঁক কি····
সেই মৌচাক কি
মধুতে বোঝাই ?
ছড়ায় আমোদ ভাই,
গড়ায় আমোদ—
যে দিকেই চাই।
মধুরের ছোঁয়া লেগে
মধুর মতন
মধুময় হয়ে যায়
আমাদের মন।
ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে
তিলে তিলে জমে জমে···
মধুক্ষরা মধু-ঝরা
এই দুনিয়ায়···
সময়ের কোন সমে
মৌচাক হয়ে যাই
বুঝি আমরাই ॥

কাঁচি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কলম হাতে নিলেই লিখতে ইচ্ছা হয় না সকলের, অথচ যে কোন রকম অস্ত্র হাতে পড়লে হাত নিসপিস করে প্রায় সকলকারই। অর্থাৎ অস্ত্রটা ব্যবহার না করা পর্যন্ত মন সুস্থির হয় না। তবে সব ক্ষেত্রে অস্ত্রচালনার বাসনা যে সঠিক পথ ধরেই চলবে এমন কিছু নয়। বরং বে-হিসাবের দিকেই কোন কোন মনের ঝোঁকটা প্রবল। আমাদের হাবুল হ'ল এই শেষের দলের ছেলে।

হাতে ছুরি থাকলে ও পেনসিলের সীস বাড়িয়ে নেবে—আম, পেয়ারা, শসা, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল পরিপাটি করে কাটবে, আবার সেই সঙ্গে টেবিলক্লথে বা মেঝেয় পাতা শতরঞ্চে অথবা চেয়ারের হাতলে কয়েকটা আঁচড় কাটতেও ভুলবে না। অসাবধানে নিজের আঙুল—তাও কয়েকবার কেটেছে। দা দিয়ে আগাছার বংশ ধ্বংস করতে গিয়ে, ভাল জাতের জবা, মল্লিকা গোলাপের ঝাড়েও কোপ লাগিয়েছে কতবার। হয়তো ছুঁচ-সুতো নিয়ে বই-খাতা সেলাই করতে বসলো—সেই সঙ্গে চুপিসাড়ে ছোট ভাইবোনেদের গায়েতেও সেটি ফুটিয়ে দিয়ে খানিকটা কৌতুক রস উপভোগ করে নিলে। আর কাঁচি দিয়ে যে কাণ্ডটা করেছিল···সেই গল্পই বলছি, শোন।

হাঁ—ছুঁচ ছুরি ইরেজার প্রভৃতির সঙ্গে একখানা কাঁচিও ওর ড্রয়ারে এসেছে। ছাত্রদের কাছে এগুলি নাকি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। বিশেষ করে কাঁচিটা। কাগজ কাটা ছাড়া এই অস্ত্রের দ্বারা আর কি কি কাজ হতে পারে তা নিয়ে সম্প্রতি পরীক্ষা চালাচ্ছে হাবুল। কাগজের ফুল কিংবা ঘুড়ি তৈরী করতে কাঁচির তুল্য কোন অস্ত্র নেই—আবার অসাবধান বা ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাথার চুল বেমানান করতেও ওর জুড়ি নেই। হারু ঠাকুরের টিকিটাও সাফ করার চেষ্টা করেছিল একবার। সেইবারই পিতা ঠাকুরের দরবারে নালিশ পৌঁছতে কাঁচির দখলীস্বত্ব যায় যায় হয়েছিল,—অনেক কষ্টে সে ধাক্কা সামলে নিয়েছে হাবুল।

আর একবার একটা ধাক্কা এসেছিল—ওঁর পকেটে একটি ছিদ্র আবিষ্কার হওয়াতে। ডিটেক্‌টিভ গল্পের মত সূত্র ধরে ধরে বাবা সন্দেহ করেছিলেন—এটি কাঁচিরই কীর্তি, এবং তার সঙ্গে শ্রীমান হাবুলও জড়িত আছেন।

বাবা জেরার ধরণে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন ওকে, হাঁরে হাবুল, এই ছেঁদাটা পকেটে হলো কি করে?

হাবুল ভালমানুষী গলায় বলেছিল, আমি তো জানি না। তুমি আপিস থেকে এলে সন্ধ্যে-বেলায়—আমি তখন পড়ছি। তারপর ভাত খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হুঁ। তা রেজকিগুলো গেল কোথায়? মেঝেয় তো পড়েনি।

হাবুল তেমনি নিরীহ গলায় বলল, রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিছলো বাবা—কুটুর কুটুর শব্দ হচ্ছিল।

ব্যাপারই। তার পেটে তো আস্ত রেজকিগুলো সেঁধোয় নি সরাসরি—এগুলো আলুকাবলি, ঝাল চানাচুর, সিঙ্গাড়া, নিমকিতে রূপান্তরিত হয়ে…

যাই হোক কাজটা কিন্তু কাঁচাই হয়েছে। পকেটমারেরা কি ভাবে পকেট কাটে—এটা তো বাবা জানেনই। কারণ বার দুই তিন ও কাজটা তাঁর উপর দিয়ে হয়ে গেছে। আবার ইঁদুরেও এমন চোস্ত ভাবে পকেট কাটে কি? সুতরাং সুগম্ভীর 'হুঁ' শব্দটির দ্বারা বাবার মনের গতিটা কোন্ দিকে ধরতে পারল হাবুল। না, এমন কাঁচা কাজ ও আর করবে না।

কিন্তু কাঁচি ছুরি যখন ওর দখলে, তখন দুষ্টু বুদ্ধির ঢেউগুলোও মগজে ওঠা-নামা করছে। এই সব অস্ত্রের ব্যবহার না করেই বা উপায় কি হাবুলের।

ভাবতে ভাবতে একটা মতলব ওর মাথায় এলো। ঠিক—ঠিক। ইস্কুলে নিত্যনিয়মিত হাজিরা দেবার দায় থেকে এরা কি মুক্তি দিতে পারে না? এই কাঁচি ছুরি ছুঁচের দল? বাড়ী থেকে প্রত্যহ এক মাইল পথ পায়ে হেঁটে এবং ভালমত পড়া তৈরী না করে ইস্কুল যাওয়ার দুর্ভোগ—সে মর্ম হাবুল ছাড়া কে বুঝবে। ঝড়বৃষ্টি – রোদের তেজ—মাঝে মাঝে পায়ে ব্যথা ইত্যাদির অজুহাত লাগিয়ে একঘেয়েমি কাটাবার সুযোগ করে নিয়েছিল হাবুল,—সেখানেও বাদ সাধলে মেজদা। একদিন বলল মা-কে, মা হাবলোটা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করছে কেন?

মা বললেন, কি করবে বল—যেতে-আসতে পাকা এক কোশ রাস্তা—ছেলেমানুষ তো—পা ব্যথা হয় না! হয়তো রাস্তায় বৃষ্টি এলো ঝেঁপে—কি চড়চড়ে রোদ উঠলো—

মেজদা বলল, এই কথা! আচ্ছা—আমি সে ব্যবস্থা করছি। রোজ কলেজে যাবার সময় ওকে সাইকেলে করে পৌঁছে দিয়ে যাব। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাবে ইস্কুলে; পা ব্যথা হবে না, রোদে পুড়বে না—জলে ভিজবে না—

মা বললেন, তোর কলেজ তো দেরিতে—ওর জন্যে অত সকাল সকাল বেরুবি?

তা হোক—ছোট ভাইয়ের জন্যে এটুকু করব না। এ আমার কর্তব্য।

আহা—কি কর্তব্যজ্ঞান মেজদার

হাবুল ঘরের মধ্যেই ভেংচি কাটলো মেজদার উদ্দেশে।

অতঃপর আর কোন ফাঁক রইলো না—নিরেট কর্তব্যপালনের নিষ্ঠায় ইস্কুল-হাজরিটা থান

শক্ত হয়ে উঠলো। দম আটকে এলো হাবুলের। এখন ও প্রতিদিনই ভাবছে—কি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। ছুরি কাঁচি ছুঁচ—এসব দিয়ে কি কিছু হতে পারে না? াতে ভাবতে দপ করে একটা আলো জ্বলে উঠলো। যেন মেঘলা আকাশে বিদ্যুতের খা টেনে দিলে কেউ। অনেক উপরের আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসায়—অনেক নীচের পৃথিবীতে ার আলো পড়ে। হোক এক লহমার জন্য—পথটা তো তবু দেখা গেল।

*　　　　*

পরের দিন সাইকেল বা'র করতে গিয়ে মেজদা খুঁত খুঁত করল। সিরিঞ্জটা আনতো রে াবলো—সামনের চাকাটায় হাওয়া ভরতে হবে।

হাওয়া ভরে দিব্যি সাঁ সাঁ করে চালাল সাইকেল। এক মিনিটও লেট হলো না ইস্কুলে।

বিকেলে হাবুল মা-কে বলল, মা, পয়সা দাও—ছুঁচ কিনতে হবে।

ছুঁচ। মা অবাক হলেন। এই তো গেল সপ্তাহে ছুঁচ কিনলি!

হাবুল মাথা নাড়ল, ও কাথা সেলাই ছুঁচ দিয়ে কি মোটা খাতা সেলাই হয়—গুণছুঁচ চাই।

মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে একটা মাথা চওড়া গুণছুঁচ কিনে আনলে হাবুল।

পরের দিন সাইকেলের অবস্থা আরও শোচনীয়। সামনের চাকাটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

মেজদা পরীক্ষা করে বলল, ইস্—টায়ারে মস্ত ছেঁদা! মনে হচ্ছে পেরেক টেরেক ফুটেছিল। যাই এইবেলা দোকান থেকে সারিয়ে নিয়ে আসি—নইলে ইস্কুল কলেজের দফা গয়া!

সাইকেল মেরামত করিয়ে যথাসময়ে ইস্কুলে পৌঁছে দিলে মেজদা।

সারাটা দিন গভীর চিন্তায় ডুবে রইলো হাবুল। বলতে গেলে ক্লাসের পড়া কিছুই কানে গেল না—। হেড স্যারের কাছে বারকয়েক ধমক খেলে। ইস্কুল শেষ হলে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরেও ভাবনা গেল না। খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লো না—বইখাতা ছুঁচ ছুরি কাচি সামনে সাজিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেদিকে। চেয়ে রাইলো আর ভাবতে লাগল।

*　　　　*

পরের দিন।

ইস্কুলের বইখাতা গুছিয়ে রাখছে—খাওয়া শেষ হলে ওগুলো ব্যাগে ভরে নেবে—তারপর মেজদা ডাকলেই টুক করে বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে। মেজদা আস্তে আস্তেই ডাকে—হাবুল, সে ডাক কিন্তু ওর কানে ভারী বিশ্রী লাগে। মনে হয়, জজসায়েব যেন আসামীকে ফাঁসির হুকুম শোনাচ্ছেন।
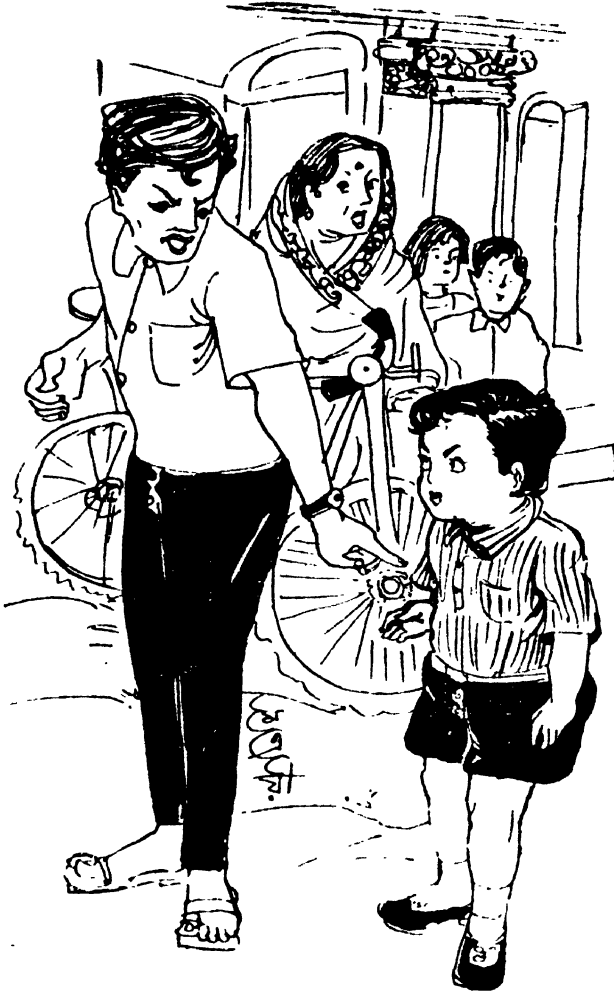
আজ কিন্তু তেমনি আস্তে ডাকল না মেজদা—একেবারে বোমা ফাটিয়ে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো, মা—মা, দেখবে এস কাণ্ড!

সে-ই কান-ফাটানো চীৎকারে শুধু মা নয়—বাড়ীর যে যেখানে ছিল এসে জুটলো। এমন কি ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবা সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন—তিনিও ফিরে এলেন।

কি—কি হয়েছে?

ততক্ষণে সাইকেলটাকে উঠোনের মাঝখানে টেনে এনেছে মেজদা। কিন্তু সে কি আর সাইকেল। ফ্রেমটা বাদ দিয়ে পেট-চেরা চাকা দু'খানা—মানে টায়ার আর টিউব দুটোই ঝড়ে ছেঁড়া কলাপাতার মত লটরপটর করছে। তালিতাপ্পা লাগিয়েও ওটা খাড়া করা যাবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে মেজদা বলল, কার কাজ এ'টা? যদি জানতে পারি–, হুঙ্কারের চোটে ওর বাকি কথা শোনা গেল না।

নাই শোনা যাক – হাবুলের বুকের মধ্যে তখন কাঁপছে।

বাবা চুপ করেই ছিলেন। কি ভাবছিলেন। সকলের মুখের পানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন মুখ থুবড়ানো সাইকেলের দিকে। চাকা দুটোকে হাত বুলিয়ে কি যেন পরীক্ষা করলেন। তারপর যে ঘরে সাইকেল ছিল – সেখানে গেলেন। মিনিট দুই পরে বাইরে এলেন। বাইরে আসার সময় ছোট্ট মত কি যেন একটা জিনিস পকেটে ফেললেন। ওঁর মুখটা তখন এক মিনিটের জন্য চক্‌চক্ করে উঠলো – তারপর ভীষণ থমথমে আর গম্ভীর দেখাতে লাগলো।

মেজদা দুঃখিত গলায় বলল, আজ আর কলেজ যাওয়া হলো না!

বাবা থমথমে গলায় আস্তে আস্তে বললেন, কেন হবে না—তুমি কলেজ যাবে, হাবুলও ইস্কুল যাবে। যাও তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও গে। সাইকেলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি আজ আপিস যাব না।

মেজদা খুসী হ'ল।

বাবা বললেন, আর শোন কলেজ থেকে ফিরেই গঞ্জের দোকানে গিয়ে দুটো নতুন টায়ার টিউব কিনে নেবে। টাকাটা অবশ্য সংসারের খরচ থেকেই নিতে হবে। দু'বেলার জলখাবার থেকে মিষ্টিটা বাদ পড়বে কিছুদিন। উপায় কি—বাজেট বরাদ্দয় কাঁচি না চালিয়ে তো টায়ার টিউবের ক্ষতি সামলানো যাবে না। একটা দিন ইস্কুল কলেজ কামাই হোক এ আমি চাই না। তোমরা কি বল ?

হাবুলের মনে হলো বাবা তার দিকে কটমটিয়ে চেয়েই প্রশ্ন করলেন, এবং ইচ্ছে করেই কাঁচির কথাটা তুললেন।

ওর বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ। মাথাটা অনেকখানি নামিয়ে প্রায় চোখ বুজে ও বার দুই ঘাড় নাড়লো—কে জানে সেটা 'হাঁ' কিংবা 'না'-এর ইশারা।

দুধ-দাঁত

শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাক চোখে খোকন সোনা দিদার পানে চায়
বলে, 'তোমার মুখে দেখি একটাও দাঁত নাই।'
কোথা গেল দাঁতগুলো সব, কও না দেখি শুনি,
কেড়ে নিল বুঝি মোদের বদমাস্ বোন টুনি ?
খোকায় চুমে বলল দিদা—নারে দাদু ভাই
টুনি তো নয়, তুই নিয়েছিস্ ফোকলা আমি তাই।
হাসলে কত মুক্তো ঝরে দেখবো আমি দাদা—
তাইতো তোমার দাঁত হয়েছে দুধের মত সাদা॥

উড়ন্ত শিয়াল

কাজল বল

—চল চল দেখি, কোথায় দেখেছিস আমার ভাইকে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াতে? —এই বলে শিয়াল পণ্ডিত তার ছাত্র ভেড়ার কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পাঠশালা থেকে বের করে নিয়ে এলো।—যদি দেখাতে না পারিস তো তোকে আর আস্ত রাখবো না!

—ভেঁ ভেঁ ভেঁ-উ বড্ড লাগছে পণ্ডিতমশাই।

—লাগুক। বল এবার কোন দিকে যেতে হবে! পণ্ডিতমশাই ধমক দিয়ে উঠলেন।

—সোজা চলুন। ভেড়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললো।

—তাই চল।—এই বলে শিয়াল পণ্ডিত ভেড়ার কান ধরে টানতে টানতে পথ চলতে লাগলো।

ঠিক এই সময় গাছের ডাল থেকে কে একজন বললো,—পণ্ডিতদাদা, ও পণ্ডিতদাদা, অত হন্তদন্ত হয়ে ছুট্‌ছো কোথায়? ও বেচারার কানটা ছেড়ে দাও। ওর কান দিয়ে রক্ত পড়ছে যে!

—কে, কে এটা? আমার উপর খবরদারি!—এই বলে শিয়ালপণ্ডিত গাছের দিকে তাকালো। দেখলো ডালপালার উপর থেকে মুখ বের করে একটা শিয়াল গাছের উপর বসে আছে। তাকে দেখে বললো—হাঁ রে, তোর সাহস তো কম নয়। গাছে উঠেছিস কেন? পড়ে তো হাত-পা ভাঙবি। নাম্‌ শিগ্‌গির।

—হুঁয়া-হুঁ—হিঁ-হিঁ—গাছে বসা শিয়ালটা হেসে উঠলো।

—বলছো কি দাদা, তোমার মত ভাবলে নাকি আমাকে?

—এই বলে শিয়ালটা ডালপালা সরিয়ে আর একটা ডালে এসে বসলো।—আরে পণ্ডিতদাদা

তোমাদের ঐ মাটি-কাদার মধ্যে আমি নামি না। গাছে গাছে ঘর করে থাকি, ডালে ডালে ঘুরে বেড়াই, ইচ্ছে হলে ডানা মেলে অসীম আকাশে গা-ভাসিয়ে দিই।

ভেড়া পণ্ডিতমশাইয়ের কানে কানে বললো—এই তো সেই উড়ন্ত শিয়াল যাকে আপনার ভাই বলেছিলাম।

শিয়ালপণ্ডিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো এই উড়ন্ত শিয়ালটাকে। মাথা আর দেহ মিলে এক ফুট লম্বা হবে। পা থেকে মাথা প্রায় সোয়া দু'ফুট। ডাল পাল্টাবার সময় যখন ডানা মেলেছিল, প্রায় পাঁচফুট জায়গা লেগেছিল উড়ন্ত শিয়ালটার। চোখ, মুখ, কান সবই তার মত দেখতে। এমনকি গায়ের রং এবং দেহটা পর্যন্ত। শুধু সামনের পা'টা পাখীর ডানার মত চামড়ার পর্দা দিয়ে আটকানো। আর পিছনের পায়ের আঙুলগুলো আংটার মত দেখতে। সন্দেহ হোল ডানাটা নকল বলে। তাই জিজ্ঞেস করলো—হাঁ রে, তুই ডানা পেলি কোত্থেকে? ত্যাখ ওটা খুলে ফ্যাল। ওসব নকল ডানা গায়ে লাগাবি তো এই দাইদেলাসের ছেলের দশা হবে। শুনিস নি ওরা বাপ ছেলে ওই নকল ডানা লাগিয়েই প্রাণ হারালো?

—উড়ন্ত শিয়াল শুনে অট্টহাসিতে গাছপালার পাতা নাড়িয়ে বললো—কি যে বল দাদা, বিদ্যার অহংকারে তুমি চোখ কান দুই'ই খুইয়েছ। এ ডানা কি খোলা যায়, না লাগানো যায়! প্রাণীবিদ্যায় টেরোপাসের (pteropus) নাম শোননি, সেই উড়ন্ত শিয়াল আমি। এ ডানা তো আমার জন্মগত।

—জন্মগত! অমনি বললেই হোল। তবে তো আমারও হতে পারতো। আমার ডানা গজালো না অথচ তোর হোল এ কেমন কথা!

—না! তুমি শুধুই পণ্ডিত সেজেছো, আসলে কিছুই জানো না। আরে দাদা, সবার উপরে ভগবান আছেন। বিচার করে তিনি সৃষ্টি করছেন সব। পৃথিবীতে প্রাণসঞ্চার করলেন তিনিই। তাঁর ধারাবাহিক সৃষ্টির পথে সরীসৃপের পরেই তিনি পাখী আর আমাদের, মানে তোমাকে আমাকে, ওই মানুষকে সৃষ্টি করলেন। অবশ্য নূতন কিছু না। ওই সরীসৃপের কাঠামা-কেই একটু এদিক আর ওদিক সাজিয়ে, শ্রেণীবিভাগ করে গড়ে তুললেন আর কি! কিন্তু কি জানো, তোমার পূর্বপুরুষদের মন খুব ছোট ছিল। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট ছোট জীবজন্তুদের ধরে ধরে খেতে লাগলো, মাটিতে গড়াগড়ি খেলো। আমাদের মত ফলমূল খেয়ে সন্তুষ্ট হোল না। তাই তো ভগবান তোমার পূর্বপুরুষদের আর রাগ করে ডানা দিলেন না। আমরা গাছে গাছে থাকতে, হাওয়ায় সাঁতার কাটতে ভালবাসতাম, তাই ভগবান আমাদের ডানা দিলেন।

—উড়ন্ত শিয়াল ডানা মেলে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে বললো—পণ্ডিতদাদা, এই সব কচি কচি

বাচ্চাদের উপর লোভ দেওয়া ছেড়ে দাও। ক'দিন আর এভাবে অন্যের ঘাড় মটকাবে? এবার একটু পুজাআচ্চা কর, ধর্মকর্মে মন দাও, তোমার পিতৃপুরুষেরা শান্তি পাবেন।

—তোরা বুঝি শুধু এখানেই থাকিস?

—আরে না না পণ্ডিতদাদা, শুধু ভারতবর্ষের এই সব বনে-জঙ্গলে নয়, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ,—বলতে গেলে পৃথিবীর সব জায়গাতেই আমাদের ঘর আছে। উড়ন্ত শিয়ালটা একবার সূর্যের দিকে তাকালো, বোধ হয় সময়টা দেখলো। তারপরই চঞ্চল হয়ে বললো—যা! কথায় কথায় একেবারে দেরি করে ফেললাম। ছেলেটার যে দুধ খাবার সময় হোল।—এই বলে ডানা মেলে শূন্যে লাফিয়ে গা ভাসিয়ে দিল।

শিয়াল অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলো ইস্ সেও যদি অমনি ডানা মেলে আকাশে পাড়ি দিতে পারতো।

শিয়ালপণ্ডিত আবেশে একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো।

শিল্পী নন্দলাল

শ্রীভবেশ দাস

শিল্পলোকের শিল্পী দেখেছি তোমাকে নন্দলাল
কালে আর কালে মহাকাল কোরে হয়েছ যে দিক্‌পাল।
তোমার তুলিতে সেকালে-একালে ঘটেছে সমন্বয়,
উল্লাসে আর বেদনায় গেঁথে, করেছ মৃত্যু জয়।
তোমার তুলিতে ধরা দিয়েছে যে একটি শিশুর প্রাণ
সেই শিশুটির মায়েরই আবার বুক ফেটে খান্‌খান্।
শিল্পে এনেছ নতুন জীবন আর বুকভরা আশা—
তোমার মনের মাধুরী দিয়েছ, অমায়িক ভালবাসা।
অবন ঠাকুর গুরু ছিল জানি, তুমি ছিলে তার শিষ্য
সেই সম্মান বাড়িয়ে দিতেই অবাক কোরেছ বিশ্ব।

রাজা হবু মন্ত্রী গবু

শ্রীঅতীন মজুমদার

চুরি! চুরি!! চুরি!!!

যেখানে-সেখানে চুরি নয়, টাঁকশালে চুরি!

যার তার টাঁকশাল নয়, মহারাজ হবুচন্দ্রের টাঁকশাল।

কত টাকা চুরি?

কে তার হিসেব দেবে? মহারাজ হবুচন্দ্রের টাঁকশালে তৈরী হয় অগুণতি টাকা। হিসেব করে কি আর তৈরী হয় যে চোর কত চুরি করিছে তার হিসেব পাওয়া যাবে?

অতএব কত চুরি হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই!

তাহলে হিসেব যেখানে নেই, সেখানে চুরি ধরা পড়ল কি করে?

ধরা পড়ল বস্তা গুণে!

ভোর না হতেই টাঁকশালের কর্মাধ্যক্ষ এসে হাজির হলেন,—নিয়মিত ভাবে ঠিক যেমনটি সময়ে তিনি আসেন। তারপর টাকা-তৈরী-ঘরে ঢুকেই সামনের সারি সারি টাকা-ভর্তি-বস্তা গুণতে সুরু করে দিলেন। একবার গুণলেন…দু'বার…তিনবার মোট চোদ্দবার গুণে শেষে দেখলেন, দুটো বস্তা কম।

সকাল আটটা বাহান্ন থেকে সন্ধ্যে সাতটা বাহান্ন পর্যন্ত মোট বাষট্টি বস্তা টাকা তৈরী হয়েছে। আর এখন দেখা যাচ্ছে ষাট বস্তা। দুটো বস্তা কম।

কর্মাধ্যক্ষ ছুটলেন মহারাজকে খবর দিতে।

তখন সবেমাত্র সাতটা বেজে তিন মিনিট। মহারাজ হবুচন্দ্র ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। আর ন'টায় ঘুম থেকে উঠলেও তক্ষুণি তার দেখা পাওয়া যায় না। কারণ উঠে প্রাতঃ-বিধি সেরে, প্রাতঃরাশ করে, গড়গড়া টেনে তারপর রাজ-পোশাক পরতে পরতে বেলা সাড়ে দশটা হয়ে যায়। দশটা বিয়াল্লিশে যান রাজসভায়। সেখানে মন্ত্রী পাত্রমিত্র সভাসদ্‌রা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। মহারাজ রাজসভায় গিয়েই যার যা কথা শোনেন। তার আগে যত জরুরী কথাই থাকুক না কেন, শোনার সময় কোথায়?

অতএব কর্মধ্যক্ষকে রাজসভায় গিয়েই বসে থাকতে হ'ল।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা বিয়াল্লিশ। রাজসভায় ঢুকে মহারাজ হবুচন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সকলে অভিবাদন করল।

মহারাজ হবুচন্দ্র সকলের কুশল সংবাদ নিলেন। তারপর রাজসভার কাজ সুরু হ'ল।

কর্মাধ্যক্ষ করজোড়ে বিনীতভাবে মহারাজকে তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাতে যাবেন, এমন

সময় মন্ত্রী গবুচন্দ্র ধমক দিয়ে উঠলেন : থামো হে থামো। অত ব্যস্ত হলে চলে না। পরশু দিনকার তিনটি বিচার আর গতকালের পাঁচটা বৈদেশিক নীতির আলোচনা এখনো বাকী আছে। সেগুলো আগে, তারপর তোমার কথা শোনা হবে।

তিনটে বিচার সুরু হ'ল। ঝাড়া এক ঘণ্টার পর শেষ হ'ল। বৈদেশিক নীতির পর্যালোচনাও শেষ হতে লাগলো দেড় ঘণ্টা।

তারপর কর্মাধ্যক্ষের নিবেদন সুরু হ'ল।

শুনেই তো মহারাজের চক্ষু চড়কগাছ!

টাঁকশালে চুরি…! সর্বনাশ!

মহারাজ মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে বল্লেন,—গবু একি শুনছি?

মন্ত্রী গবু চিন্তিত হয়ে বল্লেন,—সত্যিই তো মহারাজ, একি শুনছি?

রাজ্যের যত শাস্ত্রী সেপাই আছে, তারা কি করে মন্ত্রী গবু?—মহারাজ হবুচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

মন্ত্রী গবু জবাব দেন—তাই তো মহারাজ, তারা কি করে?

নিশ্চয় তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়—আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মহারাজ হবুচন্দ্র।

আজ্ঞে হ্যা, নিশ্চয় তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়, নইলে জেগে থাকলে চোর কি চুরি করার সুযোগ পায়?—মন্ত্রী গবু বলেন।

কোতোয়ালকে ডাক—মহারাজ হবুচন্দ্র জানালেন।

মন্ত্রী গবু হাঁক পাড়লেন,—কোতোয়াল—কোতোয়াল!

সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল হাজির।

মন্ত্রী গবু বেশ কড়া মেজাজেই বলে' উঠলেন,—রাতে যে সব শাস্ত্রী-সেপাইদের ডিউটি থাকে, তারা ঠিক মত ডিউটি দেয় কিনা সেটা আপনি দেখেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ—বিনীত কণ্ঠে কোতোয়াল জানালেন।

মিথ্যে কথা! এবার গর্জে উঠলেন মন্ত্রী গবু—কাল রাতে টাঁকশালে চোর ঢুকে দু'বস্তা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে জানেন? যদি আপনি ঠিক মত তাদের কাজ-কর্ম তদারক করতেন তা'হলে কি এটা ঘটত? নিশ্চয়ই কাল রাতে টাঁকশালের দোরগোড়ায় যে শাস্ত্রী ছিল, সে ঘুমুচ্ছিল, আর চোর সেই সুযোগে ভেতরে ঢুকে পড়ে টাকার বস্তা নিয়ে পালিয়েছে। আপনি যদি কাল রাতে তদারকে বেরুতেন, নিশ্চয়ই তাকে ঘুমুতে দেখতে পেতেন। সেই সময়ে তাকে গুঁতো মেরে জাগিয়ে দিয়ে দুটো কড়া ধমক দিলে এই চুরিটা হতো না।

আজ্ঞে, আমি কাল রাত দুটো বেজে ছাব্বিশ মিনিটে টহল দিতে বেরিয়েছিলাম এবং রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ঘুরে আজ সকাল ছ'টায় ফিরেছি। রাত প্রায় স'য়া তিনটে নাগাদ টাকশালের *দিকে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের প্রধান শাস্ত্রী হাতী সিং ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে* পাহারা দিচ্ছে। কই, তাকে তো ঘুমুতে দেখিনি।—কোতোয়াল বল্লেন।

বটে!—গবু বল্লেন,—ডাকুন তো আপনার হাতী সিংকে।

কোতোয়াল চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরই ফিরে এলেন হাতী সিংকে সঙ্গে করে।

হাতী সিংয়ের এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে তরোয়াল। রোগা টিংটিয়ে চেহারা। মুখে খাপ-খোলা তরোয়ালের মত ইয়া বিরাট গোঁপ।

হাতী সিংকে দেখে মন্ত্রী গবু হাঁক দিলেন,—কাল রাতে কি ভাবে পাহারা দিয়েছ?

ভয়ে থতমত হাতী সিং জবাব দিল, আজ্ঞে হুজুর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—।

বলি, চোখ দুটো বন্ধ ছিল, না খোলা ছিল? বেরাট এক ধমক দিয়ে মন্ত্রী গবু প্রশ্ন করলেন হাতী সিংকে।

আরো থতমত হয়ে আমতা আমতা ক'রে জবাব দিল হাতী সিং—আজ্ঞে হুজুর, খোলাই ছিল।

মিথ্যে কথা! বন্ধ ছিল। গর্জে উঠলেন মন্ত্রী গবু।

আজ্ঞে না হুজুর, সত্যি বল্ছি। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে হাতী সিং জবাব দিল।

ফের মিথ্যে কথা!—চোখ রাঙিয়ে মন্ত্রী গবু বল্লেন,—এক নম্বর কাজে ফাঁকি, দু'নম্বর রাজ দরবারে এসে মহামান্য ন্যায়াধীশ মহারাজ হবুচন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলা! এই দুই অপরাধের জন্যে তোমার মাথা মুড়িয়ে, সারা মুখে কালি মাখিয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে দু'দিন ঘোরানো হবে। তারপর বারোমাস ঘোড়ার ঘাস কাট্‌বে। বুঝ্‌লে?

এবার কাঁদ কাঁদ হয়ে হাতী সিং বল্লে,—হুজুর আমি ঘুমুইও নি আর মিথ্যে কথাও বলছি না।

ফির মিথ্যে কথা বেয়াদপ কোথাকার!—মন্ত্রী গবু রাগে ফেটে পড়লেন,—ঘুমাওনি? জান কাল রাতে টাঁকশালে চোর ঢুকে দু'বস্তা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে!

আজ্ঞে হুজুর, জানি। হাতী সিংহ বিনীত ভাবে জবাব দিল।

জানো? সাগ্রহে মন্ত্রী গবু প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, জানি। হাতী সিং জবাব দিল,—চোরকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি ঢুকতে। কাল রাতে ঠিক চারটের সময় আমার সামনে দিয়েই সে ঢুকল। তারপর বড় বড় দুটো বস্তা কাঁধে ফেলে আমার সামনে দিয়েই তো বেরিয়ে গেল।

অ্যাঃ! – আঁতকে উঠলেন গবু। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হবুচন্দ্রও।

গবু বল্লেন,—দেখলে অথচ ঠায় দাঁড়িয়েছিলে, চোরকে ধরলে না কেন?

আজ্ঞে কি করে ধরব হুজুর! আমার দু' হাতই যে জোড়া ছিল। এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরোয়াল – কোন্ হাতে ধরব বলুন। হাতী সিং বললে।

কথা শুনে মন্ত্রী গবু তো এক্কেবারে বোবা! আর মহারাজ হবুচন্দ্র তো থ!

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সভায় টুঁ শব্দটি নেই। মন্ত্রী গবু চিন্তিত। মহারাজ হবুও গালে হাত দিয়ে চোখ-বোঝা অবস্থায় ভাবছেন।

ভেবে ভেবে শেষকালে মন্ত্রী গবু বললেন, – হ্যাঁ, ঠিক – ঠিক কথাই বলেছ। এক হাতে ঢাল অন্য হাতে তরোয়াল – কোন্ হাতে ধর্‌বে? তৃতীয় হাত ত নেই! মানুষের দুটোই হাত।

মন্ত্রীর কথা শুনে মহারাজ হবুচন্দ্রও মাথা নাড়লেন – হ্যাঁ, ঠিক কথাই বটে। দুটো হাত জোড়া থাকলে কি করে ধরবে ?

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। শেষে মন্ত্রী গবু বললেন – মহারাজ, চুরি-চামারি বন্ধ করার জন্যে যে নতুন আইন জারী করতে হয়।

নতুন কি আইন ? – মহারাজ হবু প্রশ্ন করলেন।

রাতে যে সব শান্ত্রী-সেপাই পাহারা দেবে, তারা কেউ হাতে ঢাল-তরোয়াল রাখবে না। ঢাল-তরোয়াল রাখলেই দু'হাত জোড়া থাকবে, চোরকে ধরা যাবে না। মন্ত্রী গবু বললেন।

মহারাজ হবু শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন – ঠিক কথাই বটে! তোমার বুদ্ধি আছে গবু। তারপরই চীৎকার করে বললেন – এই, কে আছ ? বাদ্যিখানায় খবর দাও রাজ্যময় ঢাক পিটিয়ে নতুন আইন প্রচার করে আসুক।

পরদিন থেকে রাজ্যময় ঢাক পিটিয়ে মহারাজা হবুর নতুন আইন প্রচার হতে লাগ্ল।

মাদুরা

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

মাদুরা সোনাতে মোড়া
যত "গোপুরম্"
সেখানেতে যাহা দেখি
সব সুন্দরম্।
বাহারে মাদুরা সাড়ী
দেখিতে উত্তম্,
নারিকেল তেলে রান্না
না হবে হজম্।

'রাঘব' নামটি যার
শুনি "রাঘবন্"
কেশবে ডাকিতে হলে
বলি "কেশবন"।
মীনাক্ষী দেউল চূড়া
পরশে গগন,
দেখিলে হইবে জেন
সফল জনম্।

খোঁপায় ফুলের হার পরে সব মেয়ে
একবার দেখে এস সেথা সবে গিয়ে ॥

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(২)

বাঁটুলের মামা চরণ গাঙ্গুলী তাকে পুষ্যি দিয়ে দিতে চায় জানতে পেরে বাঁটুলের মামী বললে, বাটু তুই তোর বাবার কাছে পালিয়ে যা।

কিন্তু পালিয়ে যাওয়া অমনি চারটিখানি কথা নয়। বাঁটুলেয় মামা চরণ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে পালানো আরো কঠিন। তবু পালিয়ে যেতে হবেই হবে।

অবশ্য পালিয়ে যাওয়াটা এমন সর্বনেশে কিছু নয়। পদাই যখন হ'ল, তখন মামী পদাইকে ভালবাসে বলে ঝগড়া করে বাঁটুল বগলে মাদুর আর বালিশ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কানী-বুড়ীর পোড়ো ভিটের বাতাবি গাছতলায় শুয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঠিক দুপুর বেলা। তখন ঝিমঝিমে দুপুর, চারদিক সুন্‌সান্‌, আর কে না জানে এমনি দুপুরে কানীবুড়ীর ভিটের সেই একানোড়েটা তালগাছ দিয়ে সড়াৎ সড়াৎ করে ওঠে আর নামে? তারপর থেকে মামী তাকে ঘরে পুরে ভেতর থেকে কুলুপ এঁটে তবে ঘুমোত।

পাঠশালা থেকে পালিয়ে যাওয়া তো ডালভাত আর কখনো উৎকুনির মেলা দেখতে, কখনো চড়কের বাণ-ফোঁড়া দেখতে অনেক, অনেকবার পালিয়েছে বাঁটুল।

পইতে-তে কান বেঁধাতে হবে বলে বাঁটুল হাটুরেদের খড়ের গাড়ী চেপে একেবারে জেমো পালিয়ে গিয়েছিল। শেষে ঘুড়ি, লাটাই, ছিপ, বঁড়শী, এত এত ঘুষ দিয়ে তবে মামী তাকে পইতে নিতে রাজী করিয়েছিল।

যতবারই পালাক, যেখানেই পালাক, শেষ অবধি তো মামীমার কাছেই এসেছে বাঁটুল। মামীমার কাছে বসে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কখনো পালিয়ে যাবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে।

তাছাড়া, যাই বলো, বাড়ী ফিরে যখনই উঠোনে ধান সেদ্ধ হবার ভেমো ভাপ্‌সা গন্ধ পেয়েছে, দেখেছে কুলগাছের গায়ে মামীমার লঙ্কা হলুদ শুকোবার মস্ত কুলো, রাধীর হাঁড়িকুঁড়ির সংসারে ঘাসপাতার রান্নাবান্নায় বেড়ালছানাদের ঘোরাঘুরি, আর তাকে দেখতে পেয়ে মামীমার চোখে জল, তখনই মনটা টুপটুপে হয়ে ভরে গিয়েছে তার। মনে হয়েছে এই সব কিছুর চেয়ে আপন তার কিছু নেই।

আজ তাকে পালিয়ে যেতে হবে। পালিয়ে যেতে হবে, কেন না চাঁদবদন ভট্টচাজ বড় সাংঘাতিক লোক। ছোট ছেলেদের পুষ্যি নেবে বলে শেষ অবধি···কিন্তু সে সব সর্বনেশে কথা এখন না তোলাই ভাল।

মামী বললে, বাঁটুল তুই তোর বাবার কাছে পালিয়ে যা। বলে দিলে দু'বছর হ'ল কোম্পানী রেলগাড়ী চালাচ্ছে, তুই রেলে চেপে চলে যা। কিন্তু তাই বলেই কি চলে যাওয়া যায়? কোথায় সেই আটশো-হাজার মাইল দূরে কানপুর, কোথায় বাঁটুলের বাবা, আর কোথায় আমাদের বাঁটুল! সবে পইতে হওয়া, কান খাড়া খাড়া, চোখ জ্বল্‌জ্বলে একটা তেরো বছরের ছেলে।

'ধরো কানপুরে গেলাম, কিন্তু বাবাকে যদি চিনতে না পারি?'

বাঁটুল মামীমাকে বললে পুকুর পাড়ে বসে। মামীমা বাঁটুলের কানের পেছন, পিঠের ডান দিক, এই সব জায়গা থেকে গামচা ঘষে ময়লা তুলছিল। বললে—

'সে একটা কথা বটে।'

'বাবা কি রকম দেখতে গো?'

'খুব রঙ, আর মেঘের মত গলার আওয়াজ।'

'আর কিছু মনে নেই তোমার?'

'মনে নেই আবার! তোর মাকে নিয়ে যখন ছাঁচতলায় দাঁড়াল, তখন দেখেছিলাম রূপে উঠোন আলো হয়ে উঠল।'

'সে তো অনেকদিন আগে গো!'

'আর তোকে নিয়ে যখন আমার কাছে পৌছতে এল, একমাথা চুল, মুখের দিকে চাইতে পারি না। খালি চোখে জল আসে। তোকে আমার কোলে তুলে দিলে। বললে, বউঠান, যদি রাখতে পারেন তবে রাখুন।'

'তুমি কি করলে?'

'ওঁর সঙ্গে কথা কইলে সবাই নিন্দে করবে তাই মাটিতে আঁক কেটে লিখে দিলাম রেখে যান।'

'লিখতে জান বলে তোমার নিন্দে করে না ত কেউ? অথচ অন্য কেউ লিখলে-পড়লে

মেয়েদের নিন্দে হয়।'

'আমার বাবা যে মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন, দেশে-গাঁয়ে মানত। তিনি আমার লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন আর আমি লিখতে জানি জানতে পেরে সবাই আমাকে বলত এবার গাঙ্গুলী বাড়ীতে না জানি কি একটা সর্বনাশ ঘটে, বুঝি বা একটা প্রলয় কাণ্ড হয়!'

'তারপর?'

'কিন্তু এ মুল্লুকের রাজাগজা সবাই বাবার কাছে বিধান নিয়ে চলে আর বাবা বলে দিলেন মেয়েছেলে লিখবে পড়বে তাতে নিন্দে যারা করে তারা বেজায় বোকা। বিদ্যেসাগর মশায়ের কথা বললেন, আর আঁটুল গাঁয়ের কর্তাদের বললেন, বিদ্যের ঠাকুর তো মেয়েছেলে ঠাকুর, সরস্বতী পুজো কর না? ধেনো চাষীর গাঁ, তাই বলদের বুদ্ধি। বাবার মুখ যেমন, রাগ তেমনি, ভাগ্যে লোকে মানে-গণে, নইলে অমন রুক্ষ কথা সইত না।'

'তা বটে।'

'শোন্, তোর বাবার চেহারা আমার যেমন যেমন মনে আছে তেমনি লিখে দোব। লিখতে ভুলে গিয়েছি বললেই হয়, তবু সব লিখে দোব, চিঠি দোব, হাতে চিঠি দিবি, দেখে মিলিয়ে নিবি। পারবি না?'

'পারব।'

'তা বলে তোকে একলা যেতে দিচ্ছি না!' মামী কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, হ্যাঁ রে, শীত তো দিব্যি জেঁকে বসেছে, এই সময়ে চল্ না কেন তোতে আমাতে আমার মানতের পুজোটা দিয়ে আসি?'

'মানত? মানত তো সেবারই শোধ করলে!'

'তুই সব জানিস!' বলে মামীমা ভিজে চুল মাথার ওপর চুড়ো করে রান্না ঘরে গিয়ে বসল। উঠোনের মাচা থেকে যে লাউটা ঝুলছিল সেটা দিয়ে মাছের মাথা রাঁধাল, এই বড় বড় কই মাছের ঝোল, আর বড়ি দিয়ে সুকতো রেঁধে বাঁটুলের মামাকে খেতে দিলে।

খাওয়া যখন আধাআধি, তখন মামী অন্য দিকে চেয়ে বললে, 'আমি কাল মোল্লাচকে যাব।'

'অ্যাঁ? মোল্লাচকে?'

'হ্যাঁ! তোমার অসুখের সময়ে মানত করেছিলাম আমার বাবার কালীমন্দিরে পুজো দেব, সে মানত শোধ করিনি, এবার যাব।'

'এই এখন?' চরণ গাঙ্গুলীর মনে মনে আসলে সন্দেহ খচখচ করছে।

'কাল শনিবার না? পর পর তে'রাত্তির স্বপ্ন দেখলাম মন্দিরে কেউ কোথাও নেই, খাঁড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে আর কে যেন বলছে মানত করবি পুজো দিবি না?'

'বল কি?' চরণ গাঙ্গুলীর চোখ চড়কগাছ হবার উপক্রম। বাঁটুলের মামীর বাপের বাড়ীর মন্দিরের কালীঠাকুর যে ভয়ানক জাগ্রত, আর এ সব স্বপ্নাদেশ না মানলে যে খুব অমঙ্গল হয় তা আর কে না জানে।

'আমাকে তো আগে কিছু বলনি?'

'বলতে গিয়ে অমঙ্গল ডেকে আনি আর কি! জাননা সেবার কি হয়েছিল? স্বপ্ন দেখে আমি বলিনি এবার গাঁয়ে মড়ক লাগবে?'

'বলেছিলে বটে!'

সেবার পেল্লায় গরম পড়েছিল আর পদ্মা থেকে, ভাগীরথী থেকে ঝাঁকা ঝাঁকা ইলিশমাছ এসেছিল আঁটুল গাঁয়ে। গরমে আম কাঁঠাল তাড়াতাড়ি পেকেছিল, রোজ ইলিশমাছ খেতে খেতে বাঁটুলের মামী বিরক্ত। একদিন তাই বললে, 'কাল স্বপ্ন দেখলাম আর ইলিশমাছ খেলে নির্ঘাৎ মড়ক লাগবে গাঁয়ে।'

মড়ক লেগেছিল। মা ওলাইচণ্ডী এমন ওলাওঠা পাঠালেন যে আঁটুল গাঁয়ের বুনোপাড়া, বাগদীপাড়া, কয়েকটা পাড়া মরে-হেজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সে কথা সকলের মনে আছে। তারপর থেকে এতদিন অবধি আর স্বপ্ন দেখেনি বাঁটুলের মামী, এতদিনে দেখলে। চরণের সাধ্য কি এতবড় কথাটা উড়িয়ে দেয়?

'তাহলে মানসিকটা দিয়ে এস।'

'হ্যাঁ, কালই যাব। সঙ্গে কবিরাজ দিদি যাবেন আর বাঁটুল, পদাই রাধী যাবে।'

'বাঁটুলকে এখানে রেখে গেলে হ'ত না?'

'হ্যাঁ, এখানে রেখে যাই, তুমি মাঠে যাও, আর অমনি ওর পাখা ফরফরিয়ে উঠুক! ভাগ্নের স্বভাব জান না?'

'তা বটে, তা বটে।' মামী যে বাঁটুলের স্বভাব জানতে পেরেছে তাতে চরণ গাঙ্গুলী খুব খুশী হ'ল।

'তোমরা কাল ফলার করো, কেমন?'

'আরে সে হবে, সে হবে, ভাব কেন!'

মামা যখন খেয়ে দেয়ে মাঠে চলে গেল, মামী তাড়াতাড়ি পদাই, বাঁটুল আর রাধীকে খেতে দিলে। রাধী বললে, 'ও বাঁটুলদাদা, আজ মা আমায় আস্ত একটা মাছ দিলে, এই এতটা অম্বল, কেন গো?'

মামী মুনিষদের ভাত মাঠে পাঠিয়ে দিলে, পেতলের থালায় এই উঁচু চুড়ো করে গরম ভাত, ময়ামাছের ঝাল আর ঝিঙে পোস্ত। নিজে খেলে, বেড়ালকে দিলে, তারপর ঘরে এসে বাঁটুলকে

নিয়ে দোর বন্ধ করলে। বললে, 'মামার হিসেবের খেরোখাতার পাতা ছেঁড়, কলম আন্।'

'আমি লিখব না তুমি লিখবে?'

'দুজনেই লিখব, আচ্ছা, আমায় দে!'

মামীমা খাগের কলম হীরেকষের কালিতে ডুবিয়ে লিখলে। অনেকক্ষণ ধরে কি সব লিখলে। তারপর বললে, 'পড়ে দেখ্।'

বানান-টানানের ভুল যদি না ধরো, তাহলে বাঁটুলের মামীর লেখাটা এমন মন্দ হয়নি। একখানা লম্বা পত্তপোক্ত কাগজ, তার উপরে লেখা "স্রি কালি হায়।" বোঝাই যাচ্ছে 'দন্ত্য-স' টা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু সেটা আর এমন কি!

'জোয়ান বএস বাজখেঞে গলা দিব্ব রঙ গোঁফে তাঁ দেয় ও যে লোককে পাজী মোনে করে তাঁদিকে গড় করে না তা বেতীত গলায় কাটা দাগ পরামানিকে ফোড়া চিরেছিল নাম গোপাল বাবু বাড়্জী বাবু।

কাগজের কিছু নীচে লেখা, 'ঠাকুর জামাম্নি স্রি মান বাঁটুলকে তুমি বাঁচাও মামার মনে ভিষণ উদ্দেস্ত ইতি বউঠান ফুলমণি দেব্যা বারোশত তেষট্টি বংগাব্দ আঁটুল গ্রাম মোকাম বকপুর।'

কাগজটা ভাঁজ করলে মামী, একটা গেঁজেতে পুরলে। আর পুরলে কয়েকটা টাকা। বাঁটুলকে বললে, 'তোর জন্যে অনেক পাপ করছি বাছা, ঠাকুর মুখ চাইলে সব সার্থক।'

তারপর, একটা ফর্সা চাদরের পোঁটলায় কত যে জিনিস পুরলে মামীমা, বাঁটুলের দু'খানা ধুতি, দুটো চাদর, একটা পিরাণ, শীতকালে যেটা বাঁটুল গায়ে দেয়। এক তা' আমতা, তিলেখাজা, কড়াপাকের নাড়ু। আহ্নিক করবার এই এতটুকুন কোষাকুষি, গায়ে দেবার নকশী কাঁথা একখানা। অনেক, অনেক রাত পিদীমের আলোয় বসে বসে মামীমা কাঁথাখানা সেলাই করেছে। এই তো, ইদানীং কয়েক রাতই মামীমাকে বসে থাকতে দেখেছে বাঁটুল।

(ক্রমশঃ)

রূপকথা নয়, গল্প শোন

শ্রীআশিস সান্যাল

সবুজ বন। যতদূর দেখা যায়, ঘন সবুজ বনের নিবিড় সমারোহ। পুবের আকাশটাকে আলতা-রঙে রাঙিয়ে যখন সূর্যদেব হেসে ওঠেন, তখন ঝিলমিল হেসে ওঠে এ বনের সমস্ত প্রান্তর। শিশির-ভেজা গাছের পাতায় পাতায় বাতাসেরা যেন আলগোছে হেঁটে হেঁটে যায়। চৈত্রের দিনে ঝরা-পাতার শব্দে যখন চারিদিকে একটা বেদনা ছড়িয়ে পড়ে, তখনো এ বনে নানান রঙের পাখিরা গান করে। গাছে গাছে ফুল ফোটে। সাঁঝের আবছা আঁধার যখন ক্রমশঃ নেমে আসতে থাকে, তখন সবাই বুঝতে পারে, এবার ঘরে ফিরে যাবার পালা। তারপরে শুরু হয় রাতের নীরবতা। এভাবেই পাহাড়তলীর এ বনে প্রতিদিন রোদ ওঠে, রোদ নিভে যায়। আর তারই তালে তাল মিলিয়ে আরো সবুজ হয়ে ওঠে বনের নীলিমা।

একদিন এই বনে এসে বাসা বাঁধলো টুনটুনি পাখি। কোথা থেকে সে এসেছিল, কেউ তা জানে না। হঠাৎ এক সকালে সবাই দেখলে লেবুগাছের আগ-ডালে একটা ছোট বাসা। খড়-কুটো দিয়ে সাজানো-গোছানো একটা ঘর। খুব ভালো লাগলো সকলের। এ বনের সব চেয়ে পুরোনো অধিবাসী ময়না। সদা হাসিখুশীটি সে। কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না। সকলের সঙ্গেই তার সমান ভাব। আর ভাব জমাতেও তার খুব দেরি হয় না। নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে তো? ডানা ঝটপট্ করে সে উড়ে এসে বসলো লেবু গাছের ডালে। তারপর তার নরম মিহি গলায় বলে উঠলো—

এই ঘরে কে থাকে?
শোন, আমি ময়না।
যেই হোগ, সেই হোগ…
মুখ ভারী ময়না।

কথা শুনে টুনটুনি পাখি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফোক্‌লা দাঁতে হি-হি করে হেসে বলে উঠলো—

সোনাগাঁও থেকে আমি
হেথায় এসেছি,
সাথী নেই কেউ আমার
সাথী হবে কি?

শুনে ময়না তো খুশীতে আটখানা। নতুন সাথী পেয়ে তার মন নেচে উঠলো। তারপর দু'জনে মিলে সারাদিন উড়ে উড়ে বেড়ালো আকাশে। আতা ফলের গাছে বসে আতা খেল। ফুরফুরে

বাতাসে ডানা মেলে বসে থাকলো। রাত নেমে এলে ফিরে এলো যে যার ঘরে। এভাবেই তারা খুব নিকটতর হয়ে গেলো।

দিন যায়, মাস যায়…তাদের ভালোবাসাও আরো গভীর হয়। এখন দু'জনের গলাগলি ভাব। কেউ কাউকে না দেখলে একদিনও থাকতে পারে না। ময়নার কোন অসুখ হলে টুনটুনি ছুটে যায় তার বাড়িতে। ঠোঁটে করে নানা রকম ওষুধ এনে খাওয়ায় মিতাকে। ডানা নেড়ে নেড়ে হাওয়া দেয়। আবার টুনটুনির অসুখ হলে ময়না সারাদিন সেখানে বসে থাকে।

দু'বছর পরে টুনটুনির এক ছেলে হ'ল। ভারী ফুটফুটে চেহারা। নরম নরম ডানা আধো আধো নেড়ে সে মায়ের কোল ভরে রাখে। টুনটুনি তার জন্যে অনেক দূর দূর থেকে খাবার এনে দেয়। সকালে ছেলেকে ঘরে রেখে সে চলে যায় খাবার খুঁজতে। বন পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে যায় সে কুমোরপাড়ায়। সকালে রোদ উঠলে ওখানের লোকেরা ধান ছড়িয়ে দেয় উঠোনে। সোনালী বরণ সেই ধান ঠোঁটে করে নিয়ে আসে টুনটুনি বাড়িতে। ছেলের মুখে মুখ রেখে আদর করে খাওয়ায়। এমনি করেই তার দিন চলে যায়। বড় আমোদে কেটে যায় তার দিনগুলি।

একদিন সকালে উঠে টুনটুনি সেই যে ছেলের জন্যে খাবার আনতে গেলো, আর ফিরে আসে না। এদিকে তখন আকাশটা মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠেছে। এখুনি হয়ত ঝড় উঠবে। ঝড় এলে ওদের বড় ভয় করে। কি জানি, খড়-কুঠোর ঘর, উড়ে যায় নাকি বাতাসে? দেখতে দেখতে শির শির করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অথচ টুনটুনি এখনো ফিরে এলো না। ভয়ে তার ছেলে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। ময়না পাখি তখন সে পথ দিয়ে ফিরছিলো বাড়িতে। কান্নার আওয়াজ শুনে আঁত্‌কে উঠলো সে। হয়ত কোন বিপদ ঘটেছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো সেদিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো—

"কি রে খোকা, কি হয়েছে?
মেরেছে তোর মা?
দেখিস আমি শাসিয়ে দেবো
রাগ করিস না।

ময়নার কথা শুনে টুনটুনির ছেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার কাছে। চোখ মুছতে মুছতে বলতে থাকলো—

জান গো মাসী, ভোরবেলা
মা গেছে কোন দূর গাঁয়ে;

একলা আমি, দোর খোলা…
কেউ তো নেই বনের ছায়ে।
সেই তো গেছে মা আমার
ফিরলো না তো, মাসী
কেমন করে কাঁদন ছাড়া
এখন আমি হাসি ?

কথা শুনে তো ময়নার চোখ চড়কগাছ ! সব ঘটনাটাই সে অনুমান করলো। চাষীর বাড়ীতে ধান আনতে গিয়ে বোধ হয় আটকা পড়েছে। এদিকে আকাশ আরো কালো হয়ে উঠছে। বাতাসের বেগ আরো বেড়ে যাচ্ছে। কি করবে ময়না, তাই ভাবতে থাকলো। হ্যাঁ, একটা কিছু তো করতেই হবে। টুনটুনির ছেলেকে আদর করে বললে—

ভয় কি তোর ? থাক না বসে,
যাবো আমি উড়ে,
যেথায় থাকে মা-মণি তোর
আনবো তাকে ঘুরে।

এই বলে ময়না উড়তে লাগলো। বাতাসের তোড় যেদিকে, ঠিক সেদিকেই উড়ছিলো বলে খুব তাড়াতাড়িই সে কুমোরপাড়া এসে গেলো। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। চাষীর বাড়িতে একটা খাঁচার মধ্যে টুনটুনি পাখিকে দেখতে পেল সে। ভয়ে লাল হয়ে এসেছে তার মুখ। ছেলের কথা ভেবে মন যেন কেমন কেমন করছে। কিভাবে টুনটুনিকে বাঁচাবে, তাই নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে থাকলো ময়না। অবশেষে টুনটুনিকে যেখানে রাখা হয়েছিলো, ঠিক তার পাশেই চালের উপর গিয়ে বসলো সে। তারপরে চুপি চুপি গলায় বলতে থাকলো—

টুনটুনি লো টুনটুনি,
ভাবনা তোর কি ?
ছেলে এখন সুখেই আছে
দেখে এসেছি।

টুনটুনি ঠিক চিনতে পারলো ময়নার গলা। মনের আবেশ থামাতে না পেরে বলে উঠলো—

কিচির মিচির কিচ,
বলনা দিদি ময়না,
ছেলে আমার কেমন আছে
মন যে আর সয়না।

কথা শুনে ময়না রেগে উঠলো। বলেছিই তো ভালো আছে। আবার এত ভাবনা কিসের ? ময়নার রাগ বুঝতে পেয়ে টুনটুনি চুপ করে গেল। তারপরে কিচমিচ করে তাদের মধ্যে কথা হলো অনেকক্ষণ ধরে। ঠিক হলো, কাল ভোরবেলা যখন চাষী মাঠে যাবে, তখন ময়না আবার আসবে। এই সময় সে লুকিয়ে থাকবে সামনের কামরাঙা গাছটায়।

সারারাতে আর টুনটুনির ঘুম এলো না। কখন ভোর হবে, কখন ভোর হবে · শুধু এই কথাই সে ভাবতে লাগলো। কতো সময় এভাবে কোটে গিয়েছে, কিছুই সে টের পেল না। এক সময় সে দেখতে পেলো, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে লেপটে পড়ে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করছে। বুঝলো, মেঘ কেটে গিয়েছে আকাশের। একটা অজানা খুশীর জোয়ার সহসা তার মনে দুলে উঠলো। আরো একটু পরে সে দেখতে পেলো, পূবের ফিকে-নীল আকাশটা অনেক সাদা হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে আবীর-রঙে আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্যদেব হেসে উঠলেন। সকালের ঘাসে মুঠো মুঠো ঝলমলে আলো লুটিয়ে পড়লো। নানা রঙের ফুলগুলি সব পাঁপড়ি মেলে হেসে উঠলো।

ঘুম ভাঙার গানে পাখিরাও মেতে উঠলো চারদিকে। হায়, টুনটুনির মনে এখন কোন আনন্দ নেই। সে শুধু ভাবছে, কখন সে ফিরে যাবে তার ছেলের কাছে। এক সময় সে দেখলো চাষী দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেকে ডেকে বলছে—"দেখিস পাখিটাকে। আমি মাঠ থেকে ঘুরে আসছি।" এই বলে সে মাটের দিকে চলে গেলো। ময়না কামরাঙা গাছের ডালে বসে বসে সব দেখছিলো। যত সহজ ভেবেছিলো, এখন ঘটনাটা তত সহজ হলো না। তখন সে মনে মনে একটা মতলব কসলো। হ্যাঁ, কামরাঙা গাছের এই লাল টুকটুক ফল দিয়ে ভোলাতে হবে চাষীর ছেলেকে। এই না ভেবে সে করলো কি, ঠোঁটে করে একটা পাকা কামরাঙা উঠোনে এনে ফেলে দিলো। ওটা দেখতেই চাষীর ছেলের খুব লোভ লাগলো। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সেটা তুলে নিলো হাতে।

—"বাঃ, ভারী ভালো তো খেতে! ওই তো গাছে আরো ঝুলছে। আমি আরেকটা পেড়ে খাবো।" এই বলে সে কামরাঙা গাছের দিকে ছুটে গেলো। এই ফাঁকে কাজ হাসিল করতে হবে। ময়না সুযোগ বুঝে ঠোঁট দিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো। ফুরুত

থেকে তারা দেখতে পেলো পথ ধরে চাষী বাড়ি ফিরছে। তাঁকে শুনিয়ে তারা খুশীতে গেয়ে উঠলো—

"উড়ে যাবো আজ নিজ বাসভূমে,
কোনোদিন ফিরে আসবো না;
আমরা তো কেউ ভালোবাসা ছাড়া
খুশীতে কখনো বাঁচবো না।

পাখীর কথা

শ্রীরমা ধর

তোমাদের অনেকেরই অনেক রকম শখ আছে, তাই না? তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো শখ কোরে কুকুর পোষে, কেউ হয়তো মাছ ধরে, কেউ আবার দেশ-বিদেশের 'ষ্ট্যাম্প' সংগ্রহ করে। আজ তোমাদের একটি নতুন ধরণের শখের কথা বলবো। এই শখটির নাম 'পাখী লক্ষ্য করা'। ইংরাজীতে একে বলে bird watching hobby। ও দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই শখের প্রচলন খুব বেশী।

পাখীদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রবল। তারা বহুদূর থেকে অনেক ছোট ছোট জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পায়। তাই পাখীদের লক্ষ্য করতে গেলে কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পাখীরা গাছ-গাছড়ার মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত, তাই সবুজ রঙ্‌টির সঙ্গে তারা এমনভাবে পরিচিত যে, রঙের একটু তারতম্য হলেই তারা সহজেই বুঝে ফেলে। এইজন্য পাখী লক্ষ্য করতে গেলে প্রথমেই অলিভ সবুজ কিংবা ফিকে খয়েরী রঙের পোশাক পরতে হয়। মাথাটিও বালাক্লাভা জাতীয় টুপিতে ঢেকে রাখতে হয়। হাতেও একই রঙের হাতমোজা। এ তো গেল পোশাকের কথা। এবার আসা যাক অন্য সব খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতির কথায়। ক্যামেরা ও বাইনাকুলার এই ব্যাপারে অতি প্রয়োজনীয়। ক্যামেরায় পাখীদের চলাফেরা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিস তুলে রাখা সহজ নয় কিন্তু। পাখীরা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ ও খুব সাবধানী। তারা সামান্য একটু শব্দ শুন্‌লেই উড়ে যায়। সুতরাং ক্যামেরার সাটার (shutter) টেপার সময় ও ফিল্ম বদ্‌লাবার সময় যাতে শব্দ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আরও একটি জিনিস এ ব্যাপারে খুব দরকারী, সেটি হচ্ছে যে উপযুক্ত লুকিয়ে থাকার জায়গা; ইংরাজীতে যাকে বলে 'হাইড'। বন-জংগলের মাঝে সবুজ তেরপল ও ঘন সবুজ ডালপালা দিয়ে এই লুকিয়ে থাকার জায়গাটি তৈরী করতে হয়।

এবার শোন, পাখীদের আকর্ষণ করার নিয়ম কি রকম। পাখী সাধারণতঃ দু'জাতের হয়। এক শ্রেণীর পাখীদের সারা বছরই দেখা যায়, যেমন—চড়াই, বাবুই, কাক, শালিখ, টিয়া, চন্দনা, ঘুঘু ইত্যাদি। আর এক শ্রেণীর পাখীদের বছরের কোন বিশেষ সময় দেখা যায় যেমন—বসন্তকালে কোকিল, বর্ষাকালে চাতক। পাখীদের ভালভাবে লক্ষ্য করার জন্য লুকিয়ে থাকার জায়গার সামনে কিছু শস্য ও একটি পাত্রে জল রেখে দিতে হয়। খাওয়ার লোভে নানান জাতের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে আসে। সে সময় এক টুক্‌রো কাগজে তাদের রঙ, চেহারা, স্বভাব ইত্যাদি লিখে রাখতে হয়, এবং পরে পক্ষী-বিশারদদের কাছে লেখা অনুযায়ী তাদের নাম ইত্যাদি জেনে নিলে অল্পদিনের মধ্যেই পাখীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

অনেকে আবার পাখীর ডিম সংগ্রহ কোরে আমোদ পায়। পাখীর ডিম সংগ্রহ করার কিন্তু কতকগুলি নিয়ম আছে, যেমন—পাখীর বাসা থেকে একটির বেশী ডিম নেওয়া চলবে না এবং যে বাসায় তিনটে মোটে ডিম আছে, তার থেকে আবার একটিও নেওয়া যাবে না; অবশ্য এর পিছনে কারণও আছে। প্রথমতঃ, মা পাখী ফিরে এসে বাসা শূন্য দেখলে দুঃখ পাবে। শখের খাতিরে কারুকে দুঃখ দেওয়া অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ, নতুন পাখী না জন্মালে সে ধরণের পাখীর বংশ লোপ পাবে।

সদুপদেশ

শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী

বৎস,

অনাহারে, সুন্দরবনে কেন মরছ। সোজা কলকাতা চলে যাও। সেখানে মিলবে খানার মত খানা। মানুষ সেখানে একটি দুটি নয়, লাখ লাখ। যেখানে-সেখানে দেখবে লাইন। কোথাও চাল পাওয়া যায়, কোথাও মেলে তেল, কোথাও ফুটবলের টিকিট, কোথাও অন্য কিছু। লাইন, কেবল লাইন। সোজা চলে যাও সেখানে। পছন্দমত বেছে নাও। যেটা খুশি। সব রকম পাবে সেখানে। লম্বা, বেঁটে, রোগা, মোটা, দশকিলো থেকে তিন মণি সবকিছু চোখে পড়বে। একটু চোখ বুলিয়ে নাও। তারপর বেছে নাও মর্জি মত। পেট ভরে খাও তাদের। কোপ্তা, কাবাব, ঝালচচ্চড়ি যা খুশি বানাও হাঁড়িতে চাপিয়ে। নরমাংস মহামাংস। অমৃত। কোন কিছুর সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

তবে বাপু একটু বেছে নিও।

তোমার পিতামহ, প্রপিতামহের দিন আর নেই। এখন ভেজালের দিন। মনুষ্যমাংসেও আজকাল ভেজাল চলছে খুব। দামী কাপড় জামায়, সোনা রূপোর গহনায় মোড়া থাকলেই যে খাঁটি হবে এমন নয়। বস্তুতঃ যে মানুষের মধ্যে যত ভেজাল, সে মানুষের গায়ে তত দামী পোশাক। দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারা, তেলালো-গোলালো ভুঁড়ি—হয়ত দেখলেই জিভে জল ঝরবে। বাইরেটা দেখতে বেশ, ভেতরে দেখবে হার্টের ব্যারাম। তার মানে, খেয়েছো কি তোমার হার্টফেল। কারো পেটে ক্যানসার, কারো বুকে টিবি। যে হাড় তুমি চিবোতে ভালবাসো, সেই হাড়ের মধ্যেই হয়তো বোন টিবি। যে টুঁটি কামড়ে তুমি শিকারকে ধরাশায়ী কর, সেই টুঁটি দিয়ে হয়ত কালোয়াতী গান গাইত মানুষটি। খেলে, তৎক্ষণাৎ তোমাকেও

গানে পেয়ে বসবে। কারও গলায় কাশি, ব্রঙ্কাইটিশ, হুপিং কাশি, খুসখুসে কাশি। কারো বুকে হয়ত শ্লেষ্মা জমে আছে। খেলে তোমাকেও ধরবে কাশিতে। কারো পায়ে হাজা, হাতে একজিমা, কারো মাথায় টাক, অর্থাৎ পাকা মাথা। চিবোতে হলে দাঁত গুঁড়ো হয়ে যাবে। কারো কোমরে বাত। খেলে তোমার কোমরেও বাতের ব্যথা টনটনিয়ে উঠবে। কারও হাই-ব্লাডপ্রেসার। খেলে তোমার নির্ঘাৎ থ্রম্বসিস্। কাজেই, বৎস, দেখে শুনে পরীক্ষা করে নিও। যদি নির্ভেজাল কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাও খেও।

আর একটা কথা মনে রেখ।

মানুষের সমাজেও, বিশেষতঃ কলকাতায় দুর্ভিক্ষ চলছে। চাল আটা খুশিমত পাওয়া যায় না। দুধ ঘি কেনার ক্ষমতা নেই তাদের। মাছ মাংসের দামও আগুন। যদি তোমায় দেখে তাদের পছন্দ হয়, তবে হয়ত তোমাকেই কেটে।...

ছড়া

শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী

মোড়লদাদা, মোড়লদাদা
তোমার বয়েস কত?
—আমগাছটির মত।
আমগাছটি, আমগাছটি,
তোমার বয়েস কত?
—ইষ্টিশনের মত।

ইষ্টিশন, ইষ্টিশন,
হয়েছ কোন্ সালে?
—কোম্পানির কালে।
সেপাইরা সব ক্ষেপ্‌ল যখন
লাট বললে, 'থামা,'
তখন দিচ্ছি হামা॥

উপন্যাস

প্রৌঢ়স্বীপের ফকির

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[পূর্বভাস : ওর নাম সুকুমার, কিন্তু জাহাজে কাপ্টেন দুধওয়ালা ওকে ডাকতেন 'কুমার' বলে। সাধারণ গরীব ঘরের ছেলে, ভগ্নীপতির সঙ্গে খিদিরপুর ডকে ঘুরতে ঘুরতে জাহাজ দেখতো আর স্বপ্ন দেখতো জাহাজে উঠে লণ্ডন, প্যারিস—এইসব বিখ্যাত বিখ্যাত সুদূরের দেশ বেড়াবার।

বাবার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সে জাহাজের কনিষ্ঠ কেরানী হয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লো বটে, কিন্তু তার সুদূরের দেশ দেখা আর হ'লো না বুঝি! তার জাহাজ ভারতবর্ষেরই বন্দরে বন্দরে ঘুরবে, দূরে কখনো যাবে না।

খুব দমে গিয়েছিল সে। বাবার ওপর রাগ করে বাড়ীতে এসে একখানা চিঠিও দিলো না। অথচ তার মা জানেন না যে, সে সমুদ্রে ভাস্‌ছে জাহাজে করে। ছেলে বিদেশে চাকরী করতে গেছে, এইটুকুই জানে তার মা। সেই মাকেও সে চিঠি দিলো না।

জাহাজে তার একটি তরুণ বন্ধু জুটেছিল। সে হচ্ছে জাহাজের 'প্যান্‌ট্রি বয়' বিশ্বাস। বিশ্বাস একদিন এসে জানালো, জাহাজ ভাগ্যবান এবার—এই প্রথম—ভারতের মাটি ছুঁয়ে একটু দূরে যাবে।

কোচিন থেকে প্রায় হাজার মাইল। একটি অখ্যাত দ্বীপপুঞ্জ। তার বন্দর 'ভিক্টোরিয়া'য় গিয়ে জাহাজ ভিড়লো। ছোট্ট বন্দর, জায়গাটাও অপেক্ষাকৃত নির্জন। এইখানে ষ্টুয়ার্ডের মাধ্যমে স্থির হলো, তারা দশ মাইল দূরের একটা দ্বীপে বেড়াতে যাবে।

কী ভাবে? ষ্টুয়ার্ড তাকে নিয়ে গেল একটি মানুষের কাছে। মানুষটি খৃষ্টান এক পাদ্রী। লোকে তাকে 'ফকির' বলে ডাকে। এই 'ফকির' যাচ্ছেন পাখীদের দ্বীপে, তাঁরই মোটরলঞ্চে ক'রে ওরা যাবে, তিনি যাবার পথে ওদের ঐ দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে পাখীদের কাছে চলে যাবেন। পাখীরা ওঁকে দেখলে নাকি ভয় পায় না, ওদেরই একজন বলে মনে করে।

সুকুমার ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সবিস্ময়ে জানতে পারলো, উনি নাকি বাঙালী, কিন্তু বাঙলা ভাষা জানেন না, বলতেও পারেন না, বুঝতেও পারেন না। বাঙালাদেশেও কখনো যাননি?

তাহলে বাঙালী ব'লে নিজেকে উনি ভাবছেন কী ক'রে? এইবার নীচেরটুকু পড়ো।]

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলাম না।

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন,—like to hear my story? (আমার কাহিনী শুনতে চাও?)

কিন্তু আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই নিগ্রোটা অসহিষ্ণু কণ্ঠে কী যেন বলে উঠলো। এ-আবার অন্য ভাষা। 'পুরোহিত' বা 'প্রিস্ট্' মশাই তাকে সেই ভাষাতেই তার কথার উত্তর দিতে লাগলেন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

চীফ্ আমার খুব কাছে সরে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—'ক্রিওল্' ভাষায় কথা বল্‌ছে। খুব মজার ভাষা। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলে গেলে মনে হয়, 'নাকী' সুরে গান গাইছে।

আমি ওর 'মজার কথা'য় যোগ না দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম,—উনি বাঙ্‌লা ভাষায় কথা বলতে পারেন না কেন?

ষ্টুয়ার্ড বলে উঠলো,—বাঙ্‌লাদেশে উনি কি কখনো ছিলেন, যে, বাঙলা বলতে পারবেন?

'প্রিস্ট্' বা 'পুরোহিত' এবার আমার দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন,—sit down—all of you. (তোমরা সবাই বসো।)

নিগ্রোটা বসলো না, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অপ্রসন্নতার ভঙ্গী করে গাছের পিছন দিককার একটা ঘরে চলে গেল।

ষ্টুয়ার্ডেরও যে বসবার খুব ইচ্ছা ছিল এমন নয়, তবু, কী আর করা যায়, বুড়োমানুষটা এত করে যখন বলছে, তখন বসেই পড়ি—এইরকম একটা ভাব করে বেদীর একধারে বসে পড়লো।

আমি বসলাম গিয়ে ষ্টুয়ার্ডের পিছনে।

পুরোহিত-মশাই বললেন,—(সব কথাই তিনি বললেন ইংরেজীতে, তবে, ধীরে ধীরে—টেনে টেনে—আমাদের বোঝবার অসুবিধা যাতে না হয়। আমি সে-সব কথা বাঙ্‌লাতেই লিখলাম।)—কাল আমি পাখীদের দ্বীপে যাবো। প্রতি বছর ঠিক এইসময় ওরা আসে। কোথা থেকে যে আসে—কতদূর থেকে যে উড়ে উড়ে আসে—তা জানি না। আবার উড়ে কোথায় যায়—তাও জানি না। কিন্তু মজার কথা এই, আমাকে ওরা শত্রু-টত্রু বলে ভাবতে পারে না। আমাকে দেখলে ওরা উড়েও যায় না। মাসখানেক ওরা ঐ দ্বীপে থাকে, আমিও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি কয়েকটা দিন। থাকতে থাকতে মনে হয়, আমিও বুঝি পাখী হয়ে গেছি। প্রতি বছরই যাই—যাওয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

বলতে-বলতেই তিনি একটু হাসলেন, বললেন,—কাল তোমরা তাহলে আমার সঙ্গী হচ্ছো?

আমি বলে উঠলাম,—ক্যাপ্টেন যদি আমাকে ছুটি দেয়, তাহলে, আমাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

আমার জিজ্ঞাসার ধরণ দেখে ষ্টুয়ার্ডের মুখে-চোখে একটা বিরক্তির ছায়া নামলো। অমি, 'ক্যাপ্টেন', 'ছুটি'—এসব কথা আবার ওঁকে বলা কেন? আর তা'ছাড়া, তোমার ছুটির ব্যাপারে

'ক্যাপ্টেন' কেন, আমিই ত আছি। আমি যদি বলি, 'তোমাকে ছাড়বো না!'—ক্যাপ্টেন তখন কি ছুটি দিতে পারে? দিক্ দেখি।

এ-সবই আমার মনে জেগে উঠলো ওর ভ্রূকুটি-কুটিল চোখদুটোর দৃষ্টি দেখে।

পুরোহিত কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছিলেন, বললেন,—পাখীদের দেশে যাবে কী করে? সে অনেক দূর। আর তাছাড়া, পাখীরা তোমাদের পছন্দ নাও করতে পারে। তার থেকে তোমরা যা মনস্থ করেছো, তা-ই করো, পার্স্‌লিন দ্বীপেই যাও। আমার যাওয়ার পথেই পড়বে, আমি তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবো।

ষ্টুয়ার্ড এই কথাটার জন্যই বোধহয় উন্মুখ হয়েছিল, বলে উঠলো,–পাকা কথা দিলেন ত?

–নিশ্চয়ই।

ষ্টুয়ার্ড নিশ্চিন্ত বোধ করে উঠেই দাঁড়ালো একেবারে।

পুরোহিত একটু অবাক হয়েই বললেন,–উঠলে কেন? ব'সো।

ষ্টুয়ার্ড বললে,–আর বসার দরকার নেই, জাহাজে আমাদের অনেক কাজ। কাল রওনা হতে হলে আজ সব কাজ শেষ করে দিয়ে যেতে হবে।

পুরোহিত আমাকে দেখিয়ে বললেন,–ও একটু আমার কাছে বসুক না? হাজার হোক দেশের লোক।

ষ্টুয়ার্ড বললে–কিন্তু ওকে নিয়েই আমার যতো কাজ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আর একটু বস্‌ছি।

ষ্টুয়ার্ড আবার ধপ্ করে বসে পড়লো বেদীর ওপর।

পুরোহিত বলতে লাগলেন,–কিছুদিন আগে এখানে একটা সিনেমা এসেছিল, আমাকে সবাই তা' দেখাতে নিয়ে গেল। আমি এর আগে সিনেমা কখনো দেখিনি। তাতে দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ডোরা-কাটা প্রকাণ্ড একটা বাঘ, যেন চলতে-চলতে পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখছে। লোকে বললে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমার এতো আনন্দ হলো, যে, কী বল্‌বো! আমার দেশটা না দেখলেও আমার দেশের বাঘটাকে ত দেখলুম!

বলে উঠলাম,–দেশ কখনো দেখেন নি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,–না। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি যে বাঙালী, আমি ছোটবেলায় তাও জানতুম না। আমি ত ভালো কথা, আমার বাবাও জানতেন না, যে, তিনি বাঙালী।

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা বলে কী!

অল্প একটু হাসলেন, বললেন,–do you follow? (বুঝতে পারছো?)

কথা বল্‌ছিলেন টেনে-টেনে – থেমে থেমে ইংরেজীতেই। আমার বুঝতে তাই কষ্ট হচ্ছিল না।

মাথা নেড়ে জানালুম, – হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

উনি বলতে আরম্ভ করলেন, – বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বছর পঁচিশ বয়স। আমার মা মারা গিয়েছিলেন তার আগেই। বাবার জিনিসপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বাক্সে একটা বই পেলুম, খুব পুরানো। বই বলে ভুল হলো, একটা বাঁধানো খাতা। পাতাগুলো লাল্‌চে হয়ে গেছে। টানলে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। তাহলে, খাতাখানা কতো পুরানো, সে ত বুঝতেই পারো। তাতে এক অদ্ভুৎ ভাষায় কী যেন সব লেখা। আন্দাজে বোঝা যায়, ডায়রীর মতো। কোনো পাতাটা পুরো লেখা, কোনোটা অর্ধেক। আমার ভীষণ কৌতূহল হল। খাতাটার শেষ পাতায় দেখি – বাবার হস্তাক্ষর। বাবা ফরাসী ভাষায় লিখে গেছেন, – খাতাখানি তাঁর ঠাকুর্দার যিনি ঠাকুর্দা ছিলেন, তাঁর ডায়রী। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষের। কী ভাষায় যে লেখা কেউ ধরতে পারেনি। বেশ বুঝতে পারি, বাবা খাতাখানি নিয়ে খুব ঘুরেছেন এর-ওর-তার কাছে, কিন্তু কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারেননি। তারপরে সেই যে খাতাখানি বাক্সের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, আর বাইরে আসেনি, বা, বাবার মনেও পড়েনি।

আমি কিন্তু তাকে ছাড়লুম না। সেই খাতাখানি বহু যত্ন করে রাখতুম কাছে-কাছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম বিদেশীদের কাছে। কিন্তু কেউই তা' পড়ে উঠতে পারলো না। তোমাদের বলবো কী, এই ভাবে আরও দশ বছর কাট্‌লো। খাতাখানার কয়েকটা পাতা ঝুরঝুর করে ঝরে ধূলোর মতো মাটিতে পড়ে গেল। তবু আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই, জাহাজ এলেই বন্দরে ছুটে যেতাম, যদি কোনা বিদেশী দৈবাৎ প'ড়ে দিতে পারে।

ভেবে দেখ, বয়স তখন আমার হয়েছে পঁয়ত্রিশ। হঠাৎ এই সময় একটা জাহাজ এসে বন্দরে লাগলো, জাহাজটা মালবাহী হলেও জনকয়েক যাত্রী নিতে পারে। শুনলাম জাহাজটা যাচ্ছে ইয়োরোপ, আসছে ভারত থেকে। প্রথম দিন যাত্রীদের ধরতে পারলুম না, দ্বিতীয় দিনে ধরলুম। আমারই বয়সী একটা মানুষ, খাতাটা দেখে চম্‌কে উঠলেন। বললাম, – পড়তে পারেন ?

তিনি বললেন, – নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু, এ-তুমি পেলে কোথায় ?

বললাম সব কথা। তিনি বললেন, – কী আশ্চর্য, তুমি বাঙালী !

আনন্দের আতিশয্যে প্রথমে কথাটা কী ভাষায় বলেছিলেন জানি না, পরে ইংরেজীতে বলায় বুঝতে পারলাম।

আমি উত্তরে বললাম, – I don't know (আমি জানি না।)

উনি বললেন, – খাতাটা ত আগাগোড়া বাঙলা ভাষায় লেখা। তিনি তখ্খুনি আমাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ব'সে গেলেন। উল্টে-পাল্টে পড়তে লাগলেন। তারপরে একসময় মুখ তুলে বললেন, – তোমার পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙালী। তাঁকে পর্তুগীজরা ধ'রে নিয়ে আসে। তিনি সবে বিয়ে করতে বসেছিলেন, এমন সময় পর্তুগীজ ডাকাতরা গিয়ে পড়ে। তোমার পূর্ব-পুরুষকে জাহাজের নীচে বেঁধে রেখেছিল হাতের চেটো ফুটো ক'রে তার মধ্য দিয়ে বেত গলিয়ে। লোকে যেমন ক'রে গরু ছাগল বেঁধে নিয়ে আসে, তেম্নি ক'রে। এই দ্বীপে নিয়ে আসে, কারুর কাছে বিক্রী করে দেয় 'দাস' হিসাবে।

আমি 'হাঁ' করে শুন্ছিলাম রেস্তোরাঁয় বাস। তিনি পাতা উল্টে কয়েকটি পাতা প'ড়ে বললেন,—সব তিনি লিখে গেছেন এই খাতাখানায়। তাঁর প্রভু তাঁকে মরবার সময় মুক্তি দিয়ে যান। তিনি তারপরে এই দ্বীপেই স্থানীয় একটি মহিলাকে বিয়ে করে সংসার পাতেন।

বলতে-বলতে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে, বললেন,—কী আশ্চর্য, তুমি বাঙালী অথচ—

তোমাকে বলবো কী, আমি সব শুন্ছিলাম, আর যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠ্ছিলাম।

পুরোহিত দম্ নেবার জন্য এখানে একটু থামলেন, আমার আগ্রহের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। বলে উঠলাম,—সেই খাতাখানা কোথায় ?

উনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—সেখানা আমার কাছে নেই। সেই বাঙালী ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন।

—কী সেই ভদ্রলোকের নাম ?

পুরোহিত তার বুক পকেট থেকে সন্তর্পণে একটা ছোট্ট ডায়েরী বার করলেন। তার মাঝখানে আঠা দিয়ে আঁটা একটি ছোট পুরানো লাল হয়ে যাওয়া কাগজে ইংরেজী অক্ষরে লেখা, "হরিনাথ ঘোষ।"

আমি নামটা ভালো করে পড়ে নেবার পর তিনি ডায়েরীটা যথাস্থানে সযত্নে রেখে দিতে দিতে বললেন, চেনো এঁকে ? শুনেছ এঁর নাম ?

আমি ভাবতে লাগলাম। কিন্তু এ-নামের কোন লোককে চিনি বলে মনে হলো না।

উনি বললেন,—মস্ত বড়ো স্কলার। বিলেত যাচ্ছিলেন পড়তে। বলেছিলেন, দেশে ফিরে আমাকে উনি চিঠি লিখবেন, আমাকে উনি দেশে ফিরিয়ে নেবেন।

বললাম, দিয়েছিলেন চিঠি ?

পুরোহিত-মশায়ের গলাটা কেঁপে গেল, বললেন,—না। আমার বয়স এখন সত্তরের কাছা-কাছি, তাঁরও বয়স এমনিই হয়েছে। কিন্তু কোন চিঠি দেননি—খাতাখানাও ফিরিয়ে দেননি।

আমি চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ, কোন কথাই বলতে পারলেম না।

ততক্ষণে বেলা অনেক হয়ে গেছে। সেই নিগ্রোটা ফিরে এসেছে আমাদের জন্য কফি আর খানকতক বিস্কুট নিয়ে।

সে সব খাওয়ার পর আমরা উঠলাম। পুরোহিত-মশাই অল্প হাসলেন, বললেন,—এখন আর দুঃখ হয় না—বেশ আছি পাখীদের নিয়ে। ওরা আসবার আশায় সারা বছর প্রতীক্ষা করি, ওদের আসার সময় হয়েছে বুঝতে পারলেই রওনা হই, চলে যাই ওদের কাছে। ওরা আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

চুপ করলেন। আমার ইচ্ছা করছিল, আরও একটুক্ষণ বসে থাকি ওঁর কাছে। কিন্তু ষ্টুয়ার্ডের তাড়ায় উঠতে হলো। বললাম, জাহাজে আরও একটি বাঙালী ছেলে আছে। তাকে সঙ্গে নেবো?

উনি বললেন,—নিতে পারো। তবে বেশী লোক যেন না হয়। চারজনের বেশী চড়বার নিয়মও নেই—ছোট্ট বোট্ ত?

ষ্টুয়ার্ড বললে, এর যতো বাড়াবাড়ি। নিজে যাচ্ছো যাও, আবার তাকে কেন? বাঙালী বলে তাকে যদি নিতে চায়, ত, রেডিও অফিসার ব্যানার্জী কী দোষ করলো?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন,—বেশ, তাকেও সঙ্গে নিও।

যাই হোক্ ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ক্যাপ্টেন বললেন,—বড্ড দেরি করেছো, দু'খানা চিঠি টাইপ করে দাও, শীগ্‌গির।

বললাম,—তা' দিচ্ছি। কিন্তু কাল ছুটি দিচ্ছ ত?

বললেন,—পার্স্‌লিন দ্বীপে যাচ্ছ বুঝি? তা' যাও—কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসো। আর শোনো, 'কো-কো ডি-মার-'এর জল যেন খেয়ো না?

—সেটা আবার কী?

—সে একটা অদ্ভুত জিনিস। খেলে ভীষণ নেশা হয়।

বলেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

ধূমকেতু

স্থখরঞ্জন রায়

গগনবিহারী সূর্য, চন্দ্র, তারা, বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের নিত্য সাক্ষাৎ ঘটে। এই সব জ্যোতিষ্কের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ও তাই ঘনিষ্ঠ। ধূমকেতু কালেভদ্রে আকাশে উদিত হয়। ধূমকেতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয়ও তাই অস্পষ্ট। আগে ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানও খুব কম ছিল। এ কারণেই পুরাকাল হতেই ধূমকেতুকে মানুষ বিভীষিকার মত দেখে এসেছে এবং নানা অমঙ্গলের হেতু মনে করেছে। ধূমকেতুর সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা বহু বৎসরের মধ্যেও তাদের একটির সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটে কিনা সন্দেহ। এই বৈজ্ঞানিক যুগেও তাই সাধারণের কাছে ধূমকেতু একটি রহস্যময় জিনিস হয়ে রয়েছে।

চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গলের মত ধূমকেতুও একটি আকাশচারী জ্যোতিষ্ক। তবে চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতি একটি একটি, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা অনেক। আগে ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের কিছুই জানা ছিল না। এখন পণ্ডিতেরা ধূককেতু সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছেন, কাজেই এখন শিক্ষিত লোকের নিকট ধূমকেতু আর রহস্যময় বিভীষিকার মত নয়।

আকৃতিতে অনেক ধূমকেতুই ঠিক একটি ঈষৎ বাঁকা ঝাটার মত। এর মাথায় একটি অস্পষ্ট তারার মত থাকে। সেই মাথা হতে যেন ঝাঁটার অসংখ্য শলার মত এর পুচ্ছদেশ বের হয়েছে। এই পুচ্ছটি সম্পূর্ণ বাষ্পীয় জিনিসে পূর্ণ। মাথার তারাটি সেই বাষ্পীয় জিনিস কিছু জমেই সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই তারাটি কঠিন কি তরল বৈজ্ঞানিকেরা এখনও জানতে পারেন নি। ধূমকেতুর নিজস্ব আলো আছে বলেই বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন, চন্দ্রের মত তা ধার-করা আলো নয়। এর শিরের তারাই এর আলোকের উৎস।

তোমরা দূরবীনের নাম শুনে থাকবে, অনেকে দেখেও থাকবে। দূরবীন দিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীন দিয়ে প্রতি বছরই এখন পাঁচ ছয়টি করে ধূমকেতু দেখতে পান, কিন্তু এগুলির দীর্ঘ পুচ্ছ নেই বলে খালি চোখে এগুলি দেখা যায় না। এই ধূমকেতুগুলিকে অনেকটা কদম্ব ফুলের মত দেখায়। দেখা গেছে আগে যে সব ধূমকেতুর পুচ্ছ ছিল, তাদের পুচ্ছ ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে তারা কদম্ব ফুলের আকৃতি পেয়েছে। এ থেকে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন ধূমকেতুরা অসম্পূর্ণ তারকা ছাড়া কিছুই নয়। হাজার হাজার বৎসর আকাশ-পথে ঘুরে ঘুরে ধূমকেতুর পুচ্ছের বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তারার সৃষ্টি হয়। যে সব ধূমকেতু এখনও গগন-রাজ্যে বিচরণ করছে, তারা এখনও তারায় পরিণত হয়নি। গ্রহ, উপগ্রহ এবং তারারাজির সঙ্গে ধূমকেতুর তফাত এই যে, ধূমকেতু এখনও অগঠিত এবং এর উপাদান বায়ু হতে লঘু এবং বাষ্পীয়, কিন্তু অন্যান্য জ্যোতিষ্কর নির্মাণ-উপাদান কঠিন।

তোমরা সৌরজগতের নাম শুনেছ কি ? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগুলি ঘুরছে তা বোধ হয় তোমরা শুনেছ। গ্রহগুলির আবার ছোট ছোট উপগ্রহ আছে, যেমন চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ব'লে চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ। কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য ও চারদিকের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ মিলে হয় সৌরজগৎ। ধূমকেতুরা আমাদের এই সৌরজগতের বাইরে থেকে আসে ; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকগুলি গ্রহমণ্ডলের আকর্ষণে চিরকালের মত সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বড় বড় ধূমকেতুগুলিই শুধু খালি চোখে দেখা সম্ভব। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু দেখে দিয়েছিল। তা সূর্যোদয়ের পরেও কিছুদিন ধরে দিবালোকে খালি চোখে দেখা যেত। সেটাই মহা ধূমকেতু নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। কিন্তু এরূপ ধূমকেতু একজনের জীবনে দু'বার দেখা সচরাচর ঘটে ওঠে না। ধূমকেতুর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, গত শত বৎসরে ২০টি ধূমকেতু মাত্র খালি চোখে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে অসংখ্য ধূমকেতু বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কই নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। কিন্তু প্রাচীন কালে ধূমকেতুর তত্ত্ব যখন অনাবিষ্কৃত ছিল, তখন সকলেই মনে করত ধূমকেতুর চলার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, এরা স্বাধীনভাবে মাছের মত অসীম শূন্যে সাঁতার কেটে বেড়ায়, যখন খুশি পৃথিবীর কাছে এসে দেখা দেয়, আবার সরে পড়ে।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ ধূমকেতু দেখা দেয়। এর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য দশ কোটি মাইল বলে গণনা করে দেখা গিয়েছিল। এর আগমন ও তিরোভাবের পথ লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিক নিউটন অনুমান করেছিলেন যে, গ্রহগণের মত ঐ ধূমকেতুরও চল্‌বার নির্দিষ্ট পথ আছে।

ঐ অনুমানের ওপর কাজ করে এটা স্থির হয়েছে যে, ধূমকেতুরা সব গ্রহ-উপগ্রহের মত নির্দিষ্ট পথেই চলে এবং ঐ পথ হাঁসের ডিমের মত দীর্ঘ বৃত্তাকার। তোমরা জান যে বৃত্তপথে ঘুরলে যেখান থেকে রওয়ানা হওয়া যায়, নির্দিষ্ট সময় পর-পরই ঠিক সেখানেই ফিরে আসতে হয়। সমস্ত জ্যোতিষ্ক বৃত্তাকারে ঘুরে বলেই তাদের সঙ্গে ফিরে-ফিরে আমাদের দেখা হয়। পৃথিবী যদি সূর্যকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ না করে সোজা চলত, তাহলে সীমাহীন শূন্যদেশে পৃথিবী কোথায় চলে যেত, সূর্যের সঙ্গে কোনদিন আর তার দেখাই হতো না। শনি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণও বৃত্তাকারে কক্ষে চলে বলেই ফিরে ফিরে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। ধূমকেতুগুলিও তাই, নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে ফিরে এসে মানুষের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। এই তত্ত্বটি বিশেষ করে জানা গেছে "হ্যালির ধূমকেতু" সম্পর্কে। "হ্যালির ধূমকেতু"র কথা এবার তোমাদের বলছি।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে একটি বড় ধূমকেতু দেখা দেয়। তখন হ্যালি নামে একজন ইংরেজ জ্যোতিবিদ এর কক্ষ সম্বন্ধে গুণে ও বিচার করে দেখেন যে, আগে ১৫৩১ ও ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে যে দুটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, তাদের কক্ষের সঙ্গে এর কক্ষ সম্পূর্ণ এক। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন একই ধূমকেতু ৭৫½ বৎসর পর পর এসে পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে। তিনি তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা পর বৎসরের প্রথমভাগে এই ধূমকেতু আবার আবির্ভূত হবে। ৭৫½ বৎসর পর পর যে ধূমকেতু আবির্ভূত হয়, তাকে জীবনে দু'বার দেখা কারো ভাগ্যে বড় ঘটে না। হ্যালি দেখে যাননি, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের 'বড়দিনে'র রাত্রিতে সেই ধূমকেতু দেখা দিল। তখন থেকেই এটা 'হ্যালির ধূমকেতু' নামে পরিচিত। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তা অদৃশ্য হবার পর ১৮৩৫ সালে এর আবির্ভাব হয়। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একে শেষ বার দেখা গিয়েছে। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে যারা বেঁচে থাকবে তারা একে দেখতে পাবে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু দেখার সৌভাগ্য বর্তমানে জীবিত লোকদের মধ্যে অনেকেরই ঘটেছে। তখন বৈশাখ মাসে শেষ রাত্রিতে অনেক দিন ধরে একে দেখা গেছে। তখন একদিন এর পুচ্ছ এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে, আকাশের অর্ধেক তাতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। শেষ দিকে কিছুদিন একে সন্ধ্যাকাশে দেখা যেত। তিন সপ্তাহ পরে ধূমকেতুটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

তোমরা এটুকু বোঝ যে, বৃত্ত যত বড় হবে বৃত্ত-পথ ঘুরে আসতে তত বেশী সময় লাগবে। হ্যালির ধূমকেতু খুব বড় বৃত্ত-পথে ঘুরে বলেই একবার ঘুরে আসতে তার ৭৫½ বৎসর সময় লাগে।

হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছ এত দীর্ঘ ছিল যে, যেদিন ওটা সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী হয়, সেদিন এই পুচ্ছদ্বারা পৃথিবী সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ হবে আগেই তা জানা গিয়েছিল বলে 'হ্যালির ধূমকেতু'র পুচ্ছরূপ ঝাঁটার আঘাতে পৃথিবীর ভয়ানক দুর্দশা উপস্থিত হবে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু সেই আশঙ্কা অমূলক। ধূমকেতুর পুচ্ছ বায়ু হতেও লঘু বাষ্পে পূর্ণ। এর আঘাতে পৃথিবীর তো কোন অনিষ্ট হয়ই নি, ধূমকেতুর পুচ্ছই খর্ব হয়ে গিয়েছিল।

হ্যালির ধূমকেতু'র কক্ষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, আরও কতকগুলি ছোটছোট ধূমকেতুর পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। এরূপ বারটি ধূমকেতুর কথা এখন জানা গেছে, যারা দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে নিজনিজ আবির্তন পূর্ণ করে। এদের মধ্যে একটি তিন বৎসর চার মাস পর পর এসে দেখা দেয়। অবশ্য এই বারটি ধূমকেতু শুধু দূরবীক্ষণ দিয়েই দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধূমকেতুগুলির কক্ষ সৌরজগতের অন্তর্গত। এরা ছোট ছোট বৃত্ত-পথে ঘুরে বলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় পর পর এসে দেখা দেয়, হ্যালির ধূমকেতুর মত এত দীর্ঘ সময় নেয় না। হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষ এত বড় যে

তা সৌরজগতের বাইরে গিয়ে পড়েছে। আরো বড় বৃত্তপথে যে সব ধূমকেতু ঘুরে, তাদের তত্ত্ব এখন জানা যায়নি।

পরিশেষে একটি অদ্ভুত ধূমকেতুর কথা কিছু বলব।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বায়েলা নামে একজন জ্যোতির্বিদ একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন এবং বিচার করে দেখতে পান ১৭৭২ ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে দেখা ধূমকেতুদ্বয়ের সঙ্গে এটা অভিন্ন। তিনি গুণে একথা প্রচার করেন যে ৬⅔ বৎসরে এর এক আবর্তন হয়।

গণনায় ঠিক হয় যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এটা পুনরাবির্ভূত হবে। বাস্তবিক ধূমকেতুটি তখন পুনরাবির্ভূত হয়েছিল। তখন হর্শেল নামক একজন জ্যোতির্বিদ দেখতে পান যে, এই ধূমকেতুটির পুচ্ছ তখন সংযত হয়ে ধূমকেতুটি কদম্ব ফুলের মত হয়ে উঠছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দেও একে দেখা যায়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পর্যবেক্ষণের সময় একে প্রায় গোলই মনে হয়েছে। কিন্তু তখন এই গোল পিণ্ডটি ধীরে ধীরে লম্বমান হয়ে উঠতে দেখা যায়। পরে দেখা গেল দু'প্রান্তে দুটি পিণ্ড সৃষ্ট হয়ে মধ্যদেশ সুরু হয়ে আসছে। তখন একে ঠিক একটি ডাম্বেলের মত দেখতে হয়েছিল। পরে তা' সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং দুটি পিণ্ড পৃথক হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়ে। তারও পরে এই দুটি পিণ্ড হতে পুচ্ছ বের হতে দেখা গিয়েছে।

এই জমজ ধূমকেতুদ্বয় নিজেদের মধ্যে বহু সহস্র মাইল ব্যবধান রেখে সূর্যকে বেষ্টন করে চলেছে। এ যেন এক ভৌতিক ব্যাপার!

অন্তহীন শূন্যরাজ্যে এরূপ কত ভৌতিক ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হচ্ছে বিজ্ঞান তার কতটুকু খোঁজ রাখে!*

---

*রচনাকাল—১৯৩৪।

ব্রীজ

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

অতীতে নদী বা জলাশয় পার হতে মানুষ তীরবর্তী গাছের গোড়া কেটে সেটা পড়ে গেলে তার ওপর দিয়ে অন্য পারে যেত। প্রথমে মানুষ এইভাবে গাছ কেটে সেতু তৈরী করেছিল, এখন নানান রকম সেতু মানুষ তৈরী করছে। কোনো কোনো সেতু পৃথিবীর আজকের দিনের আশ্চর্য জিনিসের অন্যতম। কোনো কোনো সেতু স্থায়ীভাবে একই স্থানে অবস্থান করে। কোনো কোনো সেতু সারানো যায়, যাতে তার ভেতর দিয়ে নৌকা কিংবা জাহাজ চলাচল করতে পারে। কোনো কোনো সেতু স্বল্পকাল ব্যবহারের জন্য তৈরী হয়।

বিভিন্ন প্রণালীর সমন্বয়ে একটি সেতু তৈরি হয়। পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতুগুলির একটি সানফ্রান্সিসকো এবং ওকল্যাণ্ডকে সংযুক্ত করেছে। এই সেতুর কিয়দংশ ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। অপর এক ধরনের সেতু ক্যান্টিলিভার। এই সেতু খিলান (arch) অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেবল ছোট সেতুগুলিই কাঠ দিয়ে তৈরী। এখন সাধারণতঃ সবরকম সেতু পাথর, সিমেণ্ট ইত্যাদির ঢালাই বা ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয়। আজকালকার বৃহত্তম সেতুগুলি ইস্পাত ছাড়া তৈরী হতে পারে না। বাতাসে যাতে আন্দোলিত না হয়, সেইভাবে সেতু নির্মিত হওয়া দরকার।

বৃহৎ সেতুগুলির পরিকল্পনা খুব সযত্নে করা উচিত। এইসব সেতুর ভিত্তি খুব সুদৃঢ় হওয়া দরকার। সেতুর ওপর দিয়ে যে সব ভার নিয়ে যাওয়া হয়, সেগুলি বহনের শক্তি সেতুর থাকা দরকার। সেতু-নির্মাতাদের জানা দরকার যে, ইস্পাত ও অন্যান্য উপাদান যাতে সেতু তৈরী, সেগুলি গরমে বাড়ে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দীর্ঘতম সেতুই ঝুলন্ত (suspension)। প্রকৃত বৃহৎ ঝুলন্ত সেতু নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রীজ ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

এখন ঝুলন্ত সেতুগুলির মধ্যে বৃহত্তম Golden Gate Bridge. সানফ্রান্সিসকো থেকে এটা গোল্ডেন গেট পার হয়ে যায়। এই সেতুর দু'দিকের ভারবাহী স্তম্ভের মধ্যে দৈর্ঘ্য ৪,২০০ ফুট। স্তম্ভগুলির ভিত্তি পাথরের ওপরে। এই স্তম্ভগুলির জল থেকে উচ্চতা ৭৪৬ ফুট। মূল মোটা তারগুলি এক গজের কিছু বেশী। ২৭,৫৭২ সরু তার (wire) জড়িয়ে একটি পেনসিলের মাপের তার (cable) হয়। এই দুটি মোটা তারের মধ্যে ৮০,০০০ মাইল সরু তার আছে। গরমের দিনে মোটা তারগুলি বেড়ে যায় ও লম্বা হয়। ঠাণ্ডার দিনে সেগুলি সংকুচিত হয়ে ছোট হয়। পৃথিবীর দুটি দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার সেতুর একটি কানেডার কুইবেক শহরের কাছে, অরপরটি

স্কটল্যাণ্ডের ফার্থ অফ ফোর্থের ওপরে। দুটি ইস্পাতের খিলানওয়ালা সেতু Bayonne N. J. এবং অস্ট্রেলিয়ার Sydney-তে অবস্থিত।

অনেক সেতু দৈর্ঘ্য ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। যেমন Venice-এর Bridge of

Sighs. যাদের ফাঁসী দেওয়া হ'ত তাদের এই সেতুর ওপর দিয়ে বধ্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ত। London Bridge-কে এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

এই সব ব্রিজের কোনটায় মানুষ এবং রেল, কোনটায় শুধু মানুষ, কোনটায় শুধু রেল চলে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় রেলপথের ব্রিজ শোন নদের উপরে।

এইখানে আমরা ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত সেতুর নাম দিলাম।

শোন, গোদাবরী, আলেকজান্দ্রা, মহানদী, ইজাত, গঙ্গা, নর্মদা, সারিঘাট, সাটলেজ, ডাফরিন, নৈনী, কারজন, রাভি, যমুনা, বিবেকানন্দ, তাপ্তী, হাওড়া, জুবিলি ও হুগলী ব্রিজ।

খেলার ছলে হাতের কাজ

শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে আমরা কেন খেলাধূলা করি? তবে বিনা দ্বিধাতে উত্তর আসবে আনন্দ পাবার জন্য। অবশ্য এখানে আনন্দর সঙ্গে আর একটা কথা যুক্ত করতে হবে, সেটা হবে স্বাস্থ্য। খেলে সকলে যখন আনন্দ পায়, কিছু শিখতে পারে, তখন খেলাতে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি নেই।

আজ তোমাদের এমন সহজ একটা কাজের কথা ও উপায় বলে দেব, যেটা করতে পারলে খেলার থেকেও বেশী আনন্দ পাবে। অবশ্য এটাকেও খেলা বলতে পার। কারণ যে সব কাজ করলে আমরা আনন্দ পাই, সেটাকে খেলার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। সকলেই চায় তাদের বাড়ীটাকে সুন্দর ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজিয়ে রাখতে। ঘরে যতই দামী দামী সোফ', টেবিল, চেয়ার বা অন্যান্য আসবাবপত্র রাখনা কেন, ঘরের দেওয়ালগুলো যদি পরিষ্কার না থাকে, তবে আসবাবের জৌলুস চোখে পড়বে না। তাই বছরে দু'বার, তা-না-হলে অন্ততঃ একবার ঘরটাকে রং করা উচিত। অর্থাৎ সাধারণতঃ যাকে চুনকাম বা white wash করা বলে থাকি।

লোক দিয়ে একটা ঘর চুনকাম করতে গেলে মজুরী সমেত কমপক্ষে ৮।১০ টাকা ব্যয় হবে। আর নিজেরা যদি নিজ হাতে রং করতে পার তবে খুব বেশী হলে ২।৩ টাকায় সম্পূর্ণ একটা ঘর রং করা হয়ে যাবে। নিজ হাতে করতে পারলে যে কেবল টাকাই বাঁচবে তা নয়, কাজও ভাল হবে, একটা নতুন জিনিস শেখা হবে আর আনন্দও পাবে প্রচুর। সহজ পদ্ধতিতে অথচ সুন্দর করে কিভাবে চুনকাম করতে হয়, আজ সেটা তোমাদের বাৎলে দিচ্ছি। রং করার আগের দিন বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে আনতে হবে। একটা ঘরের জন্য কত পরিমাণ জিনিসের দরকার সেটাই এখানে বলছি। সাধারণ মাপের ঘরের বেলায় ২ কিলো চুন (Lime), শিরিষ বা গঁদের আঠা ৪ থেকে ৬ আনা, শিরিষ কাগজ (sand paper) এক পাতা আর মাঝারি এক প্যাকেট গুড়ো নীল। চুন ও আঠাটাকে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। তারপর শিরিষ কাগজ দিয়ে দেওয়ালগুলোকে ঘষে নাও। সমস্ত দেওয়াল ঘষতে হবে না। কেবল যেখানে যেখানে তেলের ও অন্যান্য দাগ আছে সেগুলো তুলো দিলেই চলবে। কারণ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসবার সময় মাথার তেল দেওয়ালে লাগে। তেলের উপর রং বসবে না। তারপর চুনটাকে পাতলা একটা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে পাটের ব্রাস দ্বারা (নিজ হাতে বানাতে পার বা বাজারেও কিনতে পাবে) সমস্ত দেওয়ালে লেপন কর। উপর দিক রং করার সময় টেবিলের উপর চেয়ার পেতে নেবে, তবেই হাত পাবে। এই রংটা কিছুক্ষণের

মধ্যেই শুকিয়ে যাবে তারপর আর যেটুকু চুন থাকবে, তাতে আঠাটা মেশাবে ও পরিমাণ মত নীল মেশাবে। আঠা একটু বেশী হলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। নীল বেশী হলে ঘরটা নীল-নীল লাগবে। সুতরাং নীলটা পরিমাণ মত আন্দাজ করে দিতে হবে। আবার ব্রাস দিয়ে আর একবার সমস্ত দেওয়ালটা লেপন কর। দু'কোটই যথেষ্ট। ভেজা থাকা অবস্থায় দেওয়ালের রং খুলবে না। আধঘণ্টার ভেতর সমস্ত ঘরটা শুকিয়ে যাবে তখন দেখতে পাবে ঘরের সৌন্দর্য কেমন বেড়ে গেছে। সবশেষে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ব্রাস দিয়ে যখন দেওয়ালে রং করবে, তখন ব্রাসটা সবসময় লম্বালম্বি অথবা পাশাপাশি চালাবে। কোন সময়ই দু'রকম পন্থা অবলম্বন কোরো না। তাতে রংটা শুকিয়ে যাবার পর দেখতে খারাপ লাগবে। যে চুন দিয়ে ঘর রং করা হয়, তার সঙ্গে নীল মিশিয়ে সাদা রংয়ের উজ্জ্বলতা বাড়ান হয় আর আঠা সাহায্য করে দেওয়ালে রং বসতে। আরও কয়েক রকম রং করার পদ্ধতি আছে। তবে সেটা অনেক ব্যয় বহুল। তার সম্বন্ধে আবার পরে জানান হবে।

সবাই নিজ হাতে করেই দেখ না কতটা আনন্দ পাও। সময় বেশী লাগবে না। সব জিনিসের বন্দোবস্তো থাকলে মাত্র এক ঘণ্টায় এক বছরের কাজ সমাপ্ত করতে পারবে।

বাঁচবে অর্থ, শিখবে কাজ, লাগবে ভাল।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে

মঙ্গলগ্রহের উৎপত্তি সূর্য থেকে। চাঁদ ও শুক্রের কথা ছেড়ে দিলে রাতের আকাশে মঙ্গলই তৃতীয় উজ্জ্বলতম বস্তু। গ্রহদের মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে কক্ষপথে এর অবস্থান চতুর্থ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ মাইল। এ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন দুয়ের ব্যবধান ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। মঙ্গল ৬৮৭ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ মঙ্গলে যদি কোন প্রাণী থাকে, তাহলে তার এক বছর হবে ৬৮৭ দিনে। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম ৪২১৬ মাইল। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র তিন টনের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ১৫ মাইল উপরে পাঠিয়ে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে। তাতে জানা যায় গ্রহটি প্রবল বায়ুবেগ সমন্বিত মরুভূমি সদৃশ এবং মঙ্গলের আকাশে কোন অক্সিজেন নেই

মেঠুড়ে

মিহির সেন

জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই, মিহির সেন তা আবার প্রমাণ করেছেন। একবার নয়, দু'বার নয়, চার বছরে পাঁচবার চেষ্টার পর ১৯৫৮ সালে যখন শ্রীসেন ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেন তখন অনেকেই মনে করেছিলেন ওঁর বাসনা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সাত বছর পরেও দেখা গেল অ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহা তাঁর মন থেকে একটুও সরেনি। দুর্জয়কে জয় করার নেশায় এখনো তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং ভারতের প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে ভারত মহাসাগরের বুকে বিপদসঙ্কুল পক প্রণালী সাঁতার কেটে পার হওয়া সংগ্রামী মিহির সেনের আরেক কৃতিত্ব।

সিংহল ও ভারতের মাঝে পক প্রণালী। এ প্রণালী ইংলিশ চ্যানেলের চেয়েও বিপদসঙ্কুল। এখানে আছে হাঙ্গর, বড় বড় বিষধর সাপ, আর সেই সঙ্গে উত্তাল তুফান। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল সিংহলের তালাইমান্নার থেকে সাঁতার আরম্ভ করে পরের দিন ভারতের ধনুষ্কোটিতে (বাইশ মাইল) পৌঁছতে তাঁর সময় লেগেছিল ২৫ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়—সাঁতারু মিহির সেন পক প্রণালী সাঁতরে পার হয়ে একথা আবার প্রমাণ করলেন।

মুষ্টিযুদ্ধ: ক্লে বনাম চুভ্যালোক

টরেন্টোর মেপল লিফ গার্ডেনে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে কেসিয়াস ক্লে কানাডার মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ চুভ্যালোকে পয়েন্টে হারিয়ে দিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আখ্যা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু পর পর তেইশটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটের বিজয়ী ক্লে-কে চুভ্যালোর সঙ্গে যে ভাবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, জীবনের কোনো মুষ্টিযুদ্ধে তাঁকে এমন বাধার মুখোমুখি হতে হয়নি। গত জুন মাসে আমেরিকার লুইস্টন মেনে সোনি লিস্টনের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইতে

যিনি মাত্র এক মিনিটের ভেতর লিস্টনকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই ক্লে-কে চুভ্যালোর সঙ্গে পুরো পনেরো রাউণ্ড লড়ে পয়েণ্টে জয়ী হতে হয়েছে। লড়াইয়ের পর ক্লে স্বীকার করেছেন কোনো লড়াইতে তিনি এমন কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হননি। যাই হোক, চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটে ক্লের সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ইংলণ্ডের হেনরী কুপার। যদি এই দু'জনের মধ্যে লড়াই হয় তাহলে কে জেতেন তা দেখার ও সে-খবর জানবার জন্যে বিশ্বের অন্যান্য মুষ্টিযুদ্ধ অনুরাগীদের মতন আমরাও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলুম।

তরুণ টেনিস খেলোয়াড়

খেলাধুলো যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, এটা নতুন কথা নয়। সম্প্রতি ক্যালকাটা ক্লাবে তরুণ টেনিস শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার প্রতিযোগিতার সমাপ্তি উৎসবে সভাপতির ভাষণে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা বলেছেন যে, খেলাধুলো শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলোর শিক্ষা যোগ হলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এই প্রতিযোগিতায় গৌরব মিশ্র তরুণ টেনিস পরীক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে আনোয়ার আলিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। শিক্ষার্থীদের ফাইন্যাল খেলার আসরে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণকারী আর একজন শিক্ষার্থী চিরদীপ মুখার্জির কথাও উল্লেখযোগ্য। জয়দীপ মুখার্জির বোন এষা মুখার্জিও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ঘাসের দাম

আজ আমাদের দেশে যাঁরা গদিতে বসে রাজ্যশাসন করছেন, তাঁরা চাল-ডাল যোগাতে না পেরে মানুষকে কলা-মূলো খেতে বলছেন। কে যেন একবার তারস্বরে উপদেশ দিয়েছিলেন ঘাস খাও বলে! কয়েক বছর পূর্বে ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের অধিকাংশ পণ্ডিত রায় দিয়েছেন ঘাস খাদ্য হিসাবে খুব দামী সামগ্রী। তাঁরা বলেন, পৃথিবীতে ঘাস আছে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভিন্ন জাতের। হাজার কাজে ঘাসের উপযোগিতা—মাখন, চীজ, দুধ থেকে শুরু করে মাংস, চামড়া প্রভৃতির কারবারে ঘাস হ'ল মহার্ঘ্য উপাদান। ঘাসের দৌলতে শুধু বৃটেনেই বছরে আঠারো কোটি পাউণ্ড রেভেন্যু আদায় হয়। তাঁরা আরও বলেন, মানুষ যদি ঘাসকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে সে শতায়ু হবে, নীরোগ হবে!

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন।)

পেপ্পিনেলো—শ্রীবিমল দত্ত। বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.০০

'পেপ্পিনেলো'র কাহিনী যেমন করুণ তেমনি বিচিত্র ঘটনায় ভরা। বাপ-মা মরা নেপ্‌লসের একটি গরীবের ঘরের ছেলে পেপ্পিনেলো। পোড়া চুরোটের টুকরো বিক্রি করে ও আরো নানা রকম ফন্দী-ফিকির করে তার দিন চালায়, মানুষ করে বোনগুলিকে। ভারী সুন্দর এই জীবন-কাহিনী, আর তেমনি সুন্দর ও সহজ করে লিখেছেন ছোটদের খ্যাতিমান লেখক বিমল দত্ত।

যাঁরা বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করেন নি—শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত। প্রাপ্তিস্থান : ভারতী বুক ষ্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য ১.৫০

পৃথিবীতে এমন বহু মনীষী, ধর্মগুরু ও বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মেছেন, যাঁরা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করেও সারা পৃথিবীতে তাঁদের নাম রেখে গেছেন। সেই ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন যীশুখ্রীষ্ট, হজরৎ মহম্মদ, সম্রাট আকবর, শিবাজী, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, কবি কালিদাস, কবি হোমার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, জোআন অব্ আর্ক ও চেঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি। লেখক অতি সুন্দর করে এঁদেরই জীবনের কাহিনীগুলি লিখেছেন এই বইটিতে।

সোনাঝুরি—জ্যোতিভূষণ চাকী। নিওরিট, ৪৫, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা ৩১ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.২৫

নানা রঙে ছাপা, ছবিতে ছবিতে ভরা, বড় টাইপে ছোটদের ছড়া ও কবিতার বই। কুড়িটি নানা ধরনের ছড়া ও কবিতা আছে এবং প্রত্যেকটি পড়েই আনন্দ পাবে ছোটরা। লেখকের এ ধরনের লেখায় হাত মিষ্টি।

মহাশূন্যের কথা—মনোজ দত্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩.০০

'মহাশূন্যের কথা' ভারত সরকারের বুনিয়াদী ও সাংস্কৃতিক সাহিত্য রচনায় ১৯৬৪ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই বই সম্পর্কে লিখেছেন, "সহজ ভাষায় গ্রহ-নক্ষত্রের অনেক জ্ঞাতব্য কথা এত রয়েছে। তাছাড়া মানুষে আজকাল অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে তারও খবর মনোজবাবু দিয়েছেন। ছবি দিয়ে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করবার চেষ্টাও করেছেন লেখক। ছেলেমেয়েরা এক নিঃশ্বাসে বইখানি পড়ে ফেলতে পারবে।" আমরাও তাঁর মন্তব্য সম্বন্ধে একমত।

গত সারা বৈশাখ মাসটি ধরে চারিদিকে ২৫শে বৈশাখকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করা হলো। দেশ-বিদেশে এত কবিপক্ষ পালন আনন্দ ও গর্বের কথা আমাদের, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। আর তাছাড়া এবছর এই পুণ্যদিনে ক্যাথিড্রাল রোডে 'রবীন্দ্র স্মরণী'-র বিরাট সৌধের উদ্বোধন হলো। কতদিন আগে এই পরিকল্পনাটি করেছিলেন স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এতদিন পরে সেটি আত্মপ্রকাশ করলো কত আনন্দের কথা। চৌরঙ্গী রোডের, যার নতুন নাম জহওরলাল নেহেরু রোড, পথে ট্রাম-বাস থেকেই এই নব-নির্মিত নানা রং ও কারুকার্য করা সুন্দর বাড়ীটি চোখে পড়ে। আর বাড়ীর ফটক দিয়ে ঢুকলে আরো ভালো লাগে—এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এমন কুশলী শিল্পীর হাতের স্পর্শ রয়েছে, না দেখলে বোঝা যায় না। রঙ্গালয়ে ঢুকবার পথে একাংশে কতকগুলি ফোয়ারা অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। বিরাট অঙ্গনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র আঁকা রয়েছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে কত কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিন ছিল পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য প্রাতঃকাল—কত লোক এসেছেন এই রবীন্দ্রতীর্থে মিলবার জন্য ; সকলের মনেই অসীম শ্রদ্ধা। এই অনুষ্ঠানে গুরুদেবের নিজ কণ্ঠের বন্দেমাতরম গান শোনানো হলো। প্রায় ষাট বছর আগে এই গানটি তাঁর এক বন্ধুর অনুরোধে গেয়েছিলেন। এতদিন পরেও তেমনি অক্ষুন্ন রয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে উপস্থিত হতে পারেননি—বাংলা ভাষণে সংক্ষিপ্ত কিছু বাণী টেপ রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন—তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেছিলেন—উল্লিখিত ভাষণে সে কথা তিনি বলেছেন—আর তার পিতৃদেব পণ্ডিত নেহেরুর কথাও বলেছেন। ঐ দুটি অনুষ্ঠান মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্বোধক ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন সেকথাও বল্লেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য প্রাতঃকালটি রবীন্দ্র স্মরণীর সৌধে—আলোয়, ফুলে, সঙ্গীতে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করলো—যা অনেকদিন সযত্নে মনে রাখার মত।

পরীক্ষা ভণ্ডুলের আবার এক বিবরণ সংবাদপত্রে চোখে পড়লো—মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে

ছাত্রদের এসব আচার-আচরণে। দেশের পরিস্থিতির জন্য লেখাপড়া কি ভাবে এমনিতেই বিঘ্নিত হচ্ছে—আবার যদি পরীক্ষার্থীরা এরূপ আচরণ করে তাহলে এ দুঃখ রাখবার স্থান থাকে না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির আর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে—তোমরা আমরা সকলেই একবাক্যেই যেন একথা বলি। আর সকলের সহযোগিতায় এ বছরের পরীক্ষাগুলি যাতে সুশৃঙ্খলে হয় তার কথা যেন ভুলে না যাই।

মহাজীবন থেকে—

আমরা অনেক সময় কতকগুলি নিয়মকানুন আচার-বিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাইরের নিয়মকানুন, প্রচলিত বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চললেই আমাদের কর্তব্য পালন করা হলো—এরকম একটা ধারণা আমাদের অনেকের আছে। ভক্তির চেয়ে নিয়মনিষ্ঠা যদি বড় হয়ে ওঠে, তাহলে অনুষ্ঠানের সার্থকতা অনেকখানি কমে যায়।

গুরু নানকের জীবনের একটা ঘটনা শোনাচ্ছি—"গুরু নানক বহু দেশ এমনকি বিদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান তিনি দর্শন করেছিলেন। একবার অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এলেন পুরীধামে। সন্ধ্যাবেলা এলেন শ্রীমন্দিরে। নাটমন্দিরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। এদিকে তখন মহাসমারোহে মঙ্গল-আরতি শেষ হয়েছে। দর্শনার্থী সকলে উঠে দাঁড়িয়ে পরম শ্রদ্ধায় মহাপ্রভুকে দেখছে, কিন্তু নানকের সেদিকে হুঁস নেই। ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি বসে রয়েছেন নিজের আসনে। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। মন্দিরের পাণ্ডাদের কিন্তু এই দৃশ্য ভালো লাগলো না। তাঁদের মনে হলো এ আবার কী রকম সাধু? জগন্নাথদেবের আরতি হচ্ছে অথচ উঠে দাঁড়াবার নাম নেই?

আরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নানককে ঘিরে দাঁড়ালেন। তিরস্কারের সুরে বললেন: "শুধু হলদে আলখাল্লায় সাজলে আর গলায় মালা দিয়ে বেড়ালেই সাধু হওয়া যায় না, এজন্য চাই প্রকৃত ভক্তি। আপনি আরতির সময় জগন্নাথদেবকে সম্মান দেখালেন না, এ কেমন কথা?"

নানক উত্তর দিলেন: "ভাই, জগন্নাথ কী শুধু এই কাঠের মূর্তির মধ্যেই রয়েছেন? তিনি রয়েছেন সারা বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে।" একথা বলতে বলতে তিনি ভাবতন্ময় হয়ে উঠলেন—তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল অপরূপ স্তবগান—

তিনি বললেন: "হে আমার প্রভু, গগন হয়েছে তোমার আরতির থালা, রবি চন্দ্র এই দুই দীপ সেখানে জ্বলছে নিরন্তর। তারকা মণ্ডল সুশোভিত রয়েছে মুক্তাখচিত চাঁদোয়ার

মত। মলয়জ চন্দন তোমার ধূপ—তারই সুগন্ধ বয়ে নিয়ে পবন করছে তোমার চামর ব্যজন। হে জ্যোতির্ময় প্রভু, পুষ্পসম্ভার সাজিয়ে বনস্পতিরা নিবেদন করছে তোমার পূজার আরতির পুষ্পার্ঘ্য—হে মুক্তিদাতা প্রভু, অনির্বচনীয় তোমার আরতি, এ আরতি বেজে উঠেছে অনাহত ধ্বনির মধ্যে।”

নানকের মুখে এই অপরূপ স্তবগান শুনে পাণ্ডা আর দর্শনার্থীরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। কে এই সন্ন্যাসী? কোন মহাপুরুষ ইনি? পরে জানা গেল—এই মহাপুরুষ হলেন শিখগুরু নানক।

চিঠির উত্তর

রণজয়, অজয় ও সুজয় মিত্র, কাঁথি; বিপুল ও পাপড়ী রায়, কোলকাতা; পুষ্পকলি ও প্রভাতকলি রায়, বাসন্তী, অনির্বাণ, কোলকাতা; মালবিকা চক্রবর্তী ও অনীতা, কোলকাতা; কৌশিক, শান্তিনিকেতন; ভাস্কর ও চৈতালী বসু, কোলকাতা; দীপান্বিতা, মহাশ্বেতা ও সমর্পিতা, কথাকলি দত্ত, কোলকাতা; রণেন্দ্র ও শ্রীরূপা, তেজপুর।—সকলের চিঠি পেয়েছি।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদের, **“মধুদি”**

পরলোকে সৌরীন্দ্রমোহন

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তোমাদের প্রিয় লেখক এবং মৌচাকের বিশেষ বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। ‘মৌচাকের’ জন্ম থেকেই তাঁর অজস্র গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি “মৌচাকে” প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত শিশু উপন্যাসগুলি যথা, লালকুঠি, পাঠান মুল্লুকে, মাকালীর খাঁড়া ইত্যাদি মৌচাকেই প্রকাশিত হয়। আগামী আষাঢ় সংখ্যায় সৌরীন্দ্রমোহনের উপর বিশেষ লেখা প্রকাশিত হবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ০'৪৫
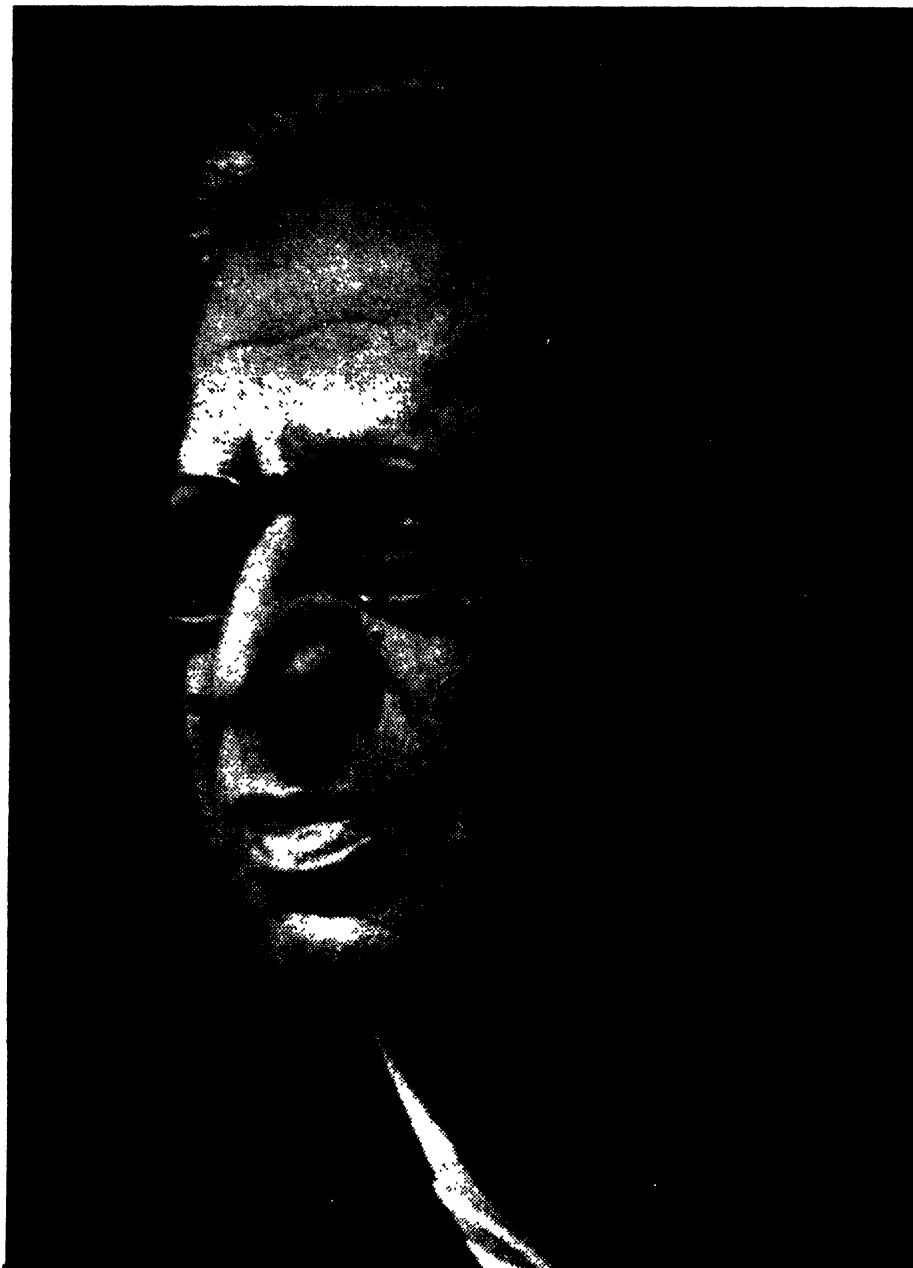
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ৯ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ মৃত্যু : ১২ই মে, ১৯৬৬

★ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ★

৪৭শ বর্ষ] আষাঢ় ঃ ১৩৭৩ [৩য় সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীসুনীল রায়

ফুলেই কেবল মধু থাকে?—মস্ত ভুলের কথা।
তেমন যদি হত, তবে
পৃথিবীটার কোথায় কবে
কথায় কাজে ব্যবহারে থাকত মধুরতা?

মৌমাছিরা খুঁজে বেড়ায় কোথায় মধু আছে,
ইচ্ছে করে, ওদের মত
ঘুরে ঘুরে ইতস্তত
সব বিবরণ খুঁটিয়ে জেনে নেব ওদের কাছে।

সব ভালো কি হয় কখনো, সবই বরণীয়?
পাহাড় এবং উইয়ের ঢিবি
এসব নিয়েই এই পৃথিবী—
ভালো আছে, মন্দ আছে, আছে মাঝারিও।

মৌমাছিদের মধুর স্বভাব—থাকব কেন ভুলে?
কিন্তু শুনি তারাও নাকি
ঠাণ্ডা ক'রে সব চালাকি
তেমন প্রয়োজনে আবার বিষ ঢালে তার হুলে!

মন্দ যতই থাক্, আমরা নিত্য সোজাসুজি
ঘরের কাছে কিংবা দূরে
মৌমাছিদের মতন ঘুরে
কোথায় মধু, কোথায় মধু—তাই যেন রোজ খুঁজি।

ফুলেই কেবল থাকবে মধু? তাই কখনো হয়?
কথায় কাজে ব্যবহারে
অনেক মধু থাকতে পারে—
সে মধুও করব প্রাণের ভাণ্ডারে সঞ্চয়।

যেখানেই যা পাব, সেসব করব এনে পুঁজি—
ভালো যা, তা করব উজাড়,
প্রাণের ভাঁড়ার মনের ভাঁড়ার
পূর্ণ ক'রে তুলব কেবল—এইটুকু সার বুঝি॥

পত্রলোকে সৌরীন্দ্রমোহন

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

আমাদের বয়স যখন অল্প ছিল, তখন যে ক'জন শিশুদের লেখক আমাদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।

'মৌচাকে'র একেবারে গোড়ার দিকে সৌরীন্দ্রমোহন কয়েকটি আশ্চর্য ছোটদের গল্প লিখেছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখতে বসলে লেখককেও শিশু এবং কিশোর হয়ে যেতে হয়, সৌরীন্দ্রমোহন একেবারে মনের মতন গল্প লিখলেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া, কিংবা পিকনিকের কোনো মজাদার গল্প। 'মৌচাকে'র সেই পুরাতন সংখ্যাগুলি এখনও হাতে পেলে বার বার পড়ি।

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা 'চালিয়াৎ চন্দর'কে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন?

এই 'চালিয়াৎ চন্দর' সৌরীন্দ্রমোহনের এক অপূর্ব কীর্তি। চন্দর সকলকেই কেবল নানাবিধ চাল মারত, এমন ভাবে সে ভাঁওতা দিত যে সবই সত্যি মনে হত। শেষে সে একদিন ধরা পড়ে গেল।

সৌরীন্দ্রমোহন হেসে জবাব দিয়েছিলেন, হাঁ, আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত, তার ঐ রকম হালচাল ছিল।

সৌরীন্দ্রমোহন জীবন থেকেই অনেক সময় গল্প নিয়েছেন, তাঁর বিখ্যাত কাহিনী 'বাবলা'র ঐ ছেলেটিকে তিনি শিয়ালদা ষ্টেশনে কাগজ বিক্রী করতে দেখেছিলেন। তাকে প্রশ্ন করে তাদের দুঃখের ইতিহাস শুনেছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন দু'খানি চমৎকার ছোটদের উপন্যাস লিখেছিলেন, একটির নাম 'লালকুঠি' আর অপরটির নাম 'মা কালীর খাঁড়া'। এই দুটি উপন্যাসই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে সৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তিনি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় প্রশংসনীয় মেধার পরিচয় দান করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময় থেকেই সৌরীন্দ্রমোহন সাহিত্যসেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাহিত্যরচনাও করেন আবার আইনের ক্লাসে বসে আইনের লেকচার শোনেন।

খুব ছোটবেলায় শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে ভাগলপুর থেকে প্রকাশিত হস্তলিখিত মাসিকপত্র 'কল্পনা'য় সৌরীন্দ্রমোহনের হাতেখড়ি। পরে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'তরণী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আরেকজন সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সেকালের এক বিখ্যাত সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কারটির নাম কুন্তলীন পুরস্কার। প্রতি বছর পূজার সময় উত্তম ছোটগল্পের

জন্ম এই পুরস্কার দেওয়া হত। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কুন্তলীনের জন্ম লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহনের 'বৌদির কাণ্ড' নামক গল্পটি এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়।

সৌরীন্দ্রমোহনের এই হল সাহিত্য-জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র। তিনি তখনকার কালের বিখ্যাত সাহিত্য মাসিক 'ভারতী'তে নিয়মিত লিখতেন, এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি সৌরীন্দ্রমোহনকে স্নেহ করতেন এবং তাঁরই উৎসাহে মাত্র ২১ বছর বয়সে সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী'র সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল তাঁর বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি 'ভারতী'তে নিয়মিত লিখতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি'ও এই 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শেফালী' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম উপন্যাস 'দরদী' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তারপর তিনি ছোট ও বড়দের জন্য প্রায় তিন শত গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেক্সপীয়রের অনেকগুলি নাটকও তিনি অনুবাদ করেছেন।

তাঁর অসাধারণ দ্রুত লিখন ক্ষমতা ছিল। যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, ততদিন তিনি অক্লান্ত-ভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস সবরকম রচনাই তিনি অনায়াসে লিখতে পারতেন। তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'দরিয়া' নামক নাটক দু'খানি যথাক্রমে ১৯০৮ এবং ১৯১২ সালেতে তখনকার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। প্রথম যুগের ছায়াছবির কাহিনীও কিছু কিছু সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি গান অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল।

সৌরীন্দ্রমোহনের 'আঁধি', 'বাবলা' ও 'কাজরী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী এবং ছোটদের গল্প।

সাহিত্যিক সমাজে উপস্থিত থাকলে সৌরীন্দ্রমোহন চমৎকার পুরনো দিনের গল্প বলতে পারতেন। শেষ জীবনে চোখটা নষ্ট হওয়ায় লেখার অসুবিধা হত, তার জন্য তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর শেষ রচনা মৌচাকেই প্রকাশিত হয়েছে 'কাঁকরমাটির পথ'।

মৌচাক পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পুরস্কার তিনি পেয়েছেন 'মৌচাক' যখন প্রকাশিত হয়, সেই কালের গল্পগুলি লিখে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ করতেন, অবনীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর তিনি প্রিয়জন, তাছাড়া 'ভারতী' গোষ্ঠী বলতে যা বোঝায় সৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে তার মাত্র দু'একজন আর মরজগতে রইলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যু যদিও পরিণত বয়সে ঘটেছে, তথাপি তাঁর মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্য ও 'মৌচাকে'র ক্ষতি অপূরণীয়।

জয় হিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গ্রীস মিশর ভারত ও চীন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যজাতি। এদের মধ্যে ভারতই বোধ হয় আদি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ রীতিমত সভ্য ও ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ। এই যুদ্ধের কাল নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে, সেই সময় আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের যে সন্নিবেশ ছিল ব'লে মহাভারতে লিখেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলেছেন সে অবস্থা ছিল হাজার পাঁচেক বছর আগে। পাঁচ হাজার বছর আগে হিন্দুরা এতো সভ্য ছিল—একথা মানতে সাহেবরা চায় না, দুশো বছর তারা এদেশ শাসন করেছে, শোষণ করেছে, এবং জগদ্বাসীকে শুনিয়েছে ভারতবাসীরা অসভ্য। ভারতবর্ষ এক উপমহাদেশ, ইউরোপ থেকে রাশিয়া বাদ দিলে যা থাকে ভারতের আয়তন তাই, এতো বড় দেশে সব মানুষই একরকম হতে পারে না, আচারে ব্যবহারে সংস্কারে পার্থক্য থাকবেই, সেই পার্থক্য থেকে সামান্য খুঁৎ বের করে জগৎসভায় আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনেক সাহেব অনেকবার করেছেন। আবার সত্যিকারের সজ্জনও আমরা দেখেছি, কানিংহাম, ম্যাক্সমুলার, রোঁমারোঁলার মত মানুষ, যাঁরা ভারতের মহত্ত্ব নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বসভায় তুলে ধরেছেন।

ইউরোপের সভ্যতা সুরু হয়েছে গ্রীস থেকে, তারপর রোম, তারপর বাকি দেশগুলি। সেইজন্য সাহেবরা সবসময় চেষ্টা করেন গ্রীসকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো সভ্য জাতি বলে, তাহলে নিজেদেরকে সেই ঐতিহ্যের উত্তর-ধারক বলে গৌরব করা চলে। কিন্তু গ্রীকদের আগে যে হিন্দুরা সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় টুকরো টুকরো প্রাচীন কাহিনী থেকে।

আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা পুরুর রণহস্তী দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। পুরুর রণহস্তী ছিল মাত্র পাঁচ শো। পুরুর ব্যূহ রচনার ত্রুটির জন্য সেই রণহস্তী লড়াই করার সুবিধা পায়নি, নাহলে সেকেন্দারকে পঞ্চনদ থেকেই ফিরতে হতো। মগধ রাজের এই রণহস্তী হাজার হাজার আছে শুনে গ্রীক সেনারা আর অগ্রসর হতে চায়নি।

গ্রীকদূত এই হাতী পোষার কৌশল দেখে অবাক হয়েছিলেন। মেগাস্থিনিস লিখে গেছেন —'জানোয়ারের মধ্যে হাতী সব চেয়ে বুদ্ধিমান, হাতী থাকা বড় ভাগ্যের কথা। এদের পিঠে চড়ে যারা লড়াই করে তারা নিহত হলে হাতী তাদের তুলে নিয়ে যায় স্বগৃহে, নয়তো তার মৃতদেহ পাহারা দেয়। আহত হয়ে পড়ে গেলে তাকে তুলে নিয়ে যায় নিরাপদ স্থানে। মাহুতকে হাতীরা ভালবাসে। একবার এক হাতী ক্ষেপে গিয়ে তার মাহুতকে খুন করেছিল, পরে বুঝতে পেরে মনের দুঃখে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।'

মেগাস্থিনিস মিশ্রী খেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে বলেন—'ভারতবাসীরা একরকম গাছের রস থেকে এক জাতের স্ফটিক তৈরী করে, তা চিবিয়ে খেলে মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগে।'

মেগাস্থিনিস ভারতের মানুষের আচার-ব্যবহার দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন, লিখেছিলেন—'ভারতবাসীরা মিথ্যা কথা বলে না। এরা মামলা-মকদ্দমা করা পছন্দ করে না। কোন ব্যাপারে সাক্ষী বা সই সাবুদের দরকার হয় না। শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে এরা লোকের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখে। এদেশে বাড়ী-ঘরে পাহারা রাখার দরকার হয় না।'

এখনকার গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের কথা মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে পাওয়া যায়—'পাটলিপুত্র থেকে পেশোয়ার অবধি ১১৫০ মাইল পথ। পথের প্রতি মাইলে পাথর বসানো ছিল, সেই পাথরের গায় লেখা ছিল সংখ্যা ও দূরত্ব। পথের তদারক করার জন্য রাজকর্মচারীও ছিল।'

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস দেশে ফিরে গিয়ে বলেন—'ভারতীয়েরা গাছ থেকে একরকম পশম পায়, তা ভেড়ার লোমের চেয়ে সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য। তা থেকে বস্ত্র তৈরী করে ভারতীয়েরা পরে।'

এই সময় তুলোর কথা গ্রীকেরা জানতো না। এদেশে তখন নানা জাতের বস্ত্র তৈরী হচ্ছে : বদর (সুতী বস্ত্র), ক্ষৌম (মসিনার ছালের বস্ত্র), দুকূল (সূক্ষ্ম ছালের বস্ত্র), অংশুক (মসলিন), লালাতন্তু, নেত্র, পুলকবন্ধ ও পুষ্পপত্ত (সাদা ও রকমারী রঙীন রেশমী বস্ত্র)।

ঐতিহাসিক নিয়ার্কাস এদেশের মানুষের রকমারী জুতো দেখে লিখে গেছেন—'ভারতবাসীরা শাদা চামড়ার জুতো পরে, জুতোর সোল খুব মোটা হয়। সিংহচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগচর্ম, কাঠবিড়ালীর চামড়াতেও জুতো হয়। গরীব লোকেরা খড়ম পরে। গাছের পাতা দিয়ে বোনা, ঘাস দিয়ে বোনা ও পশমের জুতোও হয়। নানা রঙের জুতো তৈরী হয়—লাল নীল হলদে কালো গোলাপী। জুতোর উপর নানা ধরনের শিল্পকর্ম করা থাকে,—সোনা, রূপা, মুক্তা, তামা, কাচ, টিন, সীসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির কারুসজ্জা দিয়ে জুতোকে সুদৃশ্য করা হয়।'

ঐতিহাসিক আপোলোনিয়াস লিখে গেছেন—'গ্রীকেরা তক্ষশিলায় থাকতো, অধ্যয়ন করতে।' তক্ষশিলা তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, যেখানে পড়ানো হতো—তিন বেদ, আঠারোটি কলাবিদ্যা, আইন, চিকিৎসা, সমরবিদ্যা, হস্তী-বিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা।

বিদেশ থেকে ভারতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসা নতুন নয়, তিব্বত ও চীন থেকে শিক্ষার্থী তো আসতই, সুদূর কোরিয়া থেকে এদেশে ভিক্ষুরা আসতো পড়াশুনা করতে। সপ্তম শতকে কোরিয়া থেকে যে ভিক্ষুদল এসেছিলেন, ইতিহাসে তাঁদের নাম পাওয়া যায়—সর্বজ্ঞদেব, প্রজ্ঞাবর্মণ প্রভৃতি।

পালি 'মিলিন্দ পহ্ন' গ্রন্থে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের একটা পাঠ্যসূচী আছে: ব্রাহ্মণদের জন্য—বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ছন্দ, উচ্চারণ, ব্যাকরণ, কাব্য, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বেদাঙ্গ, অঙ্কশাস্ত্র, স্বপ্নতত্ত্ব, দৈবতত্ত্ব, উল্কাপাত, বজ্রপাত, ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা, গ্রহণ নির্ণয় প্রভৃতি। ক্ষত্রিয়ের জন্য—সমরনীতি, ধনুর্বিদ্যা, অর্থনীতি, হস্তীপালন ও অশ্বপালন বিদ্যা। বৈশ্যদের জন্য—কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য ও গোপালন।

মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষাগারের ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল: অগ্নিস্থান—হোমের জায়গা, ব্রহ্মস্থান—বেদ অধ্যয়নের জায়গা, বিষ্ণুস্থান—রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষার জায়গা, মহেন্দ্রস্থান—সমরনীতি শেখার জায়গা, বিবস্বত স্থান—জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নের জায়গা, সোমস্থান—উদ্ভিদবিদ্যা শেখার জায়গা, গরুড়স্থান—চলাচল বিদ্যাশিক্ষার জায়গা, কার্তিকেয় স্থান—যুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যূহরচনা শেখার স্থান।

আবার ছোটদের গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেবার জন্য পঞ্চতন্ত্র রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্র তখনকার দিনে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, যখন যে দেশের পণ্ডিত সুবিধা পান, এই বইখানির অনুবাদ করেন। ষষ্ঠ শতকে এটি অনুবাদ হয় পহ্লবী ভাষায়, তারপর ফার্সী, হিব্রু, ল্যাটিন, স্পেনিশ ও ইটালিয়ান ভাষায়।

সক্রেটিসের শিষ্য আরিষ্টক্সেনাস লিখেছেন—এক হিন্দু দার্শনিক সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেন—'আপনার দর্শনের সিদ্ধান্ত কি? আপনি কি জানাতে চাইছেন?' সক্রেটিস বলেন—'মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ আমি চাই।' হিন্দু হেসে বললেন—'স্রষ্টা ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর সৃষ্টি মানুষকে জানবেন কেমন করে?'

বহু প্রাচীন কাল থেকে দর্শনচর্চায় ভারতের স্থান ছিল সবার শীর্ষে, এখনও তাই আছে। সনাতন হিন্দু দর্শনেরই দুটি শাখা জৈন ও বৌদ্ধদর্শন। বুদ্ধ যখন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, তখন মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করছেন, মহাবীরের আগে আরো তেইশজন জৈন তীর্থংকর ছিলেন। এ থেকেই হিন্দুর ধ্যান ধারণা ও অধ্যয়নের প্রাচীনতা বুঝা যায়।

স্থাপত্য, শিল্প, খেলাধুলা, যুদ্ধকৌশল সবেতেই হিন্দু প্রাচীনতার গৌরব করতে পারে। মগধরাজ অজাতশত্রু যুদ্ধে দুটি নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন—মহাশিলা কণ্টক ও রথমুষল। মহাশিলা কণ্টক কামানের পূর্বকল্পনা, এ থেকে বড় বড় পাথরকে ছোড়া যেতো গোলার মতো। রথমুষল এখনকার ট্যাঙ্কের পূর্বকল্পনা, রথ চলতো সারথিকে দেখা যেত না, রথের চারিপাশ থেকে লৌহ-শলাকা বেরিয়ে থাকতো, শত্রু সেনার মাঝে পড়ে সেই রথ মহা ক্ষতি করতো।

মহাভারতে যে পাশা খেলার কথা আমরা পড়ি, সেই পাশা ও দাবা খেলার ছক্ পারস্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়, পারস্যরাজ প্রথম খসরুর রাজসভায়। সেদেশ থেকে সেই খেলা যায় আরব দেশে সপ্তম শতকে। তারপর ইউরোপে তার প্রচলন হয় দশম শতকে।

প্রাচীন মন্দির ও মূর্তিশিল্পের অনেক নিদর্শন এখনও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তিয়েব দিন পর্বতমালার দক্ষিণে কুচিতে এক গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে এক হাজার বুদ্ধমূর্তি, গুহার দেয়ালে রঙীন ছবি, ও সংস্কৃত পুঁথিপত্র অনেক পাওয়া গেছে।

ইউফ্রেটিস নদীর উত্তরে ভ্যান হ্রদের তীরে দুটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির ছিল। মন্দির মধ্যে দুটি দেব বিগ্রহ ছিল, ১৮ ফুট ও ২২ ফুট উঁচু। এই মন্দির খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তৈরী। সন্ত গ্রেগরী সেই মন্দির দুটি ধ্বংস করেন ৩০৪ খৃষ্টাব্দে।

শুধু ইট-পাথরের স্থাপত্য নয়, ধাতু ও কাঠের ব্যবহারেও হিন্দুরা ছিল অদ্বিতীয়। প্রাচীন ক্যালডিয়ান রাজ্যে উর নগরে রাজা নেবুকাদ-নেজারের প্রাসাদ তৈরী হয় ষষ্ঠ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, সে প্রাসাদ ভারতীয় সেগুন কাঠের তৈরী, ভারতীয় মিস্ত্রীরাই সম্ভবতঃ তা তৈরী করেছিল, সেখানে একটি চন্দ্র-মন্দিরও তৈরী হয়।

পম্পেই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গজদন্ত-নির্মিত ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

হিউয়েন সাং এদেশে অনেক পিতলের বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন—তার মধ্যে বৃহত্তম ছিল নালন্দায় আশী ফুট উঁচু মূর্তিটি। সে মূর্তি হারিয়ে গেছে। তবে ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জে মাটি খুঁড়ে এক সাড়ে সাত ফুটের মূর্তি পাওয়া যায়, সেটি এখন বিলাতের বার্মিংহাম যাদুঘরে আছে।

দিল্লীর মেহেরৌলি অঞ্চলে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। সেটি তেইশ ফুট উঁচু, ব্যাস সওয়া-ষোল ফুট। স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। অনেক জলঝড় তার উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু আজ অবধি লোহার গায়ে মরিচা ধরেনি। ধাতুবিদ্যায় এ এক মহাবিস্ময়।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য খনির কথা লিখে গেছেন—সীসা, ত্রপু (টিন) ও অয়স (লোহা)। পাহাড় থেকে শিলাজতু, আর সমুদ্র থেকে মুক্তা, প্রবাল, শুক্তি ও শঙ্খ—তখনকার দিনে এসব দ্রব্যের কথা ইউরোপের সাহেবরা ভালভাবে জানতো না।

সেই পুরানো গৌরবকে আমরা আজ ধরে রাখতে পারিনি, অনেক পিছনে পড়ে গেছি। মনে আমরা শক্তিমান হয়েছি, কিন্তু দেহে হয়ে পড়েছি অশক্ত। আমরা যদি সাড়ে সাতশো বছর মোগল পাঠান বৃটিশের অধীন না থাকতাম, তাহলে আজ আমাদের এই দুঃসহ অবনতি হতো না—বিশ্বের মানুষের কাছে আমাদের হেয় করার সাহস থাকতো না কারো। শক্তি না থাকলে ঐতিহ্যের সম্মান থাকে না, শক্তি চাই।

ছড়া

শ্রীসরল দে

হাঁক নেই ডাক নেই
মাথাজোড়া টাক নেই
নড়বড়ে দাঁত নেই
পায়ে গেঁটে বাত নেই,
তবু তাকে সকলেই
'বুড়ো' ব'লে ডাকে।

হাঁক আছে ডাক আছে
মাথাজোড়া টাক আছে
নড়বড়ে দাঁত আছে
পায়ে গেঁটে বাত আছে,
'খোকাবাবু' ব'লে ডাকে
সকলেই তাকে।

খোকার খেয়াল

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

দুধ দিয়ে মাছ খায়, মাছ দিয়ে দুধ গো ;
ভাতে মাখে কুইনিন্—জ্বরের ওষুধ গো।
জ্বর হলে খায় টক্,
আর কাঁপে ঠক্ ঠক্ ;—
দেখিনি এমন ছেলে—এ কী অদ্ভুত গো!

সাবু খেতে বড়ো কাবু—চায় রসগোল্লা,—
সাম্‌লাবে এরে কোন্ মক্কার মোল্লা।
সন্দেশ দিতে তারে
শেষরাতে কেউ পারে ?—
না পেলে মাতায় পাড়া ছেলে একতোল্লা!

কলি-চুন ঢেলে খায় মুড়ি-মোয়া-মুড়কি,
চম্‌চম্ ফেলে চায় খেজুরের গুড় কি ?
পয়সা ছড়ায়ে দিয়ে
বোকা ছেলে যায় নিয়ে—
পকেট বোঝাই ক'রে ধুলো-বালি-সুরকি!

যতো করো গালাগালি, মারো তা'রে গাঁট্টা-
হেসে করে লুটোপুটি,—ভাবে ওটা ঠাট্টা!
যতো দাও কাট্‌লেট্—
ভরবে না তার পেট,—
খুশী হয় যদি দাও—তেঁতুলের খাট্টা!

প্রথম বেলুনে ইংলিশ চ্যানেল

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ

মানুষের আজ অন্যতম লক্ষ্য হল চাঁদে পাড়ি দেওয়া। এই লক্ষ্যে আসতে তাকে এগোতে হয়েছে ধাপে ধাপে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে দরকার হয়েছে অদম্য মরণ-পণ দুঃসাহস। এমনি দুঃসাহসের একটি কাহিনী আজ বলছি। বেলুনে চড়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার কাহিনী।

বেলুনের ইতিহাস শুরু ১৭৮৩ সালে।

একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরে মানুষ প্রথম বেলুন ওড়াল এবং আকাশে ওড়ার যুগের সূত্রপাত হল।

৫ই জুন ১৭৮৩। ফ্রান্সের এ্যানোয় গ্রামে দুই ভাই জোসেফ আর এটিনে মঁগোলফিয়ে বেলুনে গরম বাতাস ভর্তি করে সেই বেলুন আকাশে উড়িয়ে একটি ইতিহাসের ভিত্তিভূমি রচনা করলেন।

২৭শে অগাস্ট ১৭৮৩। ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস প্রথম বেলুনে হাইড্রোজেন ভর্তি করে বেলুন ওড়ালেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৩। মঁগোলফিয়ে দুই ভাই বেলুনের নিচে লটকান একটি ঝুড়িতে করে ওড়ালেন পৃথিবীর প্রথম আকাশ-যাত্রী একটি হাঁস, একটি মুরগী ও একটি ভেড়া।

২১শে নভেম্বর ১৭৮৩। বিজ্ঞানী পিলাতর দ্য রোজিয়ার ও মার্কুইস দার্লান্দিস হলেন বেলুনে পৃথিবীর প্রথম মানুষ-যাত্রী। প্যারিসের বয় দ্য বোলোন ময়দান থেকে উড়ে ২৫ মিনিটে ২৫ মাইল দূরে নিরাপদে গিয়ে নেমেছিলেন।

১লা ডিসেম্বর ১৭৮৩। অধ্যাপক চার্লস ও জঁা রবার্ট বেলুনের খানিকটা উন্নতি করে তাতে উঠলেন। বেলুন তৈরি হল রবারমিশ্রিত কাপড়ে। হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে বেলুন ভর্তি হবার পর একটি জাল দিয়ে সেটাকে আবরিত করে তার তলায় ঝোলান হল একটি গণ্ডোলা অর্থাৎ দাঁড়াবার বসবার মত একটি ঝুড়ি বা নৌকা ধরণের জিনিস। সেই গণ্ডোলায় রাখা হল বালির বস্তা; আকাশে ওড়ার সময়ে যাতে প্রয়োজনমত বালি ফেলে দিয়ে বেলুনের ওজন হালকা করা যায়, তাতে বেলুনে আকাশে ওঠার বেগ দ্রুততর হবে। বেলুনে একটি ভাল্ব্-এর ব্যবস্থা রইল যাতে নামবার সময় প্রয়োজনমত গ্যাস ছেড়ে দিয়ে নামার গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি ব্যারোমিটারও তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন।

বেলুন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হল। এরপর থেকে দেশে দেশে বেলুন ওড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। ইংরেজ, আমেরিকান, রাশিয়ান, পোলিশ, ইতালীয়ান—এঁরা সবাই ফরাসীদের সঙ্গে পাল্লা

দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। কিন্তু সেযুগের বেলুন ছিল যেন এক-একটি বিপদের জাহাজ।

যাত্রীটি বেলুনে চড়ে ইশারা করল বাঁধন খুলে দেবার। দড়ি খোলা হল। ওজন হালকা করার জন্য খানিকটা বালি ফেলে দেওয়া হল। সাঁ করে বেলুন খানিকটা ওপরে উঠে গেল। বেলুন যত ওপরে উঠবে বেলুনের ভেতরের গ্যাস ততই ফুলবে। দুটি কারণে। প্রথমতঃ, যত ওপরে ওঠা যায় তত বাতাসের চাপ কমতে থাকে ; কাজেই ওপরে-ওঠা বেলুনের গায়ে বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার দরুন ভেতরের গ্যাস ফুলতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, যত ওপরে ওঠা যায় সূর্যের তাপও তত প্রখর হয় ; ফলে বেশি পরিমাণে সূর্যের তাপ বেলুনের গায়ে পড়ার দরুন ভেতরের গ্যাস আরও ফুলতে থাকবে। এখন হঠাৎ একটা মেঘ এসে বেলুনটাকে আড়াল করে দিল ; কাজেই সূর্যের তাপ না পাওয়ার দরুন বেলুনের ভেতরে গ্যাস সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বেলুন আর ওপরে উঠবে না, নিচে নামতে থাকবে। বেলুনটাকে মাটিতে নামাবার সময়ে খুব সাবধানে ভাল্‌ব্ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নয়ত কখনো সাঁসাঁ করে নামবে, কখনো অতি ধীরে নমবে ; কখনো ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে নামবে। সবচেয়ে বিপদ ছিল মাটিতে বেলুনটা অবতরণ করার সময়ে। আর একটা বড় কথা হল বেলুনটাকে বাতাসের গতির ওপর ছেড়ে দিতে হয়। যাত্রী হয়ত যেতে চায় পুব থেকে পশ্চিমে, কিন্তু বাতাস বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। যাত্রীর দিক নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় নেই, বাতাসের গতিতেই তার গা ভাসাতে হবে।

কাজেই একথা মানতেই হচ্ছে যে, বেলুনে ওড়া ছিল একটি অতি দুঃসাহসিক কাজ। এবং সফল বীরেরা পেতেন নাটকীয় সম্মান। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথমে বেলুনে ওড়েন (৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৪) ইটালীয়ান সিনর ভিনসেণ্ট লুনার্ডি তাঁর প্রিয় একটি কাল বিড়াল ও কুকুর নিয়ে। কি তাঁর খাতির! রাজা তাঁকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। লণ্ডনে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রদর্শনী করে সেই বেলুন, কাল বিড়াল ও কুকুর দেখান হল। লোক ভেঙ্গে পড়েছিল সেই প্রদর্শনী দেখতে।

বেলুনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার ঘটনা একটি দুঃসাহসিক কাহিনী।

৭ই জানুয়ারি ১৭৮৫। ইংল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী ডোভারে বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। শীত-কাল, কিন্তু তবু সেদিন শীতের প্রকোপ তেমন ছিল না। আকাশ মেঘশূন্য, বাতাস মৃদুমন্দ, সাগরের জল স্বচ্ছ নিস্পন্দ।

সকালের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অপেক্ষমান জনতা অধীর। তবু বৈলুনিক (বৈমানিকের বদলে বৈলুনিক বললে ক্ষতি কি?) জাঁ পিয়ের ব্ল্যানকার্ড-এর দেখা নেই। বেলুনও তৈরি। অধীর থেকে অস্থির হয়ে উঠল জনতা। এবার দেখা গেল ব্ল্যানকার্ডকে। জনতা

সম্বর্ধনায় উৎফুল্ল। কিন্তু ব্ল্যানকার্ড ওদের গ্রাহ্যই করলেন না। বদমেজাজী বলে তাঁর দুর্নাম ছিল, কিন্তু দুঃসাহসিক বেলুন-বীর বলে সারা ইউরোপ এই ফরাসী ব্যক্তিটিকে সম্মানও করত।

এই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করছিলেন ডক্টর জন জেফ্‌রিস। তিনি আমেরিকান। তাঁর ইচ্ছে, ব্ল্যানকার্ড-এর সহযাত্রী হন তিনি। কিন্তু বেলুনে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার সম্পূর্ণ সম্মানটুকু ভোগ করতে চান ব্ল্যানকার্ড একা। ব্ল্যানকার্ডের তত্ত্বাবধানে বেলুন ফোলান হল ও তলায় গণ্ডোলা ঝোলান হল। গণ্ডোলার আড়ম্বর দেখবার মত। চারটে দাঁড় সিল্ক দিয়ে মোড়া, হালটার নক্সার কি বাহার! কিন্তু যদি অঘটন ঘটে ওটি জলে পড়ে, তাহলে যে কোন কাজেই লাগবে না তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

সব যখন তৈরী, দেখা গেল ডক্টর জেফ্‌রিস আর ব্ল্যানকার্ড দারুণ বাগ্‌বিতণ্ডায় মত্ত। অবশেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাকযুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে গণ্ডোলায় গিয়ে উঠলেন ব্ল্যানকার্ড; তাঁকে অনুসরণ করে উঠলেন ডক্টর জেফ্‌রিস।

এঁদের মেজাজ ছিল যেমন খাপছাড়া, অভিযানও হল তেমনি দুর্গম।

বেলুনটি প্রথম হতেই ভাল কাজ করল না! কখনো সাঁ করে খানিকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে, আবার কখনো বা ধাঁ করে খানিকটা নেমে যাচ্ছে। এ যেন সমুদ্রের অশান্ত উত্তাল ঢেউয়ের নাচনে সাঁতার কাটা। কিন্তু বেলুনটা বিস্ময়করভাবে বাতাসে ভাসমান ছিল, সমুদ্রে নেমে আসেনি। এর জন্যে অবশ্য তাঁদের কম ত্যাগ করতে হয়নি। বালি, খাদ্যদ্রব্য, জামা-কাপড়, (অন্তর্বাস ছাড়া) মায় প্যান্ট্‌লনও এক সময়ে জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। যাই হোক, ফ্রান্সের উপকূলবর্তী ক্যালেতে এঁদের নামবার কথা। সেখানে তাঁদের অভিনন্দন দেবার জন্যে বিস্তর লোক জমা হয়েছে। কিন্তু বেলুনকে সেখানে নামানো গেল না। উড়ে চলল নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে। অবশেষে ক্যালে থেকে বারো মাইল দূরে গিয়ে ব্ল্যানকার্ড একটা গাছকে কোনমতে জড়িয়ে ধরে বেলুনটা নামালেন। সেখানেও ভিড় জমে গেল। তাঁরা ওঁদের কাঁধে তুলে শোভাযাত্রা করে ক্যালে নিয়ে এল। তারপর থেকে ফ্রান্সে এঁদের কি খাতির! যেখানেই যান সেখানেই বীরের সম্মান। সমসাময়িক কাগজে মন্তব্য বেরিয়েছিল—বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকে রোম যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, এঁদের অভ্যর্থনা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি।

ভুঁড়ি-বিভ্রাট

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য

এক যে ছিল রাজা মশাই মস্ত ভুঁড়িদার
দায় হোল তার বহন করা অমন গুরুভার।
বেড়ে বেড়ে ভুঁড়ির বহর এমন হোল দশা
বন্ধ হোল নড়াচড়া, বন্ধ হোল বসা।

দেশ-বিদেশের বদ্যি এসে কেবলই হয় জড়ো
বুঝতে নাহি পারে তারা রোগটা কেমনতর।
রোগটা শেষে এমন হোল বছরখানেক বাদে
রাজার ভুঁড়ি শেষকালেতে ঠেকলো গিয়ে ছাদে

কৃপণ রাজা তখন ছড়ান অর্থ মুঠো মুঠো
ভুঁড়ির চাপে ছাদটা যখন সত্যি হোল ফুটো।
রোজা, ওঝা, গুণিন যত সবাই আসে ছুটে
ভাঁওতা দিয়ে রাজার টাকা সকলে নেয় লুটে।

রোগ সারে না, বরং বাড়ে, যজ্ঞ শুরু হয়
লক্ষ মণের ঘৃতাহুতি, সহজ কথা নয়!
ও সব করেই রাজ্য গেল, অর্থ হোল শেষ
কেঁদে কেঁদে রাজার ভুঁড়ি চুপসে গেল বেশ।

উঠলো বসে রাজা মশাই, রাখলো পেটে হাত
কাণ্ড দেখে বলল শুধু, ক্যায়াবাৎ! ক্যায়াবাৎ

শ্রীশান্তনু বিশ্বাস

বিমান ইঞ্জিনের শব্দ দূর করার জন্য একটি শব্দ-প্রতিরোধক আবিষ্কার হইয়াছে, ইহার নাম বার্জেস্‌ এয়ারো ইঞ্জিন সাইলেন্সার।

১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হারাকিরির নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট প্যালোমার উপরের পৃথিবী-খ্যাত মানমন্দিরটি পরলোকগত বৈজ্ঞানিক জর্জ ইলারী হ্যালের নামে হয়। তাই এই মন্দিরটির নাম হ্যালে মানমন্দির।

Franzy Liszt নামক খ্যাতনামা পিয়ানোবাদক প্রথম প্রথম অর্থ ব্যয় করিয়া, তাঁহার বাজনা শুনিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িবার ভানকারী এক নারীকে শ্রোতাদের মধ্যে রাখিতেন।

কোন এক ভাষায় রবারের অর্থ—যাহার দ্বারা ঘষিয়া কিছু উঠানো যায়। পেন্সিলের দাগ উঠাইতে পারা যায় বলিয়াই এই নামকরণ হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম প্রিষ্টলে এই নামকরণ করেন।

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরের ষাট বৎসর বয়স্ক জনৈক ভদ্রলোক নিজ দেহ হইতে প্রায় ৯০০ বার রক্তদান করিয়া মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

শীতপ্রধান দেশে কটা চুলবিশিষ্টা নারীদের মাথায় গড়ে দেড়লক্ষ চুল থাকে, কৃষ্ণকেশরীদের মাথায় ৮০০০০ হইতে ১৫০০০০ ও লোহিত কেশীদের মাথায় ২৫০০০টি চুল থাকে।

রবীন্দ্রনাথকে একজন বেলজিয়ান শ্রোতা বক্তৃতা দেওয়ার সময় "ভারতের যীশুখ্রীষ্ট" নাম দিয়ে অভিনন্দিত করেন।

ক্লেম সোন নামে একজন ইংরেজ নিজে উড়তে পারিতেন। তাই তাকে বার্ড ম্যান বা মানুষ পাখী বলা হইয়াছে।

বড়বাবুর দেশ-ভ্রমণ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

পেনশনটা নেবার আগেই লম্বা ছুটি নিয়ে
দেশ দেখবেন বড়বাবু এক-চক্কর দিয়ে।

খবর শুনে সবাই এসে
একে একে শুধায় হেসে

কোথায় যাবেন, উঠবেন বা কোনখানেতে গিয়ে?
কেউ বলে, "স্যার, অজন্তাটা আসবেন বেড়িয়ে।"

যাননি কোথাও এর আগে তো, এই ভ্রমণের শুরু,
মাঝে মাঝে বুকটাও তাঁর করছে দুরু দুরু।

যেতে হবে কোন্ রাস্তায়,
কোন্ ট্রেনে বা কোন্ বাসটায়,

হদিস দিতে জুটলো অনেক উপদেষ্টা গুরু।
টাইম-টেব্‌ল ম্যাপ কেউ বা ছাখে কুঁচকে ভুরু।

সঙ্গে কি কি নিতে হবেই, ফর্দ হলো তার-ও।
গরম পোশাক, লেপ, কম্বল এটা-সেটা আরও—

স্টোভ, কেট্‌লি, হাঁড়ি, হাতা,
মগ, বাল্‌তি, ছড়ি, ছাতা,

চা, চিনি আর ঘন দুধের কৌটোও দশ বারো,
ওষুধ-পত্র ঠাসা একটা বাক্‌স চিকিৎসারও।

সকালে বেল, দুপুরে ডাব মিলবে কি ঠিক নাই
ওই দুটি তাঁর না হলে নয় নিতেই হবে তাই।

কেনা-কাটা সাঙ্গ যখন
মালই হলো এক ওয়াগন!

দেখেই বড়বাবুর মাথা ঘুরলো যে বাঁই বাঁই!
ডাক্তারে ক'ন—"করোনারী, স্রেফ্ বিশ্রাম চাই।"

আটুল গাঁয়ের বাঁটুল

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'কাঁথাটা তোর বাপকে দিস।'

সবচেয়ে শেষে, বাঁটুলকে সবচেয়ে অবাক করে মামীমা তার গলার পদকটি খুলে দিলে। এই পদটির মাঝখানটায় লাল প্রবালের ফুল, আর ফুলটি ঘিরে ছোট ছোট সবুজ পাথর বসানো। পদকটা সুতো বেঁধে বাঁটুলের কোমরে জড়িয়ে দিতে দিতে মামীমা বললে, 'মন্ত্রপড়া পদক, এটি গায়ে থাকলে তোর কোন ভয় নেই।'

বাঁটুলের চোখে জল ভরে এল। 'ও মামী ঐ তুলতুলেটা দাও, ওটা হাতে রাখতে আমার ভাল লাগে!' এ কথা সে কতবার বলেছে আর কতবার চেয়েছে পদকটা। ঐ লালে-সবুজে-সোনায় আশ্চর্য, আশ্চর্য পদক, বাঁটুলের ওপর তার মামীর ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে যেটি মামীমার বুকের ওপর দোল খায়।

আজ সেই পদক মামীমা দিয়ে দিলে। বাঁটুল বুঝতে পারলে যেতে তাকে হবেই। যেতে হবে, পালিয়ে যেতে হবে।

পরদিন খুব ভোর ভোর বাঁটুলদের গরুরগাড়ী রওনা হল। পৌষের ধুলোয় রাস্তা অন্ধকার, চারদিকে সব হিম হিম, নীল রঙের ভোর।

সঙ্গে চললেন কবিরাজ মাসী। কবিরাজ মশায়ের গিন্নীকে সবাই কবিরাজ মাসী বলে, কেন না ওঁর মত কবরেজী করতে কেউ পারে না। ওষুধ বল, টোটকা বল, ছোট মেয়েদের কান বেঁধাতে, ছেলেদের ফোড়া চিরতে, ওঁর জুড়ি কেউ নেই। মেয়ে হয়েও উকি খড়ম পায়ে দেন বাড়ীতে, আর কবিরাজ মশাই যখন বাইরে বসে বিনে কড়িতে, বিনে পয়সায় ওষুধ দিতেই থাকেন, দিতেই থাকেন, তখন ঘোমটার ভেতর থেকে এমন গলা খাঁকারি দেন যে, দাঁড়কাকরা ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়, বাঁটুলের স্বচক্ষে দেখা।

তা ছাড়া সব হিসেবে থাকে ওর, কোন বোয়ামে একশো তিরিশটা কুলের আচার আছে, কোন গাছে একুশটা পেয়ারা আধ-ডাঁসা হয়েছে। লাটাই-এ ক' ফেরতা সুতো আছে। খুব কম কথা বলেন, কিন্তু ওঁকে সবাই যমের মত ভয় পায়। বাঁটুলের মামী ওঁকে খুব ভক্তি করে, কেন করে কে জানে।

এখন কবিরাজ মাসী অনেকক্ষণ কটমট করে বাঁটুলের দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'একবার হয়তো কাশীতে যাবে বদন, কাশীতে আমার দাদা থাকেন। নাম মৈ বাবু, বিশ্বনাথের গলিতে সবাই চেনে।'

মানুষের নাম মৈ শুনে রাধীর হাসি পেল, কিন্তু পদাই বললে মানুষ অসম্ভব লম্বা হলে তার নাম মৈ হয়, বেঁটে হলে নাম হয় গুট্‌কে, পদাই-এর প্রাণের বন্ধু ভজা বলেছে।

একসময়ে তারা মোল্লাচক পৌঁছে গেল।

মোল্লাচকে মামীর বাপের বাড়ীর উঠোনে পা দেওয়া মাত্রই মামীর দাদা, বউঠান, পিসী, সবাই এসে দারুণ হইচই বাধিয়ে দিলে। বাঁটুলদের গরুরগাড়ী চালিয়ে এসেছিল যে তাকে বললে, 'ভাল সময়ে এনেছিস বাবা, আজ সন্ধ্যেবেলা চলে যা। জামাইকে বলে দিগে যা আমার মায়ের বড্ড অসুখ, আমিই খবর দেব মনে করছিলাম।'

'কি অসুখ?'

'জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, কব্‌রেজের বড়ি খাবে না, জ্বরের মধ্যে চান করবে, বল কেন! যাকৃগে, তুই কি পুজো দিবি বলছিলি?'

মামী তার উত্তরে বললে, 'দাদা, বদন কোথায়?'

'বদন? বদন তার বাড়ীতে।'

'ডেকে পাঠাও দাদা, আমার বড্ড বিপদ।'

মামী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। মামীর এই দাদাটিকে বাঁটুল মামা বলে। মামা যেমন ভালমানুষ, তেমনি হইহল্লা ভালবাসেন। সবচেয়ে ভালবাসেন বোধহয় তাঁর বোনটিকে। এখন বোনের চোখে জল দেখে তাঁর খুব দুঃখ হল আর দু'একবার 'কাঁদিস না' বলে মামীর পিঠ থাবড়ে দিয়ে তিনি মুখ তুলে চেঁচাতে লাগলেন, 'বলি গামছা, কোথায় গামছা? ফুলমণি যে কাঁদছে, তা বাপের বাড়ী এসে চোখ মোছবার একটা গামছা পাবে না?'

তারপরই তিনি পুকুরে মাছ ধরাতে আর গয়লাবাড়ী থেকে দৈ ক্ষীর আনাতে ছুটলেন। এখন অবশ্য আগেকার মত অমন সস্তাগণ্ডা নেই। এ আঠারোশ ছাপ্পান্ন সালে আর কি বা পাওয়া যায় বলো। সবাই বলে, দিনরাত বলে এ কলিকালে নাকি খাওয়াদাওয়ার সুখ নেই।

তবু বাপের বাড়ী বোন এসেছে, ভাগ্নেরা এসেছে, মাছে, দুধে, দৈ-এ, ক্ষীরে ভাসিয়ে দিতে না পারলে যে মোল্লাচক গ্রামের মান থাকবে না। আঁটুল গ্রামের লোকগুলো এমন, পুজোর সময়ে যখন কবির লড়াই হবে, তখন নির্ঘাৎ গানের মধ্যে সেই ঠাট্টাটা জুড়ে দেবে। গান গাইতে গাইতে বলবে—

মোল্লাচক গ্রামের কথা শুন বলিহারী
(সেথা যেয়ে) উপোস করে ফিরে এল পণ্ডিতের ঝিয়ারী ॥

সে ভারী নিন্দের কথা হবে। তাই মামীমার দাদা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটলেন। বাঁটুলকে বললেন, 'চল্ বেটা, গ্রাম বেড়িয়ে আনি তোকে।'

তারপর এক সময়ে সব হয়ে গেল।

এ বাড়ীর মন্দির দিনরাত খোলা থাকে। দিনে একজন আর রাতে একজন পুরুত থাকেন। এই মন্দিরে বহুজন মানসিকের পুজো দিতে আসবে এ সবাই জানে, আর সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

পুজো হল, প্রসাদ বিতরণ হল। এখানে প্রতিমার সামনে আখ, কুমড়ো, শশা বলি হয় আর সেইসব ফলের টুকরো নিয়ে বাঁটুলরা বড় পুকুরে ভাসিয়ে এল।

কবিরাজ-মাসীর হাতের রান্নার নাম আছে। তিনি এসেই রান্নাঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আর তিন প্রহরের সময়ে বাঁটুলরা সবাই বড় বড় মাছভাজা, মোচাঘণ্ট, মুগের ডাল আর মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠল।

তারপর, একটু সন্ধ্যে হতে বাঁটুলকে ডেকে নিয়ে মামী আর তাঁর দাদা, কবিরাজ মাসী মন্দিরের পেছনের ঘরে দোর বন্ধ করলেন। সেখানে বাসি ফুল বেলপাতার গন্ধ, একরত্তি পিদিমে মিটমিটে আলো, আর অত্যন্ত কালো, রোগা, খিটখিটে চেহারার একটা লোক বসে বসে 'ধাঁই তা না না না' ভাঁজছে। মামী আর মামীর দাদাকে দেখে সে সষ্টাঙ্গ হয়ে পেন্নাম করলে।

অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে অনেক কথা হল। শেষ অবধি ব্যাপারটা দাঁড়াল ঃ বদন হচ্ছে জাতে নাপিত। এ গ্রামের যে যখনই তীর্থে গিয়েছে ও পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে আর সেইজন্যে হরিদ্বার, কাশী, কানপুর, দিল্লি, অনেক অনেক জায়গা তার নখদর্পণে।

মামীমার বাবা ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন, তাই বদন এঁদের কাছে খুব ঋণী। বদন বাঁটুলের বাবার কাছে বাঁটুলকে পৌছে দেবে। কাজটি হাসিল হলে ওকে

মামীমার দাদা নগদ পঞ্চাশটি টাকা দেবেন। যাকে বলে কুবেরের ঐশ্বর্য। এ বাড়ীতে মন্দির আছে, নামকরা মন্দির, তাই অনেক রূপোর টাকা এ বাড়ীতে পেন্নামী পড়ে আর মামীমার দাদা ও পেন্নামী পান।

মামী বললে, 'আমি তোকে একজোড়া গোরু কিনে দেব বদন, তুই ছেলেটাকে বাঁচা।'

বদন বললে, 'রাহাখরচ বেশী নেবনা দা' ঠাকুর। পথে চেয়ে-চিন্তে খাব, গেরস্তের উঠোনে শুয়ে থাকব। টাকা পয়সা আছে জানলে জানই তো পথের ব্যাপার সব!'

'সে তুই যা বুঝিস।'

'কানপুরে যেতে হলে কলকেতা থেকে নৌকো নেব।'

'রেল তো আছে রে!'

'না না, বড় বড় নৌকো যায়, গঙ্গা দিয়ে উজিয়ে যায় সম্বৎসর। তাতে অন্ততঃ ত্রিবেণী অবধি যাওয়া যাবে। সেখান থেকে কানপুর তো এট্টুখানি রাস্তা।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কি। তোমাদের কাছে যেমনটি শুনছি তাতে তো ঝপ্ করে বিহান বেলা বেরোতে পারলেই ভাল হয়। তবে দিদি তুমি সাবধানে থেক। চরণ গাঙুলী রাগলে পরে সব করতে পারে।'

মামী আস্তে বললেন, আমি যা করছি তা অনাথের মঙ্গলের জন্যে। ঠাকুর আমায় দেখবেন।'

কবিরাজ মাসী বললেন, 'বিশ্বনাথের গলিতে মৈ দাদাকে খুঁজে নিও বদন। দাদা সব চেনে জানে। উদিকে বাইশ বছরের বাস।'

'নেব।'

'তাহলে কথাবার্তা সব ঠিক?'

'হ্যাঁ, দাদাঠাকুর।'

বদন একটা নিঃশ্বাস ফেললে। সব ঠিক হয়ে গেল। টাকার জন্যে চরণ গাঙুলী সব করতে পারে, বাঁটুলকে বেচতেও তার আটকাবে না। সেই জন্যে বাঁটুল বদন নাপিতের সঙ্গে তার বাবার কাছে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যাবে এই আঁটুল গ্রাম ছেড়ে, অনেক অনেক দূরে।

পরদিন ভোরবেলা, মামীমাকে অনেক কাঁদিয়ে, নিজে অনেক কেঁদে, মামীমার লিখে দেওয়া চিরকুট, একখানা নকশী কাঁথা আর মন্তর-পড়া পদক নিয়ে বাঁটুল বাবার সন্ধানে বেরোল, আমাদের আঁটুল গ্রামের বাঁটুল। (ক্রমশঃ)

টপ-সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

বিখ্যাত মেয়ে স্পাই জুডি কপলনের কাহিনী তোমরা নিশ্চয় শোননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জুডি কপলনের কাহিনী ছিলো আমেরিকার সবচাইতে মুখরোচক গল্প।

আমেরিকার মস্তো বড়ো শহর ব্রুকলিন। সেই শহরের একপ্রান্তে শখলভ দম্পতি বাস করেন। মিসেস শখলভ আর কেউ নন। তারই কুমারী নাম হলো জুডি কপলন।

জুডি কপলন ছিলেন আমেরিকার জষ্টিস ডিপার্টমেণ্টের এক কর্মচারী। কাজকর্মের জন্তে তার বেশ সুখ্যাতি ছিলো। দপ্তরের বড়ো কর্তারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতেন। তাই হঠাৎ যখন একদিন এফ বী আই'র গোয়েন্দারা জুডি কপলনকে স্পাইং-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করলে, তখন সমস্ত ব্রুকলিন শহরব্যাপী আলোড়ন সুরু হলো।

ইউনাইটেড নেশন্‌সে এক রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতেন। তার নাম ওইবিচেৎ ভ্যালেনটিনো। এফ বী আই অভিযোগ করলে জুডি কপলন ওইবিচেৎ ভ্যালেনটিনোর কাছে সরকারী দলিলপত্র বিক্রী করেছে। অবশ্বি হাতেনাতে জুডি কপলনকে ধরা যায়নি। এফ বী আই সন্দেহ করেছে। তাই একদিন বিনা ওয়ারেণ্টেই জুড়ি কপলনকে গ্রেপ্তার করা হলো। একটানা বিচার সুরু হলো। ছোট আদালতে জুডিকে দোষী সাবস্ত করা হলো। সব মিলিয়ে জুডি কপলনের জেল হলো পয়ত্রিশ বছর। জুডি কপলন এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করলে। কেস গেলো সুপ্রীম কোর্টে। কিন্তু আইনের দোহাই দিয়ে পুনঃ বিচারে জুডি কপলন মুক্তি পেলো।

এই মামলা-মকদ্দমার সময় জুডি কপলনের সঙ্গে শখলভের পরিচয় হয়।

পরিচয় থেকে সর্বশেষে হয় পরিণয়।

কিন্তু যাক, এবার জুডি কপলনের পুরো কাহিনী তোমাদের শোনাই।

*　　　　*

কলেজে সবাই বলতো জুডি কপলন তুখোড় ছাত্রী। শুধু পড়াশুনায় নয়, কাজেকর্মেও জুডি কপলনের যথেষ্ট সুনাম ছিলো। তাই যখন সরকারী চাকুরীর জন্তে জুডি কপলন আবেদন করলে, তখন চাকুরী পেতে তার একটুও বেগ পেতে হয়নি। চাকুরী পাবার কয়েক মাসের ভেতরই সরকারী মহলে তার সুনাম হলো। বুড়োকর্তারা জুডি কপলনকে বিশেষ সুনজরে দেখতে লাগলেন।

জষ্টিস ডিপার্টমেণ্টে জুডি কপলন ছিলেন পলিটিক্যাল এনালিষ্ট। এই দপ্তরে বিদেশী স্পাইদের গতিবিধির, কাজকর্মের নজর রাখা হতো। জুডি কপলনকে দেয়া হলো রাশিয়ান

স্পাইদের ফাইল। গোপনীয় কাগজপত্র সম্বন্ধে জুড কপলন ভারী সতর্ক ছিলো। তাই জুডির মনিব জুডিকে বিশ্বাস করতেন আর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জুডিকে দেখাতেন।

কিন্তু তবু একদিন এই বিশ্বাসে ভাঙন ধরলো। এফ বী আই জুডির গতিবিধির উপর নজর রাখতে লাগলো। জুডির বাড়ীর টেলিফোন ট্যাপ করা হলো এবং আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড করা সুরু হলো।

জুডির সঙ্গে রাশিয়ানদের যোগাযোগ আছে এ খবরটা প্রথম পাওয়া গেলো সি আই এর কাউন্টার স্পাই ম্যাট সেটিফের কাছ থেকে। মত্ত অবস্থায় ম্যাট সেটিফ বললে যে, জুডি কপলন রাশিয়ানদের স্পাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির এক মেয়ে কমরেড তাকে এই খবর দিয়েছে। এফ বী আই অবশ্যি প্রথমে ম্যাট সেটিফের কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ হাজার হোক ম্যাট সেটিফ হলো কাউন্টার স্পাই। ওর কথার কী মূল্য আছে। তবু ম্যাট সেটিফের অভিযোগ এফ বী আই উড়িয়ে দিতে পারল না। জুডি কপলনের উপর নজর রাখতে লাগলো। জুডি কপলনের দপ্তরে এবং বাড়ীতে মাইক্রোফোন বসানো হলো। তার আলাপ-আলোচনা সবই টেপ রেকর্ড করা হতো।

একদিন জুডি কপলন তার ঘরে বসে একটি গোপনীয় রিপোর্ট পড়ছে। এমনি সময় সহকর্মী উইলিয়াম ফোলে তার ঘরে এসে ঢুকলো। ফোলে অবশ্যি তখনও টের পায়নি যে জুডি কপলনের উপর এফ বী আই নজর রাখছে।

কী পড়ছো জুডি?—ফোলে জুডিকে মনোযোগ সহকারে পড়তে দেখে প্রশ্ন করে।

কম্যুনিষ্ট স্পাইদের রিপোর্ট—জুডি কপলন জবাব দেয়।

হেসে ফোলে বলে: হালে আমার কাছে এই বিষয়ের উপর আর একটি রিপোর্ট এসেছে। সেই রিপোর্টটি এর চাইতে ইণ্টারেষ্টিং।

জুডি কৌতূহলী এবং সবকিছুই জানবার তার অপরিসীম আগ্রহ। তাই জিজ্ঞেস করলে: ...রিপোর্টটা পড়তে পারি কী?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে ফোলে একটু দ্বিধা বোধ করে। তাই একটু সঙ্কোচের কণ্ঠে বলে: রিপোর্টটি বিশেষ গোপনীয়। একেবারে টপ-সিক্রেট।

পরের দিন ফোলের মনিব পেটন ফোর্ড ফোলেকে তার ঘরে ডাকলেন। কারণ জুডি এবং ফোলের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু তার অজানা নেই। কর্তা ফোলেকে বললেন, জুডি রাশিয়ানদের সঙ্গে বড্ডো বেশী মাখামাখি করছে। ওকে কোন সিক্রেট বা টপ সিক্রেট কাগজ দেখিও না। আর শুধু তাই নয়। সুযোগ মিললেই জুডি কপলনকে সিক্রেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সরিয়ে দাও।

জুডির সঙ্গে রাশিয়ানদের বন্ধুত্ব আছে এখবরটা শুনে ফোলে রেগে কাঁই। কর্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজাগেলো জুডির ঘরে। তার হাত থেকে সিক্রেট ড্রয়ারের চাবি ছিনিয়ে নিলো। বললে: আজ থেকে এই ড্রয়ার তুমি ব্যবহার করতে পারবে না।

ফোলের ব্যবহারে জুডি ভারী দুঃখিত হলো। কিন্তু বলবার কিছু নেই। কারণ ফোলে তার মনিব। জুডি কিন্তু তখনও টের পায়নি যে এফ বী আই তাকে সন্দেহ করছে। কোন অন্যায় তো সে করেনি। তাই একটু প্রতিবাদের কণ্ঠেই বলে: ফোলে, এ তোমার ভারী অন্যায়। আমার কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নেয়া ঠিক হয়নি।

বিদ্রূপের কণ্ঠে ফোলে জবাব দেয়: তোমার মতো পলিটি-ক্যাল এনালিষ্টের আমাদেব প্রয়োজন নেই।

এবার একটু হতাশ হয়েই জুডি কপলন জবাব দেয়, বেশ, তাহলে আমি অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করি।

যদিও জুডি কপলনের কাছ থেকে সিক্রেট ড্রয়ারের চাবি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো, জুডি তার সহকর্মীদের কাছ থেকে সিক্রেট কাগজপত্র চেয়ে পড়তে লাগলো।

একদিন জুডি গেলো ফোলের সেক্রেটারী মিস ম্যাককীনের কাছে। মিস ম্যাককীনকে জুডি বললে: প্রায়ই বিশেষ জরুরী কাজে আমার অনেক ফাইলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ফোলে তখন থাকেন দপ্তরের বাইরে। তাঁর সিক্রেট ড্রয়ারের চাবি কোথায় রাখেন বলতে পারো?

(আগামীবার সমাপ্য)

সৌরীন্দ্রমোহন স্মরণে

শ্রীবাউল দাশ

সুদূর দেশের শুভ আহ্বানে—শীর্ষে হানিয়া বাজ,
অন্তবিহীন পথের যাত্রী ! চলিলে একাকী আজ !
চিরতন্দ্রার স্নিগ্ধ-অঙ্কে, ওগো স্নেহ-অবতার,
লভিলে শান্তি, আজিকে বাংলা করিয়া অন্ধকার !
তোমার প্রয়াণে হে প্রিয় লেখক মর্ম বিদরি যায়,
মুখর কণ্ঠ, রুদ্ধ হৃদয় আজি বড় বেদনায় ।
চিরজীবনের লভিতে মুক্তি চলিছ সুদূর দেশে,
মৃত্যু-রাজার কঠিন হাতের পরশ লভিছ হেসে ।

ঐ শোন ওঠে হাহাকার ধ্বনি কাঁদে তব পরিজন,—
করুণ দীর্ঘ নিশাসে ক্ষুভিয়া ওঠে নভ সমীরণ ।
বিজন পথের নবীন পান্থ !   কথা কও কথা ক'ও,
বারেক ফিরিয়া ব্যথাতুর সবে বুক মাঝে তুলে লও ।
বৃথা ক্রন্দন, বৃথা আঁখিজল, বৃথা এই অনুরোধ
আর কি ফিরিবে সে ভুবন হতে কাঁদিলে জনম শোধ ?
যে পথে চলেছ সে পথ কোথায়, কোথায় অন্ত তার ?
পৌছেনি সেথা অশ্রু উৎস মর্মের হাহাকার ?

ঘুমাও ঘুমাও চিরশান্তির মাধবী কুঞ্জবনে,
জাগাবনা আর তোমার ও তন্দ্রা রোদন গুঞ্জরণে ।
যেথায় শান্তি, যেথায় বিরাজে চিরনন্দন গন্ধ,
রচ গো আসন সে পূতকুঞ্জে, যেথায় সচ্চিদানন্দ ।
তোমার আত্মা লভুক শান্তি লভুক মধুর সুপ্তি ;
অলকনন্দা তটিনী তীর্থ-সলিলে লভুক মুক্তি ।
তোমার চরণ পূজিতে আমার এনেছি অর্ঘ্য তুচ্ছ
লহ শেষ পূজা আঁখি জলে স্নাত কানন-কুসুমগুচ্ছ ।

সংবাদ-বিচিত্রা

লুপ্ত জীবের পুনর্জন্ম

টারপান ও অরোক্স নামে ইওরোপের একজাতীয় বুনো ঘোড়া ও এক-ধরণের গরুর পূর্বপুরুষরা এই পৃথিবী থেকে বহুদিন আগেই লোপ পেয়েছে। অথচ মিউনিখের বিখ্যাত হেলাব্রুন পশুশালায় গেলে এদের আবার দেখতে পাবে। এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হয়েছে মিউনিখের পশুশালার ডিরেক্টর সুবিখ্যাত পশু-বিজ্ঞানী হাইঞ্জ হেকের অক্লান্ত চেষ্টায়। পুরাতন পুঁথিপত্র ঘেঁটে, ওদের আকৃতি ও বিবরণ সংগ্রহ ক'রে, একালের কয়েকটি সমগোত্রীয় চরিত্রের পশুর মধ্যে ক্রমাগত বর্ণসংকর প্রজনন ঘটিয়ে তিনি ঐ লুপ্ত জীব দুটির পূর্বপুরুষ সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তিনি বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কয়েক শতাব্দী বিপরীত ধারায় চালিয়ে নিয়ে গেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় দুশো বছর আগে আঁকা টারপানের প্রতিকৃতি ও তার পাশে বর্ণসংকর প্রজনন পদ্ধতিতে সৃষ্টি মিউনিখ পশুশালার টারপান।

ক্ষত-চিকিৎসায় আঠা

ক্ষত-চিকিৎসার জন্য হামবুর্গের শল্যচিকিৎসক ম্যাক্স গিবেল এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ক্ষতস্থানে তিনি অ্যাক্রিলিক থেকে তৈরী আঠা লাগিয়ে দেন, যেটি আলো হাওয়া

লেগে জুড়ে যায়। এই আঠা ক্ষতস্থানে এমনভাবে আটকে ধরে যে তেল কিংবা জল লেগে উঠে যায় না। এই আঠা জীবাণু-রোধক এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শরীরের জীবন্ত তন্তুর সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে যায়, অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষতও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। ক্ষতস্থান সেলাই না করে এই আঠা দিয়ে জুড়লে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতের কোন দাগ থাকে না। এই পদ্ধতির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে ডাক্তার গিবেল আরও স্থিতিস্থাপক আঠার সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন।

মহাকাশের সঙ্গীত ধারাক্ষম বিশাল কর্ণ
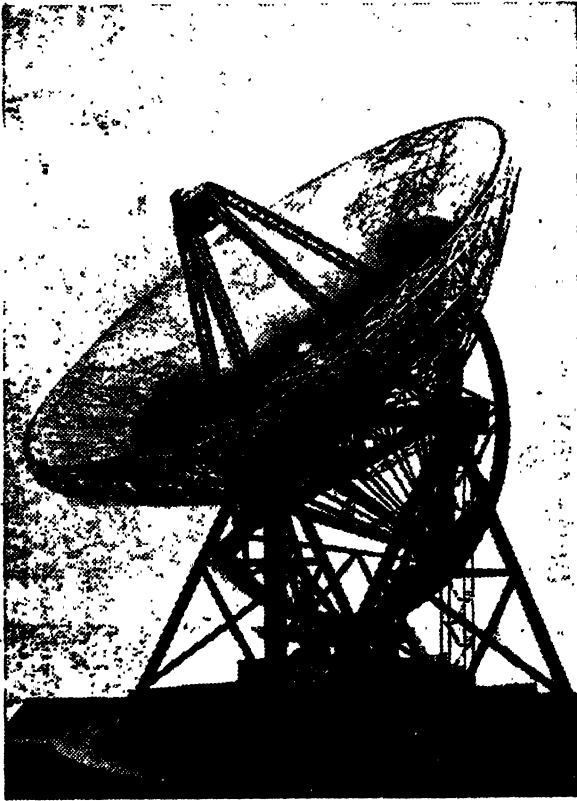
সংবাদে প্রকাশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্পূর্ণ চলন্ত রেডিও টেলিস্কোপ অতি শীঘ্র পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনের নিকটে তৈরী হবে। ছবিতে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-বিজ্ঞান বিভাগে নির্মিত ঐ জিনিসটির একটি মডেল দেখা যাচ্ছে। এই বিশাল মহাকাশ কর্ণ বহুদূরে অবস্থিত নক্ষত্রগুলি থেকে প্রেরিত বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণ করতে পারবে যা একক যে কোন সাধারণ টেলি-স্কোপের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। যেদিকে খুশি আবর্তন যোগ্য এই টেলিস্কোপের অবতল (concave) এরিয়ালের ব্যাস নব্বই মিটার বা তদূর্ধ। মুক্ত এরিয়াল সমেত এই যন্ত্রটির গতিশীল অংশগুলির ওজন হবে দেড় হাজার টন। যন্ত্রটি নির্মাণের পর জার্মান বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও বিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন তথ্যাদি জানতে পারবেন।

সৌরীন্দ্র-স্মরণে

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৩-১৯২৪ সাল। আমরা তখন ডিহির-অন-শোনে। বাবা (শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বদলী হয়ে এসেছেন, সুদূর রাজপুতানা থেকে। হঠাৎ একদিন বাবা এসে বল্লেন, পাশের বাড়ীতে লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখার্জি এসেছেন। আমরা থাকি তখন বড়ুয়া বাংলোতে। পাশে "Retreat" নামে একটি বাড়ীতে এসেছেন। আমরা তখন খুব ছোট। আমি আর আমার ছোট বোন আনিলা। সৌরেনবাবুর সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী আর রমি, সুজাতা সুপ্রিয়া প্রভৃতি। পমিও বোধ হয় সঙ্গে ছিল। নাট্যমন্দিরে বাবার সম্বন্ধী সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অত্যন্ত স্নেহভাজন; তাঁর মারফতই বাবার পরিচয় এবং সেখান থেকেই পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। সেই সময় বাবা 'নাচঘর' নিতেন। একদিন শিশির-কুমার তাঁর নাট্যমন্দিরের আড্ডায় সৌরীন্দ্রমোহনকে বল্লেন—আমাদের মণিবাবু সনৎকুমারের ভগ্নিপতি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী, সব রকম পত্র-পত্রিকা রাখেন, কোনটি বাদ নেই। ইনি 'নাচঘরের' গ্রাহক। সৌরীন্দ্রবাবু বল্লেন, "যখন নাচঘরের গ্রাহক, তখন তো খুব সৌখিনলোক বলতে হবে শিশির!"

এই রকম করেই আমার বাবার সঙ্গে সৌরীনবাবুর পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। তাছাড়া আমার মা শ্রীমতী বিভাদেবী ছিলেন একজন লেখিকা। তাঁর 'জন্মান্তরে', 'মায়ের-ছেলে' প্রভৃতি তখন প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে সৌরেনবাবুর সঙ্গেও মার পরিচয় হয়ে গেছে। তাছাড়া বাবার বন্ধু কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও খুব মাকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'অর্চনা'তে মার লেখা প্রকাশিত হ'ত। তাছাড়া আমার মাসতুতো দাদা ৺মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসতেন লেখার ব্যাপারে মার কাছে।

একদিন সৌরীন্দ্রমোহন আমাদের বাড়ীতে এলেন। বাবার নির্দেশে আমরা তাঁকে প্রণাম করলুম। রমি (শ্রীসৌম্যেন্দ্র) যদিও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তাহলেও আমার ও আমার বোন অনিলার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। রোজ বিকালে আমরা বাবা, মা, সৌরেনবাবু, রমি, অনিলা, সুজাতা প্রভৃতি বেড়াতে বেরোতুম এবং পথে অনেক গল্প হত।

একদিন সৌরীনবাবু বাবাকে বল্লেন, মণিবাবু,—কিশন, তকুকে 'মৌচাকের' গ্রাহক করে দেন না কেন? আপনি মশায় সাহিত্যানুরাগী, দিদি লেখিকা, এতএব ছেলেদের বাদ দেন কেন? এখন থেকে এরা তৈরী হ'ক। আমাদের সুধীর সরকারের কাগজ। খুব ভাল মাসিক পত্রিকা। আমি নিয়মিত লিখি। ছেলেদের এটি class পত্রিকা। ব্যাস্ ঝটপট 'মৌচাকের' গ্রাহক হয়ে যাওয়া গেল। প্রতিমাসে তখন 'মৌচাক' এলে সে কি আনন্দ!

সেই থেকে আমরা সাহিত্য-বাসরে প্রবেশ করলাম। সৌরেনবাবুকে পরে আমরা মেসোমহাশয় বলতাম। তিনি সেই যে আমাদের হাতেখড়ি করে দিয়ে গেলেন, পরবর্তী জীবনে সেটাই আমাদের সাহিত্য-সাধনার পাথেয় হয়ে রইল। মেসোমহাশয় আমাদের ছোট ছোট রচনা লিখতে দিতেন, দেখিয়ে দিতেন ও ভুল ধরে দিতেন। বলতেন, সব সময়ে সরল পরিষ্কার ভাষায় ভাব ফুটিয়ে তুলবে। সরল ভাষার জুড়ি নেই, এটা মনে রাখবে। ধাঁধা বার হ'ত 'মৌচাকে'। বলতেন, ধাঁধার উত্তর লিখে 'মৌচাকে' পাঠাবে। তাতে সাধারণ জ্ঞান বাড়বে। কোন লেখা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ছোট্ট করে লিখে সুধীর সরকারকে পাঠিয়ে দেবে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি সুধীরবাবুকে তোমাদের কথা বলব।

সেই ১৯২৩ সাল থেকে আমরা মৌচাকের একটানা গ্রাহক ছিলাম। বেশ মনে আছে, একসময় ভবানী ভট্টাচার্যের একটা লেখা মৌচাকে প্রকাশিত হয়, এবং তার সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হয়। আমরা মতামত দিয়ে সম্পাদককে চিঠি দিয়েছিলাম। তখন নয়, এখন অবশ্য ডঃ ভবানী ভট্টাচার্য আমার ভগ্নিপতি। থাকেন নাগপুরে। এছাড়া আমরা মৌচাকের নানা প্রকার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতাম। ক্রমশঃ মৌচাকটি আমাদের বড়ই প্রিয় হয়ে উঠল এবং সেইখান থেকেই আমাদের "মধুদি"র সঙ্গে পরিচয়। মেসোমহাশয় ডিহির-অন-শোন থাকতেই আমাদের নিয়ে, অর্থাৎ কিশন, তকু, অনিলা, রমি, পমি, সুজাতা প্রভৃতিদের নিয়ে একটি গল্প লিখে মৌচাকে পাঠান। ছাপা হলে এবং কাগজ এলে আমাদের কি আনন্দ! গল্পটির নাম আজ আর মনে নেই। কত রকম গল্প বলতেন মেসোমহাশয় সন্ধ্যায়—কখনও তাঁর গৃহে, কখনও বা আমাদের ঘরে। মৌচাক সম্পাদক সুধীর সরকার কি রকম কুকুরকে ভয় করতেন এবং শরৎচন্দ্র যখন কুকুর নিয়ে আসতেন, এইরে বলে সুধীরবাবু তখন টেবিলের ওপরে উঠে বসতেন। এই গল্পটি সরস করে যখন মেসোমহাশয় বলতেন, তখন আমরা খুব হাসতাম। আমাদের বাড়ীতে বিলিতি কুকুর ছিল, তাই এই গল্পের উৎপত্তি। মেসোমহাশয়ের কাছ থেকে আমরা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, ভূদেব মুখুজ্জ্যের সমস্ত গল্প শুনতাম। পরে আমার মার সঙ্গে অনুরূপা দেবী, নিরুপমাদেবীর খুব পরিচয় হয়েছিল মেসোমহাশয়ের মাধ্যমে।

এইখানে আর একটা কথা বলি। সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মাসীমা তখন (মেসোমহাশয়ের স্ত্রী) অন্তঃস্বত্বা—ভরা মাস। তাই বাবা, মা বারণ করেছিলেন রওনা হতে। কিন্তু বিশেষ কাজ থাকায় মেসোমহাশয় থাকতে পারলেন না। বৈকালের গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হলেন। কয়েক স্টেশন পরেই গুঝাণ্ডি (Gujhandi)। সেখানে প্রসব ব্যথা ওঠায় মাসীমারা নেমে পড়েন এবং মেসোমহাশয় স্টেশনে বাবার নাম করায় সেখানকার রেলওয়ের ডাক্তার হরিমোহন বাবু তাঁদের নামিয়ে রেলওয়ে হস্‌পিটালে ভর্তি করে নেন এবং খুব যত্ন করে রাখেন। রাত্রে একটি

মেয়ে হ'ল মাসীমার। এই মেয়েটিই হ'ল প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। সে গুঝাঁণ্ডিতে হয়েছিল বলে ডাক নাম হয় "গজু"। রাত্রে টেলিগ্রাম এলো ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে বাবার কাছে—"যে আপনার বন্ধুর একটি মেয়ে হয়েছে। ভাল আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।"

পরের দিন আমরা সকলে গেলাম গুঝাঁণ্ডিতে দেখতে। মেসোমহাশয় জমিয়ে বসে আছেন ডাক্তারবাবুর আতিথ্য নিয়ে।

বাবা বল্লেন, "কি মশাই, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। বারণ করেছিলাম না ?"

হেসে একটু ছোট করে মেসোমহাশয় বল্লেন "মহাশয়, জোর জুলুম খাটে না।" খুব হাসলেন বাবা। যদিও তখন আমরা এ সবের মর্ম বা রস বুঝতে অপারক ছিলাম।

পরবর্তী জীবনে ২১ বছর বাদে যখন সাহিত্যে প্রবেশ করি এবং নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে লেখা প্রকাশ হতে থাকে, তখন সৌরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। মৌচাকেও লিখি গুপ্তচরের আধিপত্য নিয়ে। বিশু মুখোপাধ্যায় তা সাগ্রহে প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "মৌচাকের গ্রাহক হয়েছিলে বলেই তো সাহিত্য-জগৎ চিনতে পারলে।" তিনি আমার একটি কবিতা ও গল্প বসুমতীতে ছাপিয়ে ছিলেন এবং সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন মাসিক 'পরাগে' আমার মাসতুতো দাদা ৺মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যোগদান করি, তখন একাধিকার মেসোমহাশয়ের গল্পের প্রুফ দেখে দিতে হয়েছে। তাঁর হাতের লেখা ছিল বড় অস্পষ্ট, বড় খারাপ। একদিন 'পরাগ' অফিসে এসে বকাবকি করাতে বল্লাম, আপনার হাতের লেখা পড়তে পারিনি তো কি করব ?

উত্তর দিলেন, "তুমি বাবু কখনও ভাল সম্পাদক হতে পারবে না।' সঙ্গে সঙ্গে মণিদা উত্তর দিলেন,—"আপনার হাতের লেখা খারাপ আর দোষ হ'ল অজিতের।"

হাসতে লাগলেন।

শ্রীরঙ্গমে এর পর নানা অনুষ্ঠানে মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। মধ্যে মধ্যে বেণীনন্দন ষ্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতেও যেতুম লেখা নিতে। কিন্তু মৌচাকের মাধ্যমে আমাদের আত্মপ্রকাশও তাঁর সেই কথা, "সরল ভাষায় লেখা আর ভাব প্রকাশ করা এর মার নেই, এই কথা সব সময়ে মনে রাখবে।" সেটা আজও ভুলিনি।

আজ তাঁর তিরোধানে আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি। স্মরণ করি, প্রণাম করি তাঁর আত্মার উদ্দেশে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে 'ভারতী' গ্রুপের শেষ প্রতিনিধির, তথা এক যুগের অবসান হ'ল।

বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

জ্যৈষ্ঠের 'মৌচাক'-এর খেলাধূলার পাতায় লিখেছিলুম ক্লে বনাম হেনরী কুপারের মধ্যে লড়াইয়ে কে জেতেন জানার জন্যে আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলুম। এখন জানা গেছে, ক্লে ও কুপারের হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে ক্লে জয়ী হয়ে তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-

শিপের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ব্রিটিশ মুষ্টিযোদ্ধা হেনরী কুপার এবং নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লের মধ্যে বিশ্ব খেতাব অর্জনের এই লড়াইকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে লণ্ডনে ক্লে ও কুপাপের মধ্যে এক মুষ্টিযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু সেটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই ছিল না। ক্লে তখন বিশ্ব খেতাব অর্জন করেন নি। কুপার তখন ছিলেন ব্রিটিশ এবং এম্পায়ারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, যে খেতাব কুপারের আজও অক্ষুণ্ন আছে। ১৯৬৩ সালের সেই লড়াইয়ের চতুর্থ রাউণ্ডে কুপারের বাঁ হাতের প্রচণ্ড হুকে ক্লে ক্যানভাসের ওপর পড়ে গিয়ে নক আউট হবার উপক্রম হয়েছিলেন, কিন্তু যা হোক করে সামলে ওঠেন এবং পঞ্চম রাউণ্ডে কুপারকে হারিয়ে দেন। কুপারের বাঁ চোখের ওপরে একটা পুরনো ক্ষত ছিল। ক্লের ঘুষির আঘাতে সেই জায়গাটা আবার ফেটে গিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরতে থাকায় রেফারী মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে ক্লেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৬৩ সেই লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে অনেকে আশা করেছিলেন কুপার ক্লেকে হারিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের মুখ উজ্জ্বল করবেন। কিন্তু এবারের লড়াই ঠিক আগের লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। তফাত আগের লড়াই শেষ হয়েছিল পঞ্চম রাউণ্ডে, এবার হল ষষ্ঠ রাউণ্ডে। পনেরো রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের ষষ্ঠ রাউণ্ড আরম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্লে কুপারের মুখে ডান হাতের এক প্রচণ্ড ঘুষি চালান। দেখা যায়, সেই বাঁ চোখের পাশের ক্ষত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। রক্তাক্ত দেহে কুপার প্রত্যাঘাতের জন্যে এগিয়ে যান। ক্লে অসহায় কুপারের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানলে রেফারী লড়াই বন্ধ করে ক্লেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

আর্সেন্যাল ফুটবল স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার জন্যে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ কি ছ' সপ্তাহ পরে আবার ক্লে চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটের জন্যে প্রস্তুত হবেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন কার্ল মিণ্ডেন বার্জার অথবা আর্নি টেরেল। দেখা যাক কার সঙ্গে ক্লের পঞ্চম লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলে এবং সে লড়াইয়ে কে জেতেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর ক্রিকেট খেলা

আগামী শীতকালে বিখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে খেলতে আসবে। এবারেই (১৯৬৫-৬৬ খৃঃ) শীতে এদের ভারতবর্ষে আসার কথা ছিল, কিন্তু এই দলটি এত টাকা চেয়ে বসল যে, এই ক্রিকেট খেলা বাতিল করে দিতে হ'ল। ৫।৬ টি টেস্ট ও কয়েকটি সাধারণ খেলার জন্য এই দল ৩৬,০০০ পাউণ্ড চেয়ে বসল। বৈদেশিক মুদ্রা-বিভ্রাটের জন্য আমাদের এত

টাকা দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না ; তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতবর্ষে আগমন বাতিল হয়ে গেল। এবারেও, ভারতবর্ষে খেলতে আসার কথা উঠল, ঠিক হ'ল যে তাঁরা মাত্র তিনটি টেস্ট খেলা ও কয়েকটি খুচরো খেলা খেলবেন। এই খেলা কয়টিতে তাঁদের মোট দেওয়া হবে ১৮,০০০ পাউণ্ড। এখন আপাতত এইরূপ খেলাই ঠিক হয়ে আছে।

বেটন কাপ

এবার বেটন কাপের ফাইন্যালে দুটো বাইরের দল পাঞ্জাব পুলিস এবং কোর অব সিগন্যালের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পাঞ্জাব পুলিসের সর্বপ্রথম বেটন কাপ জয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবার বেটনে বাইরের দলের সংখ্যা ছিল প্রচুর। শুধু ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—কোয়ার্টার ফাইন্যালের আটটা দলের ভেতর সাতটা ছিল বাইরের দল—কোয়ার্টার ফাইন্যালে কলকাতার দলগুলোর ভেতর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গতবারের যুগ্ম বিজয়ী মোহনবাগান যে শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইন্যালে পাঞ্জাব পুলিসের কাছে হেরে যায়। বাইরের দলগুলোর ভেতর উত্তর প্রদেশ একাদশ, সেণ্ট্রাল রেল, সাদার্ণ রেল, বোম্বাই ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ, আর্মি সার্ভিস কোর, ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী, পাঞ্জাব পুলিস প্রভৃতি শক্তিশালী দল হিসাবেই পরিচিত এবং প্রায় সব দলেই কৃতী ও গুণী খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু ইউরোপ সফররত ভারতীয় দলে অনেক গুণী খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে অনেক দলই তাদের পুরো শক্তি নিয়ে বেটনে খেলতে পারে নি। তবু কলকাতার দলগুলোর বিরুদ্ধে তাদের প্রাধান্যের পরিচয় প্রশংসা করার মতন। অবশ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে কোনো দলই এবার তেমন ভালো খেলতে পারেনি এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে বোম্বাই ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ ও বি. এন. রেল দলের খেলাটা ছাড়া বাকী খেলাগুলোর ভেতর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতারও তেমন আভাস মেলেনি। এই খেলাটাকে এবারে বেটনের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলা বলা যায়।

খেলার ধারা অনুযায়ী পাঞ্জাব পুলিসের বেটন কাপ জয় অবশ্যই কৃতিত্বের। দলটি নিজেদের ভেতর বল দেওয়া-নেওয়া করে খেলার চেষ্টা করেছে, আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধেও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য পরাজিত কোর অব সিগন্যালও পরপর তিন বছর আগা খাঁ কাপ বিজয়ী শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসের সঙ্গে প্রায় সমানে প্রতিদ্বান্দ্বতা চালিয়ে হার স্বীকার করেছে। তাদের রাইট আউট সুরিন্দার সিং স্টিক চালনার কৌশলে, উন্নত পদ্ধতিতে আক্রমণ রচনা করার কৃতিত্বে ফাইন্যালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিশেষ পুরস্কার পান।

এশিয়ান যুব ফুটবল

ম্যানিলায় অষ্টম এশিয়ান যুব ফুটবলে ইজরায়েল এবং বর্মা যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। নির্দিষ্ট সত্তর মিনিটের ফাইন্যাল খেলায় দু' দল একটা করে গোল করায় অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট খেলানো হয়। অতিরিক্ত সময়ে আর কোনো গোল না হলে দু'দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

এশিয়ান যুব ফুটবলে ইজরাইলের এটা পরপর তৃতীয়বার জয়ের সম্মান, যদিও দু'বার যুগ্ম জয়ের হিসেবে। ১৯৬৪ সালে সাইগনে আয়োজিত ষষ্ঠ যুব ফুটবলের ফাইন্যালেও ইজরাইল ও বর্মার খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয় এবং দু' দল যুগ্মভাবে বিজয়ীর সম্মান পায়। এবারের অনুষ্ঠানে বারোটা দেশ অংশ নিয়েছিল।

লীগ প্রথার গ্রুপের খেলায় সিঙ্গাপুর, সিংহল, জাপান ও ফিলিপাইন এই চারটে দেশ বিদায় নেবার পর কোয়ার্টার ফাইন্যালে নক আউট প্রথার খেলায় আটটা দেশ অংশ নেবার সুযোগ পায়।

এই আটটা দেশ: ইজরাইল, বর্মা, তাইল্যাণ্ড, তাইওয়ান চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং মালয়েশিয়া। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভারতকে শক্তিশালী ইজরাইলের কাছে ৪—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়।

পিওনকে ঃ খোকন

শ্রীপ্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

ও ভাই পিওন! এই চিঠিটা যাও-না নিয়ে জামালপুর—
দানাপুরের ট্রেনে চেপে যাও-না ছুটে অনেক দূর।
কি বললে? খামের ওজন বেশী হওয়ায় টিকিট চাই?
হায়রে কপাল! আঁটলে টিকিট বাড়বে যেগো ওজনটাই!
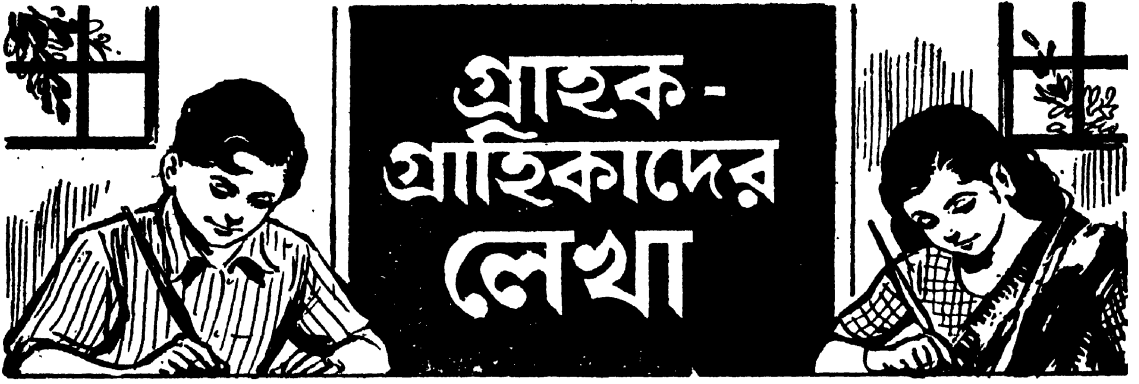
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান প্রসঙ্গে

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যকে ইংলণ্ডের রেনেসাঁস যুগের সহিত তুলনা করা হয়। এই সময় যে সকল সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহিত্যে তাঁহাদের দান অসামান্য। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহাদেরই অন্যতম।

ইনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে ১৮৮৪ সালের ৯ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন সৌরীন্দ্রমোহন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের জীবন অবসান হয়। ১৯০৪ সালে তিনি বি. এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতে সুরু করেন এবং কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য হন। পরে হাই-কোর্টে ওকালতি করেন।

শিশুকাল হইতে ইনি সাহিত্যচর্চা সুরু করেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলা-সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেন প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত যোগাযোগ ছিল।

ইনি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া 'তরণী' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে সরলা দেবীর অনুরোধে ইনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হন। বাংলা-সাহিত্যে বৈকুণ্ঠশর্মা, অপ্রকাশ গুপ্ত, অনর্গল রায় প্রভৃতি ছদ্মনামে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি লেখেন। এঁর পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক।

বাংলা শিশু-সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। শিশুদের জন্য ইনি নানা গল্প, প্রবন্ধ, কিশোর উপন্যাস প্রভৃতি 'মৌচাক' ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত "চালিয়াৎ চন্দর," "লালকুঠি", "মা কালীর খাঁড়া," প্রভৃতি পুস্তক বাংলা শিশু-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। সেরা শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে ১৯৫৯ সালে ইনি 'মৌচাক' পুরস্কার পান।

নাট্যকার হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাত। তাঁহার রচিত কয়েকটি নাটক কলিকাতার

বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

এই বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় গত ১২ই মে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মহান্ সাহিত্যিকের জীবন অবসান হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক অবদান তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমি ভক্তি-বিনম্র প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

শ্রীসত্যশঙ্কর সুর

আমার জয়ন্তী ভ্রমণ

একদিন বাবা অফিস থেকে এসে বললেন, "আমি জয়ন্তীতে টুর-প্রোগ্রাম পেয়েছি, তোমরা যাবে নাকি?" এই কথা শুনে আমি আনন্দে নেচে উঠলাম এবং অধীর আগ্রহে দিন গুণতে লাগলাম।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে জিনিসপত্তর গুছিয়ে আমরা জলপাইগুড়ি ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে শিলিগুড়িতে এলাম। এইখানে আমাদের ট্রেন বদল করতে হ'ল। একটু পরেই গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠল এবং ট্রেন সচল হ'ল। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন চা-বাগানের পাশ দিয়ে যেতে লাগল। এই চা-বাগানগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। যেদিকে দু'চোখ যায়, সে দিকেই চা-বাগান!

দেখতে-দেখতে ট্রেন কত ষ্টেশন পার হয়ে গেল। তারপরে এল তিস্তা নদীর ব্রীজ। এই ব্রীজটি বেশ বড়। কখনো ট্রেন চা-বাগানের পাশ দিয়ে, কখনো বা গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ চারিদিক গাঢ় অন্ধকার হলে শুনলাম যে, ট্রেন টানেলের মধ্য দিয়ে পার হ'ল। একটু পরে আরও একটা টানেল পরুলাম আমরা।

তারপর ট্রেন নানা ষ্টেশন অতিক্রম করে রাজাভাতখাওয়া ষ্টেশনে এল। তখন রাত ন'টা। ষ্টেশনে নেমে শুনলাম যে, যে-ট্রেনটা এখান থেকে জয়ন্তী যাবে, সে ট্রেনটা একটু আগেই চলে গেছে। পরের দিন ভোর পাঁচটার আগে আর ট্রেন নেই। আমরা বিপদে পড়ে ভাবতে লাগলাম কোথায় রাতটা কাটান যায়। অবশেষে সমস্যার সমাধান হ'ল। আমরা একটি কুলি ডেকে ফরেষ্টের বাংলোয় গেলাম। সেখানে চৌকিদার আমাদের জন্য ঘর খুলে দিল এবং আমরা এখানে এসে নিজেদের নিরাপদ মনে করলাম। তারপর আহারাদি সেরে শুতে-শুতে এগারটা বেজে গেল। সারাদিনের ক্লান্তিতে এত ঘুম পেয়েছিল যে, শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালবেলা বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে গাড়ী করে জয়ন্তীর পথে রওনা

রথযাত্রা

ভোর থেকে আজ কাজরাপাড়ায়
বাজছে সানাই ঢাক।
রথের মেলা বসছে সেথা,
ভীষণ জঁাক-জমাক।

পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
আনন্দেতে তাই,
যে-যার সাথী খুঁজছে তারা
চোখেতে ঘুম নাই।

আম-কাঁঠালে ভর্তি মেলা
আরও কত কি,
মাটির পুতুল, খেলনা, খাবার,
সাজায় দোকানি।

কিনছে সবাই খাচ্ছে সবাই
নাগরদোলায় চলছে চড়াচড়ি ;
গোরা, ভরত আগের থেকে রেডি আছে
টানবে বলে রথের কাতাদড়ি।

শ্রীচিত্ত মাইতি

একটা মধুর স্মৃতি

জানুয়ারী মাসের দুই তারিখে আমরা উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার দেওগড় শহরে বোনভোজনে গিয়েছিলাম, হিরাকুদ ড্যামের স্কুল বাসে। ভোর পাঁচটায় আমি, দিনোমণি, শশি, জ্যোতিষ, হরি এবং আলী তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসে উঠলাম।

আমাদের হিরাকুদ কলোনীর প্রায় পয়ষট্টি-জন লোক ছিল আমাদের দলে। গাড়ী যখন ছাড়ল আমরা সকলেই বলে উঠলাম শাস্ত্রীজী কি জয়, জয়হিন্দ, জয় জোয়ান, জয় কিষাণ!

জ্যোতিষের ছোট ভাই রবি বলতে লাগল, দেখ দেখ দাদা আমগাছগুলি কেমন দৌড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ বল্লে, ধ্যাৎ এ তো আমাদের বাস দৌড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষের বোন কৃষ্ণা বল্লে, দাদা বড় বোকা। বাসের একদম পিছনে বসেছিলাম আমরা। বাসের উইণ্ডস্ক্রিনের নীচেয় একটু জায়গা ভেঙ্গে বেশ বড় একটা ফুটো মত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু করে ঢুকছিল। আমার গায়ে কোট থাকা সত্বেও খুব শীত লাগছিল, তাই মাফলার খুলে কানে জড়িয়ে নিলাম।

যাওয়ার পথে বুড়ারাজার পাহাড়ের শিব মন্দির দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ী ন্যাশানল হাইওয়ে দিয়ে চলছিল। মাঝে মাঝে হর্ণ বাজা, ইঞ্জিনের গোঙানী আর বাতাসের হু হু শব্দ শুনছিলাম।

বড়রমা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে পাহাড়িয়া রাস্তা দিয়ে বড় একটা অজগরের মত চলছিলআমাদের বাস। রাস্তার দু' পাশে লম্বা লম্বা শাল ও সেগুনের গাছ। এ গাছের যেন আর শেষ নেই! শ্যামল চাদর-পরা দূর প্রসারিত বনানী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। পাশেই বৃক্ষ তরুলতা পূর্ণ বিরাট বিরাট পাহাড়শ্রেণী। আমাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে হাজার হাজার বাঁশঝাড় দেখলাম। এ

বাঁশগুলো খুব পাতলা এবং কঞ্চিতে ভরা। আমাদের যশোরের ভাল্‌কো বা তল্‌তা বাঁশের কাছে এ কিছুই না। এদের চেহারা বড় বড় পাট গাছ থেকে কিছু মোটা। আর নাম-না-জানা গাছপালায় ভরা এই বডরমা জঙ্গল।

বডরমা ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসের সামনে আমদের বাস এসে দাঁড়াল। দিনোমণি আর শশি গেল চাল কিনতে।

আমি, হরি আর আলি বসে দেখতে লাগলাম একটি পাঁচ বছরের গ্রাম্য বালককে। তাকে দেখে কতকগুলি কথা আমার জিহ্বার আগে চলে এল: 'বুকে মাটি, হাতে কাঠি, দাঁতে পোকা, দেখতে বোকা।'...

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ভাবলাম যদি একটা বাঘ বা ভাল্লুক দেখতে পাই বড় মজা হয়। তা হ'ল—ছুঁড়াল বা কেঁদো বাঘ দেখলাম একবার মাত্র। সে আমাদের বাস দেখে জঙ্গলের ভিতর লাফিয়ে চলে গেল। আর দেখলাম কতকগুলি বন্য বরাহ আর কয়েকটি শিয়াল।

দেওগড় শহরের মধ্য দিয়ে যখন প্রধানপৎ জলপ্রপাতের কাছে এলাম আমরা, তখন বেলা দশটা। জলপ্রপাতের সামনে একটা সান বাঁধানো জায়গা আছে। ওখান থেকে একশো গজ দূরে রাস্তার পাশে আমাদের আগের ব্যাচের লোকেরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁরা আমাদের জন্য পকৌড়ী ফুলুরী তৈরী করে রেখেছেন। গরমই রয়েছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি, কাজেই আমরা সকলে এক একটা প্লেটে কিছু খেয়ে নিলাম এবং পাশ দিয়ে ঝর্ণার জল বয়ে যাচ্ছিল, পাতার বাটি করে সেখান থেকে জল খেলাম। খুউব ভাল লাগল। মনে মনে ভাবলাম, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মানে মুনি-ঋষিরা বনে বনে থাকতেন, ঝর্ণার জল আর গাছের ফল খেতেন। তাঁদের ছিল না চাল বা আটার সমস্যা। কিন্তু ঐ খেয়েই তাঁরা শত শত হাজার হাজার বছর বেঁচে গেছেন এবং বেদ-বেদান্ত লিখে গেছেন। তাঁদের ব্রহ্মচর্যের প্রতাপে ব্যাঘ্র সিংহ বিড়ালের মত পোষ মেনে তাঁদের কাছে কাছে থাকত, তাঁদের হাতথেকে পাখীরা ফল নিয়ে খেত—আহা কি সুন্দরই না ছিলেন তাঁরা!

আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গেলাম। কোন গ্রুপ প্রধানপৎ জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে একদম পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে উঠল, কোন একটা গ্রুপ জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আমাদের গ্রুপে ছিল মাত্র আটজন। আমার সঙ্গে একটি বক্স-ক্যামেরা ছিল। কোডাক বক্স-ক্যামেরা "ই" মডেল। আমার বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। সিক্স-টোয়েন্টি ফিল্ম আমার ক্যামেরায় ফিট হয়, কিন্তু আমার এক বন্ধু সম্বলপুর থেকে একটা ওয়ান-টোয়েন্টি ফিল্ম কিনে এনেছিল। সে আশা দিয়ে বল্লে, মনে হয় ফিট হয়ে যাবে।

বেলা দেড়টার সময় আমরা দেওগড় শহরে গেলাম। এ শহরের প্রায় শতকরা

নব্বইটি বাড়ীই রাজাদের। রাজাদের বানানো বিরাট ঘরে বাজার বসেছে। মোটা করে গাঁথনী, কাঠের কড়িকাঠ। কড়িকাঠের মাথার দিকে অনেক জায়গা পচে গেছে। প্রায় প্রতি বিল্ডিং-এ রাজার ভাস্কর্য ও শিল্প-জ্ঞানের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। রাজার প্রাসাদের ওপর বাঘের মূর্তি আছে। উনিশশো পাঁচ খৃষ্টাব্দে নাকি এই সব বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল। এই দেওগড় শহর হল উড়িষ্যার প্রথম শহর যেখানে সর্বপ্রথম বিজলীবাতির প্রবর্তন করা হয়। রাজা এই প্রধানপৎ জলপ্রপাত থেকে হাইড্র ইলেকট্রিক উৎপাদন করে শহরে দেন। রাজার নিজের ওয়াটার ওয়ার্কস্ আছে। এই ঝরনার জল পাইপ দিয়ে শহরে দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্তমানে ডিজেল পাওয়ার হাউস আছে। আবার বন্দুকধারী পুলিশের মূর্তিও আছে। আর আছে মৎস্যকন্যা, গ্রীক ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মূর্তি। তাছাড়া উটপাখী, হাতী, হরিণ প্রভৃতি মূর্তিরও অভাব নেই। রাজার ওপর শ্রদ্ধা বাড়ল। রাজার প্রাসাদের ফটোগ্রাফ তুললাম। প্রধানপৎ জলপ্রপাতের ফটোগ্রাফ তুললাম। আমার এক বন্ধু জলপ্রপাতের ফার্ষ্ট রিজার্ভারে চান করলে, তার ফটো এবং রাজার অপূর্ব ডাক-বাংলোর ফটোও তুললাম। আমাদের ভোজ হ'ল বেলা তিনটেয়। এবার ফেরার পালা। বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাস ছাড়ল। যাওয়া-আসা এই এক শত চল্লিশ মাইল পথ স্মৃতিতে একটা মধুর স্বাক্ষর রেখে দিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র অধিকারী

অদ্ভুত অমর ঘণ্টা

অক্সফোর্ডের মিউজিয়ামে অদ্ভুত একটি ঘণ্টা আছে। একশো কুড়ি বছরের উপর হ'ল এই ঘণ্টাটি বাজছে আর বাজছে। ঘা দেওয়া নয়, ব্যাটারি নয়, কোন ইলেকট্রিকের সঙ্গে সংযোগ নয়, তবু বাজছে আর বাজছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ঘণ্টাটি তৈরী হয়। নির্মাণকাল থেকে বিশ বছর ব্যাপী বাজার বিরাম ছিল না। আশ্চর্য ব্যাপার দেখে ঘণ্টাটিকে অক্সফোর্ডের মিউজিয়মে এনে সাদরে রক্ষা করা হচ্ছে। ঘণ্টাটির মধ্যে এক হাজারের উপর তামার আর কাগজের পাতলা পাত এমন কৌশলে সন্নিবেশিত আছে, তার জন্য রাসায়নিক প্রণালীতে বিরামবিহীন বিদ্যুৎপ্রবাহ অন্তঃসঞ্চারিত হচ্ছে এবং সেই প্রবাহে ঘণ্টার এই বাজন। জ্ঞানী-গুণীরা ঘণ্টার ভবিষ্যৎ বলতে পারেন না। তাঁরা বলেন, কাল হয়ত এই ঘণ্টার বাজা থামাতে পারে, আবার এখনো একশো বছর ঘণ্টা এমনি বাজতে পারে।
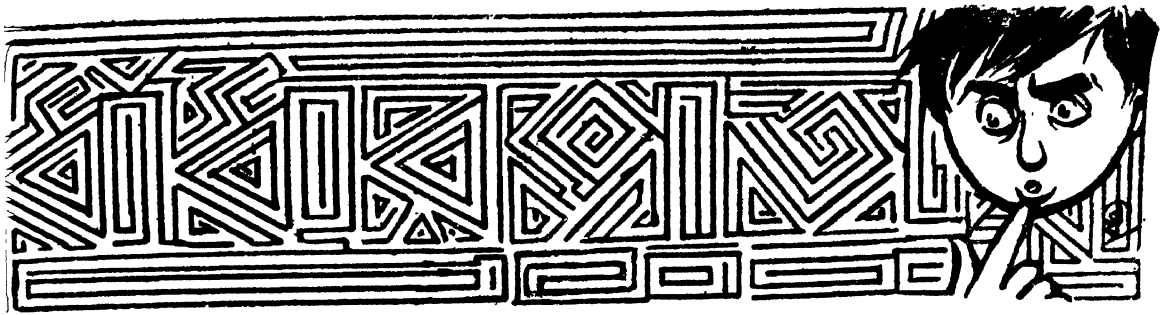
কোন দুটি এক রকম

পাশাপাশি সাজানো এই মূর্তিযুক্ত মুদ্রাগুলি এমনি দেখলে একই রকম মনে হয়, কিন্তু সবগুলি এর একরকম নয়। মাত্র দুটি এক রকম দেখতে। সেই এক রকম দুটিকে তোমরা বার করতে পার কিনা দেখ।

১। চতুষ্পদ আমি কিন্তু জন্তু নাহি হই.
মোর পরে বসে সবে ঘোড়া তবু নই।
কখনো বা হাত থাকে কখনো বা নয়,
পাইতে আমারে সদা সবে ব্যস্ত হয়।

শ্রীভদ্রা সেন (পাটনা)

২। এই (১) চিহ্নিত স্থানে দু'টি অক্ষরের একটি কথা বসাও, এবং (২) চিহ্নিত স্থানে সেইটিকেই উল্টাইয়া বসাও। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নিত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কথা বসাইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুরণ করো। (অ) এই (১) টা (২)। (আ) দশটি (১) (২)। (ই) বা (১) হাতময় (২) মাখিয়াছি। (ঈ) (১) একটা (২) সাপ দেখিয়াছে। (উ) তাহার (১) (২) তো হইয়াছেন। (ঊ) আমি একটি (১) গাছ ও কয়েকটি (২) পুঁতিয়াছি। (ঋ) তাহার মাথার চুল (১) বটে, কিন্তু মাথায় (২) নাই।

শ্রীকমল মজুমদার (দিল্লী)

৩। এক ব্যক্তি ৩০ টাকা দিয়ে ৫টি আংটি তৈরি করিয়ে বিক্রি করতে গেল। সে ক্রেতাদের বললে, এক থেকে ত্রিশ টাকার মধ্যে যত টাকার আংটি চাইবে, আমি ততো টাকার আংটি দিতে পারব। প্রত্যেকটি আংটির মূল্য কত বলতে পার ?

শ্রীহরিপ্রিয় ভৌমিক (কটক)

৪। বাণে বাণে যোগ করি যত লেখা হয়,
হরণ করেন তার বন্ধু মহাশয়।
চন্দ্রবাবু এসে কন, ভয় কি আছে আর ;
কোন্ ইন্দ্রিয় হয় সে বলতো এবার।

শ্রীপুষ্প ঘটক (কলিকাতা)

৫। পিতৃজামাতার শত্রু হয় যেই জন,
ময়ুর তাহার রাজ্য করিলে দহন ;
সেই গন্ধ পশে যদি স্বর্গের ভিতর
মহাতীর্থ স্থান তবে হইবে সত্বর।

শ্রীরাঘবেন্দ্র ভাওয়াল (কালনা)

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। নব
লবন
শালবন
বিশালবন
বিশাল ভবন

২। আগুন

৩। বিছানা

৪। পাহারা

৫। পীপা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ০'৪৫

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৭শ বর্ষ] শ্রাবণ ঃ ১৩৭৩ [৪র্থ সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

মৌচাক করেছে অবাক !
বিচিত্র এ যাদুঘরে
মোমে গড়া মধু-ভরা থাক,
মৌচাক করেছে অবাক !

যারা করে আহরণ
এ মধু-সোনা—
ফুলে ফুলে ক'রে আনাগোনা ;

অশেষ শ্রমের ফলে
দশের মিলিত বলে
গ'ড়ে তোলে এই মধু-চাক,
মধুকর করেছে অবাক !

এ-মৌচাকেতে আছে
রসের খনি,
জ্ঞানের ভাঁড়ার ভরা
উজ্জল মণি ;
মণিকার হেথা রচে
ছোটরা যা-কিছু যাচে ;
কখনো বিস্ময় আর—
লাগে যাতে তাক্,
মৌচাক করেছ অবাক !

মৌমাছি ঢালে হেথা
মিষ্টি মধুর গাথা
গুনগুন গায় মধু গান ;
জানে না অহিত কারো
না ঢালে গরল,
বিতরে শুধুই সুধা—
নেই হাঁকডাক,
মৌমাছি করেছে অবাক !!

— —

ফুলের যাদুকর

শ্রীবিমল দত্ত

সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। একটা অনেক দূরের দেশে থাকতো এক বুড়ো— তার নাম লিংপিং, তার একটা পোষা কুকুর ছিল—তার নাম সং।

লিংপিং আর তার বৌ কুকুরটাকে ভারী ভালবাসতো। তারা কুকুরটাকে সাবান দিয়ে নাইয়ে ধুইয়ে সব সময়ে পরিষ্কার করে রাখত আর ভালভাল জিনিস খাওয়াতো।

একদিন লিংপিং শুনলে সং বাগানে ভীষণ ডাকছে। সে দৌড়ে গেল, ভাবলে বোধহয় সং-এর কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে। গিয়ে দেখে যে, সে একটা গাছের গোড়ায় কেবল সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে— মাটির গাদা হয়ে গেছে, তার মধ্যে কি যেন চক্‌চক্ করছে দেখা গেল।

লিংপিং আর তার বৌ সেখানে গিয়ে দেখে মাটির তলা থেকে সোনার মোহর বেরুচ্ছে। তখন তিনজনে মাটি খুঁড়ে এক বস্তা সোনার মোহর পেয়ে গেল।

লিংপিং আর তার বৌ তো টাকাগুলো নিয়ে সিন্ধুকে ভরে ফেললো। লিংপিং-এর হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ। সে এখন মস্ত ধনী। তাকে এখন পায় কে?

পাশের বাড়ীতে থাকতো দুটো বদ্‌মায়েস্ তিরিক্ষি মেজাজের বুড়ো-বুড়ী—তারা কেমন করে সব ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল। একদিন তারা এলো লিংপিং-এর বাড়ী।

তারা লিংপিংকে বললে, "ভাই, তোমার কুকুরটাকে কিছুক্ষণের জন্যে দেবে?"

লিংপিং এতে একটু অবাক হ'ল। কিন্তু সে ছিল খুব অমায়িক প্রকৃতির লোক। তাই বললে, "বেশ তো, যদি তোমাদের কোন কাজে লাগে তো ওকে নিয়ে যাও।"

সং-কে নিয়ে তারা তাদের বাগানে গেল। একটা গাছের তলায় সং-এর মুখটা চেপে, তারা তাকে বললে, "নে মাটি খোঁড়—।" সং কিছু মাটি খুঁড়লো—কালো কালো মাটি, কিন্তু তাতে মোহর-টোহর কিচ্ছু নেই। তখন তারা বেত দিয়ে সংকে পেটাতে আর বলতে লাগল, "ব্যাটা তুই লিংপিং-এর বাগানে মাটি খুঁড়ে সোনা তুলিস্ আর আমাদের বাগানে কালো কালো মাটি ছাড়া কিছু তুলতে পারিস্ না?" এই বলে বেদম মারতে মারতে তারা সংকে মেরে ফেললো। তারপর তারা একটা গাছের তলায় গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে রাখল।

ওদিকে লিংপিং যখন কুকুর চাইতে এল তখন তারা বললে, "যে কুকুরটা হঠাৎ মরে গেছে। তাই তারা তাকে একটা গাছের তলায় পুঁতে ফেলেছে।

স্বয়ং রাজা এলেন লিপিং-এর বাড়ী।

লিংপিং খানিক কাঁদল। কুকুরটাবে তারা খুব ভালবাসতো কিনা। তারপর বললে, "ভাই, ঐ গাছটা অমাকে বিক্রী করো—আমাদের কাঠের দরকার।' অনেক টাকা দিয়ে তারা সেই গাছট কিনে নিয়ে এল।

তারপর সেই গাছের গুঁড়ি কেটে তারা করালো একটা কাঠের গামলা। তাতে তারা নানা রকম বীজ পুঁতে দিল সেই বীজ থেকে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ হ'ল। সে ফুল এত সুন্দর যে দেশসুদ্ধ লোক সেগুলো দেখতে এলো।

এ খবরে সেই হিংসুটে বুড়ো গেল বিষম চটে। সে একদিন এসে লিংপিং-কে বললে, "ভাই কাঠের গামলাটা আমাকে কয়েক দিনের জন্যে দেবে ?"

লিংপিং ভাল লোক। কাউকে 'না' বলে না। সে গামলাটা দিয়ে দিল।

তখন সেই হিংসুটে বুড়ো-বুড়ী সেটা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলে।

লিংপিং গামলা চাইতে এসে সব শুনে ভারী মনে কষ্ট পেল। বললে, "ভই, ছাইগুলো দাও তো আমি গাছের গোড়ায় দেব।" এই বলে সে সেই গামলা পোড়া ছাই সব নিয়ে গেল।

লিংপিং-এর বাগানে ছিল একটা চেরী গাছ। সেটা শুকিয়ে গিয়েছিল। লিংপিং কতক ছাই সেই গাছের গোড়ায় দিল। সে-বছর লিংপিং-এর সেই চেরী গাছে যা ফুল ফুট্‌লো তাই দেখতে একদিন সাতঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়ে স্বয়ং রাজা এলেন লিংপিং-এর বাড়ী।

রাজার বাগানের চেরী গাছ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাজা লিংপিং-কে গাড়ী করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন আর তাঁর চেরী গাছটা দেখালেন। লিংপিং কিছু ছাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। সে সেগুলো আবার চেরী গাছের গোড়ায় দিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে রাজার বাগান আলো করে চেরী ফুট্‌লো। রাজা খুব খুশী হয়ে লিংপিং-কে রাজসভায় এক সম্মানের আসন দিলেন।

ওদিকে হিংস্থটে বুড়ো এ খবর পেয়ে তার বাড়ীর যত গাছপালা ছিল সব পুড়িয়ে ছাই করে দেশময় প্রচার করে দিলে যে সেও গাছে ফুল ফোটাতে পারে।

রাজা একদিন তাকে ডেকে আনলেন। তাঁর বাগানে নাগকেশর আর কণকচাঁপা গাছে ফুল ফুটছিল না। সেই গাছে ফুল ফোটাবার জন্যে সেই হিংস্থটে লোকটার উপর ভার দিলেন। লোকটা ঠেলাগাড়ী ভরে ছাই এনে রাজার বাগানে ঢালতে লাগল। বাগানটা নোংরা বিশ্রী হয়ে গেল। গাছগুলোয় ফুল তো ফুটলোই না, উলটে গাছগুলো গেল শুকিয়ে। তার উপর ছাই উড়ে রাজার নাকে ঢুকে রাজার হ'ল বেজায় অসুখ। রাজা চটে গিয়ে হিংস্থটে বুড়োটাকে আর তার স্ত্রীকে রাজ্য থেকে দিলেন তাড়িয়ে।

লিংপিং রাজসভায় রোজ বোসতো। তার কাছে তখনো সেই গামলা পোড়া ছাই ছিল। সে সেই ছাই চিমটি-কেটে তুলে কোন গাছে দিলেই তাতে ফুল ফুট্‌তো। এ তো যে সে ছাই নয়, এ যে তার প্রিয় কুকুর সং-এর কবরের উপর হওয়া গাছের কাঠের ছাই।

লোক লিংপিং-এর নতুন নাম দিলে, "ফুলের যাদুকর"।

শ্রাবণ মাস

শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাস, শ্রাবণ মাস
বৃষ্টি-বাদল সর্বনাশ!

কলকাতাতেই বন্যা বয়
পথ চলা তো সহজ নয়
কোথায় খানা, কোথায় ইট
আছাড় খেলেই ভাঙবে পিঠ।

এই যে দাদা, কোথায় যান?
ছাতার তলায় দেবেন স্থান?
রাস্তা জুড়ে অথৈ জল
সাঁতার কেটেই অফিস চল।

নেইকো ট্রাম, নেইকো বাস
শ্রাবণ মাস—সর্বনাশ!!

বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

কারখানায় লেদ মেসিনে 'টার্নিং' বা 'থ্রেডকাটিং' করতে গেলে অসাবধানতাবশতঃ অনেক লোহার খুব ছোট টুকরো চোখের মধ্যে ঢুকে যায়। এটাকে বের করতে হলে চিকিৎসক ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট বা বৈদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্য নিয়ে থাকেন। যারা ছাতি মেরামত করেন, তাদের ও চুম্বকখণ্ড থাকে—সূঁচটা হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য। এটা তোমরা লক্ষ্য থাকবে হয়ত। এই চুম্বকের কাজই হচ্ছে ক্ষুদ্রায়তন লোহাকে টেনে নিয়ে আসা।

কিন্তু চুম্বক কেবল লোহাকেই টানে—আর কোন ধাতুকে টানে না। কারখানায় পিতলের নিয়েও কাজ করা হয়। এই পিতলের একটা টুকরো যদি চোখে গিয়ে পড়ে তাহলে তাকে রে বের করা যায় ?

সমস্যা।

অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চোখের মধ্যে এলোমেলো ভাবে যদি সেটির সন্ধান করা তা হলে চোখটি নষ্ট হয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত।

তোমরা বলবে—এক্সরে সাহায্যে টুকরোটা কোথায় আছে জেনে নিয়ে—

হাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু তা'তে অসুবিধাও আছে। এই রশ্মির সাহায্যে সন্ধান করতে চোখের মণি ঘোরাফেরার জন্য ঐ পিতলের টুকরোটির কিছু স্থান পরিবর্তন হতে পারে। তখন ঠিক অবস্থিতিটা ধরা মুস্কিল।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা যাঁরা , তাঁদের 'ড্রিল' যন্ত্রের চেয়ে আকারে ছোট এবং তার চেয়ে সূক্ষ্ম এই যন্ত্র। নতুন বাড়া লের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের চেয়েও সরু একটা হুল বেরিয়ে থাকে একটা ছোট্ট চিমটার বাহু দুটির ন থেকে। ওর থেকে পাওয়া যায় মানুষের শ্রুতির সীমানার বাইরে এক অতি উচ্চ গ্রামের ীর শব্দ-তরঙ্গ। এর নাম 'সুপারসোনিক' বা 'আলট্রাসোনিক' শব্দ—অর্থাৎ যে শব্দ যায় না , তার শব্দ-তরঙ্গের প্রতিধ্বনি ঐ চোখের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ঐ যন্ত্রের উপরে ত করে। ২৫ সেন্টিমিটার টেলিভিশান পর্দার মত একটি কম্পন-নিরূপক যন্ত্রে (অসিলোস্কোপ) বনিগুলিদ্বারা সৃষ্ট একটা ছবি ফুটে ওঠে। এই ছবির সাহায্য নিয়ে জেলির মত নরম চোখের র যন্ত্রটি ঢুকিয়ে দিয়ে চিমটার সাহায্যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পিতলের টুকরোটি বের করে আসা যায়। এই যন্ত্রের নাম 'একোলাইন ২০'।

রঞ্জনরশ্মি বা এক্সরে-তে যেমন তার তেজস্ক্রিয়তায় বিপদের আশংকা থাকে না, এই শ্রুতির অগোচর শব্দ যন্ত্রটির কাজেও তেমনি কোন বিপদের আশংকা নেই। শ্রুতির অগোচর শব্দের সৃষ্টি হয় 'ট্র্যান্সডিউসার্স' নামক যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে কম্পনে পরিণত করে। এই কম্পনগুলি হুবহু শব্দ-তরঙ্গের মতই—কেবল তাদের কম্পন-সংখ্যা মানুষের শ্রবণশক্তির বাইরে। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০ হাজার কম্পন বিশিষ্ট শব্দ-তরঙ্গই আমরা শুনতে পাই।

তোমরা ভাবছ—যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না, সে আবার শব্দ হ'ল কি ক'রে! তবে হাঁ, বহু দূরের শব্দ আমরা শুনতে পাই না এটা সত্যি; কিন্তু আমরা না পাই—যারা তার কাছে থাকে তারা তো পায়। কাজেই সে শব্দকে শোনা যায় না এমন কথা বলা যায় কি করে?

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বুঝা যাক।

আমরা যা শুনি তা আসে বাতাসের সাহায্যে। বাতাস না থাকলে আমরা শব্দ শুনতে পেতাম না। তা ছাড়া আমরা শুনি কান দিয়ে; কিন্তু কানেরও শব্দ শোনার একটা সীমা আছে। মশার গুনগুন কি ফিসফিস কথা আমরা শুনতে পাই; কিন্তু তার চেয়ে আস্তে কোন কথা হলে আমরা শুনতে পাই না। পণ্ডিতেরা বলেন, সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০ হাজার কম্পনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গই মানুষের শ্রুতিগোচর হয়। সেকেণ্ডে কুড়ি বারের কম শব্দ-কম্পন হলে আমরা শুনতে পাই না। আবার খুব জোরালো—অর্থাৎ কুড়ি হাজারের বেশি কম্পন হলেও আমরা শুনতে পাই না এবং সে শব্দ আমাদের কানে পীড়াদায়ক হয়।

এই শুনতে না-পাওয়া শব্দকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'সুপারসোনিক' বা 'আলট্রাসোনিক' শব্দ। এই শব্দ তৈরিও করা যায়। একটা সাইরেণের যন্ত্রের মধ্যে—তার মাথার দিকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র করে ঐ সাইরেণের ভিতর খুব ঘন চাপের বাতাস ছেড়ে দিলে বাতাসটা ছিদ্র পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে—তার ফলে সৃষ্টি হবে 'সুপারসোনিক'। বৈদ্যুতিক উপায়েও ওটা তৈরি করা যায়।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ-জাহাজগুলি জার্মানীর 'সাবমেরিণে' সাংঘাতিক রকম ঘায়েল হচ্ছিল। একজন ফরাসী বিজ্ঞানী দেশকে এই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করবার জন্য সাহায্য নিলেন 'সুপারসোনিক' শব্দের। যুদ্ধ-জাহাজের কাছ থেকে জলের ভিতর দিয়ে 'হাইড্রোফোন' যন্ত্র-যোগে এই সুপারসোনিক ছাড়া হ'ত। যদি কোন বস্তুতে বাধা পেয়ে এই শব্দ ফিরে আসত, তা হলে ধরা পড়ত—নিকটেই সাবমেরিণ আছে।

'সুপারসোনিক' শব্দ থেকে উত্তাপও তৈরি হয়েছে। আমরা যে কথা বলি তার মিলিত উত্তাপ-শক্তি বেশি নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, কেউ হাজার বছর ধরে নিরন্তর কথা বললে তার থেকে

াপ হবে, তাতে বড় জোড় এক গেলাস জল গরম হতে পারে। কিন্তু 'সুপারসোনিক' শব্দের াপে পানীয় জল বিশুদ্ধ করা, পশমী কাপড় পরিষ্কার করা এবং আরও কত কি করা হচ্ছে।

লোকে বলে, 'তেলে জলে মিশ খায় না'; 'সুপারসোনিক' কিন্তু তেলের সঙ্গে জলের মিশ ইয়ে দিচ্ছে। কর্পূর প্রভৃতি যে সব জিনিস কখনও জলে সম্পূর্ণ গুলে যায় না, 'সুপারসোনিক' াহায্যে তাও গুলিয়ে দেওয়া চলে।

সম্প্রতি এই 'সুপারসোনিক' সাহায্যে চুম্বকে টেনে আনতে পারে না চোখের মধ্যে এমন ছু পড়লে তা সহজেই বের করা যাচ্ছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এটা একটা পরম লাভ।

মেঘের মেয়ে

ডাঃ ননীলাল দে

আকাশখানি ছেয়েছে আজ ঘন কাজল মেঘে,
ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপন দিয়ে বইছে প্রবল বেগে।
কড়্ কড়া কড়্ ঝরছে এখন বরফ-কণা শিলা,
হাওয়ার মাঝে কুড়োয় ছুটে কেষ্ট, বিষ্টু, ইলা।
ভাবছে ইলা পড়ছে শিলা—করছে ছুটাছুটি,
দু'হাত ভরে আনবে লুটে আনবে মুঠি মুঠি।
চারটি শিলা কুড়িয়ে এনে লোভ সামলে ইলা,
মায়ের হাতে দিয়েই ছোটে—আনবে আরো শিলা।
আর পড়ে না শিলা এবার—ঘুরেই এল মিছে,
মায়ের হাতের শিলাও গ'লে কাণ্ড হ'ল কি যে।
কড়্ কড়া কড়্ পড়বে শিলা, কুড়িয়ে নেবে খুব,
মেঘটা বড় দুষ্টু বেজায় কোথায় দিল ডুব!
ক্ষুব্ধ ইলা বললে মাকে শিলেরা মেঘের মেয়ে
সব বুঝি মা লুকিয়ে গেল, মায়ের কোলে যেয়ে।

কি যে ছাই করি!

শ্রীআভা পাকড়াশী

এক গাঁয়ে এক মোড়ল ছিল। আর ছিল এক ছুতোর আর কুমোর। ছোট্টই গ্রাম। মাত্র ক'ঘর বাসিন্দা। ঐ একটি করে ছুঁতোর আর কুমোরই ঐ গাঁয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

ঐ ছুতোর আর কুমোরে কিন্তু ভীষণ ভাব। একেবারে যাকে বলে হলায়-গলায় ভাব। পাশের গাঁয়ে যদি মেলা হয় তবে দু'জনেই একসঙ্গে যাবে। কেউ কাউকে ফেলে ওরা কোথাও যায় না। সেদিন ঠিক এমনি, দু'জনে মিলেই পাশের গাঁয়ে গেছে সীতাহরণ পালা শুনতে। সকাল থেকে এই যাবার আনন্দে দু'জনে মিলে এতই মজগুল ছিল যে কাজকর্ম কিছুই করেনি। মানে, কুমোরও কলসি গড়েনি আর ছুতোরও খাটিয়া তৈরী করেনি। খাট মানে দড়ির বুনটের খাটিয়া কিন্তু, যাতে সেই হিন্দুস্থানী চাকর-দারোয়ানরা শোয়! দেখনি? তবে এখানে ওগুলো যেমন বস্তির ঘরে আর ফুটপাতে গড়াগড়ি যায়, ওখানে কিন্তু তা নয়। মানে ইউ. পি'র কথা বলছি আর কি! পশ্চিমে ওগুলো একটু ভাল ফ্রেমে আঁটা নেওয়ারে বোনা বা দড়িতে বোনা হয়ে অনায়াসে ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্থান পায়। মানে, ঘরের মধ্যে বা ছাতে শোওয়া হয় ঐ খাটিয়ায়। ঐ ছুতোর কিন্তু বাঁশের ফ্রেমের খাটিয়া তৈরী করে, আর গল্পটা হচ্ছে ঐ পশ্চিমেরই একটি গাঁয়ের। যাক, এখন খাটিয়া পর্ব থাক। কলসি পর্বও থাক।

ওরা তো মজা করে গেছে যাত্রা শুনতে। ওদেশে বলে 'নওটঙ্কি'। সঙ্গে কিছু কিছু নাচও থাকে কিনা! সীতা না নাচলেও সূর্পণখা তো নাচতে পারে? সেই যে লক্ষ্মণ যার নাক কেটে দিয়েছিল!

এদিকে হয়েছে কি, সেই রাত্রে গ্রামে হঠাৎ একটা লোক মরে গেল। এখন তাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে গেলে খাট তো চাই! ছোট্ ছোট্ ছুতোর বাড়ী—ও মা! ছুতোর তো নেই! এমন কি একটি খাটিয়াও তৈরী নেই, কি হবে! আবার আর একজন গিয়েছিল কলসি আনতে, তারাও গিয়ে দেখল কুমোর ভায়াও ভেগেছে! আর তার ঘরে একটা ফুটো কলসিও নেই, আচ্ছা মুস্কিল হ'ল তো! সবাই মিলে ভীষণ চটেমটে গেল মোড়লের কাছে, এদের নামে নালিশ করতে। মোড়লও সব শুনে ভীষণ বিরক্ত হ'ল। সারা গ্রামে তাদের খুঁজতে পাঠান হ'ল। না, কোথাও নেই। একেবারে নো-পাত্তা! তাইতে মোড়ল তো আরও রেগে গেল—ওদের বলে দিল, হোক সকাল, আসুক তারা, এমন মজা দেখাব তখন বুঝবে! ওদের জন্য কিনা গাঁয়ে লোক মরলে তার সৎকার হবে না! ছিঃ ছিঃ!

রইল পড়ে মড়া।

এদিকে সকাল হতে না হতেই ছুতোর আর কুমোর এসে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে মড়ার মত ঘুমোতে শুরু করেছে। লোকগুলো ওদের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে শেষে ভোরের দিকে ঢুলতে শুরু করেছিল, তাই দেখতে পায়নি। কিন্তু এবার স্বয়ং মোড়ল এসে তাদের বাড়ী চড়াও হয়ে টেনে তুলল। তুলে, দিলে খুব বকুনি। বললে, গ্রাম থেকে বার করে দেব। হুঁকো আর জল বন্ধ করে দেব। মানে হ'ল, কুঁয়োর জল নিতে দেবে না। আর কারুর সঙ্গে মিশতে দেবে না। ওরা তো হাউমাউ করে কেঁদেই অস্থির। সবে সারা রাত জেগে সীতার দুঃখ দেখে এসেছে। বলে, আর যা কর তা কর, হুঁকো জল বন্ধ কোর না। সত্যিই আমাদের দোষ হয়ে গেছে, এইবারটি মাফ কর। কি হুকুম তাই বল। যা বলবে তাই করব।

মোড়ল হুকুম দিলে—সারারাত ধরে যদি দু'জনে মিলে গ্রামের বাইরে যাবে, তাহলে নিদেন একটা খাট ছুতোর তুমি তৈরী করে রেখে যাবে, আর কুমোর তুমিও বাপু নিদেনপক্ষে একটা কলসি গড়ে রেখে যাবে। ওরা তো রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, তাই হবে মোড়ল, তাই হবে।

আবার একটা মেলা বসেছে পাশের গাঁয়ে। ছুতোরেরই উৎসাহটা কিছু বেশী। সেই এসে বন্ধুকে খবরটা দিলে। বললে, চল না ভাই কত মজা! নাগরদোলায় দুলব, পাঁপর ভাজা খাব, পুতুলনাচ দেখব, আর তাছাড়া আরও কত মজা আছে। কুমোর একটু ভীতু প্রকৃতির, সে বলল, কিন্তু মোড়ল যদি রাগ করে। তার চেয়ে এসো না-হয় আমি কলসি গড়ি আর তুমি একটা খাট তৈরী কর, তারপর চল সেগুলো মোড়লকে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মেলা দেখতে চলে যাই। তাই হ'ল। কিন্তু মোড়লের বাড়ীতে জিনিস রাখতে গিয়ে তারা মোড়লকে পেল না। সে শহরে ডাক্তার ডাকতে গেছে। তার বৌ-এর খুব অসুখ, সেও বাইরে এলো না। তখন তারা মোড়লের ঘরের বাইরে সেই খাট আর কলসি রেখে দিয়ে মেলা দেখতে চলে গেল। অবশ্য চেঁচিয়ে মোড়লের বৌকে বলেই গেল।

এদিকে মোড়ল গিয়েছিল শহরে হাকিম ডাকতে। তার বৌ-এর তো খুব অসুখ! কিন্তু বাড়ীর সামনে পৌঁছেই দেখল খাট আর কলসি। তাই না দেখেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে একটু দূরে নিজের বোনের বাড়ী চলে গেল। কি করে সে ঐ দৃশ্য সহ্য করবে তাই বল! হাকিমও ঘোড়া থেকে নামাই বৃথা এই মনে করে তাঁর টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেলেন।

সারা মহল্লার, মানে পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল—মোড়ল ভায়ার বৌ মারা গেছে, এ তো আর সোজা কথা নয়! সবাই মিলে হৈ চৈ করে কান্নাকাটি করছে। মোড়লকেও ধরে এনেছে তার বোনের বাড়ী থেকে। সে তো—ও ধন্যুর মা তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো!

ব'লে ভীষণ জোরে চিৎকার করে কাঁদছে। তার ঐ চেঁচানি শুনে তার বৌ ঘর থেকে কোন রকমে উঠে এসে খিঁচিয়ে উঠল—অ্যা, মোলো যা ! চেঁচাচ্ছে দেখ ! হাকিম আনতে গিয়ে এত দেরি, আবার বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচানি ! জানো না আমি উঠতে পারছি না !

চওপ !

প্রথমটা তো সবাই বেশ ভড়কে গিয়েছিল। মড়া বেঁচে উঠল নাকি রে বাবা ! শেষে সেই মোড়লের বৌ ধন্যুর মা-ই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিল। বলল, ঐ খাট আর কলসি রেখে ছুতোর আর কামার গেছে পাশের গাঁয়ে মেলা দেখতে। মোড়ল তো রেগে আগুন ! শুনেই বলল, আসুক ব্যাটারা আজ ! দেখাব না মজা ! মানুষ কে না মরতেই ভূত বানাবে ! ভেবেছে কি ওরা ! এত কষ্ট করে অত দূরে হেঁটে গিয়ে হাকিম ডেকে আনলাম, সেও কিনা ফিরে গেল ! ঘরের দুয়োরে খাট কলসি রেখে কিনা আমার বাড়ীর অকল্যাণ করা !

সকালে ফিরতেই দুই মূর্তি ভীষণ বকুনি খেল। শেষে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করল—তবে আমরা কি করব ? তোমার হুকুমই তো শুনেছি মোড়লমশাই !

চওপ ! তোদের কি আমি আমার বাড়ীর দোর গোড়ায় ওগুলো সাজিয়ে রাখতে বলে-ছিলাম ! হেঁকে ওঠে মোড়ল। শেষে বলে, থাক, খাট-কলসি তৈরী করে রেখে লোকের মরণ এগিয়ে রাখতে হবে না। যাও। খুব বুদ্ধি খাটান হয়েছে ! এবার নিজের ময়লা গামছাটায় একটা ঝটকা দিয়ে কাঁধে ফেলে মোড়ল বলে, কি যে ছাই করি ! মোড়ল হওয়াও কম ঝকমারি নয় ! সে ঘরের ভেতর ঢুকে যায় অসুস্থ বউয়ের কাছে।

ঘুমপাড়ানী গান

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট ছেলে, দুষ্টু ছেলে, কাঁদছো কেন ঘ্যানর ঘ্যানর ?
ঐ ত্যাখোনা পূব আকাশে মেঘ করেছে,
আম বাগানে আমের গায়ে রং ধরেছে।
জবাব দিয়ে কূল পাইনা তোমার 'কেন'র।

প্রশ্ন তোমার অনেক রকম—কৌতূহলের ঘোড়ায় চ'ড়ে
ছুটে বেড়ায় তেপান্তরে দিন-দুপুরে,
ঘরে ফেরে ক্লান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে,
ঘুমিয়ে প'ড়ে এরোপ্লেনের স্বপ্নে ওড়ে।

"এই যে ভারত, সোনার ভারত কেমন ক'রে টুকরো হলো !
বাঙলা কেন দু'ভাগ হলো পূব-পশ্চিম ?
হিন্দু আমি কেন, কেন ও মুস্‌লিম ?
ভাইকে কেন বলতে হবে—ও ভাই তোমার দুয়ার খোলো।"

ছোট্ট ছেলে, দুষ্টু ছেলে, প্রশ্ন তোমার বড়োই কঠিন ;
হার মেনে যান গুরুমশাই জবাব দিতে,
পণ্ডিতেরা ওঠেন ঘেমে দারুণ শীতে,
গোলক ধাঁধায় রাস্তা হারান অনেক প্রবীণ।

ছোট্ট ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো,
জবাব দিতে পারিনা গো—প্রশ্ন তোমার কঠিন বড়ো॥

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাঁটুলের মামী যতই বন্দোবস্ত করুক শেষ অবধি বাঁটুলকে একাই রওনা হতে হ'ল।

তার কারণ বাঁটুলের মামা।

মামীর মোল্লারচকে যাওয়া, পূজো দেওয়া, এ সব হয়তো আসলে বাঁটুলকে সরিয়ে ফেলবার মৎলব—এ রকম একটা ধারণা চরণ গাঙুলীর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিতে লাগল।

তার শুধু মনে হতে লাগল বাঁটুলকে যেতে দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে? চাঁদবদন ভট্‌চাজ ওকে পুষ্যি নেবে, তাকে এত এত টাকা দিয়েছে, এমন সময়ে বাঁটুলকে হাতছাড়া না করলেই হ'ত।

হয়তো হাত পা কেটেকুটে আসবে। নয়তো আঙুলটা থেঁতলে ফেলবে। পুষ্যি দিতে গেলেই পূজো করতে হয়, আর পূজোর নিয়ম বড়ই কড়া। শরীরে খুঁতটুত থাকলে চলবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে চরণ গাঙুলী বাঁটুলের জামাকাপড় কি আছে না আছে দেখছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল কিচ্ছু নেই।

বাঁটুল, পদাই আর রাধীর কাপড়চোপড় বাঁটুলের মামী কেচেকুচে একটা বেতের ডুলিতে রাখে। ডুলিটা নেহাৎ ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

চরণ গাঙুলী দেখলে ধুতি নেই, পিরান নেই, খাগড়াই চাদর দুটো নেই, কিচ্ছু নেই।

'তবে রে!' ব'লে দরজায় কুলুপ এঁটে, ছাতা মাথায় চরণ গাঙুলী হনহনিয়ে রওনা হ'ল।

সে রওনা হ'ল গোরুর গাড়ীতে। মোল্লাচকের দু'চারজন কামলা আঁটুল গাঁয়ে কি কাজে এসেছিল। কামলারা যেমন হাঁটতে পটু, তেমনি দৌড়তে। তারা চরণ গাঙুলীকে দেখে খুব পেন্নাম ঠুকলে। বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন আজ্ঞা? মোল্লাচকে?'

'হ্যাঁ রে!'

কামলারা গোরুর গাড়ীকে এক ক্রোশ পেছনে রেখে মোল্লাচকে এসে উপস্থিত। তারা মামীমার দাদাকে ডেকে বললে, 'ঠাকুর মশায় গো, মোদের জামাইদাদা আসতেছেন। বেদম গোঁসা হয়ে আসছেন মনে হয়, বড় মাছ-টাছ ধরান!'

মামা আসছে এই খবরটি পেয়ে মামীমা আর বাঁটুলকে দেরি করতে দিলে না। কথা ছিল অনেক রাতে যাবে তারা। চুপেচাপে রওনা হবে।

শেষ অবধি কথা হ'ল বাঁটুল একাই যাবে, একেবারে একা।

মোল্লাচক থেকে সেই পশ্চিমে, কানপুরে বাবাকে খুঁজতে যাওয়া খুব সোজা কথা নয়!

আগে যেতে হবে কলকাতা।

ভাগীরথী পেরিয়ে যদি বহরমপুর পৌছতে পার, তাহলে কলকাতা যাওয়া এমন কঠিন নয়। দিব্যি চওড়া রাস্তা রয়েছে, এক সময়ে নবাবরা করেছিল।

তা ছাড়া, এই আঠারোশ' সাতান্নর মধ্যে সায়েবরা আরো কয়েকটা রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদের সুবিধের জন্যে আর কি। কোম্পানীর সৈন্যসামন্ত দমদমায় থাকে, বহরমপুরের ব্যারাকে থাকে, কাশিমবাজারে থাকে।

ধর দেশের অন্যত্র কত জায়গাতেই তো সৈন্য আছে, কোম্পানী তাদের বদলী ক'রে ক'রে দেয়। দমদম থেকে ব্যারাকপুর, ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুর, বহরমপুর থেকে মালদহের ক্যান্টুমেণ্টো—এমনি ঠাঁই থেকে ঠাঁই-এ সৈন্য-সেপাইদের যেতে হয়।

হাজার কয়েক সেপাই, লস্কর, ঘোড়া, মালবওয়া খচ্চর, তাঁবু-বওয়া গোরুর গাড়ী, এ-সব চলবার জন্যে হাঁটা রাস্তাই ভাল, হাঁটা রাস্তাতেই সুবিধে।

নবাবরা অবশ্য ফুরফুরে বাতাস খেতে খেতে বজরা চড়ে ভাগীরথী দিয়ে কলকাতার দিকে যেতেন। সায়েবদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও যায়।

কিন্তু সায়েবরা এখন আর তেমন সৌখীন নেই। আগে কোম্পানীর সায়েবরা নবাবদের ডবল জাঁকজমক করেছে। এখন আর তাদের গোলাপজলে চান করবার, ফুলের আতর মাখবার, রুপোর ছুরিতে সাদোলা, কোহিতুর, লজ্জতবক্স, এই সব নামকরা আম চেখে চেখে খাবার সময় হয় না।

দু'একজন অবশ্য এখনো মুর্শিদাবাদের বালাপোশ গায়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরী তামাক খেতে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁরা দলে নেহাৎই কম।

মামী সব বলে দিলে বাঁটুলকে।

বললে, 'মামাকে তুই তো জানিস। রাগলে পরে করতে পারেনা এমন কাজ নেই। তুই এগিয়ে যা বাবা। ভাগীরথী পেরিয়ে বহরমপুরে তো যা! রাধার ঘাটে, সৈদাবাদে, তোকে বদন ধরে নেবে। ওকে রওনা করে দেব।'

'যদি না পৌঁছতে পারে?'

মামী বললে, 'তাহলে তোকে একাই যেতে হবে।'

'একা যাব?'

'হ্যাঁ বাঁটুল', মামী আস্তে আস্তে বললে, 'যার কেউ থাকে না তাকে ভগবান দেখেন। তোর জন্যে আমি এত এত মানত করে রেখেছি, পুজো দিয়েছি, তোর কোন বিপদ হবে না।'

এখন বাঁটুলের মামীমাকে কেমন যেন ঠাকুর ঠাকুর মনে হতে লাগল। হঠাৎ পদাই আর রাধীর জন্যে মনটা বড্ড কেমন করে উঠল। পইতে হবার আগে অবধি সে আর পদাই একখানা লেপ টানাটানি, ভাগাভাগি করে শুয়েছে। পদাই-এর ভাত খাবার থালা একটুখানি কানা উঁচু।

এর থালাতে ওকে ভাত দিলে আর রক্ষে নেই। অমনি বাঁটুল এতবড় হাঁ করে আজও কেঁদে ফেলে। রাধীর প্রথম দাঁতটা যখন পরে গেল তখন ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে গিয়ে বাঁটুল, পদাই আর রাধী পুকুর পাড়ে চলে গিয়েছিল। কাঁকড়ার গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল বাঁটুল, আর ক'ড়ে আঙুলে কটাস্ কামড় খেয়ে বাঁটুলের যত কান্না, পদাই তার চেয়ে দ্বিগুণ কেঁদেছিল।

এই তো সেদিন, হাবু বলেছিল ও তোর নিজের ভাই নয়, আর হাবুর হাতের দই-এর ভাঁড় পদাই ভেঙে দিয়েছিল।

এখন মনে পড়ল, ছিপগাছটা ঘরের বেড়ায় গোঁজা আছে। নারকেলের মালায় মাটির আংটা লুকোন আছে, এই শক্ত শক্ত মাটির গুলী।

আজকে বাঁটুল কত দূরে যাচ্ছে? কোথায় কানপুর, কোথায় তার বাবা! বাঁটুল বড় বড় ঢোক গিলল।

মামী বললে, 'তোর বাবাকে বলিস আমরাও ঐ সব দেশে পালিয়ে যাব। পদাই লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। তুই পথঘাট দেখে আয়, আমাদের নিয়ে যাবি।'

মামীমার নাকের লাল পাথরটার পাশ দিয়ে মুক্তোর মত জলের ফোঁটা পড়তে লাগল।

মোল্লাচক থেকেই বল বা বহরমপুর থেকেই বল, যেখান থেকেই রওনা হও না কেন, রাধার ঘাটে আসতেই হবে, নইলে তুমি বহরমপুর শহর পাচ্ছ না।

রাধার ঘাটে এসে বাঁটুল অনেকক্ষণ বসে রইলো।

খুব ভাল লাগে তার রাধার ঘাট। কত কত নৌকো, ভাগীরথীতে টুপটুপে জল। মাঝে মাঝে খেয়া-নৌকো করে মানুষ, ছাগল, গাই, বাছুর, জড়াজড়ি ক'রে নদী পার হয়। মাঝে মাঝে খেয়া-ঘাটের মাটি কাটতে হয়, পাড় বাঁধতে হয়।

সে সব কাজ সাঁওতালরা করে। রাধার ঘাটে বসে ওরা দিব্যি ভাত রাঁধে, খায়। এ ওর মাথা আঁচড়ে দেয়, বাচ্চারা চুলোচুলি ঝগড়া করে, আর বাঁটুলদের বয়সী ছেলেরা কুকুর ছানা, পাখীর ছানা, বাঁদর, কাঠবেড়ালী, যাবতীয় পশুপাখী বিক্রি করে বেড়ায়।

এই রাধার ঘাটে বসে বসে বাঁটুল অনেকগুলো হাই তুললে। গায়ে পিরান আছে, চাদর আছে, তবু শীতে হাড় ঠক্‌ঠক্ করছে।

এখন বাঁটুলের মনে পড়ল আগুনের তাপে শরীর গরম হয়। আস্তে আস্তে সে সামনে সন্নেসী ঠাকুরের চালার কাছে গেল। সেখানে মস্ত ধুনী জ্বলছে। কুলকাঠের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে, আর সহজে নেভে না। সেখানে আরো অনেকে বসে আছে, তাপ পোয়াচ্ছে।

বাঁটুল সেখানেই বসে রইল। মামীমার বাপের বাড়ীর সেই সেধো এসে নির্ঘাৎ তাকে খুঁজে নেবে। মামীমা বলেছে তার বুদ্ধি খুব, খুরের মত ধারালো।

সন্নেসী হয়তো আড়ে আড়ে বাঁটুলকেও দেখছিলেন। ছাই মেখে চোখ বুজে থাকলে বলা কঠিন দেখতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। বাঁটুলের মনে হ'ল সন্নেসী চোখ বুজে থাকলেই ভাল। উৎকুণির মেলায় সন্নেসীদের রাঁধা অমন খাসা খিচুড়ীর হাঁড়ি যারা চুরি করেছিল, নৌকায় বসে খেয়েছিল, তাদের মধ্যে তো সে-ই ছিল পাণ্ডা।

তাছাড়া সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেয়েছিল, সন্নেসীদের তো কপালের ভেতরে আর একটা চোখ থাকে, দেবতাদের দেওয়া! হয়তো বাঁটুলের দিকে চাইলেই সব জেনে ফেলবে।

সন্নেসী চাইলেন বটে, তবে বাঁটুলের দিকে নয়। দিব্যি ভিড় জমেছে, গল্প হচ্ছে, হঠাৎ বাঁটুল শুনতে পেল কে যেন এক গপ্পিদাদা পেল্লায় লম্বা লম্বা গপ্প জুড়ে দিয়েছে।

'একে কি আর শীত বলে ভায়া? শীত পড়ে আমার বোনের শ্বশুরবাড়ী উলুবেড়েতে। সেখেনে শীতকালে লোকে কুলপী খায়, আহা জলকুলপী গো!'

'জলকুলপীটা কি বস্তু মশায় ?'

'আহা, হাঁড়ি-কলসিতে রান্নাখাওয়ার জল রইল, পুকুরে চানের জল, সকালে দেখা গেল সব জমে বরফ। আমার বোনের ছেলেপিলে সেই জলকুলপী এক এক টুকরো গালে দিয়ে পাঠশালায় যায়।'

কে যেন বললে, 'উলুবেড়েতে বিদ্যেসাগর যায়নি বোধহয় ?'

'বিদ্যেসাগর ?'

'হ্যাঁ গো! বিদ্যেসাগরের কথা গরম গরম কিনা! হ্যান্ করব, ত্যান্ করব, মেয়েদেব লেখাপড়া শেখাব, বিধবাদের বিয়ে দেব, নিত্যি সত্যি কথা কইব, গুরুকে মান্যি করব! কি বলব মশায়, কলকেতায় আগে শীতকালে আকাশ থেকে কুল্পী পড়ত। বিদ্যেসাগরের কথার গরমে কলকেতা থেকে শীত পালিয়েছে। এখন তো ওখানে আম-কাঁঠাল সব পৌষ মাসেই হয়।'

গপ্পিদাদা তাড়াতাড়ি বললে, 'না না, উলুবেড়েতে বিদ্যেসাগর নেই।'

বাঁটুল এখন কথা না কইলেই পারত। কিন্তু তার নামই হ'ল আঁটুল গাঁয়ের বাঁটুল। তাকে দেখে সবাই বলে ছেলে নয় তো কাঁ্যাকড়াবিছে। হঠাৎ, এইসব বড় বড় মানুষদের মাঝে বসে তার জিভ চুলবুলিয়ে উঠল।

'শীত আজ্ঞে আমার পিসীর বাড়ী কাঁকড়া দাঁড়ায়!' সে বেশ চেঁচিয়ে বলল।

'কাঁকড়া দাঁড়ায় ? কাঁকড়া দাঁড়া কোথায় গো ? ছেলেটা দেখছি ভারী জ্যাটা ? কথার মধ্যে কথা কয় ?'

'আজ্ঞে কাঁকড়া দাঁড়া বর্ধমান জেলায়। বিখ্যাত ডাকাতে জায়গা, নাম শোনেন নি ?'

'না !'

'সেখানে শীতকালে আমরা গিয়েছিলাম। রাতে রীতিমত ঠকাঠক শব্দ। আমরা তো ভেবেছিলাম ভূতটুত এসেছে। পিসীমা পিদীম জ্বেলে দেখিয়ে দিলেন ঘরে যতজনা শুয়ে আছে সকলের শরীরের হাড় শীতের চোটে গরম হবার জন্যে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।'

'বল কি ?'

'আজ্ঞে। হাতের হাড় পেটের মধ্যে নড়ছে, পায়ের মালাইচাকি কানের পেছনে, তাই দেখে আমরা তো ভয়ে সারা। পিসীমা বললেন, এ আর কি শীত! ঘরে আছিস তাই টের পাচ্ছিস না। সকালে দোর খুলে দেখিস্!'

'কি দেখলে ?'

'গাঁয়ে দুটো বজ্জাত ভূত ছিল। নতুন লোক এলেই ভয় দেখানো তাদের অভ্যেস। সকালে দোর খুলে দেখা গেল, ভয়ানক শীতে তারা দু'জনেই মরে গেছে।'

'বটে! মানুষ মরে ভূত হয় আর ভূত মরে কি হয়?'

গপ্পিদাদা একটু রেগেই জিগ্যেস করল।

'ছেলেটার পইতে আছে দেখতে পাচ্ছি। নইলে বেঘোরে ভূতপ্রেত নিয়ে তামাশা করে কবে প্রাণটা হারাত।'

বাঁটুল আর কোন কথা কইলে না। শুধু সন্নেসী খুব খুসী হয়েছে মনে হ'ল। একটা চোখ একটুখানি খুলে বললে, 'ছেলেটার বুদ্ধি আছে। বেশ কথা কয়!'

তারপর কোন সময়ে যেন বাঁটুল ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙল মুখে রোদ লেগে। সকাল বেলা কি রোদ, কি রোদ! চারদিক রোদে ধুয়ে যাচ্ছে। বাঁটুল চেয়ে দেখে রাধার ঘাট সুনসান। এখন শুধু স্নানার্থীদের ভিড়। সকালবেলা সন্নেসী ঠাকুরের আরেক রকম চেহারা। যারা নাইতে আসছে সবাইকে কপালে ছাপ দিয়ে দিচ্ছে, আশীর্বাদ করছে।

কাউকে বলছে, 'তুই রাজা হবি,' কাউকে বলছে, 'তুই রাজার জামাই হবি,' এমন সময়ে একজন কালো, রোগা বুড়ো, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার তাবিজ, সন্নেসীর কাছে এসে বিনবিন করে কি সব বলতে লাগল। ভারী নিচু গলা, তুমি তো সবই জান বাবা, এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু শোনা গেল না।

সন্নেসী বললে, 'চাঁদবদন ভট্‌চাজ! টাকা তো অগুন্‌তি করেছ...'

এইটুকু যেই শুনেছে, সেই বাঁটুল আর নেই! ছুট্, ছুট! একেবারে ছুট্! ছুটতে ছুটতে সেই খড়ের নৌকো। খড়ের নৌকার ও পাশে এক পেল্লায় নৌকো। তাতে চড়ে কয়েকজন মাঝি মাল্লা, লোকজন, একজন মোটাসোটা লোক বসে গোঁফে তা দিচ্ছেন। বাঁটুল তাঁর দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বললে, 'মশায় কোথায় যাবেন?'

'কলকেতা।'

'আমায় যদি পৌঁছে দেন, আমার বাবা বড় অসুস্থ...' বাঁটুল অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল।

'এস।'

বাঁটুলের নৌকো যখন ভেসেছে, তখন দেখা গেল নদীর ধারে সেই মামীমার লোকটি হাত পা নেড়ে বাঁটুলকে খুঁজছে। কিন্তু বাঁটুল ট্যা শব্দটি করলে না। ও বাবা, ওখানে স্বয়ং চাঁদবদন!

(ক্রমশঃ)

টপ-সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিস ম্যাককীন কিন্তু জুডি কপলনকে একটুও সন্দেহ করেন নি। তাই কোন সঙ্কোচ না করে সিক্রেট ড্রয়ারের চাবির জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

কিছুদিন বাদে জুডি আবার ফোলের কাছে গেলো। বললে : আমি জানি তুমি আমাকে সন্দেহ করো। কিন্তু আমার অপরাধটি কী জানিতে চাই।

ফোলে জুডির প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। কোন জবাব দেয় না। কাজেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসে জুডি কপলন। ভাবতে থাকে এর পর কী করা যায়।

প্রতি উইক এণ্ডে জুডি কপলন নিউইয়র্কে বেড়াতে যেতো। এফ বী আই'র গোয়েন্দারা এবার থেকে তার নিউইয়র্কের গতিবিধির উপর নজর রাখতে লাগলো।

১৯৪৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে জুডি কপলন একদিন নিউইয়র্কে এলো। স্টেশন থেকে বাড়ীতে গেলো না। টিউব ট্রেন করে এলো ব্রডওয়ের রাস্তার মোড়ে। সেইখানে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো তার রুশ বন্ধু ভ্যালেনটিনো উইবিচেভ।

তারপর দু'জনে গেলো সামনের একটি রেস্তোরাঁয়। পাশের কামরায় বসে এফ বী আই'র গোয়েন্দারা তাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলো।

খানিক বাদে জুডি কপলন এবং ভ্যালেনটিনো ওইবিচেভ বেরিয়ে পড়লো। এফ বী আই'র কেউরা কিন্তু তাদের পেছনে ধাওয়া করলে। খানিক বাদে দু'জনে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলো এবং এফ বী আই'র গোয়েন্দারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলো।

তারপর আর একদিন শনিবারে। ব্রডওয়ের রাস্তায় জুডি কপলন দাঁড়িয়েছিলো। আজ তার আসতে দেরি হয়েছিলো। কারণ সময়টা ছিলো সন্ধ্যা, বাইরে কনকনে হিমের হাওয়া বইছে। ব্রডওয়ের রাস্তা জুডি হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে সন্ধ্যা সাতটা প্রায় বাজে। ওইবিচেভ নিশ্চয় তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ব্যস্ত হয়ে জুডি রাস্তার একটি লোককে জিজ্ঞেস করলে : ব্রডওয়ের রাস্তাটি কোন দিকে বলতে পারো। আমার সন্ধ্যা সাতটার ভেতর ব্রডওয়েতে পৌছুতে হবে, ডিনার আছে।

রাস্তার লোকটি আর কেউ নন—এফ বী আই'এর একজন গোয়েন্দা। লোকটি হেসে জবাব দেয় : ভয় পাবার কিছু নেই, আমাকেও ব্রডওয়েতে যেতে হবে। ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার আছে।

জুডি কিন্তু এফ বী আই'র গোয়েন্দাটির কথার কোন জবাব দেয় না। কারণ তার মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দাটি এবার জুডিকে ব্রডওয়েতে যাবার রাস্তা বাতলে দিলে।

ওইবিচেভ কিন্তু ঠিক সাতটার সময় ব্রডওয়ের রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো—। প্রায় মিনিট দশেক দেরি করার পর চলে গেলো। আবার এক ঘণ্টা বাদে ফিরে আসবে। এইটে হলো স্পায়িং-এর নিয়ম। নির্দিষ্ট সময়ে যদি ইনফরমার না আসে তবে একঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসতে হবে। ঠিক একঘণ্টা বাদে ওইবিচেভ এসে হাজির। জুডি কপলন তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। দেখা হবার পর কেউ কাউকে সম্ভাষণ করলে না। পাশাপাশি হাটতে লাগলো। যেন একে অন্যের কাছে অপরিচিত। কিন্তু একটু বাদেই ওইবিচেভ বুঝতে পারলে, যে তাদের পেছনে কেউ লেগেছে। চেষ্টা করলে জনতার ভেতর মিশে যেতে। কিন্তু এফ বী আই'র হাত থেকে নিস্তার নেই। এফ বী আই ঠিক করেছে যে বিনা ওয়ারেণ্টেই আজ জুডি কপলন এবং ওইবিচেভকে গ্রেপ্তার করবে। এইখানেই এফ বী আই মস্তো বড়ো ভুল করলে। কারণ সুপ্রীম কোর্ট বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করার জন্যেই এই কেস বাতিল করে দিলে।

ইতিমধ্যে সমস্ত এলাকা 'এফ বী আই'এর অনুচরেরা ঘিরে ফেলেছে। কোথাও পালাবার পথ নেই। 'এফ বী আই'র এক কর্মচারী এসে জুডি কপলনকে পাকড়াও করলে। প্রতিবাদ করলে জুডি কপলন। কিন্তু তখন তার প্রতিবাদ কে শোনে। ওইবিচেভ কিন্তু কোন বাদ-প্রতিবাদ করলে না।

গ্রেপ্তারের পর সুরু হলো জেরা—তারপর খানাতল্লাসী। জুডি কপলনকে এফ বী আই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলে।

জিজ্ঞেস করলে: তোমার নাম কী?

সহজ কণ্ঠেই জুডি কপলন জবাব দেয়, জানি না।

—কোথায় কাজ করো?—জানি না—।

ওয়াসিংটনে কতোদিন ধরে আছো।'

জানি না।

একটা ছবি দেখিয়ে এফ বী আই জিজ্ঞেস করে: এ ছবিটা জষ্টিস্ ডিপার্টমেণ্টের কিনা বলতে পারো?

জানি না।

জুডি কপলনের জবাব শুনে এফ বী আই রেগে কাঁই। এ ধরণের জবাব কখনই প্রত্যাশা

করেনি। কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই। এফ বী আই'র প্রশ্নের জবাবে ওইবিচেভ স্পষ্টই বললে যে, জুডি কপলনকে সে কোনদিন দেখেনি এবং তার সঙ্গে কোন আলাপ-পরিচয় নেই।

এবার দেহ খানাতল্লাসী সুরু হলো। জুডি কপলনের ব্যাগে অবশ্যি কতোগুলো গোপনীয় দলিলের নকল পাওয়া গেলো। জবাবে জুডি বললে, যে তার মনিব ফোলে তাকে এইসব কাগজ দিয়েছে। বলেছে, শনিবার-রবিবার রিপোর্টগুলো পড়তে।

জুডির কথায় খানিকটা সত্যি ছিলো। কারণ বহুদিন থেকে এফ বী আই তাকে বামাল সমেত ধরবার চেষ্টায় ছিলো। তাই তারা ফোলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলো কিছু গোপনীয় কাগজের নকল জুডির ব্যাগে রেখে দেবে।

এই সব কাগজের ভেতর একটি দলিল বিশেষ গোপনীয় ছিলো। আমেরিকায় সোভিয়েট দূতাবাসের সঙ্গে জড়িত ছিলো—আর্মটগ ট্রেডিং কর্পোরেশন। এই কোম্পানীর মারফৎ সোভিয়েট দূতাবাস বিনা লাইসেন্সে এ্যাটমিক যন্ত্রপাতি রাশিয়াতে পাঠাচ্ছিলো। আর্মটগ ট্রেডিং কর্পোরেশনের কীতিকলাপ এফ বী আই'র অজ্ঞাত ছিলো না। কী করে এই সব মালপত্র পাচার হচ্ছিলো তারই হিসেবনিকেশ করছিলো এফ বী আই। জুডির ভ্যানিটি ব্যাগে সেই কাগজের একটি নকল ছিলো।

ওইবিচেভের গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে সোভিয়েট দূতাবাস স্টেট ডিপার্টমেণ্টে তীব্র প্রতিবাদ করলো। দূতাবাস থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই মামলার তত্ত্বাবধান করতে এলেন। ওইবিচেভ বিচারপতিকে জানালে যে, আমেরিকার আইন-আদালতের প্রতি তার কোন আস্থা নেই। 'অতএব জজ যে প্রশ্নই করুন না কেন, ওইবিচেভ জবাব দেয়নি। বাধ্য হয়ে জজ তাকে ছেড়ে দেন।

প্রথমে জুডির ওয়াশিংটনে বিচার শুরু হলো। জুডির এডভোকেট হলেন পালমার। বড়ো উকীল রাখবার সামর্থ্য নেই জুডির।

পালমার প্রমাণ করতে চাইলে যে, ওইবিচেভ হলো জুডির প্রেমিক। অতএব জুডি এবং ওইবিচেভের সম্পর্ক হলো ভালবাসার। যদি এই ঘটনায় জুডির কোন দোষ থেকে থাকে, তাহলে তার একমাত্র দোষ হলো যে, সে এক রাশিয়ানের সঙ্গে ভাব করেছে।

একটানা বিচার চললো। জুডির মুখরোচক কাহিনী জানবার জন্যে সমস্ত ওয়াশিংটন নয়, জুরীরাও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলো। সরকার পক্ষের এ্যাডভোকেট জুডির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহু জেরা করলো। আর সেই সব জেরার বিবরণী সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু নাগরিকরা এসে জুডির সঙ্গে ভাব করতে লাগল। জুডি বললে, যে এই সমস্ত কাহিনী মন গড়া।
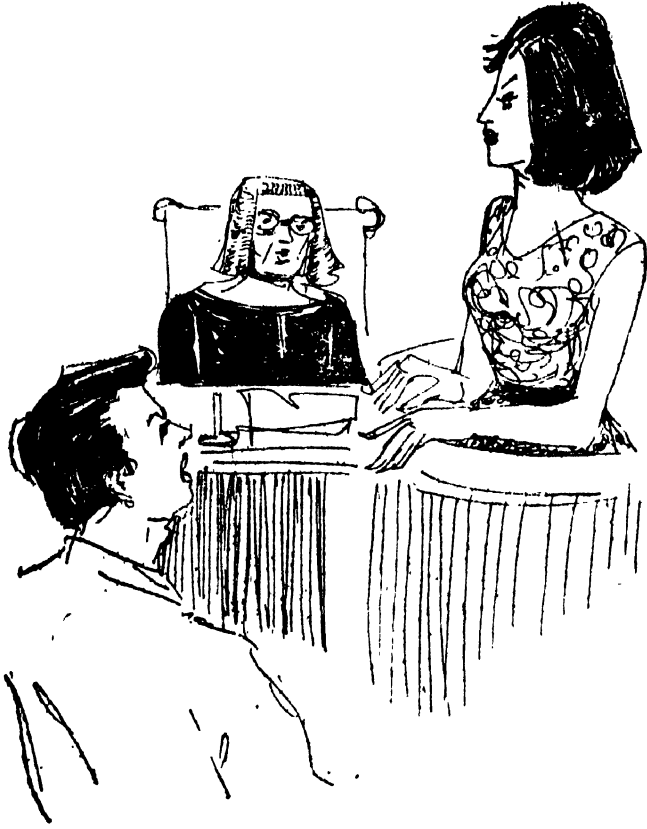
জুড়ি কপলন বিচারের কাঠগড়ায়।

জুরীরা এবং জজ জুডিকে দোষী সাব্যস্ত করলে। সরকারী দলিলপত্র বিক্রী করার অভিযোগে তার সাজা হলো দশ বছরের জেল। সামান্য চুরির অভিযোগে আরো তিন বছরের জেল দেয়া হ'লো।

জুডি কপলন বিচারের রায়কে সহজে গ্রহণ করলে না। বললে, সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবে।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে ওইবিচেভের বিচার সুরু হলো। অবশ্যি ওইবিচেভের সঙ্গে জুডি কপলনেরও দ্বিতীয়বার বিচার সুরু হলো।

ওইবিচেভ কোর্টের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলে না। একেবারে নিরুত্তর রইলো।

বিচারের মধ্যিখানে জুডি কপলন তার উকিলকে বরখাস্ত করলে। জজকে বললে, যে উকিল পালমার এই কাজের যুগ্যি নয়। সরকারী উকিল জুডিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললে। বহুবার জুডির সঙ্গে সরকারী উকিলের ঝগড়া হলো।

এই বিচারে জুডির সাজা হলো কুড়ি বছরের জেল। ওইবিচেভের সাজা হলো পনেরো বছরের জেল।

কিন্তু ওইবিচেভের সাজা বহাল হলো না। কারণ এই রায় প্রকাশ করার পরই বিচারপতি জানালেন যে, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ওইবিচেভের দণ্ড বাতিল করা হোক। অবশ্যি এই দণ্ড বাতিলের একটি সর্ত ছিলো। ওইবিচেভ অবিলম্বে আমেরিকা ত্যাগ করবে। কয়েক দিন বাদে ওইবিচেভ মস্কোর দিকে রওনা হলো।

জুডি কপলন এই কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করলে। আপীলে জুডি কপলেনকে

মুক্তি দেয়া হলো। কারণ প্রধান বিচারপতি এবং আর তার দু'জন সহকর্মী মন্তব্য করলেন যে, ওইবিচেভ এবং কপলনকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা বেআইনি হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি যে জুডির বিরুদ্ধে কেস এফ বী আই তৈরী করেনি। যদিও জুডি কপলনকে তারা দোষী সাব্যস্ত করলেন তবু আইনের খুৎ থাকাতে সেই যাত্রায় জুডি কপলন নিষ্কৃতি পেলো। এফ বী আই জুডি কপলনের কাহিনী নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি।

১৯৫২ খৃঃ সর্বপ্রথম ওইবিচেভ এবং জুডি কপলনের পুরো কাহিনী প্রকাশ পায়। জাপানে সোভিয়েট দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী রাষ্টারোভ একদিন আমেরিকান দূতাবাসে গিয়ে হাজির। বললে, সাহায্য চাই এবং এর পরিবর্তে আমি তোমাদের অনেক গোপনীয় খবর দিতে প্রস্তুত আছি।

রাষ্টারোভ বললে, যে ওইবিচেভ ছিলেন জি-আর-ইউ অর্থাৎ ওভারসিজ ইণ্টলিজেন্সের ক্যাপ্টেন। স্পাইং-এর কাজে ব্যর্থ হবার জন্যে ওইচিচেভের চাকরী যায়।

রাষ্টারোভ আরো বললে, আমি ছিলাম ওইবিচেভের বিশেষ বন্ধু। জুডি কপলনকে স্পাই হিসেবেই ওইবিচেভ নিয়োগ করেছিলো। কিন্তু ওইবিচেভের বোকামির জন্যে সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাই দেশে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তার প্রধান কারণ যে, একবার কোন স্পাইং-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলে সোভিয়েট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তাকে একটুও বিশ্বাস করে না।

ওইবিচেভ ও কপলনের কেস যখন চলছিলো, তখন ওয়াশিংটনে সোভিয়েট এম্বাসাডার ছিলেন পেন্নুসিকিন। পেন্নুসিকিনই ওইবিচেভকে ইউনাইটেড নেশনন্সে চাকুরী দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর পেন্নুসিকিনকে মস্কোতে বদলী করা হলো এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হলো। কারণ স্পাইং-এর কাজে পেন্নুসিকিন ছিলেন এক বিশেষ এক্সপার্ট।

জুডি কপলন এবং ওইবিচেভের কাহিনী আজো আমেরিকার স্পাইং-এর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

———

চলছি মাসীর বাড়ি

শ্রীমতী মায়া ঘোষদস্তিদার

ক্যাঁচোর-কোঁচ্ ক্যাচোর-কোঁচ্
চল্‌ছে গরুর গাড়ি
মায়ের সাথে হলুদ গাঁয়ে
চলছি মাসীর বাড়ি।
পথের দু'পাশ দেখছি চেয়ে
আমবাগানে আছে ছেয়ে
আম পেড়ে খায় তিনটি মেয়ে
পরনে নীল শাড়ী
আম-কাঁঠালের ছাওয়ায় ছাওয়ায়
চলছে গরুর গাড়ি।
নিঝুম দুপুর ঘুঘু ডাকা
পথ চলেছে আঁকা-বাঁকা
হাটুরেরা ঘরের পানে
চল্‌ছে তাড়াতাড়ি।
স্তব্ধ গাঁয়ে দুপুর বেলায়
চলছে গরুর গাড়ি।
ঐ দেখা যায় গাঁয়ের মাঝে
বৌ-ঝি'রা সব ব্যস্ত কাজে
কেউ বা মাজে পুকুর ঘাটে
খুন্তি, কড়া, হাঁড়ি।
শান্ত শীতল শ্যামল ছায়ায়
চলছে গরুর গাড়ি।
গরুর গাড়ির ছাউনি 'পরে
নানা গাছের পাতা ঝরে।

ময়না, শ্যামা, কোকিল ডাকে
মিষ্টি গলা ছাড়ি
মিষ্টি সুরে ক্যাঁচোর-কোঁচ্
চলছে গরুর গাড়ি।
ঐ দেখা যায় দাওয়ার 'পরে
কুমোর-বৌ রান্না করে
ছেলেগুলি সাঁতার কেটে
পুকুরটা দেয় পাড়ি।
বনফুলের গালচে বেয়ে
চলছে গরুর গাড়ি।
সবার চেনা মানিক খুড়ো
বয়সে বেশ হয়েছে বুড়ো
সারা জীবন গাঁয়ের পথে
চালায় গরুর গাড়ি,
বলতে কথা হাওয়ায় হাওয়ায়
নড়ছে সাদা দাঁড়ি।
হেলে দুলে চল্‌ছে গরু
চালিয়ে নিয়ে গাড়ি।
অশথ গাছের সবুজ ছাওয়ায়
মন মাতানো মিষ্টি হাওয়ায়
পথ হ'ল শেষ, এবার খুঁড়ো
থামায় গরুর গাড়ি।
আনন্দেতে মনটা নাচে
এলাম মাসীর বাড়ী।

দিয়াশলাই-শিল্প

শ্রীজ্যোতির্ময় ছুই

মানব-সভ্যতার আদিমতম যুগে মানুষ যখন পর্বতগুহায় বাস করিত, তাহারা জীবজন্তু শিকার করিয়া তাহাদের কাঁচামাংস ভক্ষণ করিত, তখন আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। চকমকি পাথরের যুগ পার হয়ে এসে মানুষ আরো সহজ উপায়ে আগুন জ্বালানোর জন্য বিজ্ঞানের দরবারে ধর্না দিতে লাগিল।

আজ তোমরা বাজারে দিয়াশলাই কিনিতে পাও, দেখেছ কত সহজে তাহাতে আগুন জ্বালানো যায়। ইহার কাঠিগুলির প্রত্যেকটির মাথায় বারুদের মত পদার্থ খানিকটা লাগানো থাকে এবং এই কাঠি দিয়াশলাই বাক্সের গায়ে ঘষিলেই আগুন জ্বলিয়া ওঠে। তোমাদের ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক, যে কাঠির মাথায় এবং দিয়াশলাই বাক্সের গায়ে কি এমন রাসায়নিক পদার্থ লাগানো আছে যাহার জন্য অত সহজে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। আজ তোমাদের দিয়াশলাই-শিল্পের ইতিহাস বলবো।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে চ্যান্সেল (Chancel) রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আগুন জ্বালানোর উপায় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার পদ্ধতিতে একটি কাঠির মাথায় পটাসিয়াম ক্লোরেট্ এবং চিনির মিশ্রণ লাগানো থাকিত, এই কাঠির মাথাটি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবাইলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত আগুন জ্বালাইতে হইলে অ্যাসিড লইয়া চলাফেরা করিতে হয় যাহা খুবই বিপজ্জনক। ইহার পর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘর্ষণ-দিয়াশলাই বা লুসিফার দিয়াশলাই (Lucifer matches) আবিষ্কৃত হইল। ইহাতে কাঠির মাথায় অ্যান্টিমনি সালফাইড্ এবং পটাসিয়াম ক্লোরেট্ লাগানো থাকিত এবং কাঠিটি বালির কাগজে ঘষিলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। ইহার পর ফস্ফরাস্ আবিষ্কৃত হইল, ফস্ফরাসের দহনক্ষমতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ফস্ফরাস্‌কে দিয়াশলাই-শিল্পে ব্যবহার করিলেন। আম, শিমুল গাছের কাঠ হইতে সরু সরু কাঠি প্রস্তুত করিয়া কাঠিগুলির প্রত্যেকটির মাথায় গলিত মোম বা গন্ধক লাগানো হইল এবং ইহার উপর শ্বেত ফস্ফরাস্, পটাসিয়াম ক্লোরেট্ বা ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও অঙ্গার-চূর্ণ আঠার সাহায্যে লাগানো হইল। এখন এই কাঠিগুলি শুকাইয়া লইয়া যে কোনও অমসৃণ স্থানে ঘষিলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এইভাবে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠিগুলির সহিত হাতের স্পর্শ হয়, কিন্তু শ্বেত ফস্ফরাস্ একটি বিষাক্ত পদার্থ; মানুষের মৃত্যুর জন্য ০'২৫ গ্রাম শ্বেত ফস্ফরাস্ই যথেষ্ট। শ্বেত ফস্ফরাসের এই বিষক্রিয়ার জন্য দিয়াশলাই-শিল্পে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এখন বাজারে যে নিরাপদ দিয়াশলাই (Safety matches) পাওয়া যায়, ওগুলির কাঠির মাথায় অ্যান্টিমনি সালফাইড্, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট্ এবং রেড্ লেড্ শিরিষ আঠার সাহায্যে লাগানো থাকে এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলি লাগাইবার পূর্বে কাঠিগুলিকে সোহাগার দ্রবণে ডুবাইয়া শুকাইয়া রাখা হয়।

দিয়াশলাই বাক্সর দুই পার্শ্বে আঠার সাহায্যে লোহিত ফস্‌ফরাস্ (ইহার বিষক্রিয়া নাই), কাঁচের গুঁড়া ও অ্যান্টিমনি সালফাইড্ লাগানো থাকে। কাঠিগুলি দিয়াশলাই বাক্সের এই বিশেষভাবে প্রস্তুত গাত্রে ঘষিলেই আগুন জ্বলিয়া ওঠে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু উন্নত ধরণের দিয়াশলাই-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে দিয়াশলাই ছিল বিদেশী পণ্য। তোমরা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে ঠাকুর পরিবারের স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুতির প্রচেষ্টার কথা পড়িয়াছ, সেই দিয়াশলাই শিল্পে রসায়নের আগুন যত না ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দেশপ্রেমের আগুন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু উন্নত ধরণের দিয়াশলাই-শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠায় দেশের চাহিদা মিটাইবার মত দিয়াশলাই ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতেছে।

রথের ছড়া

শ্রীসাধন বারিক

ভোর না হ'তে রথতলাতে
লোক জমেছে কতো···
কাঠের পুতুল, বেলুন, বাঁশীর
দোকান শত শত !
মিষ্টুনি আর মুন্না মিলে
রথ দেখতে যাবে···

চারটে করে পয়সা আছে
পাঁপর কিনে খাবে।
চৌদিকেতে হৈ হৈ হৈ
যায় গড়িয়ে বেলা—
ঢ্যাম কুড়া কুড় ব্যাণ্ডি বাজে
জগন্নাথের মেলা ॥

———

কুঁচবরণ কন্যা

শ্রীসতীকুমার নাগ

গহীন বন। সহজে কেউ এ বন পেরুতে পারে না। দূর থেকে দেখে মনে হয়, দৈত্যপুরীর দেশ—মিশেমিশে কালো দানবগুলো ঝাঁকড়া মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এ বনের ভিতর কি আছে না আছে, এ কথা কেউ জানে না। কি করেই বা জানবে? কেউ কি দেখেছে? যাগ গে, এসব কথা! যে কথা সবাই জানে, সেই কথাটাই বলছি। গহীন বনের পথের বাঁকে থাকে এক রাখাল। ওখানে বসে সে ভোর থেকে সাঁজ অবধি বাঁশী বাজায়। আবার কখনও কখনও জ্যোসনা রাতও কেটে যায় ঐ বাঁশী বাজিয়ে।

অঞ্জনকুমার আসছে ঐ পথ ধরে। ঐ গহীন বন পেরিয়ে অঞ্জনকে যেতে হবে অচিনপুরীতে। তা-ও মাঝপথে পড়বে তেপান্তরের মাঠ; তারপর নীল সাগর। সাগরের এ পার থেকে দেখা যায় না ওপারের কিছু। শুধু দেখা যায়, অচিনপুরীর শ্বেত পাথরের প্রাসাদের চূড়ো। এই শ্বেত পাথরের প্রাসাদের কত ইতিহাসই না জড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের কথা কেউ জানে না! রাজা-রাজড়ার ইতিহাস হলে এতদিন পাথরের গায়ে লেখা হয়ে থাকতো—সে যুগের কাহিনী। এ যুগের ছেলেমেয়েরা তা আবার ছাপার হরফে পড়তো। কিন্তু এর সব কথা কি সত্যি? না তা নয়। তবে রূপকথার ব্যাপারে এমন হয় কিনা!

আমাদের রূপকথার নায়ক অঞ্জনকুমার রাজপুত্র, কোটালপুত্র নয়; সে তোমার মত-ই একটি সুন্দর ছেলে। বুকে বল, মনে সাহস, চোখে জ্যোতি—অঞ্জনকুমারের। হাতে তার তীর-ধনুক আর পরিধানে আর্যপুত্রের যুদ্ধের পোষাক।

অঞ্জনকুমার এসে পৌছয় সেই গহীন বনের বাঁকে।

জ্যোসনা রাত লুটোপুটি খায় বনানীর দেশে। ঐ বনের বাঁকে সেদিনও রাখল আপন খেয়ালে, আপন খুশিতে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। অঞ্জনকুমার ঐ বাঁশীর সুরের টানে এক পা, দু'পা করে এগিয়ে আসে।

চারিদিক নীরব, নিঝুম! শুধু মেঠো বাঁশীর সুর। অঞ্জনকুমার ডাকে: 'তুমি বুঝি বাঁশী বাজাচ্ছো ভাই?'

'হ্যাঁ ভাই—তুমি কে ভাই?'

'আমার নাম অঞ্জনকুমার। আমি চলেছি অচিনপুরীর দেশে। সেখানে শ্বেত পাথরের পাষাণ ঘর আছে, সেখানে আমাদের কাজলগাঁয়ের কুঁচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুল বিছিয়ে সারা আকাশ যেন ছেয়ে আছে। সেই পাষাণপুরী থেকে কুঁচবরণ কন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছি। তুমি বলে দিবে

ভাই, এ গহীন বন কি করে পেরিয়ে অচিনপুরীর দেশে যাবো ?'—এই কথা বলে অঞ্জনকুমার রাখালের পাশে বসে।

এক পলক দৃষ্টি রাখালের অঞ্জনকুমারের দিকে। আলতো একটা শ্বাস ফেলে সে। শেষে রাখাল বলে, 'তোমার আগে, অনেক আগে—অনেক রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র এই পথ দিয়েই গিয়েছে অচিনপুরীর দেশে, কিন্তু তাদের মধ্যে আজও কেউ ফেরে আসেনি ? তুমি কী পারবে ভাই, অঞ্জন ?'

অঞ্জনকুমার একটু হেসে ব'লে ওঠে, 'রাজকুমার, নবাবকুমার পারেনি বটে কিন্তু আমি অঞ্জনকুমার পারব, জেনো। তুমি শুধু আমাকে পথের নিশানা বলে দাও।—দেখ, কি মজার কথা ! তোমার নাম কি, সে কথাই জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি !'

'আমার নাম রাখাল। এই গহীন বনের ধারেই আমার কুটীর। এখানে বসেই বাঁশী বাঁজাই।' —এই বলে আবার বাঁশী বাজাতে শুরু করে রাখাল। গহীন বনের নীরবতা, মৌনতা, মুখরিত হয়ে ওঠে রাখালের বাঁশীর সুরে। সারা বন যেন বাঁশীর মেঠো সুরের ঢেউ-এর দোলায় দুলে ওঠে।

রাখালের বাঁশীর মূর্ছনার পরশ পেয়ে বুনোগাছের লতা-পাতা আনন্দে যেন শিহরিত। রাখালের বাঁশীর মাধুর্যে বনের পশুদের চলনশক্তি যেন থেমে আসে, পাখীরাও পাখনা মেলে যেন উড়তে ভুলে যায়। বনের যে যেখানে থাকে, সবাই যেন রাখালের বন্ধু, মিতা, সহচর। অনেকে বলে, এ বাঁশী নাকি ভেল্‌কি জানে, যাদু জানে ! রাখাল বলে, 'অঞ্জনকুমার আমার একটা কাজ করবে ? তুমি যখন ফিরে আসবে আমার জন্য একটি লাল কমল আনবে ?'—

'কেন আনবো না, ভাই ? নিশ্চয়ই আনবো, রাখাল। শুধু লাল কমল কোথায় পাবো তা আমাকে বলে দাও।'—

'অচিনপুরীর দেশে কাজল-দীঘি আছে, সেই কাজল-দীঘির জলেতে হাজার হাজার লাল কমল ফুটে রয়েছে দেখতে পাবে। সেই দীঘির জলে ফোটা লাল কমল আমার চাই। পারবে কি ?'—

অঞ্জনকুমার হেসে বলে ওঠে, 'তা আর পারবো না !' বলতো ভাই, ঐ ফুল দিয়ে কি করবে তুমি ?'

সে অনেক কথা ভাই ! আমাদের এ রাজ্যের রাজার রাজকন্যার জন্মদিন উৎসব ছিল, রাজকন্যে বায়না ধরলেন লাল কমলের। কোথায় পাবে সে লাল কমল, রাজা চারদিকে লোক পাঠালেন। কেউ সে লাল ফুল সংগ্রহ করতে পারলে না। তারপর রাজা ঘোষণা করলেন, যে এনে দেবে লাল কমল তাকে রাজা দেবেন অনেক পুরস্কার। সেই থেকে রাজকন্যের জন্মদিন উৎসব বন্ধ হয়ে আছে !—

'এ আর এমন কি কঠিন কাজ?'—

অঞ্জন, আমি তোমাকে আমার বাঁশীটি উপহার দিচ্ছি। এ বাঁশীর স্বর যে শুনবে, সেই ঘুমিয়ে পড়বে।'—এই বলে অঞ্জনকে বাঁশীটা রাখাল উপহার দেয়।

তোমার এ বাঁশী দিলে, তুমি আবার কোথায় পাবে বাঁশী?'—অঞ্জনকুমার প্রশ্ন করে।

'এ ছাড়াও আমার সঙ্গে আরেকটি বাঁশী আছে, এই দেখ!' এই বলে রাখাল তার ঝোলা থেকে আরেকটি বাঁশী বের করে দেখায়।

দু'জনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দেখতে দেখতে রাতের রূপালী চাঁদ ওঠে। অনেক রাতে রাখাল বিদায় নেয়। অঞ্জনকুমারও বিদায় নেয়। বিদায় বেলায় অঞ্জনকুমার বলে, 'আজ থেকে তুমি আমার সবার বড় বন্ধু, মিতা।'

রাখাল অনেকক্ষণ অঞ্জনের চলে যাওয়ার পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এক সময় দেখা যায়, রূপালী চাঁদের আলোতে রাখালের দু'চোখের দু'ফোঁটা জল মুক্তার মতো চকচক্ করে ওঠে। রাখাল নিঃশব্দে একটা শ্বাস ফেলে। এ তার গোপন বেদনার ছোট্ট কাহিনীটুকু কেউ জানে না। এই অঞ্জনকুমারের মত এর আগে যারা এ পথ দিয়ে গিয়েছে, তারা সবাই রাখালের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আজও কেউ ফিরে আসেনি। আজকের দিনে রাখালের সে সব কথা বার বার মনে পড়ে।

অনেক রাত। জোসনার আকাশে এখন ফিকে চাঁদ। চাঁদ ঘুমে যেন ঢুলে পড়েছে। অঞ্জনকুমারও চলতে পারছে না। সেও যেন ক্লান্ত, অবসন্ন, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় একটা গাছের তলায় বসে অঞ্জনকুমার। অঞ্জনের চোখ দু'টো ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ গহীন বনের মধ্যে দু'একটি পাখীর কলরব, পাখনার আওয়াজ শোনা যায়। এমনি গাছ থেকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার খস্‌খস্ শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা গাছের ডাল থেকে হীরামন পাখী ডেকে উঠে।

হীরামন : অঞ্জন, অঞ্জন! রাত শেষ হয়ে এলো—উঠে পড়ো!—

অঞ্জন : (হীরামনের ডাকে অঞ্জনকুমার জেগে ওঠে) কে, কে আমাকে ডাকলে?

হীরামন : আমি হীরামন পাখী। যারা এ পথ দিয়ে যায়, আমি তাদের পথ দেখিয়ে দিই। কোথায় যাবে তুমি?

অঞ্জন : আমি যাব অচিনপুরীর দেশে। সেই অচিনপুরীর শ্বেত পাথরের ঘরে বন্দিনী হয়ে আছে—কাজল গাঁয়ের কুঁচবরণ কন্যা। তাকে উদ্ধার করতে চলেছি। আচ্ছা হীরামন, কোন পথে গেলে সে দেশ পাবো, বলবে আমায়?

হীরামন : শাল পিয়ালের বন,
পেরিয়ে পাবে তেপান্তর।
ঢেউর পর ঢেউ তুলে,
চলছে উজান সাগর।
দূর হতে যায় দেখা,—
বিশাল পুরীর দ্বীপান্তর।
বন্দিনী সেই কুঁচবরণ কন্যা
আছেন সেথা একা।

অঞ্জন : তুমি কী করে পাখী হলে—বলবে আমায় ?

হীরামন : সে অনেক কথা। একদিন আমার সৎমা আমার মাথায় কি একটা ওষুধ দিয়ে দিলেন—সে থেকে আমি পাখী হয়ে এ বনেই বাস করছি।

অঞ্জন : কি করলে আবার তুমি ভাল হতে পার, বলবে আমায় ?

হীরামন : অচিনপুরীর যে দ্বীপ-সাগর রয়েছে, সে জল আমার মাথায় দিলে আবার আমি ভাল হয়ে উঠবো।

অঞ্জন : হীরামন, আমি তোমার জন্যে সাগরের জল নিয়ে আসবো। তুমি এখানে থেকো, কিন্তু।

হীরামন : অঞ্জন, এই ফলটি তোমাকে দিচ্ছি। যখন খিদে পাবে, তেষ্টা পাবে, তখন একটু একটু করে ভেঙে খেও। দেখো, খিদে আর তেষ্টা থাকবে না।
ঠিক এমনি সময়ে গাছের পাতাগুলি খস্‌খস্ করে ওঠে আর একটা শাঁই শাঁই শব্দ শোনা যায়।

হীরামন : অঞ্জন, অঞ্জন, শীঘ্রি পালিয়ে যাও।

অঞ্জন : কেন কী হয়েছে ?

হীরামন : এই পথ দিয়ে একটু পরে একটা বিশাল অজগর যাবে—উঃ! সে ভীষণ অজগর অঞ্জন, আর দেরি করো না!

হীরামন পাখী অঞ্জনকুমারকে এ কথা বলে উড়ে যায়—আপন মনে শিস্ দিয়ে।

তারপর—কত পাহাড়, কত নদ, কত নদী, কত বন, কত উপবন পেরিয়ে, একদিন অঞ্জনকুমার এসে পৌছয়—সেই অচিনপুরীর দেশে! অচিনপুরীর কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে—কাজল দীঘি। এই কাজল দীঘিতে লাল কমল ফুটে রয়েছে। হ্যাঁ, এই লাল কমলই আমার বন্ধু রাখাল

চেয়েছে। তারপর, হীরামনের দ্বীপ-সাগরের জল। হ্যাঁ, ওতেই সে ভাল হয়ে উঠবে।—ধীরে ধীরে অঞ্জনকুমার অচিনপুরীতে এসে হাজির হয়। অঞ্জনকুমার শিউরে ওঠে। আপন মনে বলে: উঃ! কী ভীষণ অন্ধকার—এই প্রাসাদ! দু'য়ারে ঘা মারে, ঝন্ঝন্ শব্দ করে ওঠে—সহসা রুদ্ধ প্রাসাদের ভিতরের অর্গল। হঠাৎ যায় দরজা খুলে—নিঝুম, নিস্তব্ধ এই পুরী যেন ঘুমিয়ে রয়েছে!

এমনি সময়ে এক সঙ্গে অনেকগুলো রাক্ষসের হাঁউ মাঁই খাঁউ-এর চিৎকারে নিস্তব্ধ অচিনপুরী মুখরিত হয়ে ওঠে। অঞ্জনকুমার ভয় পাবার ছেলে নয়। অমনি সে তীর ছোঁড়ে—দাঁড়া, তোদের একে একে যমের বাড়ী পাঠাচ্ছি! এদিকে কিন্তু রাক্ষসীদের চীৎকার-ধ্বনিতে সারা প্রাসাদই যে মুখরিত হয়ে ওঠে তা নয়, তাদের কর্নভেদী চীৎকারে সারা আকাশ ছেয়ে যায়! এ দিকে দেখতে দেখতে অঞ্জনকুমারের তীরও ফুরিয়ে আসে। তাই তো—এখন উপায়? সে এখন কী করবে? কিছুই ঠিক করতে পারে না। সহসা তার মনে পড়ে,—হ্যাঁ, রাখাল আমাক যে বাঁশী দিয়েছিলে…বাঁশীতে ফুঁ-দিতেই রাক্ষসীদের আর্তনাদ, চীৎকার ধ্বনি ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসতে থাকে। সত্যিই, দেখতে দেখতে রাক্ষসীগুলো একে একে ঘুমের রাজ্যে ঢলে পড়ে। অঞ্জনকুমার এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারনি—রাখালের বাঁশীর এত গুণ!

এবার অঞ্জনকুমার ধীরে ধীরে প্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করে। ঐ যে শ্বেত পাথরের ঘরখানা—হ্যাঁ, ঐ ঘরেই বন্দিনী হয়ে আছে কুঁচবরণ কন্যা। শ্বেত পাথরের দরজাও অঞ্জন খুলে ফেলে। ঐ যে পালঙ্ক—ঐ পালঙ্কেই কাজল গাঁয়ের বন্দিনী কুঁচবরণ কন্যা ঘুমিয়ে আছে। ওই রাক্ষসীগুলোই একদিন কুঁচবরণ কন্যাকে ভুলিয়ে এনে এখানে বন্দী করে রাখে। অঞ্জনকুমার পালঙ্কের আরও কাছে এগিয়ে যায়…গিয়ে দেখে—কুঁচবরণ কন্যার শিয়রের কাছে সোনার কাঠি আর পায়ের দিকে রুপোর কাঠি।

অঞ্জনকুমার সোনার কাঠি রুপোর কাঠির গল্প মায়ের কাছে অনেক দিন শুনেছে। সে তখন সোনার কাঠিটি তুলে কুঁচবরণ কন্যার পায়ের কাছে নিয়ে যায়, আর রুপোর কাঠিটাও পায়ের কাছ থেকে তুলে শিয়রের দিকে নিয়ে যায়।

বাঃ, কি আশ্চর্য রহস্য!

কুঁচবরণ কন্যা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠছে মনে হয়! নিজের দুটি হাত দিয়ে চোখ দুটি রগড়ে নেয় সে। আপন মনেই কুঁচবরণ কন্যা বলে ওঠে—'কে?' নিজেই বিস্মিত ও সচকিত তখন কুঁচবরণ কন্যা।

প্রথমে অঞ্জনকুমার কোন কথা বলে না, নিজের ডান হাতের একটি তর্জনী তুলে চোখের ইশারায় কুঁচবরণ কন্যাকে বলে, 'চু-প, কুঁচবরণ কন্যে!'

কুঁচবরণ কন্যা আরও বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?'

চু-প কুঁচবরণ কন্যা!

'আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। ওরা তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। তাই

তো তোমাকে উদ্ধার করতে এই অচিনপুরীর দেশে এসেছি।' অঞ্জনকুমার নির্ভীক বীরের মত কথাগুলো বলে। বলে, 'আমার নাম অঞ্জনকুমার।'

কুঁচবরণ কন্যা চমকে ওঠে। বলে, 'কুমার শীঘ্রি এখান থেকে পালিয়ে যাও। রাক্ষসীরা এখনি তোমাকে'—

অঞ্জনকুমার কুঁচবরণ কন্যাকে আর কিছু বলতে দেয় না। শুধু বলে, 'আমি তাদের সাতদিন, সাতরাত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ওরা জাগবে, আমারা এখান থেকে চলে গেলে পর···আর দেরি করো না···উঠে পড়ে।'

কুঁচবরণ কন্যা বলে ওঠে, 'কোথায় যাবো?'

'কোথায় আবার যাবে? তোমার দেশে যাবে··তোমার মা-বাবার কাছে।'

'হ্যাঁ কুমার, আমি আমার মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে যাবো।'—

'হ্যাঁ চলো, এই অচিনপুরীর পাষাণ-কক্ষ থেকে পালিয়ে যাই। রাখাল, হীরামন, ওরা যে সবাই আমার আশায় বসে আছে।'

'ওরা কারা?'

অঞ্জন তার বাঁশীটি বের করে দেখায় আর বলে, 'এ বাঁশীটি রাখাল আমাকে দিয়েছে। সে আমার সব চেয়ে বড় মিতা, বড় বন্ধু। আর এই যে ফল দেখছো'—এই বলে ঐ ফল একটু ভেঙে নিজে খায়, খানিকটা কুঁচবরণ কন্যাকে খেতে দেয়। খেতে খেতে আবার বলে, 'একটু ফল খেলে খিদে-তেষ্টা আর কিছু থাকবে না। এর পর রাখাল বন্ধুর জন্যে লাল কমল তুলতে হবে। আর হীরামনের জন্যে সাগরের জল নিতে হবে।'—

এ ব'লে অঞ্জনকুমার ও কুঁচবরণ কন্যা উঠে দাঁড়ায়।

কুঁচবরণ কন্যার আবার সেই একই প্রশ্ন—'কেন, ও দিয়ে ওরা কি করবে?'—

অঞ্জনকুমার বলে, 'পথে যেতে যেতে তোমাকে সব বলবো। চল, যাবে না তোমার দেশে?'

'উঃ, আজ কত দিন হবে, মনেও করতে পারছি নে, আমি···আমার মা-বাবাকে কতদিন দেখিনি! কুমার, এই পাথরের ঘরের বাঁ-দিকে একটা পথ আছে, সে পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়। এ পথের সন্ধান রাক্ষসীরা ছাড়া আর কেউ জানে না!'

অঞ্জনকুমার বলে, 'চলো, কুঁচবরণ কন্যা। এই যে আমি বাঁশী বাজাচ্ছি। এ বাঁশীর সুর শুনে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে—কেউ আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না!' এ বলে অঞ্জনকুমার বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ধীরে ধীরে বাঁশীর সুর সারা আকাশকে যেন মাতিয়ে তোলে।

মুক্তির আনন্দে ওরা বেরিয়ে পড়ে দু'জনে।

একই মিলের কবিতা

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

বাজার থেকে আন্‌তো কিনে একটা মোটা রাং,
দেখিস্ যেন আনিস্‌নাকো বাসন ঝালা রাং।

বারে বারে এমন করে সাধছ কেন বাদ, (১)
কাজটা ভালো না লাগে তো দাও না ওটা বাদ।

বিনা দোষে আজকে তুমি দিলে যে এই দাগা, (২)
জীবনে তা ভুলবো নাকো, রইবে মনে দাগা। (৩)

দেখতে পেলুম কাগজেতে বড় করেই ছাপা,
এখন তুমি কেমন করে রাখবে সেটা ছাপা ? (৪)

জানিস্ এবার নিয়েছিলুম বসন্তের যে টিকে,
ঘা হোলো যা ঠিক যেন ভাই তামাক খাবার টিকে।

ভেবেছিলি আমার চোখে আছে যখন ছানি,
দেখতে বুঝি পাবো নাকো স্পষ্ট তোর ঐ ছানি।(৫)

এই নাও গো পাচক মশাই, এই এনেছি ছানা,
খাবার করার আগে সেটা বেশ যেন হয় ছানা। (৬)

যা বলি শোন্ এখন যেন যাসনে নদীর তীরে,
সাঁওতালের দল আছে খেপে, বিঁধবে তোকে
তীরে।

ঠিক মতো ঐ উনুনটাতে উঠলো কিনা আঁচ,
এখান থেকে কেমন করে করবো সেটা আঁচ ? (৭)

এ পাপ জগতে কোন মতে যায় যাতে
ভাই টিকা, (৮)
তাইতো গলায় বেঁধেছি কণ্ঠী, কপালে
এঁকেছি টিকা। (৯)

আগের দিনে কেনাবেচা চলতো দিয়ে কড়ি, (১০)
এখন সেটার দাম নেইকো কানা কড়ি। (১১)

ঐ লোকটি গাছের নীচে বসে পেতে কেদারা, (১২
ধরেছে যে গান তার সুর হোলো কেদারা। (১৩)

এখন যতোই তুই খাওয়াস্ নাকো ঘোল, (১৪)
যা করেছিস্ তাতে তোকে খাওয়াবোই ঘোল। (১৫

এই মাত্র রেখে গেলুম বেঁধে খড়ের আঁটি, (১৬)
তার ভেতরে কে ঢোকালো এতগুলো আঁটি ? (১৭

শুনেই কেবল ওর মিষ্টি গলা,
হয়নি উচিত এমন করে গলা। (১৮)

বদমেজাজী লোকটার কাছে চাইতে গিয়ে চাঁদা,
অনর্থক তুই ঝগড়া করে ফাটিয়ে এলি চাঁদা। (১৯)

(১) বাদ সাধা=বাধা দেওয়া। (২) বদনাম। (৩) খোদাই থাকা। (৪) চাপা। (৫) ইশারা। (৬) চটকে মাখা। (৭) অনুমান। (৮) বাঁচা। (৯) তিলক ফোঁটা। (১০) শামুক জাতীয় জীবের খোলা। (১১) কানা কড়ি=কপর্দক। (১২) চেয়ার। (১৩) রাগিণী বিশেষ। (১৪) সরবৎ বিশেষ। (১৫) ঘোল খাওয়ানো=হয়রান করা, অসুবিধায় ফেলা। (১৬) গুচ্ছ। (১৭) বড় মাপের বীচি; যেমন আমের আঁটি। (১৮) নরম হওয়া। (১৯) চাঁদি=মাথার ওপরের মধ্যভাগ।

আলেকজাণ্ডারকে পরাস্ত করেছিল কে?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা কত কত দিগ্বিজয়ী বীরের নাম দেখতে পাই। চেঙ্গিস খান, তৈমুরলঙ, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, এত্তিলা, পিলেসর, হানিবল, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি আরো কত কে! অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীর হিসাবে তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য তাঁরা জয় করেছিলেন; স্থাপন করেছিলেন সাম্রাজ্য। ওদের আক্রমণের ফলে দেশে দেশে দারুণ ধ্বংসলীলা, রক্তপাত, লোকক্ষয় ঘটেছিল, শ্মশানে পরিণত হয়েছিল জনপদ।

কিন্তু এই সব মহারথীরা তো ছার! এঁদের চেয়েও মহা পরাক্রমশালী আর এক দিগ্বিজয়ী বীর হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে আসছে। নীরবে, লোকের অজান্তে। কেউ বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি এই বীরকে। লোকে এর হাতে কেবল মার খেয়েছে আর অসহায় বোধ করেছে।

শেষ পর্যন্ত এই দুর্দান্ত বীরের পরিচয়টা জানা গেছে, বেশি দিনের কথা নয়। এই বিজয়ী বীর হল এনোফেলিস। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহক ক্ষুদ্র মশা, এনোফেলিস।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নাম কে না জানে? অসামান্য বীর, যোদ্ধা হিসাবে জগৎ জোড়া তাঁর নাম। কোন যুদ্ধে তিনি হারেন নি, কেউ জয় করতে পারেনি তাঁকে। কিন্তু, সেই তাঁকেও হার মানতে হয়েছিল ঐ খুদে এনোফেলিস মশার কাছে! আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়েছিল এনোফেলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগে।

ম্যালেরিয়া এক ধরণের জ্বর।

পৃথিবীতে এযাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণে অনেক অনেক দেশ রাজ্য ছারখার হয়েছে; লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়েছে যার কোনো হিসাব নেই, লেখাজোখা নেই।

বায়রণ বলেছেন—'এঞ্জেল অব্ ডেথ্ স্প্রেডস হিজ উইংস অন্ দি ব্লাস্ট্': এ কি সেই পাখা যা মৃত্যুর ছায়া ফেলে, ম্যালেরিয়ার জবাণু ছড়ায়?

সার রণাল্ড রস নামে একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম এনোফেলিস ও ম্যালেরিয়া জ্বরের মধ্যেকার সম্পর্কটা আবিষ্কার করেন। সে আধুনিক কালের কথা। এই রোগের মূল কারণ ও উৎপত্তির একটা হদিস তিনি বের করতে পেরেছিলেন। সেটা এই যে, এনোফেলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বয়ে বেড়ায় এবং ঐ মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন থেকে ম্যালেরিয়া রোগের শুরু, এই হ'ল সার রোনাল্ড রসের ধারণা। ইতিহাসে বলা হয়েছে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের একটা ফল গ্রীকদের পক্ষে খুবই অশুভ হয়েছিল। তাঁর সৈন্যেরা মেসোপটেমিয়ার জলাভূমি থেকে ম্যালেরিয়াবাহী মশা নিয়ে গিয়েছিল দেশে। তার ফলে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে গ্রীস দেশে এবং অধিবাসীদের ক্রমশ দুর্বল ও জব্দ করে ফেলে। খ্রীষ্টের জন্মেরও কয়েক শ বছর আগে গ্রীস দেশের অনেক অঞ্চল ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়েছিল। ম্যালেরিয়া গ্রীসের কি দারুণ ক্ষতি করেছিল তা ও-দেশের অনেক শহরের নাম থেকে জানা যায়।

প্রাচীন মিশর ছিল জলাভূমির দেশ। ইতিহাসে উল্লেখ আছে ঐ দেশে একসময়ে অসংখ্য লোক মরেছিল এক ধরণের জ্বর ও জ্বালাপোড়ায় ভুগে। ওটা কিন্তু ম্যালেরিয়ারই লক্ষণ। এসিরিয় সৈন্যদল ছাউনি ফেলেছিল প্যালেষ্টাইনে; ম্যালেরিয়া উৎখাত করে দিয়েছিল তাদের। সে অনেক কাল আগেকার কথা। পরবর্তী কালে এনোফেলিস মশার দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন এট্রিয়া এবং রোম সাম্রাজ্যের অবনতির একটা কারণ ম্যালেরিয়া। সে দেশের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়ায় একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এই কিছুকাল আগেও রোমের একটি শহরতলীর নাম ছিল ভেইল অব্ হেল্। এবং সেখানকায় অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল ম্যালেরিয়ার রোগী।

প্রকৃতির এমনই পরিহাস যে, প্রধানতঃ সেনাবাহিনীই হ'ত এনোফেলিসের শিকার। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলের কথা আগে বলেছি। রোমের সেনাবাহিনীও যেন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে একেবারে উবে গিয়েছিল—ঠিক যেমন কুয়াশা উবে যায় বাতাসের ঝাপটায়। এত হ'ল সে যুগের কথা। এ যুগেও ঐ রকম ব্যাপার ঘটেছে। ফরাসী সেনাবাহিনী আলজিরিয়ায় গিয়ে পা দিয়েছিল মরণ-ফাঁদে—সেখানে তখন ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড দাপট। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ সেনাপতি ফ্রেডারিক বারবোসার নেতৃত্বে বাছা বাছা একদল সৈন্যকে পাঠান হয়েছিল রোমের জলাভূমি অঞ্চলে। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। বর্ষার শেষে যখন জল টান ছিল, তখন মশার দৌরাত্ম দেখে কে? সঙ্গে সঙ্গে এল ম্যালেরিয়া। বড় ছোট কেউ পেল না রেহাই! কুড়ি হাজার লোক মারা গিয়েছিল তখন রোমে। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীদের একটি দল গিয়েছিল মধ্য আমেরিকার দারেন নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দুর্দশার একশেষ হয়েছিল তাদের। তারও দু'শতাব্দী কাল পরের কথা। ফরাসীরা গেল পানামা খাল খনন করতে; কিন্তু তাদের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিল এনোফেলিস মশা। শ্রমিকদল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ম্যালেরিয়ায়। আর, ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও বৃটিশ সৈন্যদলের মধ্যে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল। এবং

বছর কয়েক পরে সেই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ম্যাসিডোনিয়ায়। আর বেশি কথা কী, এই তো সেদিন চীনের আক্রমণের সময়ে নেফা অঞ্চলে আমাদের জওয়ানদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ঐ এনোফেলিস মশা।

নানা দেশে কেবল সৈন্যবাহিনীর উপর অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হয়নি এনোফেলিস। দেশে দেশে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপরে তার অত্যাচার আরো ভয়াবহ। ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে ম্যালেরিয়ায়। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও বছরে প্রতি হাজার মৃতের মধ্যে আশী জনের মৃত্যুর কারণ ছিল ম্যালেরিয়া। সুখের বিষয় বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে, বিশেষ করে বাংলা দেশ থেকে এই রোগটাকে প্রায় উচ্ছেদ করা হয়েছে। এক সময়ে সিংহলের শহরাঞ্চল এবং গ্রামের দারুণ ক্ষতি করেছে এই ম্যালেরিয়া। বর্তমান কালে ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া রোগ নেই বটে, কিন্তু এক কালে সে দেশও রক্ষা পায়নি এ দুর্দৈবের হাত থেকে। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া সে দেশে দেখা দিয়েছিল মহামারী রূপে।

দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো এবং পূর্ব-আফ্রিকায় আজও ম্যালেরিয়ার ভীষণ দাপট। বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং ঘন-বসতি অঞ্চলে এই রোগের প্রকোপ বেশি।

এনোফেলিস জাতীয় মশা ধ্বংস করাই হ'ল ম্যালেরিয়া দূর করার প্রধান উপায়। কিন্তু এটা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্যে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার, আর চাই এক দল ট্রেন্ড লোক। আমাদের গবর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগে ম্যালেরিয়া স্কোয়াড নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

যেখানে জল জমে সেখানেই মশার উৎপত্তি। ড্রেনে, ডোবায়, জলাভূমিতে। এসব থেকে জল বের করে ফেলা দরকার। কখনো বা জলে বিষ ছড়িয়েও দিতে হয়। কোন কোন মাছ মশা-নাশক—পুকুরে ডোবায় সেই মাছের চাষ করলে ভাল হয়। আবার এমন গাছ-গাছড়াও আছে যার ছোঁয়ায় মশার বংশ বাড়তে পারে না ; সেই গাছ লতা লাগানো যেতে পারে। ডি. ডি. টি. স্প্রে করলেও মশার উপদ্রব কমে।

ম্যালেরিয়া রোগের চলতি ওষুধ হ'ল প্রধানতঃ কুইনাইন। ভীষণ তেতো ওষুধ। সিনকোনা নামক এক প্রকার গাছ থেকে এই কুইনাইন পাওয়া যায়।

যা হোক, আমার কথা এই, একবার যখন এই দিগ্বিজয়ী বীরের তথা এনোফেলিস মশার সন্ধান ও পরিচয় জানা গেছে, তখন একদিন নিশ্চয় তাকে সম্পূর্ণ শেষ করা যাবে।

মেঠুড়ে

ইংলণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ম্যাচ

ম্যানচেষ্টারে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলা হয়। ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এটা চতুর্থ সফর। দু দিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় হাতে রেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডকে এক ইনিংস ও ৪০ রানে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। অর্থাৎ পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা শেষ হতে পুরো তিন দিনও সময় লাগেনি। এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস জয়ের মূলে হাণ্ট ও গিবসের ভূমিকা, সেই সঙ্গে অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের সেঞ্চুরী এবং অধিনায়কোচিত প্রজ্ঞার কথাও স্বীকার্য।

টেস্ট খেলায় টসে জেতা এক মস্ত সুযোগ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টসে জিতে এই সুযোগ পায় এবং প্রথম ব্যাট করার সুযোগে অনেক রান তোলে। সোবার্স, গিবস এবং হলফোর্ডের বলেই ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ব্যাটস্‌ম্যানরা আউট হন। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দু'জন ব্যাটস্‌ম্যান হাণ্ট এবং সোবার্স সেঞ্চুরী করেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটস্‌ম্যানই সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। টেস্ট খেলায় গারফিল্ড সোবার্সের এটা পঞ্চদশ সেঞ্চুরী। এই খেলার ফলে টেস্ট খেলায় রান সংগ্রহের দিক দিয়ে সোবার্স নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের ভেতর এভার্টন উইকস সবচেয়ে বেশি টেস্ট রানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রানের সংখ্যা ৪৪৫৫। সোবার্স এই খেলার পর উইকসের রান ছাড়িয়ে গেছেন। নবাগত কলিন মিলবার্নের জীবনে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান আউট হওয়া এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে না পারা সত্যিই দুঃখের।

॥ ২ ॥

ক্রিকেটের পীঠভূমি লর্ডসে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। লর্ডসে খেলা চলেছে পুরো পাঁচ দিন। দু দলই জেতার এবং পরাজয় এড়াবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। লর্ডসে সেঞ্চুরী করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স এবং হলফোর্ড, আর ইংলণ্ডের নতুন খেলোয়াড় কলিন মিলবার্ন। ইংলণ্ডের টম গ্রেভনি মাত্র চার রানের জন্যে এবং জিম

পাকিস ন রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে এগিয়ে ছিল ইংলণ্ড, তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তারপর আবার ইংলণ্ড, এমন কি এক সময় মনে হচ্ছিল ইংলণ্ডের জয় সুনিশ্চিত, কেননা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে মাত্র ন রানে এগিয়েছিল— কিন্তু তারপরই সোবার্স ও হলফোর্ড এবং পরে আবার ইংলণ্ডের পক্ষে মিলবার্ন ও গ্রেভনী চাকা ঘুরিয়ে দেন। ইংলণ্ড দল কয়েকটা ক্যাচ ফেলে দেয়, কিন্তু ফিলডিং-এর মান ছিল বেশ উঁচু। দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের কৃতিত্ব কম ছিল না। তাঁর বোলিং ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ভয় ধরিয়েছিল।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের চ্যারিটি খেলাকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল, খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর সে উদ্দীপনা নিবে যায়। আই. এফ. এ. শীল্ডে একবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের শনিবারের ফাইন্যাল খেলা দেখবার জন্যে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাঠে লাইন পড়েছিল, কিন্তু লীগের খেলায় কখনো শুক্রবার সন্ধ্যের আগে লাইন পড়েনি। এবার লাইন পড়েছিল শুক্রবার সকাল থেকে। শুক্রবার ভোরে যাঁরা লাইন দিয়েছেন তাঁদের অনেকে এসেছিলেন বর্ধমান, বার্ণপুর, আসানসোল, কৃষ্ণনগর, আরামবাগ ইত্যাদি জায়গা থেকে। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের ইতিহাসে একটাও পয়েণ্ট না হারিয়ে দুই প্রধানের পরস্পর মুখোমুখি হবার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তাই ছিল এই খেলা নিয়ে এতো মাতামাতি।

লীগের খেলায় এটা ছিল মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের পঁচাত্তরতম খেলা। তোমরা শুনে অবাক হবে, এই পঁচাত্তরটা খেলায় মোহনবাগানের ২৫টা খেলায় জয়, ২৫টা খেলায় পরাজয়, ২৫টা খেলায় ড্র। ইস্টবেঙ্গলেরও তাই আলোচ্য চ্যারিটি খেলাটাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় লীগে দু দলের মর্যাদা ও অবস্থা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। যদিও খেলায় জিততে না পারায় ইস্টবেঙ্গলের কিছুটা আক্ষেপের কারণ ঘটেছে। কেননা, সেণ্টার ফরোয়াড গুরুকৃপাল সিং এবং রাইট আউট সুকুমার সমাজপতির একটা করে গোল উপযোগী শট ক্রস-বারে প্রতিহত হওয়ায় দুটো গোলের সুবর্ণসুযোগ নষ্ট হওয়া ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের আরো কয়েকটা ভালো শট অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মোহনবাগানও সুবর্ণসুযোগের অপব্যবহার না করেছে এমন নয়, এবং সারা খেলায় গোল করার সবচেয়ে সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন মোহনবাগানের রাইট আউট অশোক চ্যাটার্জি। এই খেলায় দু দলের গোলদাতা হাবিব এবং অসীম মৌলিক। খেলায় পনেরো মিনিটে হাবিবের মাটি-ঘেঁষা শট পোস্টের নিচে লেগে গোলে ঢুকতেই ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকে। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক থঙ্গরাজের ডাইভ দিয়ে ফিষ্ট করা বল ফাঁকা অবস্থায় দাঁড়ানো অসীম মৌলিকের পায়ে পড়তে অসীমের গোলে মোহনবাগানের গোল শোধ।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

কানাই বলাই—স্বপনবুড়ো। নিওরিট ৪৫ মহারাজ ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১। মূল্য ১'৫০

শিশু-সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক 'স্বপনবুড়ো'র আর একখানি মজাদার নাটিকা 'কানাই-বলাই'। কাব্যের মাধ্যমে কানাই-বলাই দুই ভায়ের কাহিনী নিয়ে এই নাটিকা রচিত। এর মধ্যে কংসের রাজপুরী, গোকুলে নন্দের আলয় প্রভৃতি দৃশ্য যেমন আছে, তেমনি চরিত্র হিসাবে আছে, যশোদা, নন্দ, কংস, নারদ, পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি। নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে এই নাট্য-কাব্য ছোটদের খুবই খুশি করবে। সীতেশ রায়ের ভিতরের ছবিগুলি ও প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদপটটি ভারী সুন্দর।

—

আজব ছড়া—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু। লেখা-পড়া, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১'৫০

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ, কৃ, ব) কেবলমাত্র বড়দের জন্য লেখাতেই যে সিদ্ধহস্ত তা নয়, ছোটদের মজার লেখাতেও তাঁর হাত পাকা। 'আজব ছড়া' বইটি পড়লে সকলেরই তা মনে হবে। এই বইয়ে আছে ত্রিশটি মজার ছড়া বা কবিতা। লেখার সঙ্গে জোট বেঁধেছে শিল্পী রেবতীভূষণের মজাদার ছবিগুলি। ছড়ার ভাষা এবং ছন্দ এমন সুন্দর যে ছোটদের পড়তে-পড়তেই মুখস্থ হয়ে যাবে। বইটি হাতে পেলে তারা যে শুধু নিজেরা পড়েই মশগুল হবে তা নয়, পাঁচজনকে পড়ে শোনাবারও আগ্রহ জাগবে। প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

—

বুদ্ধি নিয়ে খেলা—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩'০০

নানা রকমের ধাঁধা ও বুদ্ধির খেলা নিয়ে লেখা ননীগোপাল বাবুর এই বইখানি ছোটদের কৌতূহল, জ্ঞান ও আনন্দের একখানি অভিনব বই। এ ধরনের বই আর আছে কিনা সন্দেহ। পাতায় পাতায় ছবিওয়ালা এই বই নিয়ে ছোটরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে এবং ধাঁধাগুলির উত্তর বার করে প্রচুর আনন্দ পাবে। 'মৌচাক' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে এগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেরিয়েছিল। উপহারেও এ বই ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিলে, তারা আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধিকে মার্জিত করারও সুযোগ পাবে। প্রচ্ছদপটটি বইয়ের বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে।
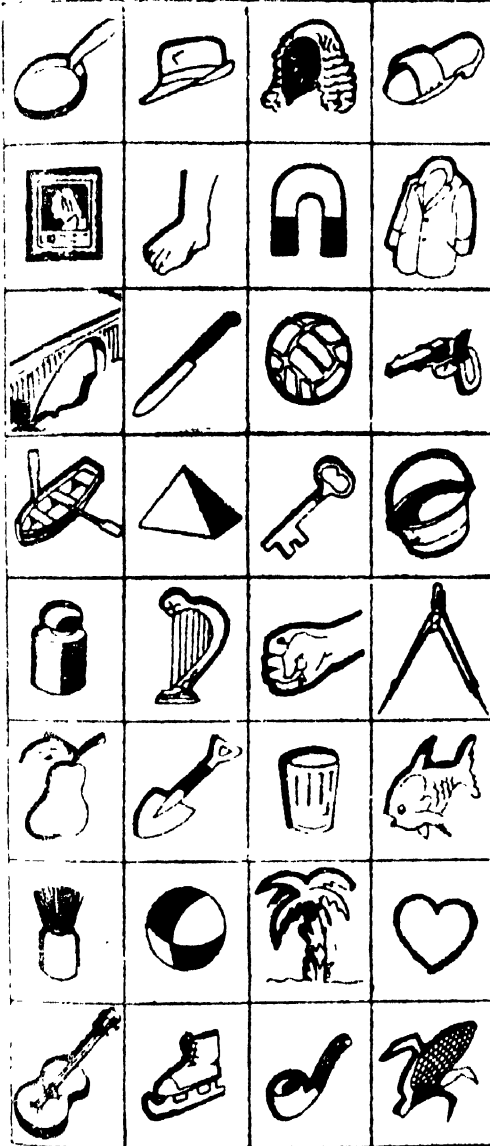
—

ধাঁধার পাতা

বাজিকর

১। ছবিতে মোট বত্রিশটি জিনিস দেখা যাচ্ছে। ওগুলির প্রত্যেকটির নামের আদ্যক্ষর (প্রথম অক্ষর) নিয়ে একই অক্ষরের কয়টি জিনিস আছে বলতে পারো?

একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি—যেমন, কোট ও কম্পাস, উভয়েরই প্রথম অক্ষর ক।

—

২। নীচের ছবিতে এক থেকে পঞ্চাশ অবধি সংখ্যাগুলি দেওয়া আছে। ওর মধ্যে কিন্তু একটা সংখ্যা নেই এবং একটি সংখ্যা দু'বার করে লেখা হয়েছে। কোন্ সংখ্যা নেই, এবং কোন্‌টিই বা দু'বার করে লেখা হয়েছে বলতে পার?
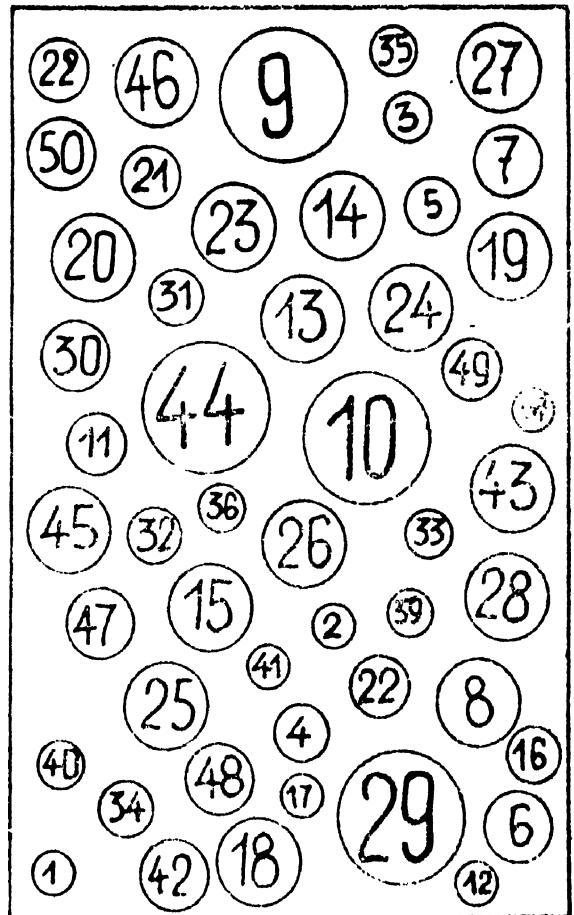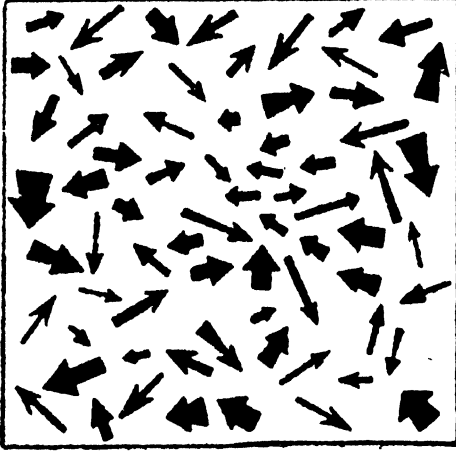
৩। ছবিতে অনেকগুলি তীর দেখা যাচ্ছে। কতগুলি তীর আছে কত তাড়াতাড়ি বলতে পার ?

—

৪। তিন অক্ষরে নাম মোর সদা কাজে রত,
দ্বিধা যদি করো মোরে দেখিবে অদ্ভুত।
প্রথম অর্ধেক মোর থাকে ঘরে ঘরে
শুভযোগ, শুভকাজে বাজে সমস্বরে।
দ্বিতীয় অর্ধেকে দেখি ডরে যত জনা,
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে সতীর গহনা।

কুমারী সুস্মিতা রায় (গয়া)

—

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

—

বাক্য-পূরণের ধাঁধা

[বড় অক্ষরে লেখা শব্দটির দুটি করে প্রতিশব্দ দিয়ে প্রতি সারিতেই শূন্যস্থান দুটি পূরণ করতে হবে। ছন্দ (পয়ার—চতুর্দশপদী) যেন বজায় থাকে।]

— — **দৈত্য** পার্থক্য তো নাই,
— — ও **সুত** এ তিনেও তাই।
— — ও **জনক** এক এই তিন,
— — **মা** হয় যে অভিন।
এক অর্থ ধরে তিন — — **সাদা,**
— — ও **ফুল** নহেক আলাদা।
— — ও **সাপ** এক অর্থ হয়,
— — **করী** এক বিজ্ঞ লোকে কয়
— — **ব্যাধ** কভু ভিন্ন নহে,
— — ও **বৃক্ষ** এক অর্থ বহে।
এক অর্থ ধরে — — **ধরণী,**
এক যান জেন — — ও **তরণী।**
— — **ব্যোম** একই জানবে,
— — **প্রভা** তিনে অভিন্ন মানবে।
— — আর **নীরে** প্রভেদ তো না
— — **হয়** এক জেনে রেখ ভাই।

[দু'সারি নমুনা দেখান হ'ল। এবার চেষ্টা ক পারবে নিশ্চয়।]

অসুর দানব **দৈত্য** পার্থক্য তো নাই
তনয় পুত্র ও **সুত** এ তিনেও তাই।

—**শ্রীবিনয় বাগ**

(সম্পূর্ণ কবিতাটি আগামীবার প্রকাশিত হ

দেশের মাঝে নানা দুর্যোগ চলেছে—সুস্থ জীবন আমরা যেন হারিয়ে ফেলতে বসেছি। বছরের ক'টা দিনই বা আমাদের সুস্থ ভাবে কাটছে—দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ, স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে সব স্থানেই দুর্ঘটনা। সকালে উঠে সংবাদপত্রখানি হাতে নিয়ে পড়বার আগে ভাবতে হয়—কি জানি কি কি দুঃসংবাদ আমাদের জন্য বহন করেছে। আর কাগজ খুললেই কিছু না কিছু ঘটনা, সময়ে সময়ে সাংঘাতিক ঘটনার কথাই পড়তে হচ্ছে। ট্রেন দুর্ঘটনা যেন প্রাত্যহিক হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাছাড়া সর্বত্রই আতঙ্ক, সর্বত্রই অভাব-অভিযোগ, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার করাল ছায়া। এই রকম দিনে তোমাদের কী আমার কথা শোনাবো তাই ভাবি। কিন্তু তবুও বলি মনে সাহস রাখো--সামনের দিকে এগিয়ে চলো। প্রার্থনা করো পৃথিবীর দুর্দিন কেটে যাক—নতুন প্রভাতের উদয় হোক।

মহাজীবন থেকে

আজকের ইতিহাসে মেয়েদের নবজাগরণ দেখি—প্রয়োজন হলে প্রিয়জনকে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে দ্বিধা করে না, অশ্রুবিসর্জন করে না। অতীতে এই দৃশ্য দেখেছি রাজপুতানায়, দেখেছি মেবারে। যুদ্ধের দিনে মেয়েরা হাতিয়ার হাতে চলেছে শত্রু-সংহারে—চোখে তাদের ঘৃণা ও প্রতিশোধের তীব্রতা ফুটে উঠেছে, অন্তরে বজ্রবাণী: জীবন কিম্বা মৃত্যু—অধীনতা নয়। তাদের এই বীরদর্পে চলার ভঙ্গীতে, শত্রু-নিধন বাসনার ভিতর দেখিছি অতীত ভারতের একটি মেয়ের ছায়া, একটি মেয়ের ছবি।

সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর সিংহাসনে। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন। উড়িষ্যার পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের উত্তরে গোণ্ডয়ানা প্রদেশ—সুশাসন ও সুপরিচালিত দেশ, ধন-ধান্যে সুখ-স্বস্তিতে পরিপূর্ণ।

রাজ্য পরিচালনায় স্বামীহীনা রানী এবং পাশে সাত বছরের নাবালক পুত্র।

এই শান্তি সুখ পূর্ণ গড়মণ্ডলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো আকবর সেনাপতি আসফ খাঁ'র। গুপ্তচর পাঠিয়ে গড়মণ্ডলের সমস্ত পথঘাট জেনে নিলেন।

সংবাদ গড়মণ্ডলে এসে পৌছলো। কুমারী জীবনের অধীত বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষাকে কাজে লাগাবার সুযোগ জীবনে দেখা দিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আসফ খাঁ'র অগণিত সৈন্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন

রানী। হাতের মুক্ত তরবারী সূর্য-কিরণে তীব্র আলোক বিকিরণ করলো! মুখে বজ্রমন্ত্র—'জীবন কিম্বা মৃত্যু, অধীনতা নয়'।

বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে লাগলো—গড়মণ্ডলে একটি প্রাণী জীবিত থাকতে মোগল যেন প্রবেশ করতে না পারে—এই হলো পণ।

যুদ্ধের মাঝখানে কিশোরকুমার বাণবিদ্ধ হয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করলো। রানী আরো ভীষণ মূর্তিতে শত্রু-সংহার করতে লাগলেন। অশ্রুবর্ষণের সময় নেই—পুত্রের চেয়ে বৃহত্তর কর্তব্য সামনে।

চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই বীরাঙ্গনা মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভীষণা দেবী-মূর্তি। বাণ এসে গলায় বিঁধলো—টেনে ফেলে দিয়ে, প্রবল শক্তি নিয়ে আবার সংহার-মূর্তিতে মেতে উঠলেন—বহু মোগল সৈন্য নিধন হলো। কিন্তু রক্তক্ষরণে লাল হয়ে গেছে দেহ, শক্তি কমে আসছে, চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—তবুও যুদ্ধ করতে করতে মন্ত্রীকে ডেকে তরবারী দিয়ে বল্লেন : মোগলরা আমার রাজ্যে প্রবেশ করবার আগে আমায় শান্তি ও স্বস্তি দিন। শত্রু যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে না পায়। মন্ত্রী ইতস্ততঃ করছেন দেখে, রানী স্বহস্তে নিজ মুণ্ড ছেদন করলেন।

'জীবনের মত জীবন কিম্বা মৃত্যু, অধীনতা নয়'—এই তেজোদীপ্ত বাণীর সার্থক রূপ দিলেন—গড়মণ্ডলের রানী দুর্গাবতী॥

চিঠির উত্তর

চিত্ত মাইতি, হলদিয়া, মেদিনীপুর :—তোমার একটি কবিতা তো ছাপা হয়েছে। হলদিয়া বন্দর দেখার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশী হলাম।

রবি চক্রবর্তী, কোলকাতা :—জীবনে প্রথম মানুষ অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করে বলেই অন্নপ্রাশনে উৎসব হয়।

শম্পা পাল, ডবলু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কোলকাতা :—চিঠি-ভর্তি তোমার স্কুলের গল্প ভাল লাগলো—কিন্তু পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?

মিণ্টু ঘটক, কোলকাতা ও তার সঙ্গী-সাথীরা, যেমন গোপা, দেবতোষ, মলি আর রেশমী :—তোমাদের আনন্দানুষ্ঠানের বিবরণ পড়ে খুশী হয়েছি।

শ্রাবণী, অরিন্দম ও মিমি, কোলকাতা—৩২, আর মৌসুমী চক্রবর্তী, রাধা দত্ত :—চিঠি পেয়েছি। সকলে ভালবাসা নিও।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০·৪৫ প
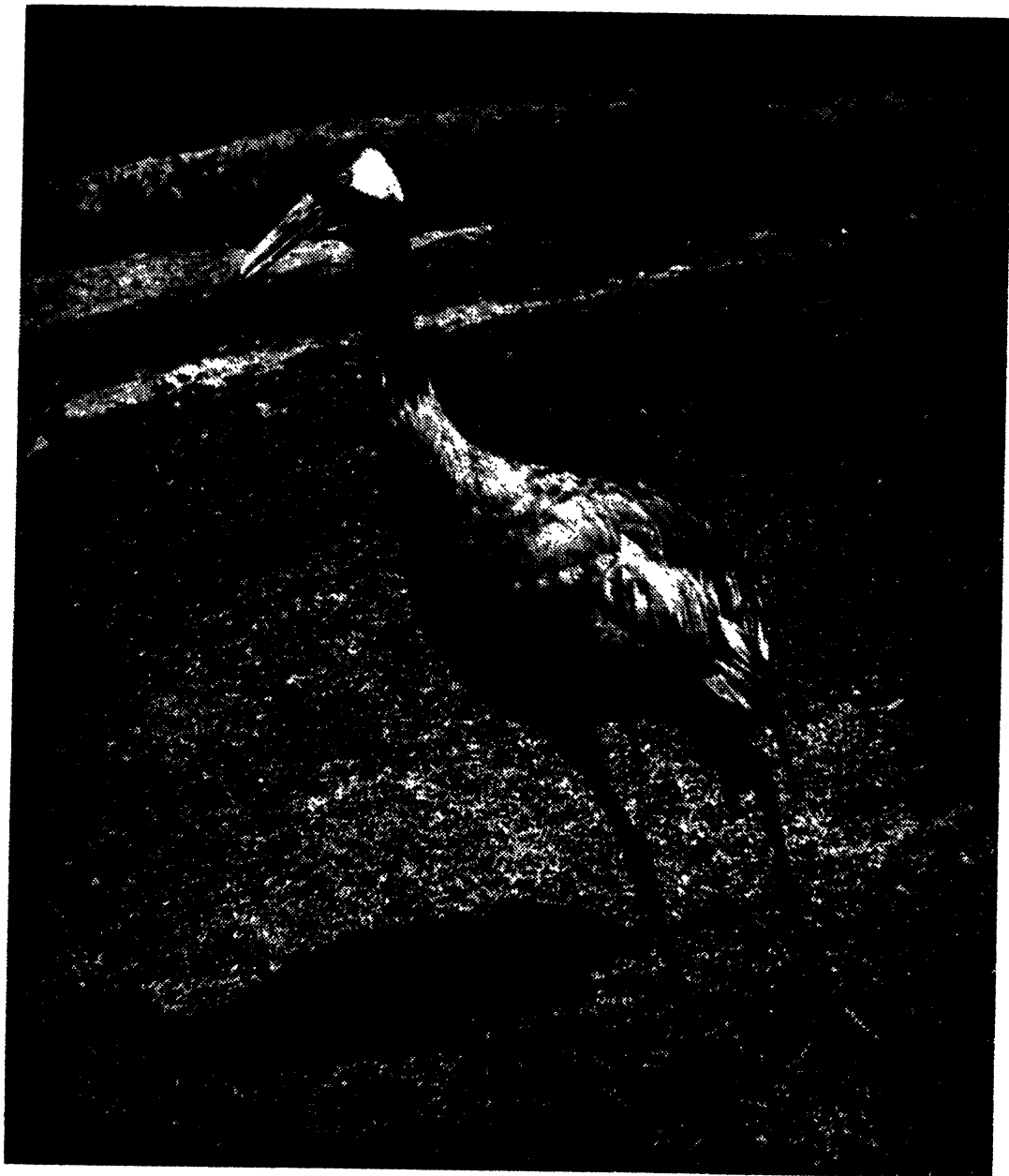
পাখী, কিন্তু ওড়ে না

ফটো : শ্রীরামকিংকর সিংহ

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৭শ বর্ষ] ভাদ্র ঃ ১৩৭৩ [৫ম সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা শুভখনে সে কোন্ তপোবনে না জানি আদিযুগে কবে—
কেবা সে মহামনা জানা'ল এ কামনা, "ধরণী মধুময়ী হবে।
মধুর বায়ু ব'বে, সাগরে মধু র'বে, মধুর দুধ দিবে গাভী ;
তরু ও ওষধিরা হইবে মধুক্ষীরা, ঝরিবে মধু নভ-প্লাবি ;
মধুর হবে রাতি, রবি সে মধুভাতি, ধূলিও হবে মধুকণা ;
পিতার মধুস্নেহ ভরিবে মন দেহ" করিয়াছিল কলপনা।
ঋষির সে বাসনা যদিও মিটা'ল না দেবতা,—তবু পৃথিবীতে
এসেছে বহু সূরী রচিতে মধুপুরী আপন মনোমাধুরীতে।

প্রেমের মৌচাকে তারা যে মধু রাখে নিখিল মানবের তরে—
সে মধু লভি' হয় জীবন মধুময় নিকটে দূরে ঘরে ঘরে।
কুসুম থরে থরে কাননে প্রান্তরে ফুটিছে তরুলতাতৃণে,
কেহ বা সুরভিতে বিদিত চারিভিতে, কেহ বা রূপে মন জিনে ;
কেহ বা অনাদরে বিজনে ফুটি' ঝরে,— না' বাস,—নাহি দেহ শোভা,
তাদের কা'র কাছে কত যে মধু আছে জানেনা তারা হয়তো বা।
কেবল মধুব্রত জানে তা,—অবিরত তাই সে ফিরে সবে যাচি',
সবার করি' সেবা যা দিতে পারে যেবা আহরি' আনে মধুমাছি।
সে মধু দেয় রাখি' আপন জন লাগি' মমতাভরে মৌচাকে ;
ভুলিয়া তার স্বাদে মানুষ বাদ সাধে ছলে বা বলে লুঠি' তা'কে।
মোহিত তার গুণে ভালো যা দ্যাখে শুনে 'মধুর বলে স্মরি' ওকে ;
অযুত বরষের আশা ও হরষের প্রতীক মধু নরলোকে।

জানো কি জনালয়ে হৃদয়ে মধু ল'য়ে মানুষ-কুসুমেরা রাজে ?
কারো বা মধুভরা মরম পড়ে ধরা নিয়ত জনসেবা-কাজে ;
কেহ বা মধু-ঢালা কথাতে গাঁথে মালা, কেহ বা মধু-সুরে গাহে ;
ধাতু ও শিলা দিয়া মুরতি বিরচিয়া বিলা'তে মধু কেহ চাহে ;
ছবিতে মধু ভরি' নয়ন লয় হরি' নিপুণ কোনো রূপকারে ;
হাসিয়া করে দান জীবন—মধুমান্ কেহ সে পর-উপকারে।
মানুষ মধুমাছি সবার দ্বারে যাচি' তাদের মধু রাখে ভরি' ;
সে মধু অনায়াসে মোদের ঘরে আসে। আমরা তা'রে অনুসরি'—
এনেছি ভাইবোন হৃদয়ে যে যেমন মধু—তা' রেখে যাব চাকে ;
জীবনে রচনাতে যা আছে ভালো—তা'তে সবারি ভাগ যেন থাকে।

পাখী, কিন্তু ওড়ে না

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

পৃথিবীতে যত রকম পাখী আছে তাদের প্রধান গুণ হচ্ছে ওড়া। অধিকাংশ জীবন্ত প্রাণীর এক বা একাধিক নড়াচড়ার উপায় আছে—যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ডানা বা পাখনা। তবে দীর্ঘকাল অব্যবহারে এগুলির ব্যবহার-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিবর্তনের এই ধারার দৃষ্টান্ত ওড়ার শক্তিহীন পাখী। এরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৃথিবীতে এক সময় উড়তে সক্ষম ছিল, কিন্তু এখন অনেকেই তা আর পারে না। এদের ওড়বার শক্তি সহজেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওড়ার মাংসপেশীর জটিল গঠন, হাড় এবং পালকযুক্ত ডানার বিস্তারের অভাবেই শুধু নয়, পাখীর আকাশে ওড়ার একান্ত প্রয়াসও একটি প্রধান কথা। যখন ওড়ার চেষ্টা আর দরকার হয় না, কারণ তখন যথেষ্ট খাদ্য মাটিতেই পাওয়া যায় এবং এখানে বিপদ-আপদের: সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে পাখীর ওড়বার ইচ্ছেই যে শুধু চলে যায় তা নয়, দৈহিক পরিবর্তনের ফলে ওড়বার শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, আর তা তারা ফিরে পায় না। বুকের হাড়ের যে অংশ ওড়বার মাংসপেশী সংযুক্ত থাকে তা তাদের তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ক্ষতিপূরণ হয় তাদের পায়ের শক্তিবৃদ্ধিতে, যাতে সে দরকার হলে দ্রুতগামী হতে পারে।

নিউজিল্যাণ্ডের ৭০০ পাউণ্ড ওজনের বিরাট মোয়া পাখীর পূর্বপুরুষ এক সময় আকাশে উড়তো—আজ তা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু এটা সত্য। শতাব্দীকালের মধ্যেই এর ওড়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়ে ডানাগুলি ক্রমে ক্রমে অনাবশ্যক পালকযুক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

স্থানীয় আদিবাসী ও মাওরী সম্প্রদায় এদের শিকার করার ফলে এই পাখীরা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

মোয়া পাখীর বংশানুক্রমে নিউজিল্যাণ্ডে আর একটি জীবন্ত পাখী হ'ল কিউই, যা এই দেশের জাতীয় প্রতীক। খুব বড় মোরগের মত এদের আকৃতি। এদের মাংসযুক্ত ডানা লম্বা, লোমযুক্ত পালকের আড়ালে ঢেকে থাকে এবং ছোট হৃষ্টপুষ্ট পায়ে দৌড়বার সময় এদের অঙ্গভঙ্গী সুন্দর দেখায়। এদের ঠোঁটের শেষে নখ থাকায় ঘ্রাণশক্তি আছে বলেই লোকের বিশ্বাস। অধিকাংশ ওড়ার শক্তিহীন পাখীর মত, মোয়া পুরুষ পাখীই বিরাট ডিমে তা দিয়ে তা ফোটায়। এই পাখীদের লুপ্ত হবার এখন আর কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ স্থানীয় গভর্নমেণ্ট আইন করে এদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

উত্তর অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের জঙ্গলের ক্যাসোয়ারী (Cassowary)

পাখীও তার ওড়ার শক্তি হারিয়েছে। সাউথ আমেরিকান রিয়া এবং ডারউইনস্ রিয়া এই দুই শ্রেণীর পাখীও ব্রেজিল এবং আর্জেন্টিনার ঘন জঙ্গলে বাস করত। রিয়া
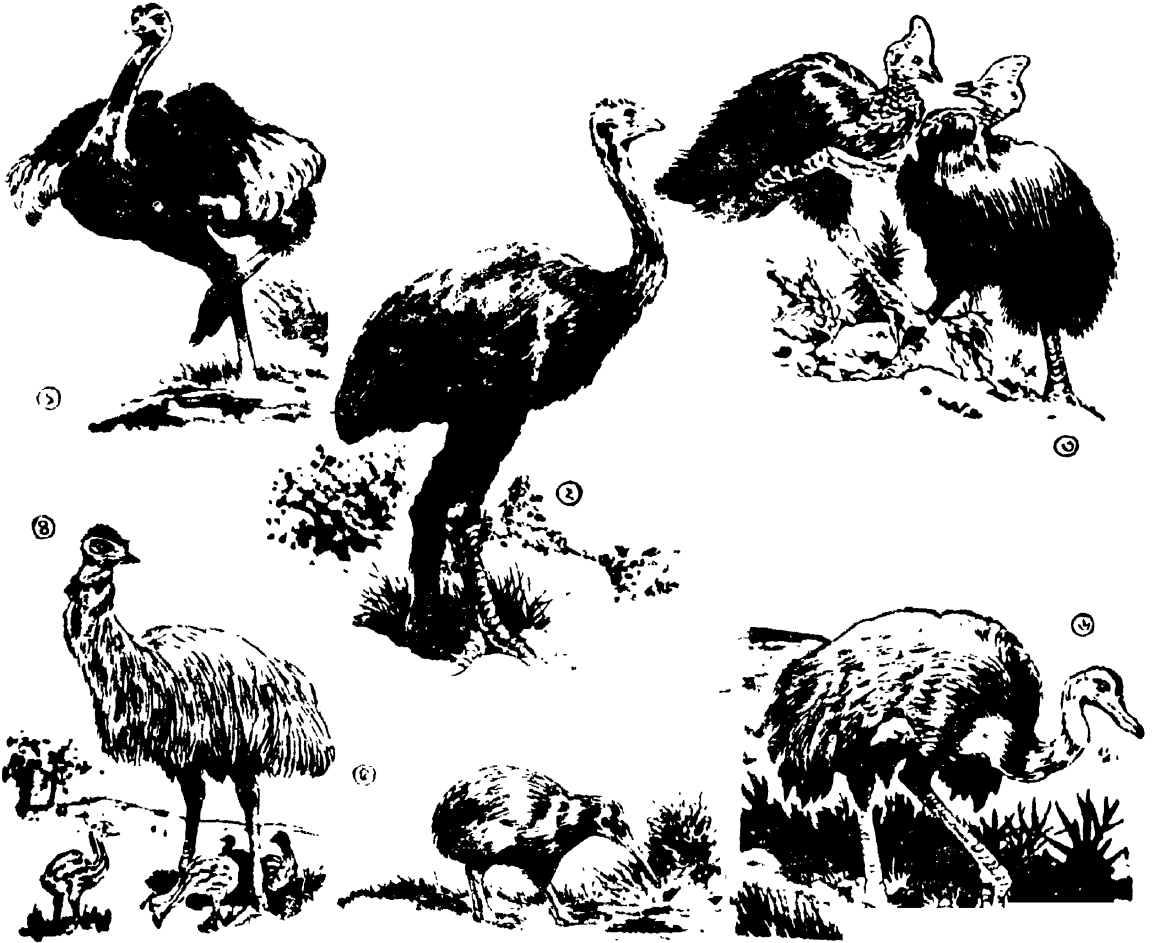
১। অস্ট্রিচ ২। মোয়া ৩। ক্রশওয়ারি ৪। ইমু ৫। কিউই ৬। রিয়া

পাখীরা ৪ থেকে ৫ ফিট উঁচু হয়ে থাকে। একটি পুরুষ রিয়া ৬টি স্ত্রী রিয়া নিয়ে বাস করে এবং পুরুষরাই ডিমগুলির যত্ন নেয়।

সাউথ আমেরিকান রিয়াদের ক্ষুদ্র আকার হ'ল ডারউইনস্ রিয়া। এই পাখীরা হিংস্র জন্তুর মতই খুব হিংস্র হয়ে থাকে এবং অশ্ব ও অশ্বারোহীদেরও আক্রমণ করে থাকে।

আর এক রকমের বড় পাখী হ'ল অষ্ট্রেলিয়ার এমু। এদের খুব ছোট ডানা

আছে। এদের পালক রিয়ার মতই ছিল এবং এরা দৌড়তে ও সাঁতার দিতে পারে, যদিও এদের পায়ের আঙুল জোড়া নয়।

সর্বাপেক্ষা জীবন্ত পাখী হচ্ছে অষ্ট্রিচ। এরা উচ্চতায় প্রায় ৮ ফিট এবং এদের ওজন ২০০ থেকে ৩০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক সময় আফ্রিকায় এদের খুব বেশী দেখা যেত। মানুষ এদের পালক ও খাওয়ার জন্য শিকার করত। এইভাবে হত্যা করতে করতে এরাও প্রায় আজ অদৃশ্য হয়ে এসেছে।

গালাপ্যাগো দ্বীপে বৃহদাকার একপ্রকার সামুদ্রিক পাখী পাওয়া যায়, যাদের পায়ের আঙুলগুলি জোড়া এবং যারা উড়তে সক্ষম নয়।
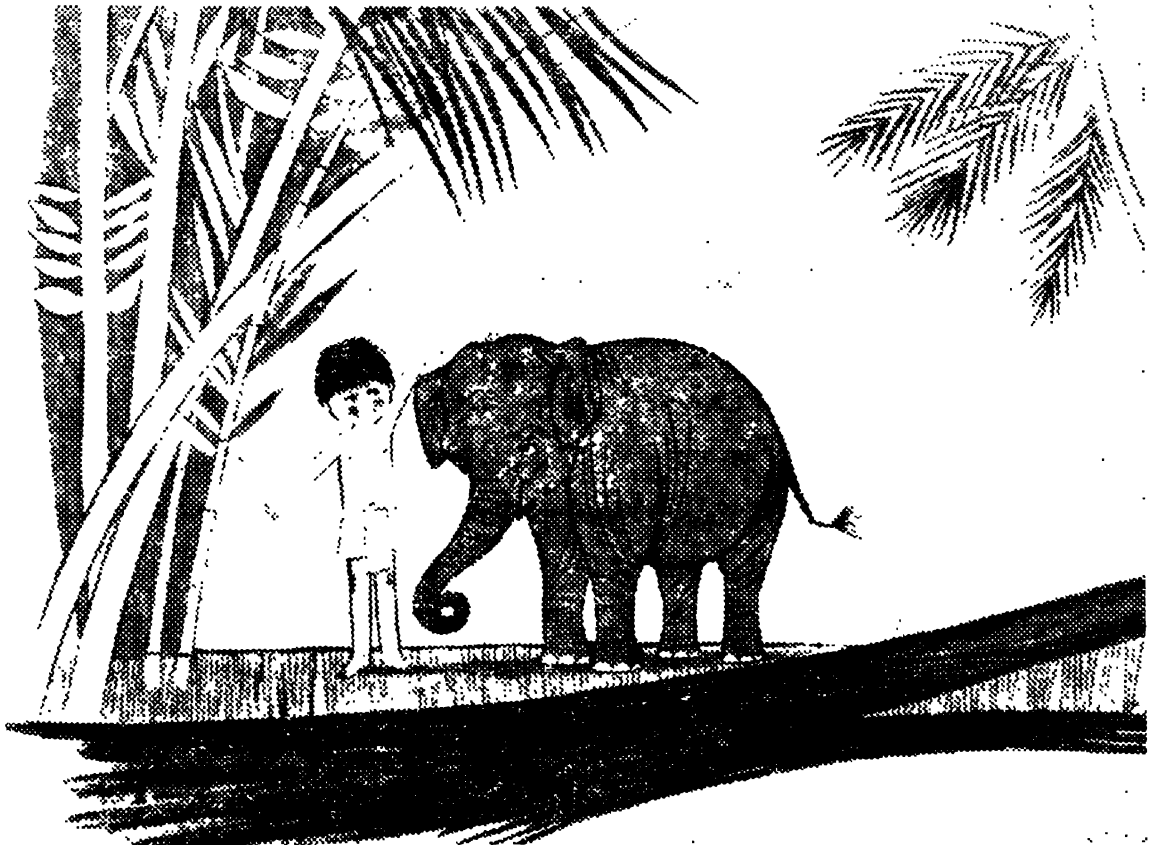
ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর টেলিভিসনে পুতুল নাচের সাহায্যে প্রতিদিন বিকালে আধঘণ্টা করে ছোটদের আনন্দদানের ব্যবস্থা আছে। এই ছবিটি সেই সিরিজের 'বড় এবং ছোট হাতী' গল্পের একটি রোমাঞ্চকর ছবি।

ছানা-বাড়ি

শ্রীশৈলশেখর মিত্র

সরকারী কাজ করি। দার্জিলিং-এ বদলি হয়ে এসেছি।

সাধারণতঃ আমি একটু ভাবুক প্রকৃতির। দর্শনের ছাত্র ছিলাম আবার, আবার আজগুবী গল্প লেখারও একটু-আধটু নেশা আছে। আমার অফিসের লোকেরা আমার এই উদাসীন খাপছাড়া স্বভাবের জন্যে আমায় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেও ছাড়ে না। এমন কি, কোন সিরিয়াস্ কথা বল্লে তারা সিরিয়াস্‌লি পর্যন্ত নেয় না।

পুজোর ছুটিতে প্রায় সকলেই যে-যার বাড়ি গেছে। আমার আপনার বলতে বিশেষ কেউ নেই। তাই পুজোর ছুটিটা কি করে কাটাব সেটাই আমার কাছে রীতিমত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। গত মাসে মাসিক কিস্তিতে যে স্কুটারটা কিনেছি, এতদিন সেটা চেপে শুধু অফিস আর মেস্ অবধি যাতায়াত করেছি, ভাবলাম এবার এটা ব্যবহার করার বেশ চমৎকার সুযোগ এসেছে। ঠিক করলাম প্রতিদিন বেশ কিছু দূর গিয়ে আউটিং করে আসব।

মনে আছে সেদিনটা ছিল মহা-অষ্টমী। একটা ব্যাগে কিছু খাবারদাবার আর একটা ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়ে, আমার স্কুটার-বাহনে চেপে, আমি কার্ট রোড ধরে সিধে 'ঘুমের' দিকে রওয়া হলাম। ইচ্ছে ছিল বেশ কিছুদূর গিয়ে কোন পাইন গাছের তলায় বা কোন ঝর্ণার পাশে সারাদিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যে নাগাত বাড়ি ফিরব।

বেশী দূর যাওরা হ'ল না। হঠাৎ ঝাঁকিয়ে বৃষ্টি নামল। সব কিছু তখন আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছে। আবার রাস্তাও অত্যন্ত পিছল হয়ে উঠেছে। এত জোরে হাওয়া দিচ্ছে যে স্কুটার একবার এদিক আর একবার ওদিক করছে। আমার পক্ষে ব্যালেন্স ঠিক রাখাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। আমার অবস্থা তখন ঠিক যেন ঝড়ের মধ্যে মাঝ গঙ্গায় হাল-ভাঙ্গা একটা নৌকা। নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই বাধ্য হয়ে স্কুটার থেকে নামতে হ'ল।

ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না।। বাঁ পাশের পাহাড়ে অস্পষ্ট একটা বাংলো দেখতে পেলাম। কিন্তু যাবার কোন পায়ে-চলা পথ দেখতে পেলাম না—আর পথ থাকলেও সেই দুর্যোগে তা আবিষ্কার করা অসাধ্য। স্কুটার ঠেলতে ঠেলতে এবড়ো-খেবড়ো চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলাম। পৌঁছে দেখি, একটা অপরিষ্কার বাড়ি। কাঠের ভাঙা ফটক্ এখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। চারপাশে আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। আমি ওপরের বারাণ্ডার তলায় চাতালে এনে আমার স্কুটারটা রাখলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে সর্বাঙ্গের জল

পুঁছলাম। শেষে রুমালটা নিংড়ে পকেটে পুরে রেখে চারদিক ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বাড়িটা একেবারে পড়ো-বাড়ি বলা চলে। বাড়িতে যে কেউই থাকে না তা সহজেই বোঝা যায়। সামনের দরজাটা ধুলোয় ধুলোয় কালো হয়ে গেছে। অন্যমনস্ক ভাবে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর দরজাটা খোলার জন্যে আস্তে করে ঠেলতে সেটা সহজেই খুলে গেল। কিন্তু যেই ছেড়ে দিলাম, অমনি মনে হ'ল কে যেন পেছন থেকে ঠেলে বন্ধ করে দিল। স্প্রিং দেয়া আছে মনে করে দরজাটা হাতে চেপে ধরে ভেতরে ঢুকে দেখি—না, তেমন কোন স্প্রিং দেয়া নেই। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল।

আমার মনে কোন কুসংস্কার নেই। আর ভয় জিনিসটা চিরদিনই আমার অল্প, তবুও কেন জানি ভয়ে আমার গাটা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। ঘরটা ধুলোয় ধুলো। দেয়ালের এক ধারে ড্যাম্প লেগে সাদা সাদা ছাতা পড়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। কাঁচের জানালাগুলো পুরু ধুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাই ঘরের মধ্যে দিনের বেলাও ভাল করে আলো ঢুকতে পারে না। চারদিকের আসবাব-পত্র নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য একটাও চুরি যায়নি। অথচ অন্য সব পড়ো-বাড়ির জানলা দরজা পর্যন্ত চোরেরা খুলে নিয়ে যায়। ফাঁকা মাঠের উপর এমন একটা জনমানবহীন বাড়ি যে কি করে অক্ষত দেহে পড়ে থাকতে পারে তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে এপাশ ওপাশ ঘোরার পর পাশের ঘরের দিকে এগোতেই সামনে চওড়া সিঁড়ি নজরে পড়ল। দোনামোনা করেও শেষ অবধি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলাও ধুলোয় ভাত। এত ধুলো যে মেঝের কার্পেটের আগে কি রঙ ছিল এখন আর চেনা যায় না। এমন কি টেবিলে রাখা টাইমপিস্‌ থেকে সেলফে রাখা জুতোগুলো সবই যেন দেখলে মনে হয় এক-একটা ধুলোর স্তূপ। এত ধুলোর মধ্যেও নজর পড়ল মেঝের ওপর কি যেন একটা ভারী, জিনিস নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট দাগ। যেন কে কি এই মাত্র টেনেছে। দাগটা ঘরের আর এক পাশের দরজা পার হয়ে গেছে। আমি ভয়ে দাগটা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম।

দাগটা পাশের বারাণ্ডা পার হয়ে একটা বাথরুমের মধ্যে চলে গেছে। যা দেখে আমার সবচেয়ে অবাক লাগল তা হচ্ছে, দাগটা ঠিক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে তখনো একটা আচকান পড়ে, আর তার পাশেই পড়ে আছে একটা ছোরা। আস্তে চিমটি কেটে আচকানটা তুলে ধরে দেখি, আচকানটা তিন জায়গায় ফালা ফালা করে ছেঁড়া। যেন কে ছুরি দিয়ে কেটেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য মেঝের দাগটা, যেন মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেউ

কোন ভারী জিনিস টেনেছে। কিন্তু এ বাড়ির কোথাও আমি ছাড়া কোন দ্বিতীয় মানুষের কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। এমন কি, মেঝেয় আমার ছাড়া আর কারো পায়ের চিহ্নের দাগও চোখে পড়ল না। এই সব দেখে আমার কিরকম মনে হ'ল এ যেন ভুতুড়ে ব্যাপার। ভাবলাম, এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই, কিন্তু এ ভাবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পৌরুষে বাধল। আর তখন বৃষ্টির তোড়ও বেশ জোর—তাই পালিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সত্যিকথা বলতে কি, এ ভাবে একা ও-ঘরে দাঁড়িয়ে থাকার সাহসও আমার ছিল না। আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

নেমে এসে বাইরে চাতালে যেখানে আমার স্কুটারটা রেখেছিলাম সেখানে এগিয়ে গেলাম। যদিও চাতালটা দোতলার বারাণ্ডার ছাউনির তলায়, কিন্তু তবুও পাশ থেকে জলের ছিটে এসে স্কুটারটা ভিজিয়ে দিয়েছে। খাবারের ব্যাগটা চোখে পড়তে আমার খিদেও যেন পেয়ে বসল আমি ব্যাগ আর ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে আবার একতলার ঘরে এসে ঢুকলাম। এবার একটা চেয়ার টেনে সামনের দরজাটা আটকে দিলাম, যাতে আবার না কোন উপায়ে বন্ধ হয়ে যায়।

খাবারের ব্যাগটা সামনের টেবিলে রেখে খুলতে যাব, এমন সময় খট্ করে একটা শব্দ হ'ল। চমকে উঠে সামনে চাইলাম। কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। নিজেকে বড় অসহায় দুর্বল বলে মনে হ'ল। আকাশে তখন একবার জোরে বিদ্যুতের ঝলকানির পর আশপাশে কোথাও একটা বাজ পড়ার শব্দ পেলাম। আমি খাবার বের করে সবে চায়ের ফ্লাস্কটা খুলতে যাব—আবার সেই খট্ করে শব্দ। এবার শব্দটা বেশ স্পষ্ট। চেয়ে দেখি, দরজার সামনে সেই আচকানটা প'রে কোন অশরীরী যেন দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় আচকানটা যেন হাওয়ায় ভাসছে। তারপর দেখি, আচকানটার সেই তিনটে ছেড়া জায়গায় তিনবার একটা ছোরা এসে গাঁথল। তারপর আচকানটা কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। ছোরাটাও খটাং করে পড়ে গেল মেঝের উপর।

শেষে সেই অশরীরী মূর্তি ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে বাগিয়ে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি চেঁচাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চেষ্টাই সার হ'ল, গলা দিয়ে কোন স্বর বের হ'ল না। আমার সারা শরীর ম্যালেরিয়া রুগীর মত থরথর করে কাঁপতে লাগল। সবচেয়ে বড় কথা, এই রকম একটা ভয়ংকর অবস্থাতেও আমি কিন্তু মূর্ছা যাইনি। ছোরাটা ভাসতে ভাসতে আমার কাছে যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমিও এক-পা এক-পা করে ততই পেছনে সরে যেতে লাগলাম। শেষে টেবিলে ধাক্কা খেয়ে আর

পেছবার উপায় রইল না। এদিকে ছোরাটা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে ছোরাটাকে বাধা দেওয়ার সাহস তো মোটেই হ'ল না বরং আমার হাত দুটো পেছনের টেবিলের উপর ক্রমাগত চলে যেতে লাগল। ছোরাটা আমার হাত দুই সামনে এসে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। তখন আমার হাতে টেবিলে রাখা ফ্লাস্কটা এসে ঠেকল আর আমার

মুখ দিয়ে শুধু 'রাম রাম' শব্দ বেরিয়ে এলো। হয়ত রাম নামের মাহাত্মেই হবে—প্রদীপ নেবার আগে দপ্ করে যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি মরার আগে আমার মনে সাহসের ঝলকানি খেলে গেল।

২

এতক্ষণ একবারও আমার চোখের পাতা পড়েনি। এবার চোখ বুজে ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে ছোরাটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে খটাং করে একটা আওয়াজ। বুঝলাম, ফ্লাস্কটা গিয়ে ছোরাতে লেগেছে। চোখ খুলে দেখি ছোরাটা আর আচকানটা দুটোই আমার সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে। অবাক কাণ্ড! এক নিমেষে সেই আচকানটাও এত দূর চলে এসেছে! আমি তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে সামনের খোলা দরজা দিয়ে ছুটন্ত কামানের গোলার মত বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় আধ মাইল পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আমি একটা চায়ের দোকানের সামনে 'জল, জল' বলে চিৎকার করে, অজ্ঞান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হ'ল দেখি আমি চায়ের দোকানের ভেতর শুয়ে, আর আমায় ঘিরে ক'জন লোক গরম দুধ খাওয়াচ্ছে। আমার জ্ঞান হয়েছে দেখে এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি হানা-বাড়িতে গিছলেন?

আমি উত্তর দিলাম—হাঁ, তখন বুঝিনি, এখন বুঝ্‌ছি ওটা হানা-বাড়ি।

তখন বৃদ্ধ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি সশরীরে জ্যান্ত ফিরে এসেছেন এই যথেষ্ট! ও বাড়িতে অনেক ধন-দৌলত লুকান আছে মশাই, কিন্তু যে চোরই চুরি করতে গেছে, সে আর জ্যান্ত ফিরে আসেনি!

আমার অনেক পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধ যা বল্লেন, তা সংক্ষেপে বল্লে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে: এক মুসলমান খালাসী চোরাকারবারী ঐ বাংলোটা করে। লোকটা ছিল একদম পিশাচ। মুসলমান সমাজে বোধ হয় দ্বিতীয় ঐরকম শয়তান আর জন্মায়নি। লোকটা যে-কোন সমাজেরই একটা কলঙ্ক। ঐ লোকটা ও তার দলের লোকেরা সাধারণ খালাসী হলেও চোরাকারবার করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। শেষে এই মুসলমানটা তার দলের অপর সকলকে খুন করে সব টাকা একা নিয়ে পালিয়ে আসে। লোকটির ইতিহাস তার বাড়ির অন্য সকলে জানত। তাই এই নৃশংস লোকটা শেষে একে একে তার ছেলে, মেয়ে, বৌকেও খুন করে। শেষকালে বাড়ির খানসামাকে খুন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। কিন্তু খানসামাটা এর প্রতিশোধ নেয়। সে তার মনিবকে ছোরা মেরে দেশ ছাড়া, পলাতক। ও-বাড়ি এতদূর মারাত্মক যে, এ অঞ্চলের কোন লোককে যে-কোন টাকার লোভ দেখিয়েও ও-বাড়ির আশেপাশে দিন-দুপুরেও পাঠান যাবে না!

একেই অফিসে বন্ধুরা আমায় কল্পনাবিলাসী বলে ঠাট্টা-তামাসা করে, কাজেই তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ পাছে আরো বেড়ে যায়, সেই ভয়ে এ ঘটনা আমি আজো কাউকে বলিনি।

স্কুটারের কিস্তির টাকা এখনো আমার শোধ দেওয়ার দু'একমাস বাকি, কিন্তু স্কুটারটা ওখান থেকে গিয়ে নিয়ে আসার সাহস আজও আমার হয়নি।

টুকু

শ্রীসুধা চক্রবর্ত্তী

মা-বাবা আদর করে নাম রাখল "টুকু", অর্থাৎ ছোট্ট "এতটুকু"। কিন্তু সে নামের অমর্যাদা করে টুকু হঠাৎ তরতরিয়ে বেড়ে উঠল।

দু'বছরের ছেলে, কিন্তু দেখে মনে হয় চার বছরের। যখন চার বছরের তখন কে তাকে বলবে চার, সে যেন মাথার উচ্চতায় বার বছরের ছেলেকেও হার মানায়।

আর গায়ের জোর? সে কথা নাই বা বললাম—দাদা-দিদিরা তাকে দেখতে পেলেই সরে আসত আর বলত, "ঐ টুকু আসছে—বাবা, যা ছেলে এসেই তো হুটোপুটি করবে।"

কিন্তু শেষে তার অবয়বটাই গণ্ডগোল বাধাল বিষম ভাবে। ষোল বছরের ছেলে গঠনে চব্বিশ বছরের ছেলেকেও হার মানাল। ক্লাসের সঙ্গী-সাথীরা সব মুখ টিপে হাসে, কেউ বিশ্বাস করে না ওর বয়স। শেষে ঐ হাসি সংক্রামিত হ'ল মাষ্টার মশাইদেরও ঠোঁটে।

খেলার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবার সময় একদিন হঠাৎ সেকেণ্ড স্যর জিজ্ঞাসা করলেন, "টুকু তোমার ঠিক বয়স কত?"

টুকু নম্রভাবে উত্তর দিল, "ষোল।"

"ঠিক তো? নইলে কাল বরঞ্চ মাকে জিজ্ঞাসা করে এসে নাম দিও।" বেশ একটু বাঁকা হাসির সঙ্গেই মাষ্টার মশাই জবাব দিলেন।

সেদিন থেকে টুকুর স্কুলের পড়ায় জবাব হয়ে গেল।

সে এসে মার কাছে কেঁদে পড়ল, ও স্কুলে আর যাব না ব'লে।

মা কত বোঝালেন, কত সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু টুকুর এক জেদ।

শেষে অপারক হয়ে মা তার বাবাকে ডেকে সব কথা বললেন।

টুকুর বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। সাদাসিধে প্রকৃতির, কিন্তু তাঁরও বিরাট চেহারা। তাই পুত্রের চেহারা নিয়ে তিনি গর্বিতই ছিলেন। কিন্তু শেষে আকৃতির জন্য সন্তানকে লাঞ্ছিত হতে হয় শুনে, তিনি বিমর্ষ হয়ে গেলেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে প্রস্তাব করলেন, "নাঃ, ও স্কুলে গিয়ে ওর আর দরকার নেই, ওকে আমি দেরাদুন মিলিটারী স্কুলে দেব। একটা ছেলে তবু মানুষ হ'ক—ওর গায়ের জোর, ওর মনের বল, লাগুক স্বাধীন দেশের মঙ্গল কাজে।

"গিন্নী, মহাভারতে বৃকোদর বা ঘটোৎকচের দানও বড় কম নয়, একথা মনে রেখ।" ব'লে, খড়ম খট-খট করে টুকুর বাবা চলে গেলেন বিশ্রাম-কক্ষে।

কিন্তু টুকুর ছোট্ট জীবন সক্রিয় হয়ে উঠল এরপর থেকেই।

'টুকু' নামটা জোর করেই বদলে নিল সে, নাম হ'ল তার বলেন্দ্র সিংহ। হ্যাঁ, সিংহটাই ওদের পদবী।

মিলিটারী স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত হতে না হতেই, বলেন্দ্র সিংহকে জড়িয়ে পড়তে হ'ল একটা বিষম সংঘাতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে।

জম্মুর ছাম্ব্ এলাকায় পাকিস্তানীদের দানবীয় আক্রমণ প্রতিহত ক'রে যারা সেদিন তাদের পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল, সেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে নাম লেখা হয়ে গেছে বলেন্দ্র সিংহের।

সিংহ প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেছে সে সিংহই ছিল, বাপ-মায়ের আদরের 'টুকু' হলেও সে 'এতটুকু' প্রাণ নিয়ে জন্মায় নি।

এমন একটা জায়গায় জোয়ানরা সেদিন আটক পড়েছিল যে, নূতন রসদ, নূতন গোলাবারুদ ও সৈন্যের সাহায্য না পেলে পাকিস্তানী সৈন্যদের বোমাবর্ষণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

কে যাবে এই ভীষণ শত্রুর গোলাবারুদের মধ্য দিয়ে নিজের ঘাঁটিতে এই খবর নিয়ে? এগিয়ে যায় বলেন্দ্র, মোটে বাইশ বছরের যুবক—যার সামনে জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। "বারুদের লরী নিয়ে আমিই ফিরে আসব, নইলে প্রয়োজন হয় তো শহীদ হব।" বলেছিল বলেন্দ্র তার উপরওয়ালা অফিসারকে।

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পদব্রজে নিঃশব্দে চতুষ্পদের মতই বুকে তীব্র সাহস নিয়ে বলেন্দ্র যাত্রা করেছিল অদূরবর্তী ভারতীয় ঘাঁটির উদ্দেশ্যে। তারপর লরী-ভর্তি সমরোপকরণ নিয়ে যখন ফিরে আসছে, তখন দুম-দাম শব্দে কান পাতা দায়, দু' পাশে এসে পড়ছে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা। বলেন্দ্র লরী চালাচ্ছে প্রাণপণে, সর্বদা ভয়—একটা গোলা এসে পড়লেই সব যাবে—মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে—উড়ে যাবে ভারতভূমির স্বপ্ন—আশা। কাশ্মীরের একটা বিশিষ্ট ঘাঁটি হবে শত্রু-করতলগত!

জোরে, আরও জোরে, খাল-খন্দ-নালা অতিক্রম করে মিলিটারী লরী এসে পৌছল যথাস্থানে।

"আঃ বাঁচলাম!" স্বস্তির হাওয়া বয়ে গেল যেন ভারতীয় শিবিরে। আর হানাদারদের তারা ভয় করে না, প্যাটন ট্যাঙ্ক আর পাকিস্তানী স্যাবার জেট কি করবে তাদের?

পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে চাইল ভারতীয় ফৌজদের, কিন্তু ভারতীয় জোয়ানদের বাহুবল, মনোবল ও বুদ্ধিবলের কাছে হার হ'ল নৃশংস দস্যুদের!

কিন্তু উপরওয়ালার আদেশে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে জীপে করে যাবার সময় হঠাৎ সোজা একটা গোলা এসে পড়ল বলেন্দ্রর জীপে।
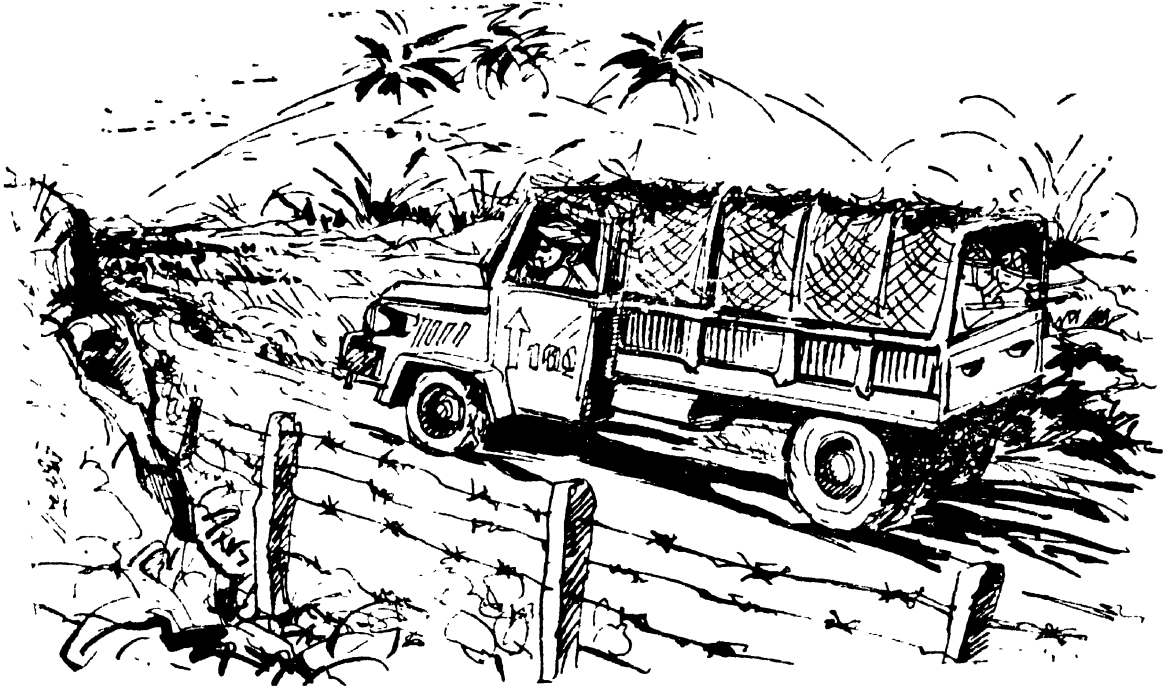
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল জীপ!

এতদিনে শেষ হয়ে গেল বলেন্দ্রর বলদৃপ্ত দেহখানি—অসামান্য মনোবলসম্পন্ন ছোট্ট প্রাণটুকু।

টুকু আর নেই! যথাসময়েই খবর পেলেন টুকুর মা-বাবা সামরিক দপ্তর থেকে। টুকুর দাদা ক্রন্দনরতা মাকে এসে ধমকে বলল, "টুকু টুকু করে কেঁদ না মা, তোমার বলেন্দ্র আর নেই বটে, কিন্তু রয়েছে তোমার ছেলের বলদৃপ্ত স্মৃতি। সারা দেশ তাকে শ্রদ্ধা জানাবে, মনে রাখবে। যা ও করে গেল তার তুলনা নেই!"···

মা তবু চীৎকার করে কেঁদে মাটিতে আছড়ে পড়লেন: "টুকু, ওরে আমার টুকুরে—।"

———

পাখীর জন্য

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

গাছতলায় দাঁড়িয়ে পল্টন বললো, 'পাখী নিশ্চয়ই তুই পাবি।'

ব'লে পল্টন চলে গেলো। আর পাখী নিশ্চয়ই পাবে শুনে দারুণ আনন্দ হলো শংকরের। একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো গাছতলায়, তারপর লাফাতে লাফাতে বাড়ীর দিকে দৌড়ুতে থাকলো।

পল্টন যে কথা বলে, সে কথা পল্টন রাখে। পল্টনের গায়ে খুব শক্তি। ওর পিসতুতো দাদা নাকি কোন্ একটা ব্যায়ামাগারের সর্বেসর্বা ছিলো। ছিলো নয়, এখনও আছে। দশাসই তার চেহারা। হাতের গুলি ফোলালে তার মধ্যে নাকি বন্দুকের গুলিও ঢোকে না। এতো শক্ত তার হাতের গুলি। বুকটা ই-য়া চওড়া। যারা বক্সিং শেখে, তারা নাকি ওর বুকে ঘুষি ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাত শক্ত করে। একবার ঘুষি ছুঁড়তে গিয়ে পল্টনের হাতই নাকি ভেঙে গিয়েছিলো। সত্যি না মিথ্যে তা এক পল্টনই জানে। তবে পল্টন নাকি সেই দাদার ব্যায়ামাগারেই ডন-বৈঠক দিতো।

কিন্তু সেই ব্যায়ামাগার একদিন ছেড়েছিল পল্টন। ছাড়তে হয়েছিলো আর কি! না হলে একদিন পল্টনও অমন দশাসই চেহারার হতে পারতো।

ছাড়বার কারণটা জিজ্ঞেস করলে পল্টন বলে, 'আদরের জন্য।'

'আদরের জন্যে?'

'হ্যাঁ, শুধু আদরের জন্যেই দাদার আখড়া ছাড়লুম।'

'আদর পেলে আবার কেউ আখড়া ছাড়ে নাকি?'

'এ তো আর বেতো দাদু কিংবা ঠাকুমার আদর নয়, এ হলো সেই পিসতুতো দাদার আদর! যাকে বলে ডাম্বেল বারবেলের আদর!'

'তার মানে?'

'তার মানে, আখড়ায় গেলেই সেই পিসতুতো দাদা এগিয়ে আসতো। আমি তার ছোট ভাই। আমার কায়দাকানুন দেখে আদর করতো—আর সে আদর উল্টে পাল্টে ছুঁড়ে দিয়ে! থাকা যায় ওখানে?'

ঘাসে বসে বসে পল্টনের কথা ভাবলো শংকর। সত্যি না মিথ্যে বলে কে জানে? তবে গায়ে যে ওর শক্তি আছে তা সত্যি। তার চেয়ে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়ে পল্টন। অর্থাৎ নাইনে পড়ে। কিন্তু ক্লাস টেনের ছেলেরা, এমন কি যে নূতন গেম-টীচার এসেছেন, তিনিও দৌড়ে পারেন না পল্টনের সঙ্গে।

শংকর কিন্তু পল্টনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের লোভ কি এড়ানো যায়? কাজে কাজেই পল্টন যখন কথা দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই পাখী ধরে দেবে।

পল্টনের সঙ্গে পরদিন দেখা হলো খেলার মাঠে। চুইংগাম চিবুতে চিবুতে মাঠে এসেছে পল্টন। উল্টো দলকে পাঁচ ছ'টা গোল ইচ্ছে হলেই দিয়ে দেয় পল্টন। গোলকীপার ধরলে কিংবা চুইংগাম খাইয়ে দিলে কমেই ছেড়ে দেয়। গোলকীপাররাও না ধরে কী ক'রে, ছ'ছটা গোল খেয়ে কি আর দলের সঙ্গে ফেরা যায়? যায় না।

শংকর পল্টনের কাছে গিয়ে বললো, 'আমার পাখী কবে দেবে?'

'ধরতে হবে তো।'

'একটু শীগ্‌গির ধরে দাও না।'

'আচ্ছা হবে।' বলেই পল্টন চুইংগাম চিবুতে চিবুতে আর ছুটতে ছুটতে মাঠে নামলো। না, আজকে হবার নয়। শংকর বুঝতে পারলো। পল্টনের মন খেলায়। চুইংগাম যখন চিবুচ্ছে তখন গোল বেশী হবে না।

শংকর নিজেই পাখী ধরতে চেষ্টা করেছিলো কয়েক দিন। কিন্তু পাখী ধরা অতো সহজ নয়। দারুণ চালাক পাখীগুলো। চুপচাপ বসে আছে বারান্দায়। খাবার ছিটিয়ে দিচ্ছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে ঠুক্‌রে খেয়ে নিচ্ছে। ফুরিয়ে গেলেই তাকাচ্ছে; ঘাড় বাকাচ্ছে—মেজাজ করে ডাকছে। কিন্তু যেই একটুখানি কাছে যাবে, অমনি—পিড়িং। এক্কেবারে দু'চারটা বাড়ী পেরিয়ে, একটা চারতলার ছাদে।

সুতরাং শংকরের সাধ্যি কি পাখী ধরবে। অথচ একটা পাখীকে খাঁচায় পুরে যখন ইচ্ছে আদর করবার, যখন ইচ্ছে দেখবার ইচ্ছেটা শংকরকে দারুণ ভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

পল্টন সেদিন নিজেই বলেছে, 'জানিস পাখী ধরায় আমার মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই?'

'সত্যি?' শংকরের আনন্দে একটা লাফ দিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো।

'সত্যি নয়তো মিথ্যে বলছি নাকি?' একটু যেনো চটে উঠেছিলো পল্টন।

কিন্তু শংকর পাখী ধরবার ওস্তাদকে চটাতে নারাজ। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলো, 'পাখী ধরা যা কঠিন।'

'ভগবান যে দুষ্টুগুলোকে ডানা দিয়ে দিয়েছেন।'

'আমাকে ডানা দিলে দেখে নিতুম।'

'ঐ জন্যেই তো দেননি। দিলে অবশ্য কাকগুলোকে একবার দেখে নিতুম।'

শংকর বুঝেছিলো কাকগুলোর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে আছে পন্টন। বোধহয় কোনোদিন ঠুকরে দিয়েছিলো আচ্ছা করে। পন্টনকে খুশী করবার জন্য শংকর বলেছিলো, 'যা ঠুক্‌রে দেয় কাকগুলো, আমিও দেখে নিতুম ওদের।'

'না না, ঠুকরে দেবার জন্য কিছু নয়।' পন্টন চেনো কি চেপে গিয়েছিলো, 'যা বিচ্ছিরি কালো।'

'তা ঠিক।' তারপর একটু ঘুরিয়ে শংকর বলেছিলে, 'ভালো হচ্ছে শালিক, ময়না, টিয়ে!'

'শালিক বড্ড চ্যাচায়।'

'চ্যাচালেও কি ঠুক্‌রে দেয় না।'

'আমার ঐ ময়না, টিয়ে, কাকাতুয়াই ভালো লাগে। ওগুলো তো আর এখানে উড়ে উড়ে আসে না। এলে দলকে দল ধরে রাখতুম। একটাও পালায় এমন সাধ্য থাকতো না।'

'এখানে তো কাক শালিক-টালিক প্রচুর। আমায় তার দু'একটা ধরে দাও না। সুযোগ পেয়েই বলেছিলো শংকর।'

'শালিক নিবি?'

'হ্যাঁ।'

'এ আর বেশী কথা কি। দেবো তোকে। কিন্তু খাঁচা-টাচা কিছু একটা চাই।'

'খাঁচা আমার আছে। খুব ভালো খাঁচা।' শংকর বলেছিলো।

'আর তখনই শংকরকে পন্টন কথা দিয়েছিলো, 'পাখী তুই নিশ্চয়ই পাবি।'

যে খাঁচাটা যোগাড় করেছে শংকর সে খাঁচাটা খুব চমৎকার। লম্বা লম্বা ঝকমকে লোহার শিক দিয়ে তৈরী। ভেতরে দুটো লোহার বাটি আছে খাবার আর জলখাবার জন্য। ঝুলিয়ে রাখবার জন্য ওপরে একটা আঙ্‌টাও আছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখল শংকর। পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কিছুক্ষণ ঢিল ছুড়লো একটা কদম গাছের মাথায়। তারপর আর ভালো লাগলো না পাথর ছোঁড়া। কিছুই ভালো লাগলো না। দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাড়ীর দিকে ফিরতে থাকলো শংকর।

রবিবার সকাল বেলাতেই পন্টনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো গলির মোড়ে।

শংকর বললো, 'আজকে ধরে দেবে?'

'আজকে?' কি যেনো ভাবলো পন্টন। মাটি থেকে একটা পাথর তুলে নাচাতে নাচাতে বললো, 'তোর যেনো কি পাখী চাই?'

'ময়না টিয়ে তো আর পাওয়া যাবে না, সে জন্যেই বলেছিলাম একটা শালিক চাই।'

'ও ঠিক আছে। কিন্তু ভালো খাঁচা আছে তো?'

'আছে।'

'নিয়ে আয়।'

শংকর আর দাঁড়ালো না। দৌড়ে বাড়ী পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখের আড়াল করে খাঁচাটা নিয়ে গলির মোড়ে এলো।

পল্টন দাঁড়িয়ে পাথর নাচাচ্ছিলো। খাঁচা দেখেই ওর চোখ যেনো কেমন হয়ে গেলো। কেমন লোভী লোভী। শংকরের মনে হলো তাই।

পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে পল্টন হাত বাড়িয়ে খাঁচাটা নিজের হাতে নিলো।

'বাঃ, চমৎকার খাঁচা তো। তুই যেনো কি পাখী নিবি?'

'শালিক।'

'শালিক পাখী নিয়ে কি হবে?'

'খাঁচায় রেখে আদর করবো, খেতে দেবো।'

'আদর করবি? পাখীকে আবার আদর করে কি করে?'

তাই তো! এক মুহূর্ত ভাবলো শংকর। তারপর বললো, 'কেনো মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে।' হো হো করে হেসে উঠলো পল্টন, বললো, 'তাহলে কুকুর পুষতে পারিস।'

'আদর না করলে দেখবো আর কি!' অপ্রস্তুত হয়ে বললো।

'শালিক পাখী আবার খাচায় রেখে দেখতে হয় নাকি। সবখানেই তো শালিকের ছড়াছড়ি। লোকে তোর কথা শুনলে হাসবে।'

শংকর কিছু একটা বলতে পারলো না। ভাবতে থাকলো কী বলা যায় তাই।

পল্টন আবার বললো, 'বুঝতে পারছি তোর দরকার নেই খাঁচাটা। আমি নিয়ে যাচ্ছি। ময়না, টিয়ে যদি কোনোদিন এদিকে দেখিস, ছুটে খবর দিস আমায়। ধ'রে খাঁচায় ভ'রে খাঁচাসুদ্ধ তোকে ফিরিয়ে দেবো।'

শংকরের কিছু ভাববার বা বলবার আগেই পল্টন খাঁচাটা নিয়ে দৌড় দিলো। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই পেছন ফিরে আর একবার বললো, 'খবর দিস কিন্তু। ঠিক ঠিক ধ'রে দেবো তখন। সেই সঙ্গে খাঁচাটাও।'

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নৌকোয় তো উঠে বসল বাঁটুল, নৌকো ভেসে চলল।

নৌকোর পেছনে তিনটে খুপরি ঘর। তার মধ্যে বসে বসে একজন মোটাসোটা গিন্নী তরকারী কুটছেন। পাশে বসে একটি ছোট্ট মেয়ে, হয়তো রাধির চেয়ে সামান্যই বড় হবে, একঘেয়ে আবদার করে চলেছে। কাঁদছে তো কাঁদছেই, ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে কান্না।

কিন্তু বাঁটুল দেখতে পেলে মেয়েটার চোখে একফোঁটা জলও নেই। যাকে বলে খটখটে।

মেয়েটা মাঝে মাঝে নোলক খুঁটছে আর পা ছড়িয়ে সুর করে বলে চলেছে, 'নৌকো চড়ে যাব না গো, আমায় কেন নিয়ে এলে, কদমা কখন কিনে দেবে ?'

বাঁটুলের ইচ্ছে হল মেয়েটার কান ধরে কয়েকবার ওঠ-বোস করায়। কিন্তু যাদের নৌকো তারা হয়তো বিশেষ পছন্দ করবে না ভেবে চুপ করে গেল। তা ছাড়া ভদ্রলোক তাকে ডাকলেন।

'আজ্ঞে, বলুন !'

'কলকাতায় আমরা তো বাবুরঘাটে নামব। তোমার বাবা কোথায় থাকেন ?'

এই মরেছে। কলকাতায় কোথায় নামতে হয়, কি করতে হয়, কলকাতা জায়গাটার চেহারাই বা কি রকম, তা কি বাঁটুল জানে ?

'আজ্ঞে, তা তো জানি না···মানে, বাবা···'

'আহা, তুমি নামবে কোথায় ?'

'কেন, গিন্নীর ঘাটে ?'

'গিন্নীর ঘাটে !'

ভদ্রলোক কয়েকবার ঢোক গিললেন। যাকে বলে ঘন ঘন। বাঁটুল অবিশ্যি অকুতোভয়। বাবুরঘাট যদি নাম হতে পারে, তাহলে গিন্নীর নামেই বা ঘাট হবে না কেন ? বাঁটুল কারুকে এখনো বলেনি, তবে সে তো মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে একদিন মামীমার নামে একটা কিছু করবে। এখন ঠিক করল মামীর ঘাট করে দেবে। বদন পাঠকের ইঁট-ভাঁটি থেকে ইঁট চুরি করা যাবে এখন। আর পাঠশালার ছেলেরা তো সবাই বলেছে, বাঁটুল বললেই বেগার খেটে দেবে।

'তুমি গিন্নীর ঘাটে নামবে ?'

'আজ্ঞে।'

এই সময় মাঝিটা অবশ্য বাঁটুলের দিকে চেয়ে, কেমন যেন দাঁত কিড়মিড় করে বললে 'হা ভগবান ! এ ছোঁড়াও দেখছি ঘোঁৎনার মতন, বুঝলি রে গুরুচরণ ?'

গুরুচরণ বললে, 'কি যে বল ভুবনদাদা, ঘোঁৎনা তো ডালে হাঁটে, ইনি যে পাতায় পাতায় যায়। শুনলে না, গিন্নীর ঘাটে নামতে চায় !'

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমরা চুপ কর বাপু।'

বাঁটুলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ।'

আর কিছুই বললেন না। এদিকে বেলা বাড়তে লাগল। এক সময়ে পলাশীর কাছাকাছি নৌকো বাঁধা হল। এখানে বোধ হয় খবর দেওয়াই ছিল, দেখা গেল দুটো লোক মাছ নিয়ে এল, দিব্যি চকচকে ইলিশ মাছ। একজন বুড়ো ভদ্রলোক সাদা ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি 'এস, রূপচাঁদ এস' বলে ডাকতে লাগলেন।

মোটা ভদ্রলোক নৌকো থেকে হেলেদুলে নামলেন। নামবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ভদ্রলোকের সে কি খাতির ! এস, ছাউনীর নিচে বস। তোমার সঙ্গে আজ কতদিন পরে দেখা !

রূপচাঁদবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, তেলটা সঙ্গে নিয়ে নিই। বসে বসে কথা কইতে কইতে তেল মাখা যাবে।'

বাঁটুলকে বললেন ভদ্রলোক, তেলটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস।'

বাঁটুল সঙ্গে সঙ্গে গেল।

দিব্যি খড় দিয়ে ছাওয়া চালাঘর। সেখানে বসে দুজনেই তেল মাখতে লাগলেন। ভাবে-গতিকে বোঝা গেল রান্নাবান্না হলে বুড়ো ভদ্রলোকও এখানে খাবেন। বাঁটুল ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদিকে রান্নাবান্নার তোড়জোড় চলেছে। গিন্নী ঠাকরুণ সেই ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটাকে নিয়ে কি সব ধুয়ে-টুয়ে রাখছেন।

রূপচাঁদবাবু বুড়ো ভদ্রলোককে দাদা বলে কথা বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, কি আশ্চর্য, দু'জনে কুটোকুটি ঝগড়া লেগে গেল। যাকে বলে ছেলেমানুষের ঝগড়া।

রূপচাঁদবাবু বললেন, 'এবার বেগুন খেয়ে সুখ হল না দাদা। বড্ড দর। পয়সা পয়সা সের।'

বলতে না বলতেই বুড়ো ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন। বললেন, 'পয়সা পয়সা?'

'আমি নিজে কিনলাম!'

'কি জন্যে নিজে কিনলে? আমি তোমার দাদা এখানে রয়েছি। যদি নিকুঞ্জকে দিয়ে একটা খবর দাও, তা' হলেই তো তোমায় আমি অমন একমণ বেগুন নৌকো বোঝাই করে রাজমহলে পাঠিয়ে দিই?'

'নিকুঞ্জকে দিয়ে আমি খবর দেব? সেবার নিকুঞ্জ আমার ছাতাটা হারিয়ে এসেছিল না?'

দু'জনেই তেড়ে উঠলেন, ঝগড়া করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে চান-ও করলেন, বাঁটুলও নাইলে। আর, ওঁরা পাশাপাশি বসে খেলেনও তৃপ্তি করেই। খেতে খেতে ঝগড়া করলেন, খেয়ে উঠে ঝগড়া করলেন। অবশেষে, যখন নৌকো ছাড়বার সময় হল, তখন রূপচাঁদবাবু বলতে লাগলেন, 'কতদূর দেশে যাচ্ছি দাদা, তোমার মত কাকে পাব?'

বুড়ো ভদ্রলোক কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, 'বটে! আমার কষ্ট বেশী হচ্ছে তা জান? এবার এই এগার দিন বাদে দেখা!'

'আমার চে তোমার কষ্ট বেশী হচ্ছে?'

এই নিয়ে আরেক দফা লেগে যাচ্ছিল আর কি! কিন্তু মেয়েটি এসে বললে, 'ও বাবা, মা বললে কানপুর থেকে ফেরবার সময়ে বাকি ঝগড়াটা কোর'খুনি।'

কানপুর! বাঁটুলের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। মেয়েটা বাঁটুলকে বলল, 'তোমায় মা ডাকছে।'

এগিয়ে, নৌকোর দিকে যেতে যেতে মেয়েটা বললে, 'খুব তো মাছভাজা দিয়ে ভাত, খেলে বসে বসে, তোমার আসল নামটা কি?'

'আসল নাম মানে?'

'আহা, ঐ গিন্নীর ঘাট যখনই বলেছ, তখনি তো আমরা বুঝতে পেরে গিয়েছি তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ। গিন্নীর ঘাট বলে তো কোন ঘাট কলকাতায় নেই!'

বাঁটুল হতভম্ব।

'এখন দেখ না কি হয়!'

'কি হবে?'

'বাবা তোমায় কি করে তাই দেখ।'

'কি করবে?'

'হয়তো কেটে কুচিকুচি করবে।' মেয়েটি খুব নিরীহ গলায় বললে, 'আমার বাবা ডাকাত তো!'

'অ্যাঁ?'

'আজ্ঞে! মস্ত ডাকাত। বাবা ডাকাত, ঐ মাঝিমাল্লারা ডাকাত, আমাদের নৌকোর পাটাতনের নিচে তোমার মত অমন দশটা ছেলের কঙ্কাল রাখা আছে, তা জান?' বাঁটুলের মাথাটা বোঁ বোঁ করে বোধহয় ঘুরেই যেত। কিন্তু মেয়েটির মা বললেন, 'ফিসফিস করে কি বলছিস রে পদ্ম?'

'কিছু বলিনি মা।'

'তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না রে, ও ভারী মিথ্যে কথা বলে। এই দেখ না, সেবার দেখি নদীর ধারে দিব্যি কচুশাক হয়ে রয়েছে। এই লকলকে। আমি বঁটি হাতে শাক কাটব বলে পাড়ে নেমেছি, দেখলাম একটা চাষীর মেয়ে শাক কাটছে। আমি তাকে হাত নেড়ে ডাকছি। ও মা! পদ্ম গিয়ে তাকে বলেছে মা-র হাতে বঁটি দেখেছ? মা ফি মঙ্গলবার একটা করে মেয়েকে ধরে আর কাটে!'

রেগে গিন্নী ঠাকরুণ পানের পিচ ফেললেন। বললেন, 'শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেব, তাই তো নিয়ে যাচ্ছি। শাশুড়ীর চড়চাপড়টা না খেলে এ সিধে হবে না।'

'শ্বশুরবাড়ী?'

'হ্যাঁ বাছা। ওর বে' হয়েছে, সেই ফুলবেড়েতে। তা বেয়ান, বেয়াই, ওঁরা কানপুরে থাকেন। বেয়াই-এর দোকান আছে। আমরা থাকি কাশী। তবে মাঝে মধ্যে দেশে এসে থাকা হয়।'

নৌকোতে উঠে পদ্মকে বাঁটুল শুধু বললে, 'নামবার আগে মজা টের পাইয়ে দোব।'

পদ্ম যেন সেকথা শুনতেই পেল না। একবার একটু মুচকি হেসে বললে, 'দেখো, নৌকোতে তক্তা তুলে দেখো!' তারপরই ছোট একটা গামছার পুঁটলী থেকে দুটো তিনটে পুতুল বের করে গোছাতে সুরু করল।

বাঁটুল অবিশ্যি তবু একবার তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখে নিল। গোটাকয়েক কালো

কালো হাঁড়ি। তাতে কৈ মাছ খলবল করছে।

রূপচাঁদবাবু বাঁটুলের পাশে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'বাড়ী থেকে পালাচ্ছ?'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক বলছ?'

'আজ্ঞে।'

'যাচ্ছটা কোথায়? চেহারায় মালুম হচ্ছে সদ্বংশের ছেলে।'

বাঁটুল মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, 'বাবার কাছে।'

'বাবা কি কলকাতায় আছেন?'

'না, কানপুরে।' রূপচাঁদবাবুরা কানপুরে যাবেন জেনেই বোধহয় বাঁটুলের মনে হল এঁকে সত্যি কথাটা বলা যাক। আর, পথে যখন বেরিয়েছে তখন কিছু কিছু লোককে তো তার বিশ্বাস করতেই হবে।

'কানপুরে?'

'হ্যাঁ। তাঁর নাম গোপাল বাঁড়ুজ্জে।' শুনে রূপচাঁদবাবু চমকে উঠলেন। বললেন, 'গোপাল বাঁড়ুজ্জে? তুমি তাঁর ছেলে?'

'আজ্ঞে।' বাঁটুল ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। আসলে নৌকো যতই এগোচ্ছে, ততই তার মনটা হু হু করছে। মনে হচ্ছে একটি ছুটে চলে যায় আঁটুল গ্রামে।

'তামার মামাবাড়ী তো আঁটুল গ্রামে, তাই না?'

'আজ্ঞে। আপনি কি করে জানলেন?'

'আর কি করে জানলাম!' রূপচাঁদবাবু উত্তেজনার বশে গড়গড়ার নল দিয়ে কান চুলকে ফেললেন কয়েকবার, তারপর বললেন, 'গোপাল বাঁড়ুজ্জে আমার দূর সম্পর্কের ভাই না? আমরা রেজিনগরের ঘাষাল না? কানপুরে আমার বেয়াই বাড়ীতে গোপলদাদা মাসে একবার খায় না? কাশীতে এলে আমাদের বাড়ী ওঠে না?' রীতিমত ঝগড়ার সুরে বললেন।

তখন গিন্নী বেরিয়ে এসে বাঁটুলকে কাছে ডাকলেন। কর্তাকে বললেন, 'ওকে মিছে ধমকাচ্ছ কেন?' বাঁটুলকে বললেন, 'তুই কি করে জানবি বাছা। তোর বাবা তো খবরটবর নেয় না। আমরা সত্যিই তোদের জ্ঞাতি হই। তা পালাচ্ছিস কেন বাছা? মামা-মামী কি খেদিয়ে দিয়েছে?'

রূপচাঁদবাবু অমনি চেঁচাতে লাগলেন, 'খেদিয়ে দিক, খেদিয়ে দিক, ওর কাকা আছে, ও নিরাশ্রয় নয়!'

বাঁটুল মনে মনে ভাবলে হা ভগবান! মামার হাত থেকে খুড়োর হাতে!

(ক্রমশঃ)

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা

শ্রীঅসিত গুপ্ত

একদিন আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা এক মস্ত দাঁড়কাক মেরে বসল।

দাঁড়কাকটা আকাশ থেকে টাল খেতে খেতে লট্‌কে গিয়ে পড়ল সাদা ধবধবে একগাদা তুষারের ওপর

দাঁড়কাক দেখতে কালো হ'লে হবে কি, তার শরীরের রক্ত তো লাল। লালে লাল হয়ে গেল সাদা তুষার।

কিন্তু দাঁড়কাকের ডানা হচ্ছে বিখ্যাত রকমের কালো। মরে যাবার পরও সেই ডানা যেমনকার তেমনি কুচকুচে কালো-ই রয়ে গেল।

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা তখন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা দাঁড়কাকের রক্তের চেয়ে টুকটুকে লাল কি কিছু আছে এ-জগতে? কিংবা দাঁড়কাকের ডানার চেয়ে কুচকুচে কালো? আর তুষারের মতো সাদা?

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা ভাবল, ঠিক হয়েছে। বিয়ে যদি করতেই হয় তো ঐরকম এক রাজকন্যাকে বিয়ে করতে হবে। যার গায়ের রঙ হবে তুষারের চেয়ে ধবধবে সাদা, মাথার চুল হবে দাঁড়কাকের ডানার চেয়ে কুচকুচে কালো আর ঠোঁট হবে দাঁড়কাকের রক্তের চেয়ে লাল টুকটুকে।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় সেই কুঁচবরণ কন্যা আর মেঘবরণ কেশ?

পাওয়া যায়, পাওয়া যায়। কারা যেন বলল পুব দিকে গেলেই পাওয়া যাবে তেমন মেয়ে। তবে অনেক কষ্ট করতে হবে। বহু বিপদ-আপদ পথে।

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা ভাবল দেখা-ই যাক্ না! যদি সন্ধান পাওয়া যায় সেইরকম এক রাজকন্যার!

এই না ভেবে সে চলল পুব দিকে। অনেকখানি গেছে এমন সময় পথের মাঝে দেখে এক অবাক কাণ্ড। আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা তো থ।

'কি হয়েছে বাপু?' ভিড় ঠেলে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে।

'কি আর হবে!' একজন লোক বলল।

'তবু, কি হয়েছে শুনি না?'

'এই যে দেখছেন এই লোকটা, এ মারা গেছে। একে এখন কবর দেওয়া হবে।'

'তা বেশ তো! মরে গেছে কবর দেবে। তাতে এত গোলযোগ কিসের?'

'গোলযোগ নেই, বলেন কী?' লোকটি খুব তেরিয়া হয়ে উঠল আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার এই কথা শুনে।

'সেইটাই তো জানতে চাইছি। মরে গেছে চুকে গেছে ল্যাঠা। মরবার পর আবার গোলযোগ কী?'

'ও মরতে পাবে না। মানে, মরা ওর চলবে না এখন।

'কেন? ওর মরতে বাধা কী?'

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার এই গা-জ্বালানো কথা শুনে লোকটা রেগেই খুন। 'মরবে কী করে? জানেন ওর বিস্তর দেনা আছে। দেনা শোধ না ক'রে কেউ কী কখনো মরতে পারে? আর মরলেও কী কবর দেওয়া যায়?'

'ও! এই কথা!'

এই না বলে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা তৎক্ষণাৎ ঝনাৎ ক'রে শুধে দেয় মরা লোকটার সব দেনার টাকা। তারপর শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে লোকটাকে ঠিক ঠিক কবর দেওয়া হচ্ছে কিনা! লোকটা যখন একেবারে কবরে শুতে চলে যায়, তখন আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা ফের গুটি গুটি পূব দিকে পায়ে হাঁটতে থাকে।

সাদা ধবধবে গায়ের রং, কালো কুচকুচে চুল আর লাল টুকটুকে ঠোঁটের রাজকন্যা তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।

কিছুদূর যেতেই পথে হঠাৎ তার সঙ্গে একটি ছোটখাটো সবুজ রঙের লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

'কি কোথায় যাচ্ছেন অত হন্তদন্ত হয়ে?' সবুজ লোকটি জিজ্ঞেস করে।

সে খবরে তোমার কী দরকার বাপু হে? গায়ে পড়ে ঐ গলায় গলায় হবার চেষ্টা আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা একদম পছন্দ করে না।

'আহা, চটছেন কেন? বললে কি-এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তাছাড়া কাউকে তুচ্ছ করতে নেই। বলা কি যায় কে-কখন কীভাবে কাজে লাগে!

'আমি যাচ্ছি পূব দেশে।' আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দেয়।

'কেন, পূব দেশে কেন?'

'রাজকন্যার খোঁজে।'

'তা বেশ, তা বেশ। এই কথাটা বললেই তো হ'ত। চলুন যাই আমি আপনার চাকর হয়ে।'

'আমার চাকরের দরকার নেই।' আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা এবার বেশ বিরক্ত হয়।

'আহা, আমার অনেক ক্ষমতা। নিয়ে গেলে মোটে পস্তাবেন না। তবে এক সর্ত।'

'বেশ ফিচেল লোক তো তুমি। নিতেই চাইছি না তোমাকে সঙ্গে, তার ওপর আবার সর্ত। বেশ বলে ফেল কি তোমার সর্ত!'

'রাজকুমারীর দেখা পেলে তার হাত থেকে সবচেয়ে আগে রেশমী রুমাল কিন্তু নেব আমি। আগে আমি তার সঙ্গে কথা বলব, তারপর আপনি।'

'আচ্ছা, তাই হোক্। নইলে তুমি তো ফেউয়ের মতো লেগে থাকবে।'

এই বলে ওরা দু'জন পুব দেশ পানে চলতে থাকে।

যেতে যেতে পথে ওদের সঙ্গে আরো লোকের দেখা হয়। তারা সবাই আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার সঙ্গে পুব দেশে যেতে চায়। তাদের রকম রকম ক্ষমতা। কেউ দারুণ দৌড়াত পারে। কারুর কান এত ভালো যে, মাঠে ঘাস গজাবার শব্দ অবধি শুনতে পায়। কেউ পড়-পড় প'ড়ো বাড়িকে এক আঙুল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কেউ ইয়া ইয়া শক্ত পাথর গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে পারে অথচ হাতুড়ি লাগে না।

এই সব করিতকর্মাদের নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা পুব দেশের দিকে যায়। কিন্তু পুব দেশে যাওয়া কি সোজা কথা! পথে কত বিপদ-আপদ। সরু-মোটা, লম্বা-বেঁটে, পুঁচ্‌কে-ধেড়ে, মিচ্‌কে-পটাশ খটাস-খটাস কতরকম দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্ষস থেকে থেকেই তাদের জ্বালাতন করতে লাগল।

শুধু কি জ্বালাতন! গাছের মগডালে ব'সে, পাহাড়ের টঙে চ'ড়ে বিদ্‌কুটে সব ছড়া আওড়াতে লাগল:

ওরে ব্যাটা মাথা মোটা
নাদা পেট রাজার ছেলে
আর তার হাঁদা-গাধা দলবল
সব ব্যাটাকে সাব্‌ড়ে দেব ঘটাং ঘট
হাতের কাছে একটিবার পেলে
তোদের রক্ত দিয়ে খুলব জলের কল।

তখন আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা দেখল এদের ঠাণ্ডা না করলে তো নিষ্কৃতি নেই। কিছুতেই যেতে দেবে না পুব দেশে, রাজকন্যার খোঁজে। আগে এদের ঢিট্ করতে হবে। তাই সে দিল লেলিয়ে তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের।

এইভাবে পথের বাধা দূর করতে করতে একদিন আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা পুব দেশে গিয়ে পৌছুল।

কিন্তু রাজকন্যা কোথায়?

রাজকন্যা তখন বন্দী এক অকূল-পাথার পুরীতে। বিশাল দুর্গের মতো ভয়ংকর সেই অকুল-পাথার পুরীতে কেউ ঢুকতে পারে না। মড়ার মাথার উপর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বর্শা দিয়ে পুরীটি আগাগোড়া ঘেরা।

কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর, কোটালপুত্তুর, সওদাগরপুত্তুর আগে আগে চেষ্টা করছে রাজকন্যাকে ঐ অকুল-পাথার পুরী থেকে উদ্ধার করতে। কেউ পারেনি। না পেরে প্রাণ হারিয়েছে। বিষাক্ত বর্শার গায়ে বিঁধে আছে তাদের সার সার মাথা।

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা সেই পাথার-পুরীর বাইরে আকাশের সমান উঁচু উঁচু দেওয়ালের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বললো, 'রাজকন্যা জাগ, আমি এসেছি পশ্চিম দেশ থেকে তোমাকে বিয়ে করব ব'লে। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

রাজকন্যা শুধোয়, 'তুমি কে?'

'আমি আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা।'

'সে আবার কি! তুমি কী রাজা নও?'

'না, আমি ঠিক রাজা নই। আমি আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা। লোকে আমাকে তা-ই বলে।

'কত রাজপুত্তুর মন্ত্রীপুত্তুর এসেছিল আমাকে বিয়ে করতে, তারা পারল না, আর তুমি কোথাকার ছেলের রাজা না কি, তুমি এসেছ আমাকে বিয়ে করতে? তা যাকৃগে তুমি যে-ই হও, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার না ক'রে তো বিয়ে করতে পারবে না বাপু।'

'বেশ আমি তোমাকে উদ্ধার করব। কিন্তু কী ক'রে করব বলে দাও।'

'এই দিলুম তোমাকে একজোড়া কাঁচি। কাল ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কিন্তু ফেরত দিতে হবে এই কাঁচি। তা তুমি এর মধ্যে আমাকে উদ্ধার করতে পার চাই না পার।'

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা সেই কাঁচি জোড়া হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল, কি ক'রে রাজকন্যাকে উদ্ধার করা যায়। পুব দেশে এসে, রাজকন্যার দেখা পেয়েও তাকে অকুল-পাথার পুরী থেকে উদ্ধার করতে পারবে না? না না, সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। দেশের লোকেরা তাকে যা-তা বলবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা ভাবল একটু গড়িয়ে নিই। শরীরটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে। তারপর আবার সারারাত জেগে তো কাঁচি নিয়ে খুটখাট করতে হবে! পাহারা দিতে হবে কাঁচিকে, পাছে কেউ নিয়ে নেয়!

এই মনে ক'রে যেই শুয়েছে, অমনি রাজকন্যা করল কি খুব চুপিসাড়ে ওর মাথার তলায় একটা ঘুমের কাঠি রেখে দিল। দিতেই আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার চোখ দু'টি এল বুজে। একটু পরেই তার নাক ডাকার ঘড়-ঘড় আওয়াজ পাওয়া গেল।

তখন রাজকন্যা সেই কাঁচি জোড়া ফের নিয়ে নিলে।

যাঃ, এখন রাজকন্যা উদ্ধার হবে কী করে? রাজকন্যা যে বলেছিল ভোর না হতেই কাঁচি জোড়া ফেরত চাই।

কিন্তু সেই সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি সব দেখেছিল। দেখল, রাজকন্যা কাঁচি জোড়া তুলে নিয়ে ভয়ংকর এক দৈত্যের কাছে জিম্মা ক'রে দিল। সেই দৈত্য হচ্ছে বিষময় দৈত্য। তার কাছে যাবার সাধ্য নেই কারো। তার নিঃশ্বাসের হাওয়াতেই মারা যায় লোক।

তবু দৈত্য হ'লে কি হয়, দৈত্যদের চোখেও তো ঘুম আছে। খানিক পরে দৈত্য গেল শুতে। যেই না সে ঘুমিয়ে পড়েছে, অমনি সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি মাথায় পরল জাদু-ই টুপী আর হাতে নিল জাদু-ই তলোয়ার নিয়ে সোজা হাজির হ'ল বিষময় দৈত্যের শোবার ঘরে।

জাদুর কাছে বিষ কিচ্ছু না। যে নিঃশ্বাসের বিষে লোক মারা যায়, মাথায় জাদু-ই টুপী ছিল ব'লে সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটির কিচ্ছু হ'ল না। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না বলা চলে।

তারপর সেই জাদু-ই তলোয়ার দিয়ে সবুজ রঙের লোক ফুস্‌মন্তরে দৈত্যের মুণ্ডুটা বালিশে নাবিয়ে রেখে এল।

সকাল হ'ল। অকুল-পাথার পুরীর কাননে পাখি ডাকল। গাছের পাতা থেকে ঝরে গেল শিশির।

রাজকন্যা এল সোনার চিরুনি হাতে। মুখে একগাল হাসি। তাঁর সাদা, মুক্তোর মতো সুন্দর দাঁতে রোদ্দুরের প্রথম আভা পড়তে যেন ঝকমক ক'রে উঠল। পিছু পিছু এল দাসীর দল। রাতের বিনুনী খুলে রাজকন্যার মেঘবরণ কেশ আঁচড়ে দেবে তারা।

রাজকন্যা এসে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজাকে শুধোয়, 'কি রাতে ঘুম হয়েছিল তো ভালো? কোন কষ্ট হয়নি?'

'না, না, কষ্ট কি! খুব ভালো ঘুম হয়েছিল। তবে ঘুমিয়ে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম।'

'কিরকম স্বপ্ন?'

'স্বপ্নে মনে হলো একটা জলার পেত্নী যেন আমার বালিশের তলা থেকে কাঁচি জোড়া চুরি ক'রে নিচ্ছে।'

এই কথা শুনেই রাজকন্যার মুখ শুকিয়ে গেল। অতি কষ্টে মুখে একটা শুকনো হাসি টেনে সে বলল, 'ওমা, তাই নাকি! কোথায় যাব! তা সেই কাঁচি জোড়া কোথায়? ভোর হয়ে গেছে, এখন তো আমাকে কাঁচি জোড়া ফেরত দিতে হবে। আছে তো ঠিক?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে বৈকি! এই নাও তোমার কাঁচি। বাব্বাঃ, একে সামলে রাখা কি কম ঝকমারি!'

কাঁচি জোড়া ফেরত পেয়ে রাজকন্যা অবাক। শুধু অবাক নয়, অমন চাঁদপানা মুখ তার অপমানে বেগ্‌নে হয়ে গেল।

কিন্তু অত সহজে কি তুষারের মতো সাদা, রক্তের মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট আর দাঁড়কাকের ডানার মতো কালো কুচকুচে চুলের রাজকন্যাকে পাওয়া যায়?

তাই আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজাকে আরো পরীক্ষা দিতে হ'ল। এক রাত্তিরের পরীক্ষায় সে পাস করেছে, আরো দু'রাত্তিরের পরীক্ষায় পাস করলে তবে যদি মেলে রাজকন্যা।

দ্বিতীয় রাতে রাজকন্যা একখানা চিরুনি আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার হাতে দিয়ে বলল, 'এই চিরুনিখানা নাও, কাল সকালেই ফেরত চাই। না পারলে তোমার আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না বাছা!'

কিন্তু সে রাত্তিরেও চিরুনি চুরি গেল। ঐ রাজকন্যাই করল। যাকে-তাকে তো সে বিয়ে করতে পারে না। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছে কদ্দুর দৌড়! আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা জেগে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই যে ঘুমের কাঠি! সেই কাঠির চোটে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আর অমনি চিরুনি গেল চুরি।

কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার সঙ্গে ছিল সবুজ রঙের ছোটখাটো লোক। এবারও চিরুনিখানা ঠিক সময়ে সে উদ্ধার ক'রে এনে দিলে। আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজাও সকাল হতেই রাজকন্যাকে ফিরিয়ে দিলে তার চিরুনি। রাজকন্যা রাগে গরগর ক'রে উঠল। লোকটা তো কম নয়। হেরে যাচ্ছে খালি ওর কাছে!

তৃতীয় রাত্তিরে রাজকন্যা ফরমাস করল, শুধু চিরুনি নয়, যে মাথায় চিরুনি চলবে এবার সেই মাথাটিও চাই চিরুনির সঙ্গে সঙ্গে। নইলে—নইলে কী? আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার মাথাটি রেখে যেতে হবে।

এই কথা শুনে খুব মুষড়ে পড়ে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা। এখন সে কী করবে? চিরুনি চলবার জন্যে কোথা থেকে আস্ত মাথা যোগাড় ক'রে আনবে?

দুশ্চিন্তায় মারা যেতে লাগল আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা।

কিন্তু সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি হাওয়ার মতো বেগে এসে ফিসফিস ক'রে ব'লে গেল, 'কিচ্ছু ভেবো না। আমার ওপর ভরসা রাখ।' এদিকে হয়েছে কি, সেই বিষময় দৈত্য প্রথম রাত্তিরে কিন্তু মরেনি। সে ভীষণ একটা চালাকি খেলেছিল। সবুজ রঙের লোকটিও অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি, মুণ্ডুটাকে সে সত্যিই সত্যিই নাবিয়ে আসতে পেরেছে কিনা!

তৃতীয় রাতে রাজকন্যা চিরুনি চুরি ক'রে সেই বিষময় দৈত্যের হাতে দিয়ে তাকে খুব ধমকালো। বলল, 'খুব সাবধান। এবার যদি এটা তোমার কাছ থেকে ফের হাতিয়ে নেয় তাহলে কিন্তু রক্ষা নেই!'

দৈত্য ঘাড় নাড়ল।

তারপর মস্ত এক পাহাড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে এল চিরুনিখানা। তা'তে আবার চৌষট্টিবার কুলুপ এঁটে একশ' আটাশ বার চাবি দিল।

শুধু কি তাই! দিয়ে নিজে জেগে বসে রইল পাহারায়। পাছে একটি মাছি পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে না পারে!

কিন্তু হ'লে হবে কি! সবুজ রঙের লোকটির কাছে আছে জাদু-ই টুপী। আর হাতে আছে জাদু-ই তলোয়ার! তার কাছে অসাধ্য কিছু নেই। আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার আরো যে সব চ্যালা-চামুণ্ড ছিল, তারাও সাহায্য করল এ-ব্যাপারে।

যে লোকটা দারুণ দৌড়তে পারত, সে অমনি এক দৌড়ে খবর এনে দিলে কোন্ পাহাড়ের তলায় আছে সেই চিরুনি। যে লোকটার কান খুব পরিষ্কার, ঘাস গজাবার শব্দ অবধি যে শুনতে পায়, সে অকূল-পাথার পুরীর বাইরে বসে-বসেই বলে দিলে, দৈত্যটা এখন হাঁচছে না ঢুলছে, নাকি দাঁত কিড়মিড় করছে!

সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি সময় বুঝে গেল সেই পাহাড়ের তলায়, যেখানে চৌষট্টিবার কুলুপ এঁটে একশ' আটাশ বার চাবি দিয়ে রাখা আছে চিরুনিখানা।

আবার ভোর হ'ল। অকূল-পাথার পুরীর কাননে পাখি ডাকল। গাছের পাতা

থেকে ঝরে পড়ল শিশির। রাজকন্যা এলো সোনার চিরুনি হাতে। পিছু পিছু দাসীর দল। রাজকন্যার মুখে হাসি আর ধরে না।

'কই, কিসের ছেলের রাজা না কি, আমার চিরুনী কই? চিরুনী চলবার জন্যে মাথা কই?'

'হ্যাঁ, এই যে দিই।' এই ব'লে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা চিরুনীখানা এনে দিলে রাজকন্যাকে আর সঙ্গে দিলে সেই বিষময় দৈত্যের মাথা।

'আপাততঃ এই মাথাতেই চিরুনি চালাও। এর চেয়ে ভালো মাথা আর খুঁজে পাইনি।'

এবার রাজকন্যার আনন্দ আর ধরে না। সব পরীক্ষায় উত্‌রেছে আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা। এবার তাকে বিয়ে করতেই হবে।

খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে করার পর আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা যেই রাজকন্যার ঘরে যেতে যাবে, অমনি সেখানে হাজির হ'ল সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি। রাস্তা রুখে বলল, 'দাঁড়ান। আমার সর্ত?'

'কী সর্ত?'

'সে কি! ভুলে গেছেন? বলেছিলুম যে, রাজকন্যার হাত থেকে সবার আগে রেশমী রুমাল নেব আমি। এখন আপনাকে সেই সর্ত পালন করতে হবে।'

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা বলল, 'বেশ। নিশ্চয়ই মানব তোমার সর্ত। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। যাও, তুমি আগে রেশমী রুমাল নাও রাজকন্যার হাত থেকে।'

সবুজ রঙের লোকটি রাজকন্যার হাত থেকে রেশমী রুমাল নিয়ে এল। রাজকন্যা কিছুতেই দিতে চায় না। বলে, এটা তোমার জন্যে নয় বাপু, আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজার জন্যে।' কিন্তু সবুজ রঙের লোক কিছুতেই সেকথা শোনে না। জোর ক'রে রাজকন্যার কাছ থেকে কেড়ে নেয় সে রুমাল। আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজাকে এসে বলে, 'হুজুর এ রুমালে বিষ মাখানো। ধরলেই মৃত্যু। এই দেখুন—ব'লে সে তার মাথা থেকে জাদু-ই টুপী আর হাত থেকে জাদু-ই তলোয়ার ফেলে দিলে। দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুমালের বিষে সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি ছটফট করতে করতে মারা গেল।

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা তাই দেখে হায় হায় ক'রে উঠল।

কিন্তু চোখ বোজবার আগে সবুজ রঙের ছোটখাটো লোকটি ব'লে গেল, 'হুজুর আমার জন্যে দুঃখু করবেন না। আমি হচ্ছি সেই লোক, আমি মারা-ই গিয়েছিলুম। কিন্তু আমার বিস্তর দেনা ছিল ব'লে আমি মরতে পারছিলাম না। আপনি মহানুভব, তাই আপনি আমার সব দেনা শোধ করেছিলেন। তাই আমি আপনার এটুকু উপকার করে গেলুম।' এই ব'লে সবুজ রঙের লোকটি চিরতরে চোখ বুজল।

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজা তখন আর কি করে! অকূল-পাথার পুরীর কাননে মাটির তলায় তাকে শুইয়ে রেখে এলো। তারপর সেখানে সবুজ রঙের সেই ছোটখাটো লোকটির কবরের উপর একদিন আশ্চর্য এক ফুলের গাছ হ'ল। বারো মাস তিরিশ দিন ফুটত সেই ফুল। যে দেখত সেই বলত, 'ফুল তো নয় যেন এক গুচ্ছ নির্মল হাসি।'

আয়র্ল্যাণ্ড-এর ছেলের রাজাও রাজকন্যাকে নিয়ে চলে গেল পশ্চিম দেশে। সেখানে তারা সুখে হেসে-খেলে দিন কাটাতে লাগল।*

* একটি আইরিশ রূপকথা অবলম্বনে।

সোনা গলা রোদ্দুর

শ্রীপ্রবীর দাস

সোনা-গলা রোদ্দুর
আকাশটা কদ্দুর ?
মেঘগুলো সারি বেঁধে
পাখা মেলে যদ্দুর ?

সোনা-গলা রোদ্দুর
বুনোহাঁস মেলে সুর,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়
কোন্ সে অচিন-পুর ?

সোনা-গলা রোদ্দুর
চোখ যায় যদ্দুর
মাঠ ভরা ফাঁকা বনে
সোনালী সমুদ্দুর !

সোনা-গলা রোদ্দুর
থালা থালা রক্-চুর,
ষোল কলা রূপ যেন
ঝরে ওতে ঝুর ঝুর !!

পুতুল খেলার সময়

খুকু তোমার দুপুর এখন, পুতুলখেলার সময়
সূয্যিঠাকুর পড়লো হেলে সারা আকাশময় ;
পুতুলগুলো ছড়িয়ে বসে সারা ঘরের কোণে,
তুমি তাদের পাড়াবে ঘুম তোমার আপন মনে।

খুকু তোমার দুপুর এখন মা পড়েছেন শুয়ে
মেনি বেড়াল ঝিমোয় এখন ক্লান্ত হয়ে ভূঁয়ে
ছোট্ট খোকন ঘুমিয়ে আছে কাছে মায়ের পাশে
ঘরকন্না শুরু এবার, কর গিন্নীর বেশে।

খুকু তোমার এখন দুপুর, বাবা গেছেন কাজে
মৌমাছিরা খুঁজছে মধু ফুলবাগানের মাঝে,
প্রজাপতি ক্লান্ত পাখায় ঘুরছে এধার-ওধার
শালিক পাখী জটলা করে কার্ণিশের ঐ ধার।
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে হেঁকে, চাই ফিতে, চাই চুড়ি,
খুকু বল, এমন দুপুর কোথা থেকে করলে তুমি চুরি ?

খুকু তোমার দুপুর এখন সবার চোখে ঘুম,
এই দুপুরে তোমার শুধু ঘরকন্নার ধুম।

খেলনা-শহর ম্যাডুরোদাম

শ্রীঅমলেন্দু সেন

তোমরা অনেকেই হয়তো গ্যালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছ। লিলিপুটদের দেশের কথা, সেখানকার ছোট ছোট ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট আর ক্ষুদে মানুষদের বিচিত্র কাহিনী প'ড়ে তোমরা অবাক হয়েছ। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে সেরকম কোন দেশ আছে পৃথিবীতে, সে খবর গ্যালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী যিনি লিখেছিলেন, তাঁর জানা ছিল না। তিনি কল্পনা ক'রে লিখেছিলেন সেই মজার দেশের কথা।

কিন্তু আজ আমি তোমাদের যদি বলি পৃথিবীতে তেমনি একটি দেশ আজ সত্যি-সত্যিই আছে, তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভাববে, এও কল্পনায় গড়া রাজ্য।

যে শহরটির কথা আজ আমি তোমাদের কাছে বলতে যাচ্ছি, সে শহরটি কিন্তু মোটেই কল্পনায় গড়া রাজ্য নয়। সেই ক্ষুদ্র শহরটির নাম হচ্ছে ম্যাডুরোদাম। এই ক্ষুদ্র শহরটি কোথায় জানো? হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডের এই ক্ষুদ্র শহরটিতে রয়েছে এর নিজস্ব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের সব দোকানপাট, গির্জা, পোতাশ্রয় এবং বেতার কেন্দ্র।

ম্যাডুরোদাম শহরটিকে বিনা দ্বিধায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম শহর বলা চলে—এ যেন কোন একটি ওলন্দাজ শহরেরই অবিকল প্রতিরূপ, ক্ষুদ্রাকারে তৈরি।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একবার সেই ম্যাডুরোদাম শহরে বেড়াতে যাও তা হ'লে দেখবে, তোমারও মনের অবস্থা অবিকল গ্যালিভারের মতো হবে,—লিলিপুটদের দেশে পৌঁছে তার মনের ভাব কি রকম হয়ে গিয়েছিল তা তোমরা জানো।

ম্যাডুরোদাম শহরটি বেশ মজার শহর—এখানে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগে
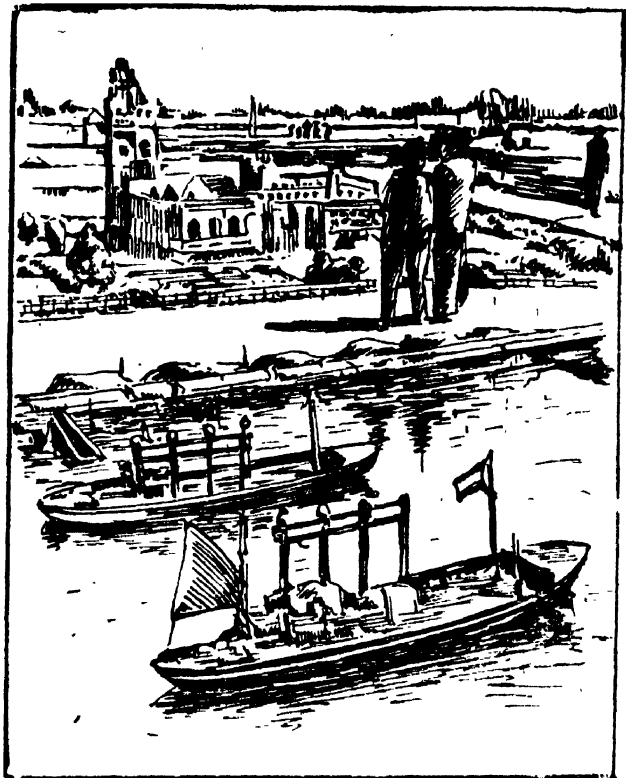
তৈরি দু'রকমের রাস্তাই আছে। এই শহরটি তৈরি করতে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, শহরের মধ্য দিয়ে চলবার সময়ে এখানকার রাস্তাঘাট, দু'পাশের সাজানো বাড়ী-ঘর, পার্ক ও দোকানপাটের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঐশ্বর্যের যেন ছড়াছড়ি চতুর্দিকে।

হেগ শহর থেকে ট্রামে চ'ড়ে ম্যাডুরোদাম শহরে যেতে হয়। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক এই শহরে বেড়াতে আসেন।

লিলিপুটদের দেশের মতো ক্ষুদ্রায়তন এই শহরের মাঝখান দিয়ে যে বড় সড়কটি চ'লে গেছে, তা লম্বায় দু'মাইল। সন্ধ্যা হলেই সারা শহর বিদ্যুতের আলোতে ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে। এই শহরে ৪৫ হাজার বাল্‌ব জ্বলে আলো করার জন্যে। এই ৪৫ হাজার বাল্‌ব থেকে বিদ্যুতের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে এক সঙ্গে। বন্দরে নোঙর করা ছোট ছোট জাহাজগুলোতে আলো জ্বলে উঠে তা ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গের শিখরে শিখরে—অবাক হয়ে দেখবার মতো সেই অপরূপ দৃশ্য!

ক্ষুদ্রাকারের একটি বিমান বন্দরও রয়েছে এখানে। সন্ধ্যা হলেই এই বিমান বন্দরের মিনারের চূড়া থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর রশ্মি ফেলা হয় বারে বারে চারদিকে, আকাশের বুকে।

ম্যাডুরোদাম শহরটি আকারে ক্ষুদ্র হলে কি হবে, এ শহরের জীবন-চাঞ্চল্য কিন্তু একটুও কম নয়। হৈচৈ নেই বা কোন রকম গণ্ডগোল নেই এমন একটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত এখানে পাওয়া যায় না বললেই চলে। অবশ্য বড় শহরের মতো এখানেও সারাক্ষণই নানা রকম শব্দ শোনা যায়। সব সময়ে এই শহরে রেলগাড়ী চলছে, ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, বাস চলছে। কর্মব্যস্ততা যখন এখানে সবচেয়ে বেশী, তখন মোটর গাড়ী, বাস এবং সাইকেল আরোহী ও পথচারী মানুষের ভিড়ে রাস্তা এমনভাবে জমাট বেঁধে যায় যে, তখন আর এক পা-ও সামনে এগোবার উপায় থাকে না। নোঙর তুলে জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, কল-কারখানাগুলোতে কাজ শুরু হয়, বন্দরে ক্রেনের সাহায্যে ভারী ভারী সব মাল ওঠানো-নামানো হয় এবং সবচেয়ে আধুনিক ধরনের আন্তর্জাতিক রেলগাড়ীগুলো এই শহরের লোহায় বাঁধা রাস্তা দিয়ে যখন ছুটে চলে, তখন সব শব্দ আওয়াজ একসঙ্গে মিলে-মিশে এক বিচিত্র ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়।

ম্যাডুরোদাম শহরের একটি নিজস্ব অর্কেষ্ট্রাও আছে, সেটা রাখা হয়েছে এখানকার শিল্প ও বিজ্ঞান ভবনে। এই শহরে সবকিছুই আছে—একটি যাদুঘর, একটা দুর্গ, প্রাচীন নগর-প্রাচীর, বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটা স্কুল, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও ষ্টেশন, পার্ক, এবং

একটা চিড়িয়াখানাও আছে। আরও একটা বিষয়ে ম্যাডুরোদাম বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে যা পৃথিবীতে আর কোন শহরেরই নেই—একমাত্র এই শহরেই রাজবংশের একজন লোক মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই মেয়র হচ্ছেন হল্যাণ্ডের রাজকন্যা রাজকুমারী বিয়েত্রিস।

ম্যাডুরোদাম পৌরসভা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা হচ্ছে ৩০। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই এই পরিষদ গঠিত। যেসব ছাত্র-ছাত্রী পৌরসভা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, তাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে, ছুটির দিনগুলোর খানিকটা সময় এই ক্ষুদ্র শহরের পৌরসভা পরিচালনার কাজে ম্যানেজারকে হাতে-কলমে সাহায্য করার জন্য ব্যয় করা।

পর্যটকদের কাছ থেকে এবং আরো নানাভাবে যে টাকা রাজস্ব হিসেবে আদায় হয়, তার সবটাই ওলন্দাজ ছাত্রদের জন্য স্থাপিত স্যানাটোরিয়াম চালাবার জন্য ব্যয় করা হয়।

এই শহরটি তৈরির পিছনে এক মর্মন্তুদ করুণ ইতিহাস আছে। আজও হয়তো কান পাতলে শোনা যাবে পুত্রহারা এক জনক-জননীর বুক-ফাটা আর্তনাদ। তাঁদের সেই করুণ কান্নাই রূপ পেয়েছে এই ক্ষুদ্রায়তন শহরটির বুকে। ম্যাডুরোদাম শহরটি নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন কিউরোকাওর উইলেমষ্টাডের শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী জে. এম. এল. ম্যাডুরো। ১৯৪৫ সালে নাজি বন্দী-শিবিরে অন্তরীণ অবস্থায় নিহত তাঁদের একমাত্র পুত্র জর্জের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন, সেই অর্থ দিয়েই তৈরি হয়েছে এই খেলনা-শহর ম্যাডুরোদাম।

শ্রীশান্তনু বিশ্বাস

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাইপ্রাসে পঙ্গপালের তিনশত টন ডিম নষ্ট করা হয়েছিল। সাইপ্রাসে সাধারণতঃ পঙ্গপাল দেখা যায় না।

*

দক্ষিণ আমেরিকায় বালসা নামে একপ্রকার গাছ দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে এর মত সোজা, লম্বা, মজবুত আর কর্কের চেয়ে হাল্‌কা গাছ দেখা যায় না।

*

বেলজে নামক এক উপজাতির নাম থেকে বেলজিয়ামের উৎপত্তি।

*

নিগ্রো বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিশু পক্ষাঘাতের ঔষধ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

*

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ভারত জাতীয় কংগ্রেস থেকে রণবিধ্বস্ত চীনে সাহায্যের জন্য একটি মেডিকেল মিশন পাঠান। এই মিশনে ছিলেন: ডাঃ এম. অটল (মিশনের নেতা), ডাঃ এম. চোলকার (সহকারী নেতা), ডাঃ ডি. এম. কোটনিস (সভ্য), ডাঃ ডি. মুখোপাধ্যায় (সভ্য), ডাঃ বি. কে. বসু (সভ্য)।

*

এস্কিমোরা সাবান ও মোমবাতি খেয়ে থাকে এবং অক্টোপাসের শুঁড় ইটালীয়দের এখনো উপাদেয় খাদ্য।

*

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় মাকড়সা আছে, যাদের জালে হামিংবার্ড ও ফিঞ্চ জাতীয় পাখীরা জড়িয়ে ধরা পড়ে প্রাণ হারায়।

*

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Pierre Gogelman সর্বপ্রথম কৃত্রিম চোখ তৈরি করেন।

মেঠুড়ে

উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ

স্পেনের সর্বপ্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সর্বপ্রধান টেনিস প্রতিযোগিতায় ম্যানুয়েল সান্তানার বিজয়ীর সম্মান এ-বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের বড় খবর। ডেনিস র‍্যালস্টনকে ফাইন্যালে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে সান্তানা এবার উইম্বলডন বিজয়ী হয়েছেন। সান্তানা ক্লে কোর্ট অর্থাৎ স্লো কোর্টের অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। আটাশ বছর আগে মাদ্রিদের এক বস্তি-ঘরে সান্তানার জন্ম। মাদ্রিদ টেনিস ক্লাবে তাঁর বাবা মালীর কাজ করতেন। ভালো করে খাওয়া-পরা জুটত না, তাই মাদ্রিদ টেনিস ক্লাবেই কোর্ট ঝাঁট দেবার চাকরি নিয়েছিলেন সান্তানা। কোর্ট ঝাঁট দিতেন, ফুলের গাছে জল ছিটোতেন আর দু'চোখ মেলে খেলা দেখতেন। দেখতে দেখতেই খেলার শখ, শখ থেকে আজ তাঁর মাথায় বিশ্ব টেনিসের মুকুট।

এ-বছরের উইম্বলডনে মহিলাদের বিভাগে বিলি জিন কিং বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছেন। গত বারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ এবং গতবারের রানার্স ব্রাজিলের মেরিয়া বুনো তাঁর কাছে হেরে গেছেন। বিলি জিনের উইম্বলডন জয় মহিলাদের টেনিসে আমেরিকার হারানো সম্মানের পুনরুদ্ধার বলা যায়।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবার কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। জুলাইয়ের ৩০শে তারিখটা বিশ্ব ফুটবল ক্ষেত্রে যেমন স্মরণীয় দিন, তেমনি কলকাতার ক্রীড়া-রসিকদের কাছেও ঐ তারিখটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফিরতি লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের দুই সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় এর ভেতর কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত ফলাফল ঘটে গেলেও, লীগ জয়ের ব্যাপারে এই খেলাটা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয়।

চার বছর পরে ইস্টবেঙ্গল কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ বিজয়ী হল। এর আগে ইস্টবেঙ্গল আরো সাত বার (১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২, ৯৬১) ফুটবল লীগ জয় করে।

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা
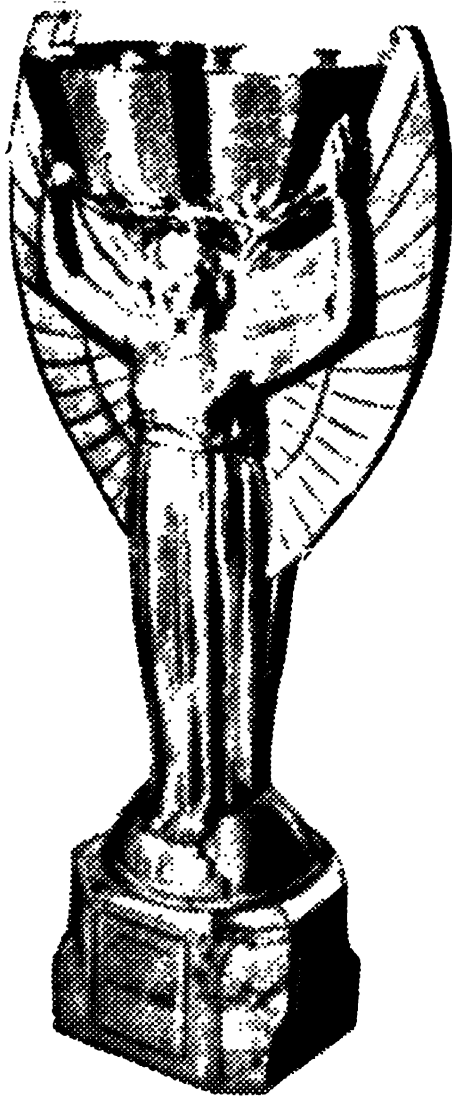
জুলে রিমে কাপ

ইংলণ্ডের মাটিতে সর্বপ্রথম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এবং ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ইংলণ্ডের সর্বপ্রথম বিশ্ব কাপ লাভ, ফুটবল খেলার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর।

চার বছর উদ্যোগ-আয়োজন এবং বিস্তর প্রচারের পর ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপ ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। শুধু ইংলণ্ডে নয়, বিশ্ব কাপ বা জুলে রিমে কাপের খেলাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ফুটবল ক্রীড়া-রসিকদের অধীর আগ্রহ দেখা গেছে। কারণ, ফুটবল পাঁচ মহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং বিশ্ব কাপ ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। ইংলণ্ডই সারা বিশ্বে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা এবার হ'ল ইংলণ্ডের মাটিতে।

চার বছর অন্তর বিশ্ব ফুটবলের আসর বসে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্ব কাপের খেলা শুরুর পর যে ক'বার বিশ্ব কাপের খেলা হয়েছে, তার কোনো বারেই এবারের মতন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি।

ইংলণ্ডের একটা কেন্দ্রে সাতটা স্টেডিয়ামে মূল প্রতিযোগিতার খেলাগুলো হয়। প্রধান খেলাগুলো হয় লণ্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। সেখানে সেমি-ফাইন্যাল, ফাইন্যাল, তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা সমেত মোট ন-টা খেলা হয়। এবার বিশ্ব কাপ ফুটবলে তেতাল্লিশটা দেশের

ভেতর প্রাথমিক প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় এবং মূল প্রতিযোগিতায় গত দু'বারের

জিওফ হার্স্ট (ইংল্যাণ্ড) ইনি একাই পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ৩টি গোল করেন।

বিজয়ী ব্রাজিল, প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী দেশ ইংলণ্ড ছাড়াও ইউরোপের দশটা, উত্তর-দক্ষিণ-মধ্য আমেরিকার পাঁচটা এবং এশিয়ার একটা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

প্রত্যক্ষ দর্শক ছাড়াও ৪০ কোটির ওপর ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের লোক টেলিভিশনে খেলাগুলি দেখে। খেলার সংবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশের ১,৬০০ শো পত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। এর উপর বেতারে নানা ভাষায় ধারা-বিবরণী প্রচারিত হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই খেলায় পৃথিবীর সব দেশ কিভাবে সাড়া দিয়েছে! এই খেলা যে-সব দর্শক দেখেছেন, তাদের কাছ থেকে আয় হয়েছে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। আর বাকী ৫ লক্ষ পাউণ্ড টেলিভিসন কোম্পানীগুলির কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি অর্ধে পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে নব্বই মিনিট বিশ্ব কাপের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। মাঝে অবশ্য পাঁচ মিনিট বিরতি থাকে। কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে অমীমাংসিত খেলায় অতিরিক্ত সময়ে খেলাবার ব্যবস্থা ছিল, যদিও কোয়ার্টার ফাইন্যালের চারটে খেলার কোনোটাতেই অতিরিক্ত সময় খেলানোর দরকার হয়নি—নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখটা ইংলণ্ডের ক্রীড়া-ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। পশ্চিম জার্মানীকে ৪—২ গোলে হারিয়ে ইংলণ্ড যখন ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জুলে রিমে কাপ সর্বপ্রথম লাভ করল, তখন ইংলণ্ডে ইংরেজরা কি ভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করেছিল তা' আমরা এখানে বসেই ধারণা করে নিতে পারি। ইংলণ্ড

দল যাঁরা এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, সে-দলটি সারা ব্রিটেনের দল নয়— শুধু ইংলণ্ডের দল। স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলস প্রত্যেকে আলাদা আলাদা দল হিসেবে বিশ্ব কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডেই হেরে যায়। ইংল্যাণ্ড যেমন গ্রেট ব্রিটেন নয়, তেমনি ফ্যাইন্যালে পরাজিত জার্মানীও গোটা জার্মান দল নয়। পশ্চিম জার্মানীই মূল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পূর্ব জার্মানী প্রাথমিক প্রতিযোগিতার খেলায় ৬ নম্বর গ্রুপ থেকে বিদায় নেয়। সুতরাং আধখানা জার্মানীর বিশ্ব কাপে রানার্স হওয়াও কম কৃতিত্বের কথা নয়। পশ্চিম জার্মানীই ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব কাপ জয় করে। পশ্চিম জার্মানী এবারে ফাইন্যালে জয়ী হতে পারলে উরুগুয়ে, ইটালী ও ব্রাজিলের মতন দু'বার জয়ী হিসেবে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় জুলে রিমে কাপ চিরতরে লাভ করবার আশা করতে পারতেন।

দু'বারের বিশ্ব কাপ বিজয়ী ব্রাজিল, যাদের তৃতীয়বার জয়ী হয়ে জুলে রিমে কাপ চিরতরে পাবার কথা, তারা এবারের প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ খেলতে পারেনি, গ্রুপ লীগ থেকেই তারা বিদায় নেয়। ব্রাজিলের ব্যর্থতার মূলে বিশ্ব-খ্যাত খেলোয়াড় ফুটবল জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা পেলের আঘাত

বিশ্ব কাপের ফাইন্যাল খেলায় পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মার্টিন পিটার্সের (১৬নং খেলোয়াড়) দ্বিতীয় গোলটি করার অব্যবহিত পরের দৃশ্য।

যে অনেকখানি দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনের খেলাতেই জখম হয়ে পেলেকে মাঠ ছেড়ে যেতে হয়, পরের খেলায় তিনি খেলতে পারেননি। তার পরের খেলায় একটা পা-ই তাঁর প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলো দেশ প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলে, উত্তর কোরিয়াকে শুধু অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে খেলতে হয়। অষ্ট্রেলিয়াকে ৬—১ এবং ৩—১ গোলে হারিয়ে উত্তর কোরিয়া মূল প্রতিযোগিতার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গ্রুপ লীগে রাশিয়ার কাছে ৩—০ গোলে হারার পর চিলির সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা শেষ করা, ইটালীর মতো শক্তিশালী দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে উত্তর কোরিয়ার কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠা, এশিয়ার ফুটবলের পক্ষে আশার কথা। যদিও উত্তর কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইন্যালে পর্তুগালের কাছে ৫—৩ গোলে হেরে যায়, তবুও সে হারাটা গৌরবের। ফুটবলের কলানৈপুণ্য, ক্রীড়াশৈলীর জন্য পর্তুগালের রাইট্ ইন ইউসেবিও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড। পেলের পরেই আজ ইউসেবিও-র নাম। ইউসেবিও মূল প্রতিযোগিতায় ছ-টা খেলায় মোট আটটা গোল করেছেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিনি দুটো পেনালটি-সমেত চারটে গোল করেন। ইউসেবিও-র শ্রেষ্ঠত্বের আরো বড় পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর অন্তরের মধ্যে, ফুটবল এবং দেশকে ভালোবাসার মধ্যে। সেমি-ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হারার পর ইউসেবিও-র সে কি কান্না! ছোট্ট শিশুর মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কেঁদেছেন। অঝোরে তাঁর চোখের জল পড়ছে, আর গায়ের জার্সি দিয়ে তিনি চোখের জল মুছছেন—এ ছবি হয়তো তোমরা আমাদের দেশের খবরের কাগজের পাতায় দেখেছো। ইউসেবিও ছাড়া নিজ ক্রীড়াশৈলীতে যাঁরা অগণিত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের ভেতর ইটালীর ফেচেটি ও মাজোলা, স্পেনের লুই স্যুয়ারেজ, উত্তর কোরিয়ার সিউং ডং ইয়াং ও সিউং জিন, হাঙ্গেরীর বেনে, আর্জেন্টিনার ওনেগা, রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন, ইংলণ্ডের ববি চার্লটন নবি ষ্টিলেস, জিওফ হার্স্ট, গর্ডন ব্যাঙ্কস্ ও ববি মুর, পশ্চিম জার্মানীর বেকেনবেয়ার, হেলমুট হ্যালার, উয়ে সিলার প্রভৃতি খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করবার মতন।

দলগত সংহতি এবং প্রাণপণ সংগ্রামই ইংলণ্ডের বিশ্ব কাপ জয়ের মূলে। তবু ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়ের মূলে হার্স্টের অবদান অনস্বীকার্য। চারটে গোলের ভেতর হার্স্ট একাই তিনটে গোল করেছেন। তবে ইংলণ্ডের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন ববি চার্লটন।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে ১৯৩০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বিশ্ব কাপের খেলায় কোন্ কোন্ দেশ বিজয়ী, কোন্ কোন্ দেশ রানার্স ইত্যাদি হয়েছে, তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল :—

সাল	বিজয়ী	রানার্স	মূল প্রতিযোগিতা স্থান	যোগদানকারী দেশ
১৯৩০	উরুগুয়ে (৪)	আর্জেন্টিনা (২)	উরুগুয়ে	১৩টি
১৯৩৪	ইটালী (২)	চেকোস্লোভেকিয়া (১)	ইটালী	২৯টি
১৯৩৮	ইটালী (৪)	হাঙ্গেরী (২)	ফ্রান্স	৩৬টি
১৯৫০	উরুগুয়ে (৫ পয়েন্ট)	ব্রাজিল (৪ পয়েন্ট)	ব্রাজিল	৩৩টি
(লীগ-প্রথার খেলায় চূড়ান্ত ফলাফল নিষ্পত্তি হয়)				
১৯৫৪	পশ্চিম জার্মানী (৩)	হাঙ্গেরী (২)	সুইজারল্যাণ্ড	৩৮টি
১৯৫৮	ব্রাজিল (৫)	সুইডেন (২)	সুইডেন	৫৩টি
১৯৬২	ব্রাজিল (৩)	চেকোস্লোভেকিয়া (১)	চিলি	৫৬টি

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, ইংলণ্ড এবারে বিশ্ব কাপ বিজয়ী হওয়ায় বৃটিশ সরকার সম্মানসূচক ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন।

পরিচ্ছন্নতা

"পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়, কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সে-ই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটি তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়।

কেবলমাত্র নিজের শরীরই নয়, গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যকরূপে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে অবিন্যস্ত ও ছড়াইয়া রাখিবার উপায় নাই; যথাস্থানে যত্নপূর্বক রাখিতে হয় এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।"

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়
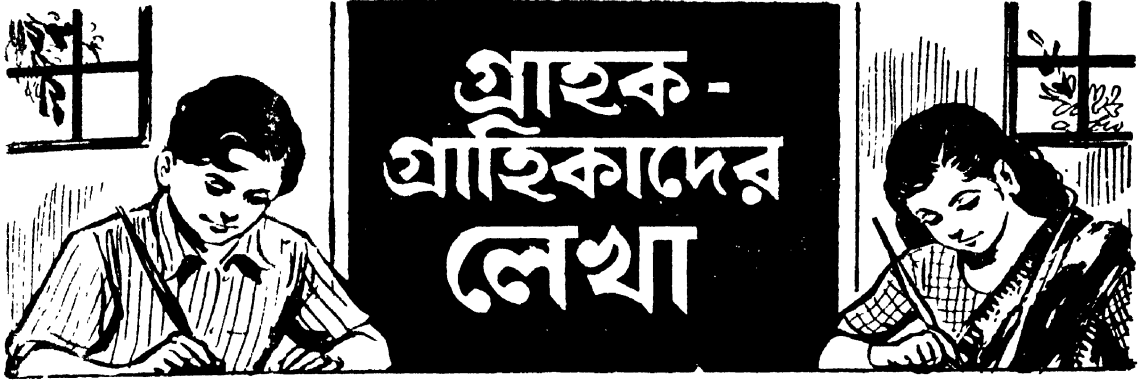
'ম্যাসাঞ্জর'-এ একদিন

সময়টা তখন ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। আমরা কলেজের কয়েকজন বন্ধু মিলে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার মতলব করছি। কিন্তু প্রথমে বাড়ি থেকে অভিভাবকরা রাজী না হওয়াতে আমাদের যাওয়াটা মুলতুবী রাখতে হয়েছে। সবারই মন খুব খারাপ। এমন সময় আমরা একটা খুব ভাল সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে মত দিলেন।

ম্যাসাঞ্জর জায়গাটার নাম শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার বেশী নয়। এটার সম্বন্ধে আগে কোনও কৌতূহল বোধ করিনি। কিন্তু আমাদের মনোভাব বদলে গেল জায়গাটা দেখার পর। এখন মনে হয়, ম্যাসাঞ্জরে না গেলে আমরা প্রাকৃতিক একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখা থেকে বঞ্চিত হতাম।

রাত্রি তিনটের সময় আমরা ধানবাদ থেকে রওনা হলাম। শীতকালের ভোর তিনটে, রাত্রিই বলা চলে। কোথাও তখন ভোরের আলো ফোটেনি, পাখীরাও জাগেনি। আমরা বাসে করে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে আছেন অভিভাবক স্থানীয় কয়েকজন ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবরা। বাস প্রায় ভর্তি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। তার মাঝ দিয়ে বাসের হেড লাইট রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘন অন্ধকারে রাস্তার ওপর এই আলোই যেন আমাদের পথ-প্রদর্শক। চারিদিকে অসম্ভব নিস্তব্ধতা ; একমাত্র বাসের ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসছে না। তার ওপর ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য সব জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দু'পাশের গাছপালা-গুলো অস্পষ্টভাবে আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। তারপর ক্রমশঃ সূর্যের রক্তিম আভা একটু একটু করে দেখা দিতে লাগল। আবছা অন্ধকার আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে, ধীরে ধীরে পূর্ব দিগন্তে লাল আবীর ছড়িয়ে সূর্য উঠল।

ভোরের আলো ফোটার পর আমরা চারিদিকে দেখতে দেখতে চলেছি। গাছে গাছে পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। প্রকৃতিকে তখন আরও সুন্দর লাগছে। তখন আমরা সবাই মিলে "চলরে চল···ঊর্ধ্ব

গগনে বাজে মাদল" গান ধরেছি। গায়ে প্রচুর গরম জামা থাকা সত্ত্বেও শীত করছে।

এরপর আমাদের বাসটা তোপচাঁচি ও মাইথন ড্যামের ওপর দিয়ে যেতে লাগল। সকালের ঝিকমিকে রোদ্দুরে তোপচাঁচি খুব সুন্দর লাগছিল। চারিদিকে ফুলের গাছ। একপাশে পাহাড় উঠে গেছে আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে বুনো ফুলের সে কি বাহার! আরও কয়েক মাইল যাবার পরই এল মাইথন ড্যাম। বাসের জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই মনে হচ্ছিল যেন ঐ অতল গভীরে এখনও সূর্যের আলো ঢোকেনি, হয়ত ঢুকবেও না কোন দিন। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত লাগছিল ওপর থেকে। সামনে পাহাড় আর দু'দিকে গভীর খাদ। আমরা চলেছি ওপর দিয়ে। এই জায়গাটার চারিদিকেই নিস্তব্ধ আর থমথমে ভাব। নীচে গভীর খাদের শূন্যতা ও পরিবেশের সব মিলিয়ে অদ্ভুত ভাল লাগছিল। এখান থেকে মাইল দুই দূরেই কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। সেখানে আমরা নেমে মূর্তি দেখলাম। মন্দিরটা বেশ বড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পথের দু'পাশে খাবারদাবার ও এটা-সেটার দোকান। পূজার জন্য ফুল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হয় এখানে। এখানেই এই মন্দির স্থাপনের বিচিত্র এক ইতিহাস শুনলাম।

তারপর আবার পথ। এইভাবে আমরা পাঁচ ঘণ্টা চলার পর এক জায়গায় নামলাম। সেখানে দামোদর নদীর একটা ছোট্ট শাখা ব'য়ে গেছে। দু'দিকে জঙ্গল। এখানে সামান্য জলযোগের পর আমরা জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ক্রমশঃ রোদ বাড়তে লাগল। আবার বাসে চড়লাম। ধানবাদ থেকে ম্যাসেঞ্জর প্রায় ১৯০ মাইল; তাই অনেকটা সময় বাসেই কাটাতে হয়। এরপর অনেক ছোট ছোট জায়গা পার হয়ে দেওঘর-এ পৌঁছলাম। এখানে বেশ লোকালয় ও মানুষের ভিড় দেখা গেল। খানিকক্ষণ থামার পর আবার বাস চলতে আরম্ভ করল।

আমার বন্ধুদের মধ্যে গোপা, কাজল, মিতা, কৃষ্ণা, অঞ্জলি, কল্পনা—এরা সবাই বেশ ভাল গান করতে পারে। ওরা পর পর গান করে চলছিল, এবং এই গান শুনতে শুনতে আমাদের ভ্রমণ যেন আরও আনন্দের হয়ে উঠছিল। বেলা প্রায় সাড়ে ১০টার সময় আমরা ম্যাসেঞ্জরে পৌঁছলাম। সবাই হৈ-চৈ করতে করতে নামলাম। অনেকটা সিঁড়ির মত রাস্তা পেরিয়ে নীচে নামতে হয়। তারপর একটা বেশ ভাল জায়গা দেখে সবাই বসল। আমরা বন্ধুরা তখন জায়গাটাকে ভালভাবে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

ম্যাসাঞ্জরের দু'দিকে উঁচু পাহাড় উঠে গেছে, আর তাদের মধ্যে অনেকটা যে ফাঁকা জায়গা, সেখান দিয়ে ব'য়ে গেছে 'ময়ূরাক্ষী' নদী। নদীর ওপর ব্রীজ রয়েছে, ড্যামও

রয়েছে; যেদিকে জলটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেদিকটা অসম্ভব চওড়া। আর এর উল্টো দিকটাতে বেশ সরু মত জলের রেখা চলে গিয়েছে। দু'পাশে সুন্দর ভাবে বাগান করা আর স্থানে স্থানে বসবার জায়গা। এদিকটায় নানারকম ফুলের বাহার। শীত-কালের মরসুমী ফুলে জায়গাটা ভর্তি। আর মধ্যে মধ্যে জলের ফোয়ারা। যদিও এগুলো কৃত্রিম। কিন্তু আরও দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে যে নদী বয়ে গেছে, সেখানে কোনও কৃত্রিমতা নেই। প্রকৃতি সেখানে সম্পূর্ণ নিজস্ব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সে দিকটাই বেশী ঘুরলাম। এখানে একটা খুব সুন্দর ডাকবাংলো আছে। সেটা পাহাড়ের ওপর। ডাকবাংলোর ওপর থেকে এই জায়গাটাকে ঠিক ছবির মত দেখতে লাগে। এরপর ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করার পর, চারিদিকে বেড়াতে আর নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় আমরা ঘুরতে লাগলাম।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সূর্য ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে। এবার ফেরার পালা। বিকেল পাঁচটার সময় আমরা আবার বাসে উঠলাম। কিছুদূর যাবার পরই সূর্য ডুবে গেল। সূর্যোদয়ের মত সূর্যাস্তও আমার কাছে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। আকাশের রক্তিম বর্ণের নীচে গাছগুলো কালো কালো আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই রং দেখেই বোধহয় শিল্পীর তুলিতে ক্যানভাস্ রঙিন হয়ে ওঠে।

আমরা সারা দিনের ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছলাম। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু মন খুশীতে ভরপুর। এই দিনটা আমার জীবনের খাতায় একটা রঙিন দাগ রেখে গেল।

শ্রীমৈত্রী গুপ্ত

দীঘা-সৈকতে

সামনে সমুদ্দুর
চোখ মেলি যদ্দুর
ছল ছল করে জল
ঢেউ ওঠে অবিরল
কূল কই
মাটি কই
গ্রাম কই—কদ্দুর?
আকাশের নীলিমায়
অগোছালো বালুকায়
লুকোচুরি খেলে হায়
পড়ন্ত রোদ্দুর।
বাতাসের ঝুরঝুর
বুক করে দুর দুর
একা শুধু দেখে যাই
সাথী নেই
মাঝি নেই
নেই মোর শত্তুর
গ্রাম কই—কদ্দুর?

শ্রীচিত্ত মাইতি

হাতী শিকার

হাতী তোমরা সবাই দেখেছো। কোচবিহারের মহারাজার অনেক হাতী ছিল এবং এখনো কিছু কিছু আছে। হাতী ধরার ব্যাপারটি ভারী মজার। আমি যদিও দেখিনি, তবে আমার দাদা জলপাইগুড়ি 'ফরেষ্ট অফিসে' কাজ করেন, তাঁর কাছেই শোনা গল্প। বলছি শোনো—বনের মধ্যে যে-সব জায়গায় হাতী চলাফেরা করে, সে-রকম স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে মোটা মোটা কাঠের খুঁটি দিয়ে একটি খোঁয়াড় তৈরী করা হয়। খোঁয়াড়ের এক পাশে একটি দরজা থাকে, দরজাটি ওপর দিকে তুলে রাখা হয়। খোঁয়াড়ের চার পাশ লতা-পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে দূর থেকে হাতী বুঝতে না পারে।

খোঁয়াড়ের লোকেরা কোন এক নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকে। খোঁয়াড়ের ভেতরে ও বাইরে কলাগাছ পুঁতে রাখা হয়। হাতী কলাগাছ খেতে খুব ভালবাসে; তাই তারা দল বেঁধে খোঁয়াড়ে প্রবেশ করলেই ঝুপ্ ক'রে দরজাটি নামিয়ে দেওয়া হয়। হাতীরা যখন বুঝতে পারে তখন তারা ছুটোছুটি ক'রে খোঁয়াড় ভাঙবার চেষ্টা করে। খোঁয়াড়ের লোকেরা তাদের শান্ত করবার জন্যে বল্লম দিয়ে খোঁচা মারে ও মশাল জ্বেলে ভয় দেখায়।

অনেক পুরুষ হাতী বেশী অশান্ত হয়ে উঠলে তাদের গুলী ক'রে মারা হয়।

এই দেখে অনেক অশান্ত হাতী মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে যায়।

কয়েক দিন পরে পোষা হাতীদের সাহায্যে এক-একটি নতুন বন্য হাতীকে বেধে ফেলা হয়। পোষা হাতীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কয়েক দিনের মধ্যেই তারা মানুষের পোষ মানে এবং অনুগত হয়ে পড়ে।

শ্রীতপনকুমার চৌধুরী

আমরা কিশোর দল

বিশ্বের মোরা চিরবিস্ময় দেশের
কিশোর দল,
নবীন বাণীর বন্যায় মোরা চির চল-চঞ্চল!
নিশীথ আঁধার দুঃখের পারে
মোরা নবারুণ ঊষা—
সত্যের শত রত্ন-শোভিত মন-মণি-মঞ্জুষা।
মোদের প্রতিভা-স্রোতে আছে শত
তুষার-স্বপন-সুপ্তি,
বিশ্বকবির ছন্দ নয়নে,
নেতাজীর দৃঢ়-দীপ্তি।
প্রতিবেশীদের গোপন-গোচর
আঘাতে করি না ভয়—
মোরা এক জাতি—এক প্রাণ মোরা,
মোরা চির-দুর্জয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

অ্যালফাবেটা ক্লাব : ছোটদের নৃত্য-নাট্য—শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়। নিওরিট, ৪৫ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১। মূল্য ২·০০

ইংরেজী হরফদের নিয়ে লেখা অভিনব এই নাটিকাটি ছোটদের কেবল যে পড়তেই ভাল লাগবে তা নয়, ছোটদের দ্বারা অভিনীত হলে, ছোট্ট দর্শকরাও প্রচুর আনন্দ পাবে। সংক্ষেপে এর কাহিনীটি হচ্ছে : কেয়া আর মহুয়া দুই বোন। মহুয়া বড়, স্কুলে যায়। কেয়ার তাই দুঃখ, সে কেন স্কুলে যায় না। তার কান্নাকাটি আর বায়না থামে না। শেষে তার বাবা এনে দিলেন এ. বি. সি. ডি শেখবার বড় রঙচঙে বই। কেয়া সেই বই দেখে অক্ষর চিনতে-চিনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে এ. বি. সি. ডি-রা তার কাছে এসে কত গান শোনাচ্ছে নেচে নেচে। হরফদের সঙ্গে আছে গ্রামার সাহেব, যাদুকর, ব্যাঙ আর 'ভাওয়েল'-এর দল। ছাপা, ছবি, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট ছোটদের আনন্দ দেবে।

ছোটদের দৃষ্টি-প্রদীপ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতি প্রকাশন, ২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৭৫।

বিভূতিভূষণের নামের সঙ্গে পরিচয় নেই, বাংলাদেশে এমন শিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' বইয়ের নাম তোমরাও জানো। এই 'দৃষ্টি-প্রদীপ' তাঁর আর একখানি নাম-করা বই এবং এর মধ্যে এমন কাহিনী আছে, যা 'পথের পাঁচালী'র মতই তোমাদেরও ভাল লাগবে। প্রধানতঃ বইখানি বড়দের জন্য লেখা হলেও, ছোটদের জানবার, বোঝাবার অনেক কাহিনী আছে এতে এবং সেইজন্য সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর স্কুল-পাঠ্য বই হিসাবে এটি নির্দিষ্ট হয়েছে। কাহিনীগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে 'ছোটদের দৃষ্টি-প্রদীপে'।

চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০

হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন শিবরাম বাবুর দু'টি আজব চরিত্র—মজার সৃষ্টি। তোমরা যারা ছায়াছবিতে লরেল আর হার্ডি অথবা কোহেন আর কেলীর অভিনয় দেখেছ, তারা গোবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে তাদের ছাপ পাবে। এই দু'টি মজাদার চরিত্র নিয়ে লেখা ষোলটি গল্পের সংকলন 'চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন'। কাহিনীর কৌতুক আর সেই সঙ্গে তাল রেখে ছবিগুলি হয়েছে যেন সোনায় সোহাগা। এই ছবিগুলি এঁকেছেন মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়।

বাজিকর

ক্ষেত্রটির মধ্যে কতগুলি বিন্দু আছে কত তাড়াতাড়ি বলতে পার ?

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

'বাক্য-পূরণের ধাঁধা'র উত্তর

অসুর, দানব, দৈত্য পার্থক্য তো নাই,
তনয়, পুত্র ও সুত এ তিনেও তাই।
বাবা, পিতা ও জনক এক এই তিন,
প্রসবিনী, জননী, মা হয় যে অভিন্ন্।
কুসুম, পুষ্প ও ফুল নহেক আলাদা,
এক অর্থ ধরে তিন শ্বেত, শুভ্র, সাদা।
ভুজঙ্গ, অহী ও সাপ এক অর্থ হয়,
গজ, হস্তী, করী এক বিজ্ঞলোকে কয়।
শবর, কিরাত, ব্যাধ কভু ভিন্ন নহে,
বিটপী, তরু ও বৃক্ষ এক অর্থ বহে।
এক অর্থ ধরে ধরা, পৃথিবী, ধরণী,
এক যান জেন নৌকা, তরী ও তরণী।
আকাশ, গগন, ব্যোম একই জানবে,
রশ্মি, কর, প্রভা তিনে অভিন্ন মানবে।
জল, বারি আর নীরে প্রভেদ তো নাই,
ঘোড়া, অশ্ব, হয় এক জেনে রেখ ভাই।

(এই বাক্য-পূরণের ধাঁধাটির প্রায় নির্ভুল উত্তর এসেছে বেলেঘাটার অঞ্জলি চৌধুরী ও রত্না চৌধুরী এবং বাগবনের অঞ্জনা কুণ্ডুর কাছ থেকে—

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ছবির নামগুলি সাজালে এই রকম দাঁড়ায়—

আতশী কাঁচ,	টুপী,	পরচুলা,	জুতা,	ডাকটিকিট,	পা,
চুম্বক,	কোট, পুল,	ছুরি,	ফুটবল,	পিস্তল,	নৌকা,
পিরামিড,	চাবি,	বালতি,	জার,	বাদ্যযন্ত্র,	মুষ্টি,
কম্পাস,	নাসপাতি,	বেলচা,	গেলাস,	মাছ,	ব্রাশ,
বল,	গাছ,	পান,	বেহালা,	বুট,	পাইন, ভুট্টা

এর মধ্যে একই আগুক্ষর—পরচুলা, পা, পুল, পাইন, পান, পিরামিড, পিস্তল। চুম্বক, চাবি, কোট-কম্পাস, নৌকা-নাসপাতি, বালতি-বেলচা-বাদ্যযন্ত্র, বেহালা ও বল। মুষ্টি-মাছ।

এ বছর এ পর্যন্ত যে-সব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বছরের তুলনায় অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছে। এবারের ফলাফল তাই আনন্দ-দায়ক ও সন্তোষজনক। যারা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের আনন্দের অংশ আমরাও গ্রহণ করছি, আর যারা সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ এই বছরে স্কুল-কলেজগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই ক্ষতি হয়েছে—তবুও তাদের সাফল্যে আমরা গৌরব অনুভব করছি। যারা এই দুর্যোগে অকৃতকার্য হয়েছ, তারা আগামী বছর যাতে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে পারো, সেই শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি।

এখন তো তোমাদের কলেজ-জীবন শুরু হবে, তারই জন্য প্রতি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর আনাগোনার অন্ত নেই! প্রতিদিন শত শত ছেলেমেয়ে সব কলেজে ধর্ণা দিচ্ছে, কিন্তু স্থান সীমাবদ্ধ থাকায় তাদের অসুবিধার কথাও শুনছি। তবে নতুন কলেজের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে, কাজেই বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আশা করি যে তোমরা নতুন পরিবেশে বেশ ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে এবং নতুন পরিবেশ ভালই লাগবে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পরবর্তী পরীক্ষার ফলাফল আরো ভালো যাতে হয় তার চেষ্টা করবে।

মহাজীবন থেকে—

কয়েক শত বছর যবনিকা সরিয়ে অতীতের মেবার-এর এক অপূর্ব শক্তি-শালিনী, সঙ্কল্পে দৃঢ়, একটি মেয়েকে দেখছি। তিনি টংটোডার রাজা শুরতানের মেয়ে তারাবাঈ। মেয়ে তার বাপের মতই সাহসী ও স্বাধীনচেতা।

রাজ্যটি ছোট হলেও দুর্দান্ত পাঠানদের কাছে থেকে অব্যাহতি পায়নি। অত্যাচার ও লুটপাটে দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলে, তারা অবশেষে রাজ্যটি নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিল।

শুরতান মারওয়ারের দ্বারে দ্বারে সাহায্য চাইলেন, কিন্তু নিষ্ফল হতে হলো। অবশেষে আরাবল্লী পাহাড়ের নিচে বদনোর-এ এসে আশ্রয় নিলেন তিনি।

তারাবাঈ তখন ছোট ছিলেন, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন সব এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর পিতৃরাজ্য তিনি উদ্ধার করবেন।

অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ—সব দিকেই তারাবাঈ পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। নারীর সমস্ত কোমলতা বিসর্জন দিয়ে, মণিময় কঙ্কণ, বাজু, কণ্ঠের হীরককণ্ঠী ও ওড়না ফেলে, আরাবল্লীর পাহাড়ে শিকারের অন্বেষণ করে বেড়ান। রাজপুতদের কয়েকটি উৎসবের মধ্যে 'আহেরিয়া' উৎসবটি প্রধান উৎসব। এই উৎসবের ওপর তাদের সমস্ত বৎসরের শুভাশুভ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এটি শিকারের উৎসব। প্রথম শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তারা সমস্ত বৎসরের জয়ের আশা ত্যাগ করে।

এই উৎসবে তারাবাঈয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য, অপূর্ব সাহস এবং অপরিসীম ধৈর্য দেখে বদনোরবাসী বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

বাবার মনে চকিতে আনন্দ-স্বপ্ন ভেসে আসে·· লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার হবে।

তারপরের দৃশ্য !

অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে চলেছে বাপের পাশে সাদা ঘোড়ায় চড়ে। সারা দেহ তার কঠিন বর্মে ঢাকা, হাতে খোলা তরবারি। চারিদিকে যুদ্ধের বাজনা বাজছে—দেশের স্বাধীনতা ফেরাতে চলেছেন শূরতান আর কন্যা তারাবাঈ। পিছনে নির্ভীক সেনার দল।

জনসাধারণ জয়ধ্বনি করলো।

অদ্ভুত সাহস আর বীরত্ব প্রদর্শন করলেন তারাবাঈ। অজস্র শত্রু নিধন করলেন একা। শত শত বীর প্রাণ দিল, মাটি রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

জয় হলো না—কিন্তু হার স্বীকার করলেন না তারা। তারাবাঈ ঘোষণা করলেন, টোডা যে পুনরুদ্ধার করবে তিনি তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দেবেন।

যাঁরা গেলেন স্বাধীনতা আনতে, তাঁরা আর ফিরলেন না।

এবার এলেন মেবারের রাণা রায়মল্লের দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীরাজ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এলেন।

মহরমের উৎসব।

সমস্ত পাঠান সৈন্য বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে তাজিয়া নিয়ে উৎসবে মেতে টোডা অভিমুখে চলেছে। এই সমস্ত ঘোড়সওয়ারদের ভিতর চলেছেন পৃথ্বীরাজ, তারাবাঈ ও কয়েক শত সৈন্য। দু'টি জ্বলন্ত বজ্র চলেছে দীপ্ত তেজে টোডা উদ্ধারে,—দেশের স্বাধীনতা জয়ে। সমস্ত রাত ধরে যুদ্ধ চললো। সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তারাবাঈ ও পৃথ্বীরাজ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন।

এই মৃত্যু-ঝড়ের পরে টোডায় আবার স্বর্ণপতাকা উঠলো। সে পতাকা পাঠানের নয়। সে পতাকা স্বাধীনতার পতাকা। রাজপুতদের বিজয়-পতাকা।

এরপরে আবার দেখা গেল তারাবাঈকে রাজ-অন্তঃপুরে রাজবধূ বেশে।

কিন্তু দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যখনই প্রয়োজন হয়েছে এগিয়ে এসেছেন তারাবাঈ। অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা তিনি ত্যাগ করতে চাননি যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ। দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ, এই তিতিক্ষার কথা মনে হলে—পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

চিঠির উত্তর—

কামারুজ্জামান, মোহনপুর—তুমি যে অংশটা ভুলে দিয়েছ, সেটায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কয়েকটি কবিতার নাম আছে, তা বার করতে হবে। আচ্ছা দেখ, তোমরা পারো কিনা। ডাকটিকিট সংগ্রহের হবি খুব ভালো। তোমার আছে জেনে খুসী হচ্ছি।

"......ছেলেটা দুষ্ট—আখ্যা পেয়েছে বিদ্রোহী নামে। এই রঙ্গজগৎকে সে প্রশ্ন করতে চেয়েছিল—সত্যই কি সে দুষ্ট? সেদিন লিচুচোর বলে, দামোদর শেঠ তাকে পুরস্কারস্বরূপ দিল কয়েকটা কিল, চড়, লাথি, ঘুষি। রাঙাজবা হয়ে উঠল তার সারা শরীর। দুর্নামে তার দিদি তাকে পত্র লেখা বন্ধ করল। তাই সে এই পৃথিবী হতে মুক্তি চেয়েছিল—কিন্তু সে যে মৃত্যুঞ্জয়..."

তপনকুমার চৌধুরী, কোচবিহার—মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের রচনার চূড়ান্ত নির্বাচন করেন সম্পাদক মশাই। তোমার এই চিঠি তিনি দেখেছেন। তাঁকে আবার লিখো।

ইন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বেহালা; হীরক চক্রবর্তী, কোলকাতা—হাতের লেখায় আর একটু মন দাও, রাগ করো না যেন।

অনিন্দিতা, কলকাতা; দীপশিখা ও বহ্নিশিখা রায়, জলপাইগুড়ি; শ্রীমতী সেন, পুরুলিয়া—চিঠিতে কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, সেই জন্য প্রাপ্তিস্বীকারই শুধু করছি।

সকলের জন্য প্রীতি রইল। ইতি— তোমাদের—মধুদি'

সোভিয়েত ইউনিয়নে 'শিশু রাজ্য' আর্তেকে ছুটি কাটাবার অপূর্ব সুযোগ

১৯৬৬ সালের 'সোভিয়েত দেশ' নেহরু পুরস্কারটা যদি পেয়ে যেতে পারো তবে বিনা পয়সায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণসাগরের তীরে 'শিশু রাজ্য' আর্তেকে একমাস ছুটি কাটিয়ে আসতে পারো।

দশ থেকে চোদ্দ বছরের যে কোন ছেলেমেয়ে এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে। প্রতিযোগিতার বিষয় হল, ১১টি প্রশ্নের উত্তর দান এবং একটি প্রবন্ধ রচনা। প্রবন্ধের বিষয় হল: "বড় হয়ে আমি কি হতে চাই।" প্রতিটি প্রশ্নের সংগে পয়েণ্ট দেওয়া আছে। যে সব চেয়ে বেশি পয়েণ্ট পাবে সেই জিতবে। ১৯৬৬ সালের ৩১শে আগষ্টের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে, কোথায় পাঠাবে তার ঠিকানাগুলো নীচে দেওয়া হল। মনে রাখবে, প্রথম পাঁচজনকেই আর্তেকে ছুটি কাটাবার জন্যে পাঠানো হবে।

সব প্রশ্নেরই একটি করে উত্তর লিখতে হবে। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি, মারাঠি, গুজরাটি, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু, কানাড়ি, মালায়ালম, যে কোন ভাষায় এর উত্তর পাঠাতে পারো। উত্তর পাঠাবার সময় একটা খামে করে পাঠাবে। সেই খামের ওপর "সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার—শিশুদের প্রতিযোগিতা" লিখে দেবে। হাতের লেখা পরিষ্কার হওয়া চাই। প্রশ্নগুলো কোথায় পাবে? 'সোভিয়েত দেশ'-এর ১৩নং সংখ্যায় প্রশ্নগুলো পাবে, আর যদি নীচের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে লেখো তাহলেও পাবে।

১। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার বিষয়ে লিখবার ঠিকানা:—

সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার কমিটি,
পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টা বোর্ড,
১/১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

২। হিন্দী, উর্দু, ইংরাজী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি ও সংস্কৃত ভাষার জন্য লিখবার ঠিকানা:—

সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার কমিটি,
উত্তরাঞ্চলীয় উপদেষ্টা বোর্ড,
২৫ বারাখাম্বা রোড, নয়া দিল্লী-১

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৪৫

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র

৪৭শ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৭৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার ছোটদের পত্রিকা মৌচাক
মধুভরা চাক নিয়ে মাসে মাসে দেয় ডাক।
সোজা কথা দিয়ে গড়া মজাদার ছড়াতে
চঞ্চল মনটাকে টেনে আনে পড়াতে।
রকমারি কবিতার ছন্দের হিন্দোল
এনে দেয় সুমধুর আনন্দ হিল্লোল।
পাড়ি দিয়ে রূপকথা-রথে দূর প্রান্তে
কল্প-লোকের কথা সেও পারে জানতে।
প্রাচীন কালের লেখা যতো মহা-গ্রন্থ,
লিখেছেন মহাকবি কতো মহাজন তো!
তাঁদের লেখার সাথে ক'রে দেয় পরিচয়।
মনে জাগে আগ্রহ, জাগে কতো বিস্ময়।

গল্পের ছলে বলে কতো ইতিবৃত্ত
জানবার আগ্রহে ভ'রে দেয় চিত্ত।
ভ্রমণের কাহিনীর ভেসে-যাওয়া ভেলাতে
নিয়ে যায় মনটাকে বিশ্বের মেলাতে।
ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে দেশ যত দূর দূর
অজানাকে জেনে মন গর্বেতে ভরপুর।
আবিষ্কারের কথা অভিযানকারীদের
শিহরণ আনে মনে পুলক রোমাঞ্চের।
বিজ্ঞানীদের যতো সাধনার অবদান
উদ্ভাবনের কথা প'ড়ে বাড়ে ধ্যানজ্ঞান।
স্বদেশের বিদেশের জ্ঞানী, গুণী, মহাজন,
দেশসেবী, ত্যাগী, বীর, আদর্শে দৃঢ়পণ,
তাঁদের কীর্তিকথা, জীবনের ইতিহাস
মনে আনে উন্নত হবার সে অভিলাষ;
প্রেরণা যোগায়ে করে জীবনকে ফলবান,
শোনায় কর্মপথে নির্ভয় জয়গান।
কৌতুক রসে-ভরা চুট্‌কি যে গল্প
মজা আর হাসি তায় থাকে নাতো অল্প।
জ্ঞানের বিচিত্র খেলা ধাঁধা-রূপ শতদল
শেখায় খাটাতে যতো বুদ্ধির কৌশল।
গ্রাহক-গ্রাহিকাদেরও থাকে এতে লেখা তো,
ছোট থেকে তাদেরও হয় লেখা শেখা তো!
শত শত মধুকরে ভ'রে দেয় ভাণ্ডার;
চিত্তের পুষ্টির উপাদান বাংলার।
নিত্য নূতনে ভরা মধুময় মৌচাক
যুগ যুগ ছোটদের আদরের হ'য়ে থাক।

শুভঙ্কর

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর একশ' নয়া পয়সায় টাকা আর এক হাজার 'গ্রাম'-এ এক কিলোগ্রাম বা কে, জি, র ব্যবহার চলছে, তার ফলে হিসাবপত্র রাখার অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। দু'শ বছর আগেও এদেশে সমুদ্রের কড়ি দিয়ে ছোটোখাটো বেচাকেনার কাজ চ'লত, একটা কড়ি বা কড়ার দাম ছিল এক পয়সার কুড়ি ভাগ। যখন টাকায় আট মণ চাল ছিল, জিনিসপত্র সস্তা ছিল, তখন গরিব লোকে দু'কড়ার তেল, ছ'কড়ার চাল কিনে সংসার চালাত। চার কড়া বা চারটে কড়িতে হ'ত গণ্ডা, কুড়ি কড়া বা কুড়িটা কড়িতে হ'ত এক বুড়ি বা পয়সা, চার বুড়িতে হ'ত এক পণ বা আনা, চার পণে হ'ত চৌক বা সিকি, চার সিকিতে হ'ত কাহন বা টাকা, সেকালের ভাষায় তঙ্কা। আমরা সে যুগে জন্মাইনি, সুতরাং এক টাকার সওদা করবার জন্য বারোশ' আশিটা কড়ির বোঝা ব'য়ে বেড়াবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, তবু ছেলেবেলায় হিসাবের নিয়ম জানবার জন্য ধারাপাতের কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি আমাদের মুখস্থ করতে হয়েছে ; বাংলাদেশের শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তিদের অনেকেরই, বিশেষ করে পল্লীগ্রামের সকলেরই ঐগুলির সঙ্গে পরিচয় আছে। এখনও পান অথবা আমের পণ, খড়ের কাহন দরে কেনাবেচা চলে। আশিটাতে পণ এবং তার ষোলোগুণে কাহন গোণা হয়। মণকষা, সেরকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি না জানলে আজও গ্রামের লোকের চলে না, সেই সঙ্গে মুখে মুখে হিসাব করবার জন্য চলে শুভঙ্করী। আজ ঐ সব হিসাবের জটিলতা থেকে আমাদের ছেলেরা মুক্তি পেয়েছে—এটা খুবই আনন্দের কথা, তবু পুরানো অভ্যাস সহজে যেতে চায় না ; যত দোষই থাকুক, পুরানো হিসাবের ধারা দেশ থেকে মুছে যেতে সময় লাগবে, সেই সঙ্গে সে-যুগের জটিল হিসাবকে অশিক্ষিত জনসাধারণের নিত্যব্যবহারের কাজে লাগাবার জন্য যাঁরা সহজ ক'রে দিয়েছিলেন, সেইসব মানুষকে ভুলতে সময় লাগবে।

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের লোক বুঝেছিল, গদ্য মুখস্থ রাখার চেয়ে পদ্য মুখস্থ রাখা সহজ; তাই জটিল হিসাবের নিয়মগুলিকেও ছন্দে বেঁধে ছড়ার মতো 'ঘোষানো' বা মুখস্থ করানো হ'ত, তাকে ব'লত 'আর্‌জা'। সেই আর্‌জাগুলির শেষে লেখকের নামের ভণিতা থাকত। ভৃগুরাম, ফকিরচন্দ্র, গোবিন্দরাম, ধুলদণ্ডী প্রভৃতি অনেকের নাম দেওয়া আর্‌জা পাওয়া যায়, তাঁদের অনেকেরই পরিচয় আমরা জানিনা। তবে একজনকে ভুললে অপরাধ হবে, যাঁর আর্‌জা থেকে অন্য অনেকে সাহায্য নিয়েছেন। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামে

লক্ষ লক্ষ চাষা, মজুর, মুদি যার দয়ায় মুখে মুখে হিসাব ক'ষে কেনাবেচা করছে আজও। তাঁর নাম শুভঙ্কর। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় বলছি।

আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলুম শুভঙ্কর ছিলেন একজন সুপণ্ডিত কায়স্থ। তিনি পাঠশালায় ছেলেদের পড়াতেন, তার প্রমাণ তাঁর অনেক আর্যায়। 'বুঝ ছাওয়াল সকল,' 'শুন শিশুগণে' ইত্যাদি পাঠ আছে। মধ্যে কথা উঠেছিল, 'শুভঙ্কর' কারও নাম নয়, 'রায় গুণাকর', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতির মতো একটা উপাধি, ভৃগুরামই ঐ উপাধি পেয়েছিলেন। সম্প্রতি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত প্রমাণ করেছেন, শুভঙ্কর একজনের নামই বটে, এবং ভৃগুরাম তাঁর সমসাময়িক অন্যলোক। শুভঙ্করের 'কাগজসার' এবং হারবিষের লেখা, ধান্যের লেখা প্রভৃতি অনেক আর্যার পুঁথি পাওয়া গেছে। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে রতন কবিরাজ 'মদনমোহন বন্দনা' কাব্য লিখেছিলেন, তাতে আছে 'আইলেন ভাস্কর, খবর কহে শুভঙ্কর,' অর্থাৎ ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী সৈন্য যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করে, সে সময়ে শুভঙ্কর জীবিত ছিলেন। শুভঙ্করের নিজের অঙ্কের মধ্যেও বর্গীর অত্যাচারের কথা আছে: 'সাগর ঘোষ নামে এক গোওালা আছিল। দৈবের কারণে বর্গী আসিয়া পড়িল॥' দেড়শ' বছরের পুরানো পুঁথিতে 'শুভঙ্কর সেন' ভণিতা পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া জেলার পলাশডাঙার কাছে 'পথরা' গ্রামে, অন্য কারও কারও মতে হদল-নারায়ণপুরের কাছে রামপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। দু'টো জনপ্রবাদই সত্য হতে পারে; একই ব্যক্তি দু' জায়গায় জীবনের বিভিন্ন সময়ে বাস ক'রে থাকতে পারেন। কড়াক্রান্তির, রতি-মাসার চুলচেরা হিসাব ক'রে ধান চাল থেকে সোনা, রুপো, পেতল, কাঁসার দাম ও মাপ, জমি, বাড়ি, পুকুরের মাপ মুখে মুখে বার করবার সহজ উপায় বলে গেছেন তিনি: তেরিজ, ফাজিল, হরণ-পূরণ, মাসমাহিনা, সুদকষা, কিছু বাদ দেননি। তাঁর শতাধিক আর্যা হাতের লেখা পুঁথিতেই পাওয়া গেছে। তাঁর 'মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর' অনেকেই জানেন, দু'একটি অপ্রচলিত অঙ্ক শুনে রাখা ভালো:

"নৃপতি সহিতে শুভঙ্কর গেল মৃগয়া করিতে।
হেনকালে পুষ্করিণী দেখে আচম্বিতে॥
পুষ্করিণীর ষোল যোজন ধনু দুই ষোল জল।
জলের মধ্যে মৎস্য করে কলবল॥
অর্ধ অঙ্গুলি ছাড়া মৎস্য নাচিতে লাগিল।
রাজা বলে শুভঙ্কর কত মৎস্য হইল॥

আজকের দিনে এরকম উদ্ভট অঙ্ক নিয়ে মাথা খারাপ না করাই ভালো। তবে এ থেকে এইটুকু জানা যাচ্ছে, আজ থেকে সওয়া দু'শ বছর আগে শুভঙ্কর বিষ্ণুপুর-

'রাজা বলে শুভঙ্কর কত মৎস্য হইল'

রাজ গোপাল সিংহের কর্মচারী ছিলেন। তিনি শুধু হিসাবই কষতেন না, মৃগয়াও করতেন, কবিতাও লিখতেন, রাজার প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন নিজগুণে। তিনি প্রথম জীবনে পাঠশালার পণ্ডিতী করতে করতে খ্যাতিলাভ ক'রে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, না, শেষ জীবনে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নিজের আবিষ্কৃত হিসাবের সহজ নিয়মগুলি দেশের লোককে দিয়ে যাবার জন্য ছেলে পড়াতে আরম্ভ করেন, তা বলতে পারলাম না; শুধু

এইটুকু বলতে পারি, তাঁর 'শুভঙ্কর' নাম সার্থক হয়েছিল, বাংলাদেশের 'শুভ' করেছেন তিনি, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিদিনের কাজকারবার সহজ করে, জীবনযাত্রার পথের বাধা দূর ক'রে স্মরণীয় হয়েছেন তিনি। তাঁর মধ্যে শুধু বুদ্ধি-চাতুর্য ছিল না, রসজ্ঞানও ছিল, হিসাবের ফাঁকে ফাঁকে সেটা উঁকি মারে; একটি অঙ্ক থেকে নমুনা দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি:

সত্যযুগে কপিল মুনি হইল পাতালবাসী।
বারশত বাহাত্তোরি সঙ্গে লয়া দাসী॥
ছান করিবারে ঋষি করিল পয়ান।
ঋষি প্রতি সহস্রেক শিষ্যের যোগান॥
ঋষি প্রতিদিন এক হরিতকি খায়।
শিষ্য প্রতি চৌউথাই হরিতকি পায়॥
চারি যুগে কত হয় লেখা করি বল।
শুভঙ্কর বলে বুঝ ছাওয়াল সকল॥

উচ্ছৃঙ্খলতা

"উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রধান কারণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার। যাহাদিগের কোন নেতা ও শাস্তা নাই, তাহারাই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। সেইজন্য কোন ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশানুসারে চলা উচ্ছৃঙ্খলতানাশের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, তেমনি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়া সর্বদা তাঁহার আদেশানুসারে কার্য করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যায় এবং স্বেচ্ছাচারিতা দমিত হয়।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

ডানাওয়ালা কাঠবিড়ালী ও গিরগিটি

শ্রীকাজল বল

ছোট্ট ভেড়াটা শিয়াল পণ্ডিতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো একসময়। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো। আর খুব সতর্ক হয়ে তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিক। কান খাড়া করে, নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাক্, আর ভয় নেই। শিয়াল পণ্ডিতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বাব্বাঃ, সে যে-ভাবে জাপটে ধরেছিল আর একটু হলেই আর রক্ষে ছিল না! ভেড়া একটু নড়েচড়ে গাছটার তলায় হাঁটু গেঁড়ে বসলো।
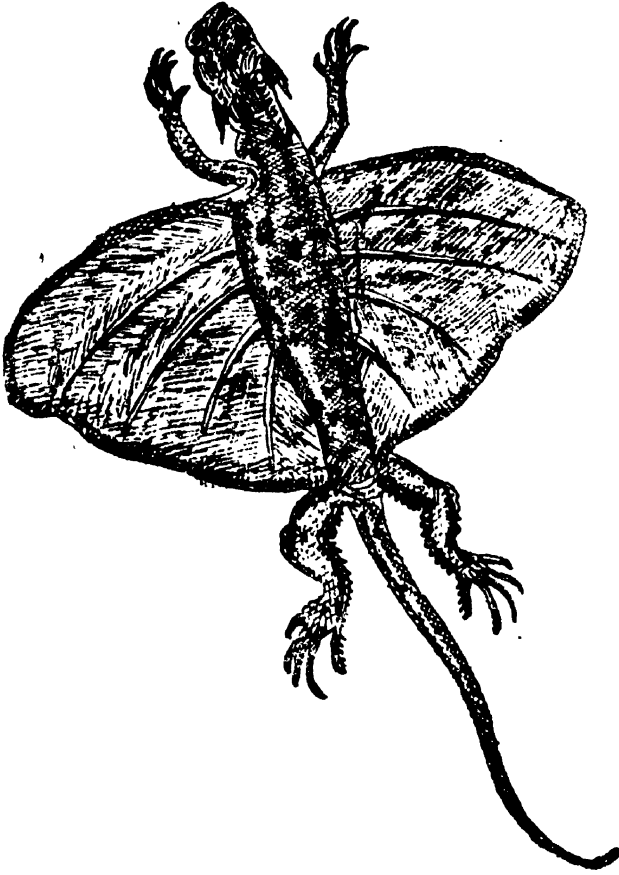
সামনের গাছের ডাল থেকে একটা কাঠবিড়ালী ভেড়ার কাণ্ডগুলো দেখছিল। সে একটু এগিয়ে এসে বললো, ও ভেড়া ভাই, কি হোল? অত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন তোমায়?

ভেড়া মুখ তুলে তাকালো কাঠ-বিড়ালীটার দিকে। একটু অবাক হোল এই কাঠবিড়ালীটাকে দেখে। অন্য কাঠবিড়ালীর চাইতে এর একটু তফাত আছে বলে মনে হোল। গায়ে কেমন জানি আলোয়ান গোছের কি একটা জড়ানো। তাই জিজ্ঞেস করলো,—কে গো তুমি? কি নাম তোমার?

—বাঃ, চিনতে পারছোনা আমায়! কাঠবিড়ালী গো, কাঠবিড়ালী।

—হুঁ, তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার গায়ে ওটা কি?

—ও হো! এটার কথা বলছো?—এই বলে হাসতে হাসতে গায়ের চাদরের মত চামড়াটা প্যারাসুটের মত মেলে ভেড়ার কাছের একটা ডালে এসে বসলো। ভেড়া অবাক

হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। ওড়ার সময় দেখলো হাতের এবং পায়ের আঙুলগুলোর সঙ্গে চামড়ার চাদরটা লাগানো। গায়ের রংটা লাল। সাধারণ কাঠবিড়ালীর চাইতে আকারে অনেক বড়। ভেড়া বড় বড় চোখে কাঠবিড়ালীর দিকে তাকিয়ে বললো,—আচ্ছা কাঠবিড়ালী, তুমি কি উড়তে পারো? ওটা কি তোমার ডানা? কাঠবিড়ালী হাসতে হাসতে ভেড়াকে বললো,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দেখলে না, আমি তো উড়েই তোমার কাছে এলাম; আর উড়ি যখন, তখন এটা ডানা বইকি! আমার ডানায় পালক নেই শুধু চামড়া দিয়ে তৈরী। পাখীর ডানার সঙ্গে শুধু এটাই তফাত। আর হবে নাইবা কেন; তাদের তো ভগবান ডানা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা এ ডানা বলতে গেলে নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছি।

—তোমরা তৈরী করেছো? বাঃ, বেশ মজার তো! আমাকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও না ভাই। আমার খুব ইচ্ছে তোমাদের মত উড়ে বেড়াই। ভেড়া উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো। ভেড়ার কথা শুনে কাঠবিড়ালী বললো,—তোমার ইচ্ছে হলেই কি তুমি তা তৈরী করে পরতে পারবে? সে মানুষেরা পারে। তাই তো আমাদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ।

—তা হলে তুমি তৈরী করে পরলে কি করে?

—আরে না-না আমি তৈরী করিনি। আমি বলেছি আমরা, মানে আমার পূর্বপুরুষেরা, এই ঠাকুরদাদার দাদুর দাদুরা, সবাই খুব ওড়ার চেষ্টা করতো। এ গাছ থেকে ও গাছ, ও গাছ থেকে এ গাছ লাফালাফি করার সময় নিজেদের চামড়াগুলোকে যতটা পারে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ডানার মত চওড়া করতো। শুধু তারা নয়। তাদের ছেলেরা, নাতি-নাতনীরা সবাই ওই ভাবে ওড়ার চেষ্টা করতো। তারপর আস্তে আস্তে এই চামড়াগুলো বড় হয়ে গেল। পাখীর ডানার মত ডানা গজালো না, মানুষের তৈরী প্যারাসুটের মত হয়ে গেল।

—তোমরা পাখীদের মত উড়তে পারো?

—দূর! কি যে বল তার ঠিক নেই। ওদের মত উড়তে পারবো কি করে? পাখীরা তো অন্য জাত। মানুষেরা আমাদের জাতভাই কিনা, তাই ওদের তৈরী প্যারাসুটের মত আমাদের ডানা কাজ করে। ওর সাহায্যে শূন্যে ভাসতে পারি, যেখানে খুশী নামতে পারি, তার বেশী না।

এমন সময় একটু দূরে ঝোপঝাড়টা নড়ে উঠলো। ভেড়া শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেল। কাঠবিড়ালী চুপি চুপি ভেড়াকে বললো,—ভেড়া ভাই, এই ঝোপের ভিতর চুপটি করে বসে থাকো। আমি দেখি শব্দটা কে করলো।

ভেড়া তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঝোপের ভিতর। উড়ন্ত কাঠবিড়ালী ডানা মেলে

ডালে ডালে উড়ে উড়ে ব'সে, সেই শব্দ লক্ষ্য করে হারিয়ে গেল গাছ-গাছালীর আড়ালে।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এলো সেই কাঠবিড়ালীটা। সঙ্গে আরও চার পাঁচটা কাঠবিড়ালী। সবারই ডানা আছে। তবে তাদের দেহের আকার ও গায়ের রং ভিন্ন। সবার হাতেই ফলমূল রয়েছে। সেগুলো ভেড়ার সামনেই এনে নামিয়ে রাখলো।

ভেড়া কাঠবিড়ালীর পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে উড়ন্ত প্রথম কাঠবিড়ালীটা বললো,—বেচারা ভেড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা ভাই এখন যেও না, চারদিকে পাহারা দাও, এই বনে ওর কত শত্রু আছে। তোমরা ফেলে চলে গেলে এই বেচারা এখানেই প্রাণ হারাবে।

—ঠিক বলেছো ভাই। এলামই যখন কাশ্মীর থেকে তোমার দেশে বেড়াতে, দু-চারদিন থেকেই যাবো। ভেড়ার সঙ্গেও আলাপ করবো। তারপর তোমাদের ভাই আসামের জঙ্গলটাও দেখে যাব।

এই বনে সুদূর বার্মা থেকে এক কাঠবিড়ালী এসেছিল। সে বললো,—আচ্ছা ভাই লাল কাঠবিড়ালী, তোমাদের দেশে আর কোথায় কোথায় আমাদের জাত-ভাইরা আছে?

—সে ভাই সব জায়গাতেই পাবে। গঙ্গা নদীর দু'ধারের জঙ্গলে, হিমালয়ের পাদদেশে, আরো কত জায়গায়; তাই না কাশ্মীর কাঠবিড়ালী ভাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা যা বলেছো! নাও নাও, এবার আর কথা বোল না; এবার চল পাহারা দিই। হিংস্র জন্তুরা এলে ভেড়াকে সাবধান করে দেওয়া যাবে।

অন্য কাঠবিড়ালীরা সায় দিল প্রস্তাবটাতে। আর কোন কথা না বলে ভেড়াকে গোল করে ঘিরে সবাই পাহারা দিতে লাগলো।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভেড়া উড়ন্ত কাঠবিড়ালীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে বেরুলো। এ-পথ থেকে ও-পথ। এ-বন থেকে ও-বন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ইন্দোচীন সীমানার কাছাকাছি এসে পড়লো। তবু থামলো না। শিয়াল পণ্ডিতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বন আর শেষ-ই হয় না। জনপথের আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছিল।

এমন সময় কাদের কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ালো। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সে তাকিয়ে দেখলো, মাটিতে ও ছোট ছোট আগাছার ডালে কতকগুলো গিরগিটি বসে বসে জটলা করছে।

—শুনেছো তো ভাইয়া চীন এই সীমানা ডিঙ্গিয়ে ভারতকে আক্রমণ করছে?

- হ্যাঁ, ঐ বদমাসটার কথা আর বলো কেন? বরাবরই ও দস্যু ছিল। তাই তো ভারত আক্রমণ করতে তার একটুও লজ্জা করছে না!

—কিন্তু ভাই, আমরা যাই কোথায়? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে মরতে হবে। আমার বোনের আবার পাঁচটি ডিম আছে, সে বেচারী ডিম আগলে কেঁদে কেঁদে খুন। তার তো আর ছেলেপুলে নেই। তাই এগুলো নষ্ট হলে সে পাগল হয়ে যাবে!

—আরে ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। চীন আসছে তো বয়ে গেছে, চল আমরা সবাই মামার বাড়ী দাক্ষিণাত্যে চলে যাই। যুদ্ধ থামুক, তারপর আবার ফিরে আসবো।

– হ্যাঁ, ঠিক বলেছো ভাই। চল চল আমরা সবাই মামার বাড়ী যাই। মনে নেই কিছুদিন আগে মামা খবর পাঠিয়েছিল ওদের ওখানে ফিলিপাইন, পূর্ব-ভারতীয় ইত্যাদি দেশ থেকে আমাদের বিদেশী ড্রাকো (Draco) ভাইবোনেরা বেড়াতে এসেছে।

—বাঃ, কি মজা! চল আমরা আজই রওনা দিই। বিদেশী ভাইদের সঙ্গে খেলবো, নাচবো, 'টিক্-টিকা-টিক্-টিক্, কড়, কড় কি মজা'— এই বলে সেই গিরগিটিটা লাফিয়ে উঠলো। ডিগবাজী খেলো অনেকবার। ভেড়া দেখে অবাক হোল। একি! এ গিরগিটিটারও যে ডানা আছে! তার সামনে একটা ঝোপের ফুলে একটা প্রজাপতি বসেছিল। সেই গিরগিটিটা লাফিয়ে এসে প্রজাপতিটাকে খেয়ে ফেললো। ভেড়া অবাক হয়ে দেখলো গিরগিটিটাকে। গিরগিটিটা লম্বায় ১৩"/১৪" ইঞ্চি হবে। দেহ আর লেজের দৈর্ঘ প্রায় একই। লেজটা একেবারে সরু। সামনের পায়ের একটু তলা থেকে চামড়ার ডানাটা পিছনের পায়ের আগে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ডানাটা যেন ভাঁজ করা একটা হাত-পাখা। বুকের পাঁজরের মতন কতকগুলো পাঁজর রয়েছে ডানাটায়। সেগুলোর সাহায্যেই ডানাগুলো একবার খুলছে এবং বন্ধ করছে, চামড়ার ডানাগুলোতে রং-এর ছড়াছড়ি। তাকে দেখাদেখি অন্য টিকটিকিরাও শূন্যে লাফিয়ে উঠে ডানা মেলে দিল। আর উড়ে উড়ে মনের আনন্দে পোকামাকড় ধরে ধরে খেতে লাগলো।

ভেড়া দেখলো সেখানে রং-এর হাট বসেছে।

জননী ও জন্মভূমি

ভ্রমিয়া সকল তীর্থ আসিনু আবার
মাগো! এই পদ-তীর্থ পূজিতে তোমার।
জুড়াব সন্ন্যাস-দগ্ধ কঠোর জীবন,
জননী ও জন্মভূমি করি দরশন।

—নবীনচন্দ্র সেন

লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কিগো মন।
চাই না সুরম্য স্থানে নানা অলংকার,
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কানের কথা

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

তোমাদের কাছে আজ আমি কানের কথা বলবো। কান না থাকলে পৃথিবীর কত সুন্দর সুন্দর শব্দ-মাধুর্য থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হ'ত। কান আমাদের অন্যতম ইন্দ্রিয়, ইহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয়। বাইরে থেকে কানের গঠন সরল মনে হলেও কানের আভ্যন্তরীণ গঠন কিন্তু খুব জটিল। ইহার তিনটি অংশ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ। কানের বাইরের অংশটারই নাম বহিঃকর্ণ, ইহা তরুণাস্থি (cartilage) দ্বারা গঠিত। এই বহিঃকর্ণ না থাকলে আমাদের শ্রবণের কোনও রূপ ব্যাঘাত ঘটতো না। এই বহিঃকর্ণ টা কেন আছে জানো? পড়া না বলতে পারলে মাষ্টারমশাই যাতে তোমার কান ধরে টানতে পারেন শুধু সেই জন্যে, কি কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না?

বহিঃকর্ণের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্রপথ আছে, এই ছিদ্রপথে শব্দ-তরঙ্গ গৃহীত হয়। ইহার নাম কর্ণকুহর। এই কর্ণকুহরের শেষপ্রান্ত একটি পাতলা পর্দার দ্বারা বন্ধ, শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে এই পর্দাটি কম্পিত হয়। এই পর্দাটির নাম কর্ণপটহ (ear-drum)। এই পর্দার দ্বারা বহিঃকর্ণ সম্পূর্ণরূপে মধ্যকর্ণ হইতে পৃথক হয়েছে। এখন বলতো কেউ কেউ যে বলে, কানে জল ঢুকে মস্তিষ্কে চলে যায় বা কীটপতঙ্গ কর্ণকুহরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্কের মধ্যে বাসা বাঁধে, এরূপ ধারণা কিরূপ বিজ্ঞানবিরোধী এবং ভিত্তিহীন! কানে জল ঢুকে সাময়িক অস্বস্তির সৃষ্টি হতে পারে বটে, কিন্তু মধ্যকর্ণে তথা মস্তিষ্কের মধ্যে জল বা কীটপতঙ্গের প্রবেশ-পথ কর্ণপটহ-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

কর্ণপটহের ভিতরের দিক হইতে মধ্যকর্ণের সুরু। এই মধ্যকর্ণে তিনখণ্ড হাড় আছে। এই হাড় তিনটি পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ইহাদের আকৃতি অনুসারে ইহাদের নামকরণ যথাক্রমে হাতুড়ি (hammer), নেহাই (anvil) এবং রেকাবী (stirrup) হয়েছে। এই হাড় তিনটি কর্ণপটহের কম্পনকে অন্তঃকর্ণে পৌছাইয়া দেয়। মধ্যকর্ণ একটি নালীর সাহায্যে কণ্ঠনালীর সহিত সংযুক্ত, এই নালীর নাম শ্রুতিনালী (eustachian tube)। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যই যখন আমাদের সর্দি হয় তখন এই শ্রুতিনালীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্ণপটহের ভিতরের ও বাইরের বায়ু-চাপের অসমতার দরুণ শ্রবণে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটে।

অন্তঃকর্ণের গঠন অত্যন্ত জটিল, ইহার আকৃতি প্যাচানো বলিয়া ইহাকে চক্র-প্রণালী (labyrinth) বলা হয়। এই অন্তঃকর্ণ একটি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহার মধ্যে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নল পরস্পরের সহিত সমকোণে অবস্থিত। এই অর্ধবৃত্তাকার

নলগুলি শ্রবণকার্যে অংশগ্রহণ করে না। ইহাদের দ্বারা আমাদের চলাফেরার স্থৈতিকবোধ নির্ণীত হয়। ইহা ছাড়া শামুকের মত দেখতে একটি প্যাচানো নল অন্তঃকর্ণে রয়েছে, ইহার এরূপ আকৃতির জন্য ইহাকে শম্বুকী নল (cochlea) বলা হয়। এই স্থান হইতে প্রায় ২৭,০০০ শ্রবণ-স্নায়ু (auditory nerves) মস্তিষ্কে অর্থাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়াছে, ইহারা শ্রবণের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়। অর্থাৎ তোমাকে যদি কেউ 'মারবো' বলে, এই 'মারবো' শব্দ-তরঙ্গ কর্ণপটহের কম্পনের মাধ্যমে ও মধ্যকর্ণের হাড়গুলির কম্পনের মাধ্যমে এবং অবশেষে ঐ শ্রবণ-স্নায়ুগুলির সাহায্যে ভীতির অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এই অনুভূতি কিন্তু শোনায় সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়, কারণ ঐ স্নায়ুগুলি মুহূর্তে ক্রিয়াশীল বার্তাবহের (instantaneous messenger) কার্য করে।

এই শ্রবণ-স্নায়ুগুলির উপর কতকগুলি খুব সূক্ষ্ম চুল (sensory hair) আছে, এগুলি সেকেণ্ডে ১৬,০০০ হইতে ২৪,০০০ বার পর্যন্ত কাঁপতে পারে।

অতএব দেখতে পাচ্ছ, আমাদের শ্রবণ-কার্য কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কাযকারিতায় পরিচালিত হয়? এরূপ সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি আমাদের সারা দেহে আরো রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের গোটা দেহটা একটা বিরাট কারখানা বিশেষ। এই কারখানার কোনও অংশে কোনরূপ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং শারীরিক যন্ত্রপাতির ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ ডাক্তার ডাকতে হয়।

বন-ভোজন

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন-ভোজ হবে ভাই—
নেই গোছ কিছুর-ই,
চালে ডালে মিলিয়ে
করে দাও খিচুড়ি;
ছোলা মুগ মুসুরী—
যেটা যার ভাঁড়ারে,
নিয়ে আয় চটাপট্
আছে খুব তাড়া-রে;

ঘর থেকে লুকিয়ে
নিয়ে আয় চাল-টা,
জন প্রতি দু' মুঠো—
ভরে থাক্ থাল-টা;
আলু-টা মুলো-টা
এনেছে ভুলো-টা,
নুনটুকু আনতে
চোট খেলো নুলো-টা;

চটাপট্ ফটাফট্,
নেই গোছ কিছুরই,
চেয়ে দ্যাখ নাড়ুটা
করেছে ঘি চুরি!

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কলকাতার শহর দেখে তখন অবিশ্যি বাঁটুল বুঝল এ এক ভয়ানক জায়গা। এত বাড়ী-ঘর-দোর, এই এই বড় বড় ঘাট। ইস্, যতদিন কলকাতা দেখেনি, ততদিন বাঁটুল ভাবত বহরমপুরের মত শহর নেই। নশীপুরের ঝুলনে আর কাশিমবাজারের রাসে যেমন লোকের ভিড় হয়, এমন আর কোথাও হয় না।

এখন দেখে বুঝল বাপ রে বাপ! এই জন্যেই মামীমা বলে কলকাতা শহরে একটা মানুষ হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করে কার সাধ্যি! শুধু বাড়ী আর বাড়ী! গঙ্গার জলের মধ্যে অবধি নেমে বসেছে, কি বড় বড় ঘাট। কেমন করে ওগুলো তৈরী করেছে কে জানে। পদ্ম অবশ্য তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে প্রত্যেকটি ঘাট তৈরী করবার আগে নাকি জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ধরে গঙ্গায় ফেলা হয়েছে, তবে মা গঙ্গা ঘাট বাঁধতে দিয়েছেন।

কিন্তু পদ্মকে তো সে চিনে ফেলেছে। তা ছাড়া পদ্ম তাকে দাদা বলে ডাকছে যখন, তখন একটু-আধটু শাসন করতেও পারে সে।

'মেলা ব'ক না পদ্ম।' বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বললে।

'বা রে, মা কে জিগ্যেস কর না!'

'ছিঁচকাঁদুনেপনা ক'র না।'

'কে ছিঁচকাঁদুনেপনা করছে?'

'তুমি। দিনরাত যারা মিছে কথা বলে তাদের কি হয় জান?'

'কি হয়?'

'বছর দশেক বয়স হলেই তাদের ধরে নিয়ে যায়।'

'কে?'

'আছে, কোম্পানীর লোক আছে। ধরে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরে রাখে, আর নিত্যি নিত্যি একশো দু'শো আঁক কষায়।'

পদ্ম বলল, 'তাই নাকি? তাহলে তাদের খবর দাও না বাঁটুলদাদা, কানপুরে আমার তিনটে হিংসুটে ননদ আছে, তাদের ধরে নিয়ে যাবে?'

'কেন?'

'মা গো মা, আমার চে' একটু বড়, তাই কি রকম বকে। পুতুল খেলতে গেলে শুধু ওদের পুতুল বর হবে, আর আমার পুতুল বউ হবে, কেন বল তো?'

'কেন?'

'তাহলে আমি যখন মেয়ে পাঠাব তখন ভাল ভাল পুঁতির মালা, জরির কাপড়, সব ওদের দিয়ে দিতে হবে। ভারী চালাক! ওদের তো কিচ্ছু দেয় না আমার শাশুড়ী? আমি একদিনও থাকতে চাই না বলে আমাকে এত এত পুতুল দেয়, খেলনা দেয়!'

'তুমি থাকতে চাও না কেন?'

'থাকবে না হাতী! জান, ওদের বাড়ী কি বিচ্ছিরি দেখতে, সেখানে ওদের ভাইটা থাকে! কান দুটো ছড়ানো, পড়াশুনো কিস্সু পারে না, বেঞ্চে দাঁড় খায়। আমাকে শুধু শুধু কান মুলে দেয়। কেন, বর বলে কান মলবে কেন? তেমনি মার খায় ওর বাবার হাতে!'

পদ্মর বোধহয় খুব আনন্দ হ'ল। কিছুক্ষণ পা দুলিয়ে সে বললে, 'কলকাতাটা লাগছে কেমন?'

'ভাল না।'

'আমারও এই বাগবাজারের বাড়ীটা ভাল লাগে না। কেবল মামা, মামী, মাসী, দিদিমা, আর খাও, খাও, খাও! বিচ্ছিরি!'

বাঁটুলের অবশ্য খারাপ সে জন্যে লাগেনি। আসলে সে তো কাউকে চেনে না। এত অপরিচিত লোকজনের মধ্যে থাকা!

তা ছাড়া এদের এই থাম দেওয়া বাড়ী, বড় বড় খাট, আলমারী, দেখে-টেখে তার মনে হচ্ছে বোধহয় তার মামা-মামী গরীব। বোধহয় সে-ও গরীব। এদের নাকি অনেক টাকা। এখন, টাকা থাকলেও যে মানুষ ভাল হতে পারে, তা বাঁটুল জানে না। তার তো সব শিক্ষা মামীর কাছে, আর মামীর কথাবার্তাই অন্যরকম।

'ঝাঁটা মার টাকার মুখে, টাকার লোভে ছেলেটাকে বেচে দেবে?' এই ধরণের কথা সে সদাসর্বদা বলে।

এইসব নানা কারণেই বাঁটুলের তেমন ভাল লাগছে না। দু'দিন বাদে সে বলেই ফেললে, 'আমরা কবে যাব?'

'এই তো, যাব রে যাব! কলকতায় এলি, কলকেতার কিছু দেখবি না?'

'বাবার কাছে যাব।' বাঁটুল গোঁজ হয়ে বললে।

'যাব তো বটেই। তার আগে তোকে একটা দেখার মত জিনিস দেখিয়ে আনি। শিবপুরের বাগান দেখবি, তা ছাড়া, আর ধর্ গিয়ে একুশ-বাইশ দিন বাদে সরস্বতী পুজো। পুজোটা সেরে গেলে হয় না?'

সরস্বতী পুজো!

বাঁটুলেব বুকের নিচে কি যেন কন্‌কন্ ক'রে উঠল। আঁটুল গ্রামে তাদের বাড়ীর মত পুজো আর কোথাও হয় না। বই আর ঘট পুজো হয়, কিন্তু গাঁদাফুল এনে বাঁটুল পাহাড় করে ফেলে। সরস্বতী পুজোর পরদিন শেতলষষ্ঠী। সেদিন সব ঠাণ্ডা বাসি খেতে হয়। এবার কে মামীমাকে গোটা সেদ্ধ করবার জন্যে দত্ত পুকুরের জল এনে দেবে? কার হাতে মামীমা পেসাদের থালা দিয়ে বলবে যা, সকলকে বেঁটে দি'গে যা?

কিন্তু এই সময়েই পদ্ম আর পদ্মর দুই মামাতো ভাই কানু বলাই এসে বাটুলের হাত ধরলে। বললে, 'তুমি আছ, এবার তুমি ঠাকুর সাজাবে, কেমন?'

'আমি সাজাব?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' পদ্ম তার হাতটা ঝাঁকিয়ে বললে, 'আমি তো ওদের বলেছি তুমি কেলাসে প্রথম হও, আঁক জান, কোনদিন গাধার টুপী পর না!'

পদ্ম বলেছে!

'বলেছি তুমি অনেক বেশী লেখাপড়া শিখবে বলে কানপুরে যাচ্ছ। তোমার বাবার মত মস্ত বড় বাবু হবে তুমি, তোমার সঙ্গে ওরা পারবে কেন? এই প্রথম, ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যেকথা বলা সত্ত্বেও পদ্মকে ভালবেসে ফেলল বাঁটুল।

তা ছাড়া, এদের বাড়ীর কথাবার্তা শুনে বুঝল, তার বাবাকে সবাই খুব বড় চোখে দেখে। কানু বলাইয়ের বাবা কি কাজে কোন্নগর গিয়েছিলেন, তিনি এসে তো বাঁটুলকে নিয়ে বেদম হইচই জুড়ে দিলেন। ওর জামা করাও, ধুতি আন, জুতো আন, ও বিদেশে যাচ্ছে। পশ্চিমের শীত কাঁথা আর দোলাইয়ে মানবে কেন?

সুঁটকো মত একটা দর্জি বাঁটুলকে মেপেজুখে জামাও বানিয়ে দিল দুটো জামার হাত দুটো অবশ্য একটু ঢোলা, আর ফতুয়ার পকেট দুটো বড্ড বড়। কিন্তু দর্জি বললে, 'এখন কলকাতার ছেলেবাবুরা এই পরছে মশায়!'

রূপচাঁদবাবু বললেন, 'দর্জির চেয়ে কি আমরা বেশী জানব ?'

বাঁটুল গাঁয়ের মত না হোক, দিব্যি ধুমধামে এখানে সরস্বতী পুজো হয়ে গেল। সরস্বতী আবার ঠাকুর গড়ে পুজো হয় তা বাঁটুল জানত না। গাঁদাফুল আবার কিনতে পাওয়া যায় তাই বা কে জানত? কানু আর বলাই বললে, 'আমাদের মামাবাড়ী ভবানীপুরে। সেখানে কেমন সুন্দর পাড়া-গাঁ মতন! কত গাঁদা ফুল, কত রকম ফুল!'

পুজোর পেসাদে এত এত কেনা সন্দেশ এল। সন্দেশগুলো মতি দাসী দু'দিন আগেই ময়রা বাড়ী থেকে কিনে নিয়ে এল। মতির বাড়ী বলাগ্রামে, বাটুলকে তার ভারী পছন্দ।

'ও দাদা, এ্যাই এ্যাত এ্যাত সন্দেশ নে'লাম!' মতি হাসলে।

'দু'দিন আগেই আনলে যে মাসী ?'

'আনব না ?' মতি ভাঙা কোমরে হাত রেখে চোখ বড় বড় করে বললে, 'আমাদের বাগবাজারের ময়রাগুলো বড্ড দুষ্টু যে গো! যেমন পুজোর সময় কাছে আসবে, তেমনি সন্দেশগুলো ছোট হতে থাকবে। আহা, সোনার পাড়া-গাঁ ছেড়ে কেন বা এলে দাদা? এখেনে কিছু কি আছে? কচু ঘেঁচু শাকসব্জী, সবই মানুষ কিনে খায়। বাগবাজার আবার বড্ড শহর দাদা! অন্য দিকে গিয়ে দেখিছি দুটো গাছপালা, পুকুর-টুকুর তবু আছে! এখেনে যেন কিচ্ছুটি নেই।'

'ও মাসী তুমি এলে কেন ?'

'পয়সার জন্যে দাদা!' মতি দাসী অন্য কাজে যেতে যেতে বলে, 'বড় যে গরীব আমি!'

বাঁটুলের ইচ্ছে হয় মতি দাসীকে তার মামীমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, সঙ্গে চিঠি দিয়ে দেয়। লিখে দেয় আমি ভালো আছি তবে তোমাদের জন্যে বড্ড কষ্ট। অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখছি, তোমরা দেখলে তবে সুখ হ'ত। তা ছাড়া লিখে দেয় বোধহয় আমি বড় হয়ে যাচ্ছি, এখন তো কই একলা ঘুমোতে ভয় করে না? বাবার কাছে যাচ্ছি বলে ভগবান আমাকে বড় করে দিচ্ছেন ?

মতি দাসী যখন ওখানে যাবে, ধরো যদি যায়, তা'হলে আগেই দেখতে পাবে ছেঁচতলার বেড়ার কাছে তার মামীমা দাঁড়িয়ে আছে। মামা নিশ্চয় মাঠে গিয়েছে, পদাই পাঠশালায়। রাধি উঠোনে বসে হয়তো শাকসব্জী বাছাবাছি করছে। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, তখন মামীমা ছেঁচতলার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁটুলের কথা ভাবে তা কি বাঁটুল জানে না ?

সেই জন্যেই তো সরস্বতী ঠাকুরের আসন সাজাতে সাজাতে বেলপাতার গন্ধে বাঁটুলের চোখ কতবার জলে ভরে গেল। কেন চাঁদবদন ভট্চাজ্জি তাকে পুষ্যি নিতে চাইলে? কেন মামা তাকে দিয়ে দিতে চাইল? কেন বাঁটুলবাবাকে খুঁজতে যাবে? সবাই বলছে তার বাবা সায়েবদের মত দেখতে, আর খুব হাঁক-ডাকের মানুষ। বাবা যদি বলে, এ মা, তুই বিচ্ছিরি ছেলে তোকে আমি চাই না?

আরো কত কি ভাবছিল বাঁটুল কিন্তু পদ্ম এসে বললে, 'ও বাঁটুলদাদা, তুমি জয়জয় দেবী শোলোকটা জান?'

পদ্মকে শ্লোক শেখাতে গিয়ে বাঁটুল সব ভুলে গেল।

এর মধ্যে একদিন বাঁটুল গিয়ে তার রূপচাঁদকাকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে দেখে এল। বিদ্যাসাগরকে দেখতে যাবে শুনে তার সে কি ভয়! কে জানে, সে রাগী লোক, হয়তো বাঁটুল মণকষা পারেনি শুনলে ভীষণ রেগে যাবে। হয়তো লাটসায়েবকে বলে দেবে, বিদ্যাসাগরকে তো সবাই মানে, বাঁটুলকে কান ধরে গ্রামে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু ও মা! বিদ্যাসাগরের বাড়ী দেখা হ'ল, পাঁচিলে একটা বেড়াল বসেছিল, হয়তো বা বিদ্যাসাগরেরই বেড়াল হবে, তাকেও দেখা হ'ল, খুব শিক্ষিত-শিক্ষিত চেহারা। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দেখা হ'ল না। তিনি নাকি কি কাজে শোভাবাজারে গিয়েছেন।

ফিরে এসে রূপচাঁদকাকা বললেন, 'আ হারে, তোর চোখের দেখাটা দেখা হ'ল না?'

বাঁটুল ভাবলে মরে যাই আর কি! মণকষা যদি জিগ্যেস করে বসত, তাহলে চোখের দেখা বেরিয়ে যেত!

তারপর আর কি! বাঁটুলের জামা-কামিজ এসে গেল। পদ্মর মা-র যত পালকী-চড়া আত্মীয়-কুটুম সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল, সব বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়া হ'ল। এখন আর নৌকো চড়তে বাধা নেই।

তা, কানু বলাইয়ের বাবা মানুষ ভাল, কিন্তু গরম গল্প ছাড়তে ওস্তাদ!

তিনি সেদিন এসে চেঁচামেচি জুড়লেন। বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন, কি শুনে এসেছেন সেই কথা!

'রাঙাদি, তুই যেতে পাবি না, জামাইবাবুরও যাওয়া হবে না, কি হয়েছে জান না!'

'কি হয়েছে?'

'ভয়ানক কাণ্ড!'

'কি কাণ্ড?'

'ব্যারাকপুরে, জানলেন জামাইবাবু, এক বেটা মঙ্গল পাঁড়ে ক্ষেপে গিয়ে একখানা

বন্দুক তুলে দুম্‌দুমাদুম্ গুলী চালিয়ে দিয়েছে দশটা সায়েবকে নিকেশ করে। লোকটার তো তৎক্ষণাৎ ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু সবাই বলছে এখন কলকাতা থেকে কোন লোককে বেরুতে দেওয়া হবে না।'

পদ্মর বড়মামা ধীর স্থস্থির মানুষ। তিনি একটু হেসে বললেন, 'গল্পের গোরু গাছে ওঠে! ওরে, আমি সবই জানি। ওদিকে আমি গিইছিলাম সেদিন। লোকটা কারুকে মারে-ধরেনি। তেড়েগে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপরেই তাকে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এক বেটা হাবিলদারের মাথা খারাপ হয়েছে বলে ওরা যাত্রা পিছিয়ে দেবে?'

কাজেই, যাত্রা পিছোন হ'ল না। বাঁটুলরা রওনা হয়ে গেল কয়েক দিন বাদে। বাগবাজারের ঘাট থেকেই নৌকো ছাড়ল।

রূপচাঁদকাকা বিছানায় কাত হয়ে বললেন, 'বাঁটলো, লিখে রাখ, ১৮৫৭ সাল, এতই মার্চ, এই বার, আমরা কানপুর রওনা হলাম।

বাঁটুল লিখে রাখল। (ক্রমশঃ)

আলোর গান

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আলোর দেশে যাচ্ছি ছুটে
যাচ্ছি ছুটে—ছুটে,
আলোর রঙে নাইবো মোরা,
আঁধার যাবে টুটে।
চল ছুটে সব, ঝট্ ওরে আয়,
সূয্যি মামা ডাক দিয়ে যায়,
আয়রে সবে, পড়বি যদি,
রঙ সাওরে লুটে।
যাচ্ছি মোরা ছুটে।
যাচ্ছি মোরা হেসে,রামধনুকের দেশে
দুঃখ যা ওই, যাবে তা ওই
গাঙের জলে ভেসে
মোরা চলব হেসে হেসে।
সূয্যি মামা ডাক দিয়ে যায়
চলরে সবে ছুটে।

রশিদুল হোসেন

শরীর সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন

প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আমাদের হৃৎপিণ্ড ১০৩,৬৮৯ বার ওঠা-নামা করে। রক্ত চলাচল করে ১৬৮,০০০,০০০ মাইল। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় ২৩,০৪০ বার। খাদ্যের প্রয়োজন হয় ৩·২৫ পাউণ্ড। তরল পানীয়ের প্রয়োজন হয় ২·৭ পাউণ্ড। তাপ নির্গত হয় ৮৫·৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট। নখ বাড়ে ·০০০৪৬ ইঞ্চি। চুল বাড়ে ·০১৭১৪ ইঞ্চি। ঘুমের মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ বার আমরা নড়াচড়া করে থাকি।

গতির হিসাব

ফ্রিগেট (Frigate) পাখী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী জীব। এরা প্রতি ঘণ্টায় ২৬১ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে থাকে। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী চিতাবাঘের গতি হ'ল ঘণ্টায় ৭০ মাইল। জলচর প্রাণীদের মধ্যে সেল ফিশ (Sail fish) সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং এদের গতি চিতার সমান। কচ্ছপ ঘণ্টায় মাত্র ৪ মাইল যেতে পারে। শামুকের এক মাইল অতিক্রম করতে লাগে ৩ সপ্তাহ। আর মানুষ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশী ২৩ মাইল পর্যন্ত দৌড়তে পারে।

জীবন্ত কার্পেট

মার্কুইস দ্বীপের কনেরা বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত পুরুষদের পিঠের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিবাহ-বেদীতে বসেন।

প্রাচীনতম বিচারালয়

৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রাচীনতম বিচারালয় বসে স্পেনের ভ্যালেনসিয়া গির্জার সামনে। সপ্তাহের একটি মাত্র দিন বৃহস্পতিবার এর কাজ হয় বেলা ১১টার সময়। সেচ ও জলের বণ্টন ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিচার এখানে চলে। এটি দেশের চাষীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত সহস্র বৎসরে ২০ জন স্পেনের রাজা ও একনায়কতন্ত্রী নায়ক এসেছেন ও গেছেন, কিন্তু কেউই এই বিচারালয়ের ক্ষমতা সংকুচিত করতে আজও পর্যন্ত পারেননি।

অশ্রু অর্ঘ্য

শ্রীসুনীল সরকার

এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া। বড্ড গরীব। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করে যে পয়সা পায়, তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার চালায়। কিন্তু এভাবে আর ক'দিন চলে। বয়সও তো হলো। তা একুনে পঞ্চাশের কাছাকাছি। যৌবনের সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নেই। অথচ উপযুক্ত একটি ছেলেও নেই যে এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে সাহায্য করবে। একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি বড়ো হয়েছে। বিয়ে-থা দিতে হবে। কিন্তু টাকা কোথা। নানান চিন্তায় কাঠুরিয়ার রাত্রে ঘুম হয় না। শুধু ছটফট্ করে। বৌ সান্ত্বনা দেয়, তুমি চিন্তা কোর না। দেখবে ভগবান আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন।

—কবে, কবে চাইবেন বলতে পারো? কাঠুরিয়া অস্থির চিত্তে স্ত্রীকে বলে।

স্ত্রী পুনরায় স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, সারা জীবন আমরা সৎপথে চলেছি। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েও আমরা সৎভাবে জীবনযাপন করেছি। তুমি কি বলতে চাও—শেষ জীবনে আমরা এতটুকু সুখ-শান্তি পাব না? পারবো না কুসুমের বিয়ে দিতে? ঠিক পারবো। তুমি কিছু ভেবো না। দেখবে ভগবান সত্যি আমাদের প্রতি সদয় হবেন।

কাঠুরিয়া স্ত্রীর সান্ত্বনায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। কি করে পারবে! এদ্দিনে যিনি একবারটি মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখলেন না, তিনি কবে আর ফিরে তাকাবেন! তাকাবেন না, তাকাতে পারেন না, অসম্ভব!

যৌবনের প্রারম্ভে যে পুরো পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পেলো না, আজ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে কে দেবে তাকে অর্থ? কে দেবে আশা? কে দেবে ভরসা? কেউ না। কেউ দেবে না। যন্ত্রণায় ছটফট্ করে কাঠুরিয়া। সারা রাত্তির তার ঘুম হয় না।

ভোর না হতেই কুড়ুল হাতে কাঠুরিয়া কাঠের সন্ধানে বনে চলে যায়। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। একটি বিরাট শিশু গাছের নীচে বসে পড়ে কাঠুরিয়া। সারা রাত্তিরের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তিতে তার চোখ দু'টি আপনা থেকে বুঁজে আসে। হাত থেকে খসে পড়ে কুড়ুল। ঘুমিয়ে পড়ে গাছের ছায়ায়।

ধীরে ধীরে ভোরের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। পাখিরা ভোরের গান গেয়ে নতুন দিনের যাত্রা শুরু করে। হিংস্র পশুরা বনের নিরাপদ স্থানে

আশ্রয় নেয়। বনপরীরা পাখনা মেলে উড়ে যায় আকাশে। জেগে উঠে বন-বৃক্ষের দল। কচি কচি পাতাগুলো অরুণ আলোর সোনালী আভায় আনত হয়ে ভোরের প্রণাম জানায় বনদেবতাকে। বনদেবতা প্রত্যেক গাছের নিকট গিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন—বৃক্ষরাজী পরিপুষ্ট লাভ করো। দীর্ঘজীবী হও।

ঘুম ভেঙে কাঠুরিয়া আশ্চর্য হয়ে যায়

এমনি করে আশীর্বাদ করতে করতে তিনি যখন শিশুগাছের নিচে এগিয়ে যান, তখন সেই নিদ্রামগ্ন কাঠুরিয়াকে তিনি দেখতে পান। ভীষণ রেগে যান বনদেবতা। এরাই তো আমার বনরাজ্যকে করছে ধ্বংস। জীবন্ত বৃক্ষকে কেটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছে বাজারে। ক্রেতারা আবার কিনে নিয়ে জলন্ত দগ্ধ করছে উনুনে। রোষে ফুলে ওঠেন দেবতা। ওকেই আজকে জীবন্ত কেটে ফেলবো। দেখি ওর কষ্ট হয় নাকি! এই বলে মাটিতে পড়ে থাকা কুড়ুলটি তুলে নিয়ে সক্রোধে আঘাত করতে যান

কাঠুরিয়াকে। কিন্তু অদৃশ্য হতে বনদেবীর করুণ মিনতি ভেসে আসে বনদেবতার কানে :—

ওগো দেবতা প্রাণাধিক মম,
বধিও না, বধিও না প্রিয়তম—
প্রাণে কাঠুরিয়া।
ঘরেতে দুঃখিনী স্ত্রী কাঁদে অহরহ
সোমত্ত মেয়ে ঘরে, জ্বালা সে দুঃসহ।
কুড়ুলেরে সোনা করি, বাঁটেরে করি রুপো
দাও না ছাড়িয়া।

বনদেবতার হাত থেকে খ'সে পড়ে কুড়ুল। ঝরে পড়ে শিশু-ফুল কাঠুরিয়ার গায়। জেগে ওঠে কাঠুরিয়া। অদৃশ্য হয়ে যায় বনদেবতা ও বনদেবী।

চোখ দুটো রগড়ে কুড়ুলের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে ওঠে কাঠুরিয়া। একি! তার কুড়ুল হলো সোনা, আর বাঁট হলো রুপোর! বিস্ময়াবিষ্ট কাঠুরিয়া তার কুড়ুলটি হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে। সত্যি তো এ যে সোনা আর রুপো! তবে কি তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে! সেকি লোহাকে সোনা আর কাঠের হাতলকে রুপোর মত দেখছে! তার দৃষ্টি চলে যায় ঊর্ধ্বাকাশে। কই না তো—ঐ তো নীলাকাশে শুভ্র মেঘের দল উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে পাখিরা। ঐ তো সূর্য্যিমামা হাসছে, হাসছে বনফুল। আন্দোলিত হচ্ছে বৃক্ষের কচিপাতা।

তবে কি ভগবান সত্যিই মুখ তুলে তাকালেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কুড়ুলকে বুকে চেপে ধরে ভগবানের উদ্দেশ্যে যখন কাঠুরিয়া অশ্রুবর্ষণ করেছিলো, তখন বিশাল শিশু-বৃক্ষের উপর থেকে বনদেবতা ও বনদেবী আশীর্বাদ করলেন :—

কাঠুরিয়া কাঠুরিয়া যাও ফিরে ঘরে
মেয়েটির বিয়ে দাও, সুন্দর বরে।

কাঠুরিয়া অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি এসে স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বলতেই স্ত্রীর দু' চোখ আনন্দাশ্রুর আবির্ভাবে সিক্ত হয়ে উঠলো। সে অশ্রু দুঃখ-কষ্টের অশ্রু নয়। সে অশ্রু ভগবানের অর্ঘ্য।

মহাভারতের সময় খেলা

শ্রীরমা ধর

মহাভারতের নাম শুন্‌লেই মনে হয় সেখানে কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ, তাই না? কিন্তু সত্যিই কি তাই? কুরু-পাণ্ডবরা তো আর একদিনেই বড় হয়ে যাননি? প্রথম থেকেই তো আর তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ছিল না? তাঁরাও ছোট ছিলেন; শিশুদের মত নানা খেলায় তাঁরাও মেতে থাকতেন। ছেলেবেলায় কৌরব ও পাণ্ডবরা 'বীটা' নিয়ে খেলা করতেন। 'বীটা' হচ্ছে যবের মত দেখতে ছোট এক টুক্‌রো কাঠ। সম্ভবতঃ ঐ ছোট্ট কাঠের টুক্‌রোটিকে অন্য একটি লম্বা কাঠের টুক্‌রো দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হ'ত দূরে। অর্থাৎ তোমরা যাকে ডাণ্ডাগুলি বা ড্যাংগুলি খেলা বলো, অনেকটা সেই ধরনের। ছেলেবেলায় তাঁরা দৌড়াদৌড়ি ও লক্ষ্যাভিহরণ অর্থাৎ ছুটে গিয়ে কোন জিনিস তাড়াতাড়ি আনা ইত্যাদি ধরনের কৌতুককর খেলাও খেলতেন। তোমরা যেমন বন্ধুদের সংগে চড়ুইভাতি বা পিক্‌নিক কর, কুরু-পাণ্ডবরাও ছেলেবেলায় সেই ধরনের আনন্দজনক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতো নিজেদের মধ্যে।

জলবিহার বা সাঁতারকাটা তাঁদের খুব প্রিয় ও আনন্দদায়ক খেলা ছিল। তবে মধ্যম পাণ্ডব ভীম ছিলেন প্রত্যেকটি খেলায় সেরা। তাঁকে কেউ-ই কখনও হারাতে পারতো না।

ধনী ও অপেক্ষাকৃত বড়দের মধ্যে সে সময় পাশা খেলার খুব প্রচলন ছিল। যুধিষ্ঠির ছিলেন পাশা খেলায় পারদর্শী। পাশা খেলায় বিশারদ হবার জন্য 'অক্ষহৃদয়' নামে বিদ্যাশিক্ষা করতে হ'ত। তোমরা অনেকেই জানো যে, এই পাশা খেলায় হেরে গিয়েই যুধিষ্ঠির রাজ্য হারিয়েছিলেন।

মিতব্যয়িতা

"কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কার্পণ্য অভ্যাসগত লোভের শাসনে অভ্যাসজাত। সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা উদ্দেশ্য-বিশেষের উচ্চতর অনুরোধে ইচ্ছাকৃত সংগ্রহ। কার্পণ্যের আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিতব্যয়িতার আদি চিন্তা পরের সুখ। কার্পণ্যের যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা আপনার নিমিত্ত, মিতব্যয়িতার যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা পরের নিমিত্ত।"

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

আমার খোকনসোনা

শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাশ

(১)

দে দোল, দে দোল,
খোকনসোনা ঘুমিয়ে আছে
ভরে মায়ের কোল।

(২)

আকাশেতে চাঁদ উঠেছে,
নয়কো সেটা চাঁদ ;
আমার কোলে চাঁদ ঘুমায়ে
ফাঁদলো রূপের কাঁদ।

(৩)

আকাশ পাড়ে মেঘ চলেছে,
নয়কো মোটে কালো ;
খোকনসোনার কালো কেশে
করছে ভুবন আলো।

(৪)

দেখছি কেমন বৃষ্টি পড়ে
আকাশ হ'তে আসি,
আমার সোনার চোখের জলে
বক্ষ যে যায় ভাসি।

(৫)

নদীর জলে ঢেউয়ের হাসি,
নয়কো ভালো মোটে ;
কুল্‌কুলিয়ে যখন সোনার—
মুখের হাসি ফোটে।

(৬)

বনের ভিতর কালো কোকিল
গাইছে কুহু গান
তার চেয়ে গো কান্না খোকার
তোলে মধুর তান।

(৭)

জগৎ মাঝে যতোই ভালো,
আছে বা না আছে ;
সবার ভালো খোকনসোনা,
আছে আমার কাছে।

(৮)

দে দোল, দে দোল,
আমার সোনা ঘুমাক্ এবার
জুড়ে আমার কোল।

মিঠুনের ছোটকা

শ্রীবিকাশ বসু

ইজিচেয়ারে আধ-শুয়ে মিঠুনের ছোটকা বাচ্চাদের একটা গল্পের বই পড়ছিল। ছোটকা রোমাঞ্চ রহস্য গল্পের পোকা। ছোটকার জ্বালায় স্কুল-লাইব্রেরী থেকে বই আনবার জো নেই। টের পেলেই কেড়ে নেবে। আর টের পায় না এমন কখনও হয় না। আনলেই টের পাবে।

তবে হাঁ, ছোটকা যখন গল্পের বই পড়ে তখন ছোটকার দিল খোশ। চোখ বুজে বরদান করে।

বই পড়তে পড়তে ছোটকাকে পা নাচাতে দেখে বিবি মিঠুনকে ইশারা করল—'মিঠুন'। অর্থাৎ সময় হয়েছে নিকট এখন—।

মিঠুন পায়ে পায়ে ছোটকার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,—'এবার অনেক বাজি কিনে দিতে হবে, ছোটকা।'

ছোটকা বই থেকে মুখ না তুলে গম্ভীরভাবে বলল,—'এবারে তোদের বাজি কিনে দোব না।'

মিঠুন প্রায় কেঁদেই ফেলতো, কিন্তু তার আগেই ছোটকা হেসে ফেলে বলল,—তৈরী করে দোব।

মিঠুনের মুখের একগাল হাসি মেঘ-ভাঙা রোদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিবি ছোটকার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—'সত্যি ছোটকা, সত্যি?'

তিতির ছুটে এসে বলল,—'আমার কিন্তু রকেট চাই ছোটকা।'

মিঠুন বলল,—'আমেরিকান রকেট।'

বিবি বলল,—'ধ্যেৎ, রাশিয়ান রকেট। আমেরিকান রকেটের চেয়ে ঢের ভালো।'

ছোটকা বলল,—'উহুঁ।'

সবাই ছোটকার দিকে তাকাল। ছোটকা বলল,—'নো রকেট। তুবড়ি।'

মিঠুন তাতেই খুশি—'খুব ভালো হবে ছোটকা। বুড়োশিবতলার তুবড়ি প্রতিযোগিতায় নাম দোব, ছোটকা?

'—নিশ্চয়ই। এবারের ফার্ষ্ট প্রাইজটা তোর বাঁধা। কিন্তু এখন যাও। এখন ডিটেকটিভ বিশ্ববন্ধু খুনীর একেবারে হাতের মুঠোয়, এখন বিরক্ত করো না।'

ডিটেকটিভ বিশ্ববন্ধুকে এবং ছোটকাকে খুনীর কবলে রেখে মিঠুনরা ওঘরে গিয়ে

ক্যারম খেলতে বসল। তিতিরের খেলায় মন বসছিল না। সে বলল,—'ছোটকা ঠিক তুবড়ি করতে পারবে তো রে দাদা ?'

মিঠুন বলল,—'পারবে না মানে! জানিস ছোটকা একজন কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়র।'

তিতির বলল,—'এঞ্জিনীয়র তাতে কী হয়েছে, ছোটকাদের কারখানায় কি তুবড়ি তৈরী হয় নাকি ?'

'—নাই বা হ'ল ! ছোটকা ইচ্ছে করলে এটম বোমা তৈরী করতে পারে তা জানিস, তুবড়ি তো ছেলেমানুষ !'

মিঠুন ছোটকা-গর্বে গর্বিত হয়।

বিবির ওসব কোন দুর্ভাবনা নেই। ছোটকাকিমাকে ছোটকা সেদিন যে এসেন্সটা তৈরী করে দিয়েছিল, সেটা বাজারের থেকে ভালো। ছোটকার তুবড়ি দেখবার মত দেখাবার মত হবে।

দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতে মিঠুন ছোটকাকে অস্থির করে তোলে,—'ছোটকা, তুবড়ির কী হ'ল ? কালীপুজো যে এসে গেল।'

ছোটকা বলে,—'হবে রে হবে। তবে একটা কাজ করতে হবে।'

একটা কেন মিঠুন একশটা কাজ করতে রাজি।

'—কুল কাঠ নিয়ে আসতে পারবি ?'

উঠোনে কুলকাঠের পাহাড় বানিয়ে ফেলল মিঠুন। সড়ালের বাগান থেকে নিয়ে এল, তে-ঘোরীর মাঠ থেকে নিয়ে এল। তারপর মনে পড়ল চাঁদাবুড়ির উঠোনে একটা গাছ আছে, সেখান থেকেও নিয়ে এল। পায়ে কাঁটা ফুটল, হাত কাটল, মিঠুনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলল,—'এতে হবে না, ছোটকা !'

ছোটকা বলল,—'হবে। তবে বেগুন কাঠে আরও ভালো হয় রে মিঠুন।'

মিঠুন সঙ্গে সঙ্গে ছুটল কুড়ুনের বেগুন ক্ষেতে। সহজে কি দিতে চায়! কুড়ুনে চাষীকে কাকা বলে ডেকে, তাকে জপিয়ে-জাপিয়ে প্রায় তার গোটা ক্ষেতটা তুলে নিয়ে এল মিঠুন।

এবারে উঠোনে বেগুন কাঠের পাহাড় তৈরী হ'ল।

মিঠুন বলল,—'এতে খুব ভালো হবে, না ছোটকা ?'

'—হবে। তবে তে-পল্‌তে কাঠে সবচে ভালো হয়।'

তে-পল্‌তে কাঠ কোথায় পাওয়া যায় ? ক'দিন ধরে মিঠুনের ঘুম নেই। লোকে কেন তে-পল্‌তে গাছের মত এমন মূল্যবান গাছের চাষ করে না। অবশেষে তার মনে

পড়ে হাজিচণ্ডীর মাঠে যাবার পথে দেখেছে সে তে-পল্‌তে গাছের বেড়া। লাল লাল ফুল হয়। ডালে গোলাপের মত কাঁটা।

পারলে মিঠুন গোটা বেড়াটাই ভেঙে আনতো। আলিবাবার গুপ্তধনের মত নিয়ে এল তে-পলতে কাঠের রাশ। এবারে উঠোনে তৈরী হ'ল তে-পল্‌তে কাঠের পাহাড়।

ছোটকার নির্দেশনায় মহা উৎসাহে পোড়ানো হ'ল সেই পাহাড়। একটা লম্বা গর্তের মত করে তার মধ্যে পোড়া কাঠকয়লাগুলো রেখে তার ওপর কচুর পাতা ঢাকা দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। অনেকটা কবর দেওয়ার মত ব্যাপার।

মিঠুন বলল,—ছোটকা, তুবড়ি!

ছোটকা বলল,—'এক সপ্তাহ মাটি চাপা রইল।'

মিঠুন বলল,—'এক স-প্তা-হ!'

ছোটকা বলল,—'হাঁ। তুমি এখন এক কাজ করো। সোরা, গন্ধক আর লোহাচুরের যোগাড় দেখো।' সোরা ফুটিয়ে ছাতে রোদে শুকোতে দেওয়া হ'ল। তিতির মাঝে মাঝে খবরদারী করে আসে। কাকে না উল্টে দেয়। গন্ধক তুলে রেখে দেওয়া হ'ল, যথাকালে গুঁড়ো করে নিলেই চলবে।

লোহাচুর দেখে ছোটকা বলল,—'এ কী, ছোটদানা এনেছিস কেন?'

—'হাল্কা হলে বেশি ওপরে উঠবে।'

—'দূর্ গাধা! বড় দানা নিয়ে আয়, বড় বড় ফুল কাটবে।'

বিবি বলল,—'তাই বুঝি?'

ছোটকা বলল,—'বিবি, তুবড়ি যদি চাও তো কয়লা বাট।'

কবর থেকে কাঠকয়লাগুলো ইতিমধ্যে তোলা হয়ে গেছে। বিবি তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে লেগে গেল কয়লা বাটতে। ছোটকাকিমা এসে বলল,—'ছেলেমানুষকে দিয়ে কয়লা বাটানো হচ্ছে।' ছোটকা বলল,—'ছেলেমানুষ মানে? দু'দিন পরে তো লঙ্কা বাটবে।'

—'সে যখন বাটবে তখন বাটবে, এখন তো উঠুক।' ছোটকাকিমা বলল।

বিবির কালিঝুলি মেখে কয়লা বাটতে ভালোই লাগছিল। সে উঠবে না। ছোটকাকিমা তাকে একরকম জোর করে ঠেলে তুলে দিল।

—'আমি এখন কী করব?'

বিবির একটা কাজ চাই। ছোটকাকিমা বলল,—'চোদ্দ পিদ্দিম গড়তে হবে না? যাও তুমি চোদ্দ পিদ্দিম গড়োগে।'

মনের মত কাজ পেয়ে বিবি চোদ্দ পিদ্দিম গড়তে লেগে গেল। কিন্তু তুবড়ি ছেড়ে বেশি দূর গেল না। কাছেই বসল। তিতির কাছে বসে তাকে কাদা জুগিয়ে দিতে লাগল।

—'মিঠুন, তুমি যাও এইবেলা বাজারে। এরপরে গেলে ফুটোফাটা ছাড়া কিছু মিলবে না।' মিঠুন চলে গেল তুবড়ির খোল কিনতে। ছোটকা বলল,—'বেশ লাল দেখে বেশি পোড়া দেখে নিবি বুঝলি।'

কালীপুজোর আগের দিন বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল যেন। সবাই খাটছে। ঠিক যেন যগ্যি-বাড়ি। ছোটকা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। মা এসে বলল,—'তুমি খালি ফাঁকি দিচ্ছ ঠাকুরপো।'

ছোটকা বলল,—'এঞ্জিনীয়র নিজে খাটে না, মাথা খাটায়।'

মা বলল,—'দেখো ঠাকুরপো, এঞ্জিনীয়রের নাম থাকে যেন।'

ইতিমধ্যে এক ফাঁকে মিঠুন বুড়োশিবতলার ফ্রি তুবড়ি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে এসেছে। ফার্স্ট প্রাইজ তার বাঁধা। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়রের তৈরী তুবড়ির কাছে কে পারবে? ছোটকা নিজে হাতে নিক্তি ধরে মেপে দিলেন মশলা। ফর্মুলাও ছোটকার নিজের। একটা খোলে মশলা পুরে এক্সপেরিমেণ্ট করা হ'ল। বেশ হয়েছে। তিতির হাততালি দিয়ে উঠল।

বিবি বলল,—'থ্রি চিয়ার্স ফর ছোটকা।'

ছোটকা বলল,—'রাত্তিরে আরো খুলবে। আরও ভালো করে ঠাসিস।

রাত্রে দেখা গেল, সত্যি দেখবার মত জিনিস হয়েছে। এক একটা তুবড়ি ওঠে দু'তলার মাথা ছাড়িয়ে, বোম্বাই বাঁশের মত ঝাড় হয়ে, বড় বড় ফুল কাটে। কিন্তু তারপরই বোমার মত ফাটে। তুবড়ির মতই মিঠুনের আশা উঁচু উঁচু আরও উঁচু হয়ে ওঠে এবং তারপরই ফেটে চৌচির হয়ে যায়! মিঠুন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল,--'ছোটকা, কি হবে, আমি যে নাম দিয়েছি।'

মা বলল,--'ঠাকুরপো, তোমার ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হবে।'

বাবা বললেন,—'ভালোই তো হয়েছে। বেশ কেমন পটকা-কাম-তুবড়ি।'

ছোটকা হাসতে হাসতে বলল,—'আমার কী দোষ। মিঠুন পটকা হ'ল না, পটকা হল না বলে কাঁদাকাটা করছিল, তাই দিলাম ওতে একটু পট্‌কার মশলা মিশিয়ে।'

মা, বাবা, ছোটকাকিমা সবাই হেসে উঠল। মনে মনে ছোটকা আরো জোরে হাসল। আসলে ছোটকা তুবড়ির খোলগুলোকে জলে ভেজাতে ভুলে গিয়েছিল।

মৌচাকের পূজা-সংখ্যা

আগামী কার্তিক সংখ্যার মৌচাক বিশেষ পূজা-সংখ্যা হিসাবে পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। বহু বিখ্যাত লেখকের নানা ধরণের লেখায় আর ছবিতে-ছবিতে ভরা থাকবে এই সংখ্যা। এই বিশেষ সংখ্যার জন্য কোন দাম বাড়ানো হবে না, অথচ আকার হবে সাধারণ সংখ্যার ডবল।

এঁদের সংসার

শ্রীরুণু চট্টোপাধ্যায়

আমার মা-মাসীদের ধারাই আলাদা। দেখা হলেই নিজেদের মধ্যে বেড়াল, কুকুর জন্তুজানোয়ার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেতো। লোকে তাঁদের আড়ালে 'বেড়াল দিদিরা' বলে ডাকতো। একবার হয়েছে কি আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছি বিয়ের নেমন্তন্নে। মস্ত ঘরে একটা সিংহাসনের ওপর বউ বসে আছে, আর একটু দূরে বড়মাসী তাঁর মোটা-সোটা শরীর নিয়ে বসে।

মাকে দেখা মাত্র বললেন, 'বেনি এদিকে আয়। হ্যাঁরে, তোর খেঁদির খবর কি? আজকাল একটু মোটা হয়েছে?'

অমনি মা তাঁর খেঁদির রূপ-গুণের বর্ণনা শুরু করলেন। 'কি বলবো যে দিদি, এতো দুষ্টু হয়েছে খেঁদি! কোনোমতেই দুধ খাচ্ছে না। সেই ভোর থেকে চেষ্টা করে তবে বেলা দশটা নাগাদ একটু দুধ খাওয়াতে পারলাম।' তারপর মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কৃষ্ণা, টুকি, কেলোকে ঘরের ভেতর রাখতে বলেছিলাম, রেখেছিস?'

'হ্যাঁ মা, ছোটঘরে রেখে এসেছি।' আমি বললাম।

আরো কিছু হয়তো বলতেন মা, কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার মেজমাসী এসে হাজির হলেন। আধময়লা কাপড়, চুল উস্কখুস্ক, হাতে মস্ত ব্যাগ। বড়মাসীর ভুরু কুঁচকে উঠলো, মাকে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখেছিস চিরকালই রমিটার ঐ রকম পাগলী পাগলী ভাব। বিয়ে বাড়িতে এসেছে ঐ পোষাকে!'

মেজমাসী আমাকে বললেন, 'এইমাত্র পুঁটুরাণীকে হাসপাতালে দিয়ে এলাম। কিছু খাচ্ছে না। ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

বড়মাসী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: 'তখনি বলেছিলাম রমি, ভিটামিন খাওয়া। আমার মুটু, সে তো ঐ ভিটামিন খেয়েই ঐ শরীর বাগিয়েছে। আর শুধু তো ভিটামিন বড়ি দিলেই হবে না, খাদ্য থেকে যাতে ভিটামিন পায় তার চেষ্টা করতে হবে। এই তো এখুনি আসার আগে মুটুকে আটা গুলে তার সঙ্গে কিছুটা দই দিয়ে সামান্য ডিমের হলদেটা দিয়ে খাইয়ে এলাম। জানি প্রত্যেকটাতে ভিটামিন গিজগিজ করছে।'

পাশের এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, 'ওঁর ছেলে বুঝি?' আমি বললাম, 'ছেলের চেয়ে বেশী, বেড়াল!'

কনের মা এসে সবাইকে আপ্যায়িত করে মেজমাসীকে দেখে বললেন, 'একি চেহারা হয়েছে রমা? শরীর খারাপ নাকি?'

মেজমাসী বললেন, 'না, আজ সারাদিন হাসপাতাল-ঘর করতে হয়েছে। পুঁটুরাণীর খুব অসুখ। আমি হাসপাতালে এ-বাড়ির টেলিফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। যদি কোনো খবর আসে ডেকে দিতে বলবেন আমাকে।'

বড়মাসী পুঁটুরাণী সম্বন্ধে সব খুঁটিয়ে জিগ্‌গেস করছিলেন আর মাঝে-মাঝে হায়-হায় করছিলেন আর বলছিলেন, একটু আগে যদি ওঁকে খবর দিতো মেজমাসী তাহলে হয়তো পুঁটুরাণীকে বাঁচানো যেতো। এখন মনে হচ্ছে বড় দেরি হয়ে গেছে।

পাশের ভদ্রমহিলা এঁদের কথাবার্তায় এতো জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, শেষে উনি বললেন, 'আচ্ছা, কালীঘাটে মানত করলে হয় না? হয়তো ভালো হয়ে যাবে বেড়ালটা।' মা ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, 'বেড়াল বলবেন না, ও ওর মেয়ে।' তারপর নিঃশ্বেস ফেলে ব্যাগ খুলে একটা টাকা বের করে রুমালের খুঁটে বেঁধে বললেন, 'মেজদি মনে করে এক সপ্তাহ পরে পুঁটু একটু ভালো হলে পুজো দিতে হবে।' এমন সময় খবর এলো মেজমাসীর টেলিফোন। মেজমাসী টেলিফোন ধরতে গেলেন, বড়মাসীও সঙ্গে গেলেন। খানিকপরে মেজমাসী কাঁদতে-কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন দেখলাম। মা তাড়াতাড়ি আমার হাতে চাবিটা দিয়ে বললেন, 'খাবার পরই চলে যাস বাড়িতে—আমি ওদের সঙ্গে চললাম।

খাওয়া-দাওয়া হতে একটু দেরি হয়ে গেলো। ঘুমে চোখ বন্ধ হবার যোগাড়। বাবা আর আমি যখন বাড়ি পৌছলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। ঘর খুলে আলোটা জ্বালতেই দেখলাম, ঘরের মেঝেয় বাবার উপন্যাসের পাতা উড়ছে। তিনটে বেড়ালে মিলে দারুণ উৎসাহে পাতাগুলো নিয়ে ফুটবল খেলছে। যেগুলো উড়ছে না সেগুলো নখে করে ছিঁড়ছে। আর আমার বাবা বেচারা এইসব দেখে সত্যিকারের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর চীৎকার করে বললেন, 'ঝাঁটাটা আন তো কৃষ্ণা। ওগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি।' তাড়াতাড়ি ঝাঁটা এনে উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাগুলো ঝাঁট দিতে শুরু করি আমি। বাবা বললেন, 'আঃ, ওগুলো নয় ঐ বেড়ালগুলোকে দূর কর ঝেঁটিয়ে। আচ্ছা দাঁড়া, বস্তাটা আনি কয়লার ঘর থেকে। ওগুলোকে তাতে পুরে এখুনি বিয়ে বাড়ি দিয়ে আসি। দূর আছে—চিনতে পারবে না?

ভালো কাপড়টা ছাড়তে আমার ঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আমার খুব সখের যে শাড়িটা খাটের ওপর রেখে গিয়েছিলাম, সেটা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছে। তার আগে একটু মায়া হচ্ছিল তিনটেকেই তাড়ানো হবে ভাবতে, এখন আর কোনো মায়া-দয়া নয়।···

বাবাকে বললাম, 'মা আসবার আগেই চল ছেড়ে দিয়ে আসি।'

বিয়ে-বাড়ির কাছে যখন পৌছলাম, তখন বেশ নিস্তব্ধ চারদিক। পাশের গলিটার কাছে বস্তাটা খুলে রেখে বাবা আর আমি গাড়িতে উঠে পড়লাম।

রাত্তিরে মা'র বিয়ে বাড়িতে থাকার কথা ছিল। সকালে প্রায় দশটা নাগাদ মা নীচে থেকে ডাকছেন, 'ওগো, কাউকে পাঠিয়ে দাও। বেড়াল তিনটেকে ওপরে নিয়ে যাক। দেখো না কি দুষ্টু যে হয়েছে, ঠিক যেন মানুষ। আমি বাড়ী থাকবো না ব'লে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে তিনটেতে বসে আছে। কি করে জানলো যে ও-বাড়িতে আমরা যাবো?'

বাবা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

গাঁয়ের দুপুর

শ্রীকুমুদরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

শহর থেকে অনেকদূরে গাঁয়ের কিনারায়
যাও যদি কেউ সবুজের চর নদীর মোহনায়
খড়ের ছাওয়া ঘর তুমি ভাই দেখবে হেথা-হোথা ;
ঘাসের সবুজ নুইয়ে মাথা কইছে মনের কথা।
গাঙের জলে সিনান করি পারের তরী বেয়ে
রাখাল ছেলে চলছে ঘরে সুয্যি পানে চেয়ে।
বটের ছায়ে করছে খেলা দামাল ছেলের দল ;
একটি মেয়ে সঙ্গী তাদের বাজছে পায়ের মল।
ঠিক-দুপুরে ভূতের ভয়ে, ভয়েই জড়োসড়ো
থুকথুড়ি দেয় কেউ বা মাথায় বুকে দেয় বা কারো।
নদীর কূলে চরে চরে কাঁটাবনের ঝোপ
গাঙশালিকের বাসা সেথায় মনের মতো টোপ।
বনের শশা ফলছে সেথায় যত্ন বিনা হায়
দুষ্টু ছেলে খাবার লোভে নিত্যি হানা দেয়।
মৌমাছিদের চাকটি কোথায় খুঁজতে হবে ভাই !
মধুর লোভে হুল ফুটাতে রাজী আছি তাই।
তুলসীপাতা নিতে হবে ঘষতে হবে বটে,
আরো কিছু লাগবে বুঝি বুদ্ধি তো নেই ঘটে।
চারদিকেতে যাচ্ছে দেখা নীল-সবুজের ভার
ধানের শিষে জ্বলছে কোথাও হীরা-মণির হার।
শন্ শন্ বইছে হাওয়া পাটের সবুজ ভুঁয়ে,
কলার পাতায় শিশির যেন পড়ছে চরণ ছুঁয়ে।
এমনি করে রোজ দুপুরে গাঁয়ের আঙিনায়,
মায়ের কোলে খেলার মত মনের ভেলা ধায়।

মেঠুড়ে

কমনওয়েলথ গেমস

পঁয়ত্রিশটা দেশের প্রায় এক হাজার প্রতিযোগীর সমাবেশে অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসের আট দিনের প্রতিযোগিতা ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। ১৯৫৮ সালে কার্ডিফের কমনওয়েলথ গেমসে মিলখা সিং, মল্লবীর লীলারাম এবং লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডের কৃতিত্বে ভারত স্বর্ণপদক পেলেও কোনোবার এতো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি যে রকম করেছে এবারের কিংসটনের কমনওয়েলথ গেমসে। পঁয়ত্রিশটা দেশের ভেতর ভারত এবার নবম স্থান অধিকার করে তিনটে স্বর্ণ, চারটে রৌপ্য ও তিনটে ব্রোঞ্জ পদক মিলিয়ে মোট দশটা পদক ঘরে এনেছে।

অ্যাথলেটীকস, ব্যাডমিণ্টন, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও ভারোত্তোলনের জন্য কর্মকর্তা সমেত চব্বিশজন প্রতিনিধিকে এবার কিংসটনে পাঠিয়েছিল। এঁদের ভেতর মল্লবীরদের সাফল্যই সবচেয়ে বেশি। দশটা পদকের ভেতর সাতটা পদক তাঁরাই পেয়েছেন। বাকি তিনটের ভেতর একটা অ্যাথলেটিকস, একটা ভারোত্তোলন এবং একটা ব্যাডমিণ্টনের। ভারতীয় মল্লদের ভেতর ভীম সিং হেভিওয়েটে, মুক্তিয়ার সিং লাইটওয়েটে এবং বিশম্ভর সিং ব্যাণ্টমওয়েটে স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছেন। ফ্লাইওয়েটে শ্যামরো ও ফেদারওয়েটে রণধাওয়া রৌপ্যপদক এবং ওয়েল্টার-ওয়েটে হুকুম সিং ও লাইট-হেভিওয়েটে বিশ্বনাথ সিং ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ফেদারওয়েট বিভাগে ভ্যারোত্তোলনে রৌপ্য পদক পেয়েছেন এম, এল, ঘোষ। পারভিনকুমার হ্যামার থ্রোতে রৌপ্য পদক এবং দীনেশ খান্না ব্যাডমিণ্টনে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

কমনওয়েলথ গেমসে এবার সবসুদ্ধ তেরোটা বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পিটার রেন্‌ফ্রয়ের সাঁতারে চারটে স্বর্ণপদক, ক্যানাডার কিশোরী সাঁতারু এলায়েন ট্যানারের চারটে স্বর্ণ ও তিনটে রৌপ্যপদক লাভ বিশেষ কৃতিত্বের। অ্যাথলেটিকসে একমাত্র বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রিলে দল। ৪×৪০০ গজ রিলে দৌড়ে তাঁরা মার্কিন দৌড়বীরদের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন

ক্রিকেট টেস্ট : ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

লীডস মাঠের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডকে এক ইনিংস ও ৫৫ রানে হারিয়ে দেয়। চতুর্থ দিন তিন ঘণ্টা খেলা চলার পর খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। ওভাল মাঠে শেষ টেস্টে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৩৪ রানে জয়ী হয়।

অনেক আশা করেছিলেন, লীডস মাঠের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাতে পারবে। টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৫৪ রানে চারটে উইকেট হারিয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সোবার্স ও নার্স সেঞ্চুরী করেন। ৯ উইকেটে ৫০০ রান তুলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। প্রত্যুত্তরে দু'ইনিংস মিলিয়ে ইংলণ্ডের ৪৪৫ রান এবং প্রথম ইনিংসের শেষ দিকে মাত্র ৮৩ রানের ভেতর ৬টা উইকেটের পতন হয়।

পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৬৮ রানের উত্তরে ১৬৬ রান তুলতেই ইংলণ্ডের সাতটা উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু টম গ্রেভনি এবং জন মারের চমকপ্রদ ব্যাটিং, দু'জনের দুটো সেঞ্চুরী এবং শেষ তিন উইকেটে ইংলণ্ডের ৩৬১ রান যোগ, টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব বেশি ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত ব্রায়ান ক্লোজের অধিনায়কোচিত গুণে ইংলণ্ড কোনো রকমে রক্ষা পায়।

পাঁচটা টেস্টের ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়—তিনটে টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাধান্য, একটা টেস্টে ইংলণ্ডের আধিপত্য ও একটা টেস্টে দু'জনের সমান অবস্থা। এই সিরিজ নিয়ে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এ পর্যন্ত পঞ্চাশটা টেস্ট খেলা হল। এর ভেতর ইংলণ্ড সতেরোটা টেস্টে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ষোলোটা টেস্টে জয়ী হয়েছে। বাকী সতেরোটা টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে হয়েছে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজে ওরেল ৫৩৯ রানের বেশী রান কখনো করতে পারেন নি, কিন্তু অধিনায়ক সোবার্স এবার ৭২২ রান করেছেন। গারফিল্ড সোবার্সের উইকেটের সংখ্যাও কুড়ি। ব্যাটিং-এ তাঁর নাম সবার ওপরে—বোলিং-এ দ্বিতীয়।

এবার চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের স্কোর সংক্ষেপে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

চতুর্থ টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৫০০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। সোবার্স ১৭৪, সেমুর নার্স ১৩৭, হাণ্ট ৪৯ ; কেন হিগস ৯৪ রানে ৪ উইকেট, স্নো ১৪৬ রানে ৩ উইকেট।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ২৪০ রান। ডি' ওলিভেরা ৮৮, কেন হিগস ৪৯ ; সোবার্স ৪১ রানে ৫ উইকেট, ওয়েসলী হল ৪৭ রানে ৩ উইকেট।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২০৫ রান। বব বারবার ৫৫, কলিন মিলবার্ণ ৪২; ল্যান্স গিবস ৩০ রানে ৬ উইকেট, সোবার্স ৩৯ রানে ৩ উইকেট।

পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ২৬৮ রান। রোহন কানহাই ১০৪, সোবার্স ৮১; বব বারবার ৪৯ রানে ৩ উইকেট, স্নো ৬ রানে ২ উইকেট।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংসে ৫২৭ রান। টম গ্রেভনি ১৬৫, জন মারে ১১২, কেন হিগস ৬৩; হল ৮৫ রানে ৩ উইকেট, সোবার্স ১০৪ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস ২২৫ রান। সেমুর নার্স ৭০, বেসিল বুচার ৬০; জন স্নো ৪০ রানে ৩ উইকেট, ইলিংওয়ার্থ ২২ রানে ২ উইকেট।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার এবার ছিল নবম অনুষ্ঠান। কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে ওখানে আয়োজিত মারডেকা ফুটবল প্রতি-যোগিতায় মালয়েশিয়া সমেত এশিয়ার দশটা দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, তাইওয়ান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং মালয়েশিয়া—এই দশটা দেশের ভেতর প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা হয়। এদের ভেতর গতবারের যুগ্ম বিজয়ী তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়া রীতিমত শক্তিশালী দল ছিল। এই সঙ্গে ব্রহ্মদেশের নামও করা যেতে পারে।

গ্রুপ ভাগের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার ব্যবস্থা ছিল। গ্রুপ ভাগের প লীগ প্রথায় পরিচালিত দু' গ্রুপের যারা চ্যাম্পিয়ন তাদের ভেতর অনুষ্ঠিত হ মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানের নামাঙ্কিত ট্রফির ফাইন্যাল খেলা সাধারণতঃ প্রতিদিন দুটো করে খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের খেলাটা অনুষ্ঠিত হ রাত্তিরে আলোরমালার ভেতর। প্রতি অর্ধে চল্লিশ মিনিট করে খেলার স্থায়িত্বকা ছিল মোট আশী মিনিট।

এবার ফাইন্যালে বর্মাকে ১-০ গোলে হারিয়ে টুঙ্কু আবদুল রহমান স্বর্ণ ট্রা পেয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম দল। ফাইন্যালে হেরে গেলেও বর্মার উন্নত ক্রীড়াধারা মা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে প্রশংসা পায়। ফাইন্যাল খেলায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে জয়সূচক গোলই বর্মার বিরুদ্ধে এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র গোল। এবারের প্রতি যোগিতায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারত ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া হারিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে। চতুর্থ স্থানের অধিকারী হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।
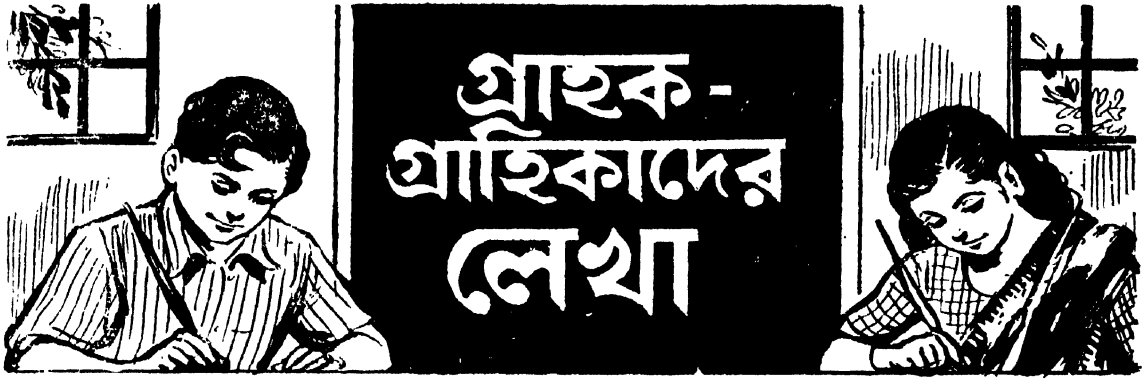
স্বপ্নময় বৃন্দাবন-উদ্যান

পরীর দেশ—অনেকের মুখে তার অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে কতবার কল্পনায় সেখানে গেছি। কিন্তু বাস্তবে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মহীশূরের বৃন্দাবন-উদ্যান—বিদ্যুতের আলোক-মালায় এক অপূর্ব পরীরাজ্য! কতবার এই উদ্যান এক অদৃশ্যশক্তিতে মনকে আলোড়িত করেছে, আর আজ তার হাতছানিতে সাড়া দিতে পারলাম—৬ই অক্টোবর, ১৯৬৫। আসাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বৈদ্যুতিক বিভাগের ছাত্রদের কাবেরী বাঁধের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-কলাপ বোঝাবার এবং নিয়ে যাবার ভার পড়ল আমার বাবার উপর।

মা, দিদি এবং আমিও এই সঙ্গে গৌহাটি হতে সুদূর মহীশূরের পথে রওনা হলাম। রেলযাত্রার বিবরণী দিয়ে প্রবন্ধ স্ফীতকায় করলাম না। শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, গৌহাটি থেকে বাঙ্গালোরের দীর্ঘ রেলযাত্রা ছাত্র দাদাদের সঙ্গে খুব আনন্দেই কাটিয়েছিলাম।

১১ই সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ট্রেন বাঙ্গালোরে পৌছল। ভাষা না বুঝিলেও পোর্টাররা জিনিসপত্তর প্ল্যাটফর্মে রাখল এবং কোনরূপ গণ্ডগোল না করে ন্যায্য পয়সা নিয়ে চলে গেল। সঙ্গী দাদাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে, বাবা আমাদের নিয়ে ষ্টেসনের বাইরে এলেন। আমার মনে তখন এক চিন্তা, এদের ভাষা তামিল না তেলেগু? এদের ভাষা তো আমি বুঝি না, এমন কি বাবাও বোঝে না, কাজেই দুশ্চিন্তা থাকা-খাওয়ার কি উপায়? অল্পক্ষণেই চিন্তামুক্ত হলাম। দেখলাম, এরা সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী জানে। ট্যাক্সীচালক ষ্টেসনের নিকটবর্তী একটা হোটেলে আমাদের পৌঁছে দিল। জিনিস-পত্তর রেখে, আমরা হোটেলের খাবার-ঘরে গেলাম। বাবা সরলভাবে মাছ-ভাতের নাম উল্লেখ করতেই তাদের মুখে যে ভাব হল, তাতে মনে হল যে তারা যেন সামনে ভূত দেখছে। বুঝিলাম যে, আমাদের মত মেছো বঙ্গালীকে হোটেলে স্থান দেওয়ায় তারা অনুতপ্ত। সে রাত্রে ইডলি,

দোষায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। দিদি বেচারী চিরপরিচিত মাছের টুকরোটি না পেয়ে মনমরা হয়ে রইল।

সকালে কফির দেশে চায়ের সন্ধানে বার হয়ে মা প্রচুর কালো আঙ্গুর ও নারকেল নাড়ু আনলেন। জীবনে প্রথম একআনা দামের নারকেল নাড়ু খেলাম। বিকেল চার টের সময় আমরা ৯৬ মাইল দূরস্থ মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। তীব্র গতিতে বাস পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে ছুটে চলতে লাগল। দু'পাশে পার্বত্য মনোহরণকারী দৃশ্য। স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে; প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। পৌনে আটটার সময় আমরা বৃন্দাবন গার্ডেনে পৌঁছলাম।

রূঢ় বাস্তব হঠাৎ স্বপ্নে পরিণত হ'ল। জলের উপর রঙীন বাল্‌ব্ দিয়ে কি অপূর্ব রঙের এবং সৌন্দর্যের বাহার! জল ও বিদ্যুতের এই অপূর্ব সৌন্দর্যের সমন্বয় চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। স্মৃতির পটে এই অপূর্ব দৃশ্য কখনও ম্লান হবে না। ১½ ঘণ্টা ধরে যে সৌন্দর্য-রাজ্যে বিচরণ করলাম, তাকে পরীরাজ্য বললেও তিলমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। স্মৃতির পটে বৃন্দাবন গার্ডেন চির জাগরূক হয়ে থাকবে।

শ্রীশৈবাল পুরকায়স্থ

দুটি ছবি কি এক রকম?

ঘোড়ার পিঠে চেপে যাচ্ছে একটি বিদশীয় লোক। দুটি একই ছবি আছে পাশাপাশি। প্রথম ছবিটি দেখে দ্বিতীয় ছবিটি আঁকা হয়েছে, কিন্তু হুবহু এক রকম হয়নি—অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেছে। ছবি দুটি ভাল করে দেখে, কোথায় কোথায় ঠিক এক রকম হয়নি বলতে পারো?

(উত্তর আগামীবার পাবে।)
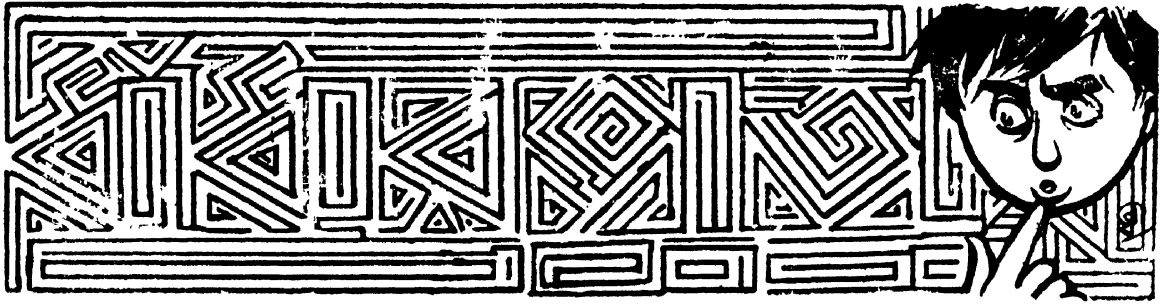
বাজিকর
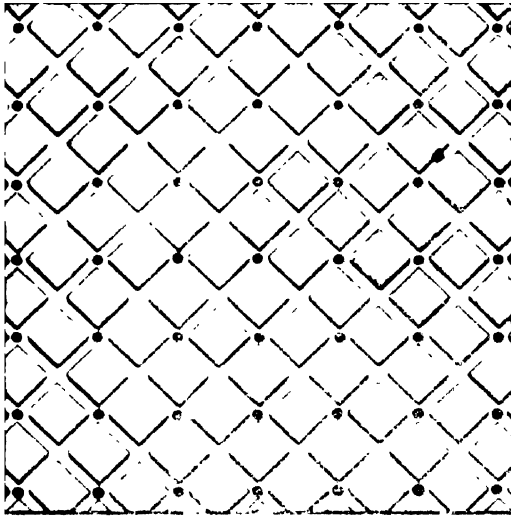
পুলিশ ব্যারাক

১। একটা পুলিশ ব্যারাকের ছবি পাশে দেখা যাচ্ছে। নীচে দাঁড়িয়ে আছে সাতজন পুলিশ। ওদের বিন্দু দেওয়া জায়গায় এমন করে দাঁড় করাতে হবে, যাতে একজন আর এক জনকে দেখতে না পায়। কি করে ওদের দাঁড় করাবে বল তো?

চাবি ফেলার কায়দা

২. একটা খালি কাঁচের বোতলের মধ্যে একটা চাবি ঝুলানো আছে সুতো দিয়ে। বোতলটি মুখ না খুলে বা বোতলটি না ভেঙ্গে চাবিটিকে বোতলের তলায় ফেলতে পারো?

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মোট ১৯৫টি বিন্দু আছে।

চারিদিকে দুঃখ-দুর্দশা, ধর্মঘট, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে—মৃত্যুর করাল ছায়া। বন্যা, মহামারি, ভূমিকম্প—এই হলো আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ছবি—। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এসবের মধ্যেই কখন শরৎকাল এসে পড়েছে। হঠাৎ মুখ তুলে দেখলাম—শরৎকাল এসেছে, বৃষ্টি-ধোয়া পথ দিয়ে, এনেছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রসন্ন প্রভাত। অন্য দিকে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে পূজার বাজনা বেজে উঠলো বলে। এত দুঃখ কষ্টের মাঝে বাঙ্গালীর জীবনে এই পূজার ক'টি দিন আনে—আশা, শান্তি ও উৎসাহ।

এই সব দুর্বিপাকের মধ্যেও পূজা তোমাদের আনন্দ ও উৎসাহমণ্ডিত হয়ে সার্থক হোক প্রার্থনা করি। আর সবাইকে জানাই শারদ-শুভেচ্ছা—।

মহাজীবন থেকে

সে যুগের নামকরা শহর কৌশাম্বী। কৌশাম্বীর পথে-ঘাটে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। রাজপথের দু'পাশে মনোরম প্রাসাদ। অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন। নাগরিকদের মধ্য সমৃদ্ধির দিক থেকে সর্বোচ্চে রয়েছেন শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়। দেশে বিদেশে বাণিজ্য নিয়ে তাদের আনাগোনা, বন্দরে বন্দরে বেসাতি বোঝাই তাদের জাহাজ, বছরের শেষে ফিরে আসে অগণিত অর্থ আর বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিয়ে।

কৌশাম্বীর শ্রেষ্ঠীকুলের গৌরব বৃষভসেন। অর্থসম্পদ তাঁর অপরিমিত। সমাজে তাঁর অপরিসীম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অর্থের প্রতি নেই তাঁর মোহ। দান-ধ্যানে তাঁর অর্থের একটা বিরাট পরিমাণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। তবু নতুন অর্থাগমের পথ তাঁকে হাতছানি দেয়। দানব্রতী বৃষভসেনের অর্থভাণ্ডার স্ফীত থেকে স্ফীততর হতে থাকে।

কৌশাম্বীর উপকণ্ঠে তাঁর প্রাসাদোপম বাসভূমি। দাসদাসী আর প্রার্থীদের বিরাট সমাবেশ সেখানে। বণিককুলের নিত্য যাতায়াত। কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত তার অতিক্রান্ত হয়—তবু যেন পরিপূর্ণ সুখ শান্তি নেই তাঁর জীবনে। পরম পাওয়ার প্রত্যাশায় তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

জনতার কোলাহল, কর্মতরঙ্গের অবিরাম আবর্ত, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে হয় বৃষভসেনের—তাই সময়ে-অসময়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন নিরুদ্দেশ

যাত্রায়। ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমায়—দেশ থেকে দেশান্তরে। বণিক-পত্নী কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিলেন যে, স্বামীর নিরুদ্দেশ যাত্রার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অভ্যস্ত পরিবেশ যেন ক্রমশঃ তাঁর কাছে বেশী মাত্রায় অসহনীয় বলে মনে হচ্ছে। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্মে লিপ্ত থেকেও যেন তাঁর নির্লিপ্তভাব।

সেবার কৌশাম্বীর উপকণ্ঠ থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে অসামান্য সুন্দরী একটি মেয়ে—বেশভূষা অত্যন্ত দীনহীনের মত। কিন্তু অতুলনীয় তার কান্তি। পত্নীকে ডেকে বৃষভ-সেন বললেন, পথের ধারে নিতান্ত অসহায় আর নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছি এ মেয়েটিকে—সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় দেখে নিয়ে এলাম সঙ্গে। তোমার পরিচর্যা করুক—নইলে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে অসম্মান আর অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

বণিক-পত্নী সম্মত হলেন। আশ্রয় পেলো নিরাশ্রয়া মেয়েটি। নাম চন্দনা। অনেক জিজ্ঞাসা করেও পিতৃপরিচয় কিছু পেলেন না বণিক-পত্নী।

চন্দনা তার জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম যন্ত্রের মত করে। কোনো কাজে কোন খুঁত নেই। তবু বণিক-পত্নীর মন খুসী নয়। চন্দনার চলাফেরা, কাজকর্মের মধ্যে নানা অছিলায় ত্রুটি আবিষ্কার করে তিনি তাকে গঞ্জনা দেন। বণিকের আশ্রয় পেয়েও চন্দনা অনেক সময় নিজেকে নিরাশ্রয় ভাবে। কাজকর্মের অবসরে যখন আত্মস্থ হয় চন্দনা, তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্য দেশের এক রাজ্যখণ্ডের ছবি। সে রাজ্যের অধিপতির গৃহে তার জন্ম। সামন্ত রাজা হলেও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্যবিত্ত-ছিল অসামান্য। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কেটেছে তার জীবন। তারপর একদিন নেমে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা। প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলেন সামন্তরাজ। রাজ্য ও প্রাণ দুই হারালেন তিনি। রাজপরিবারের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রইল না চন্দনার। পথের ভিখারী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল—তারপর দুঃখকর অভিজ্ঞতার পথে যেতে যেতে একদিন আশ্রয় পেলো বৃষভসেনের গৃহে।

বৃষভসেনের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা এবার আরোও তীব্র হয়ে উঠেছে। চন্দনা তার মনের খবর রাখে না। যন্ত্রের মত তার কাজকর্ম নিয়ে থাকে, তবুও অবসর-ক্ষণে সেও মুক্তি পেতে চায়—পরমপ্রাপ্তি।

কৌশাম্বী নগরের পথে সেদিন দেখা গেল এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে। কৃচ্ছ্রসাধনের চিহ্ন তার দেহে। কিন্তু মনে অপরিসীম প্রশান্তি। রাজপথ দিয়ে চলেছেন নির্বিকার উদাসীন পথিক। কর্মব্যস্ত নাগরিকদের তাঁর দিকে দৃষ্টিদানের অবসর নেই। বৃষভ-সেনের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তপস্বী পুরুষ। বণিক-পত্নী চন্দনাকে আদেশ

করলেন ফল মিষ্টান্ন দিয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে। চন্দনা মিষ্টান্ন আর ফল থালায় সজ্জিত করে নিবেদন করলেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী গ্রহণ করলেন সেই অর্ঘ্য। মুহূর্তের মধ্যে চন্দনার মনে জাগলো এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। সন্ন্যাসী নিলেন আহার্য, চন্দনা দিলেন তার মন প্রাণ। বৃষভসেনও আবিষ্ট হলেন এক নূতন অনুভূতিতে। সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন শ্রেষ্ঠী। ঐশ্বর্যময় মোহমুক্তি ঘটলো তাঁর জীবনে, মুহূর্তের ব্যবধানে বিষয়সম্পত্তি দান করলেন সন্ন্যাসীকে, গড়ে উঠলো বিশাল বিহার। মুক্তি-কামীদের আশ্রয় হলো বৃষভসেন প্রতিষ্ঠিত এই মঠ। মঠের সংলগ্ন ভূমিতে স্থাপিত হলো সন্ন্যাসীদের জন্য স্বতন্ত্র এক বিহার। সেই বিহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চন্দনা। জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁর অতিক্রান্ত হলো জীব-সেবার সাধনা উদ্‌যাপনে।

যে মহাপুরুষের দর্শনমাত্রে চন্দনা আর বৃষভসেনের জীবনে ঘটলো পরম লগ্নের আবির্ভাব—তিনি সর্বত্যাগী মহামানব মহাবীর বর্ধমান।

চিঠির উত্তর—নূপুর মিত্র, জামির লেন, কলিকাতা: গ্রাহিকা তুমি—তাই প্রশ্ন করেছ, লিখেছ। কিন্তু কই কি জানতে চাও তাই তো লেখনি। অমিতা পাণ্ডা, মানিকাবসান, মেদিনীপুর: তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিতে যে ধাঁধা পাঠিয়েছ—তার সঙ্গে উত্তর না থাকায় আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। তোমরা যখনই কেউ ধাঁধা পাঠাবে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটিও লিখে দেবে। শম্পা পাল, ডবলিউ সি ব্যানার্জী লেন, কোলকাতা: তোমার এবারের চিঠিতে স্কুলের কাহিনী খুব সুন্দর। ববি চক্রবর্তী, কোলকাতা; মিষ্টু ঘটক, কোলকাতা: গত পূর্ববারে তোমাদের নাম ভুল ছাপা হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। এবার ঠিক হয়েছে তো? অনীতা মৈত্র, হাওড়া; পলা পত্রনবীশ, প্রিন্স গোলাম হোসেন শা রোড; মালা চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া; অরিন্দম ও অর্পিতা দত্ত, যাদবপুর; কৌশিক ও নূপুর, কোলকাতা; শ্রীরূপা ও রণেন, তেজপুর: সকলের চিঠি পেয়েছি।

জয়িতা মুখার্জী, 'নৃসিংহ ভবন', বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা: আমার স্নেহের শত বছরের ছোট্ট জয়িতা, তোমার মিষ্টি চিঠি অনেকদিন পেয়েছি, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি। হয়ত রাগ করেছ, কিন্তু যদি বলি কবিতাটি ছাপা হবে, তাহলে রাগ নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। ভাল আছ তো?

তোমাদের

শুভকামনা সহ—

'মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ০·৪৫

শ্রীশ্রীদুর্গা

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻

৪৭শ বর্ষ]　　কার্তিক : ১৩৭৩　　[৭ম সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ভেবেছিলাম লিখতে বসে
　　মৌচাকের পদ্য,
মধুর রসে চটচটিয়ে
　　করব অনবদ্য।

হঠাৎ হল থামতে,
এবং ভাবের শূন্য থেকে
　　মাটির ওপর নামতে।
কারণ, একটি মৌমাছি
গুনগুনিয়ে ভেস্তে দিল
　　কাব্যখানার সব ছাঁচ-ই

মৌচাক আর দেখি কখন,
মৌমাছিদের দিক থেকে!
ভাবি, মধুর ভাণ্ড শুধু
যেমন খুশি যাই চেখে।

মধুর বৃষ্টি হয় না কোথাও
নেই ফোয়ারা অফুরান,
হয় না চক্রবৃদ্ধি সুদে
বিনা মেহনতের যোগান।

বিন্দু সুধা লাখো ফুলের
খুঁজে দিনের পরে দিন,
সবাই সবার জন্যে জমায়
হিংসা এবং লালসহীন।

ফুলে চুমুক দিলেই কিন্তু
চাক্ বাঁধবার হয় না সুজন,
মধু-র রসিক আছে যত
মৌমাছি আর তাদের ক'জন!

রঙীন পাখার প্রজাপতি
সেও ত' মধু লুটে বেড়ায়,
মৌচাক যে গড়বে, এমন
নেইক মুরোদ, মানে না দায়।

তাইত বলি মৌচাক ত'
শুধু মধুর জন্যে নয়,
মৌমাছিদের ঝাঁকেই যে তার
মেলে আসল পরিচয়।

ঝাঁকের জন্যে এক যেথা আর
একের জন্যে সমস্ত ঝাঁক,
মধু-র চেয়েও মস্ত কিছুর
সবার সেরা সে মৌচাক।

ছয় বন্ধু
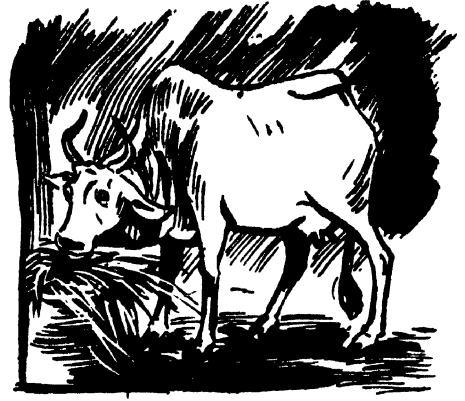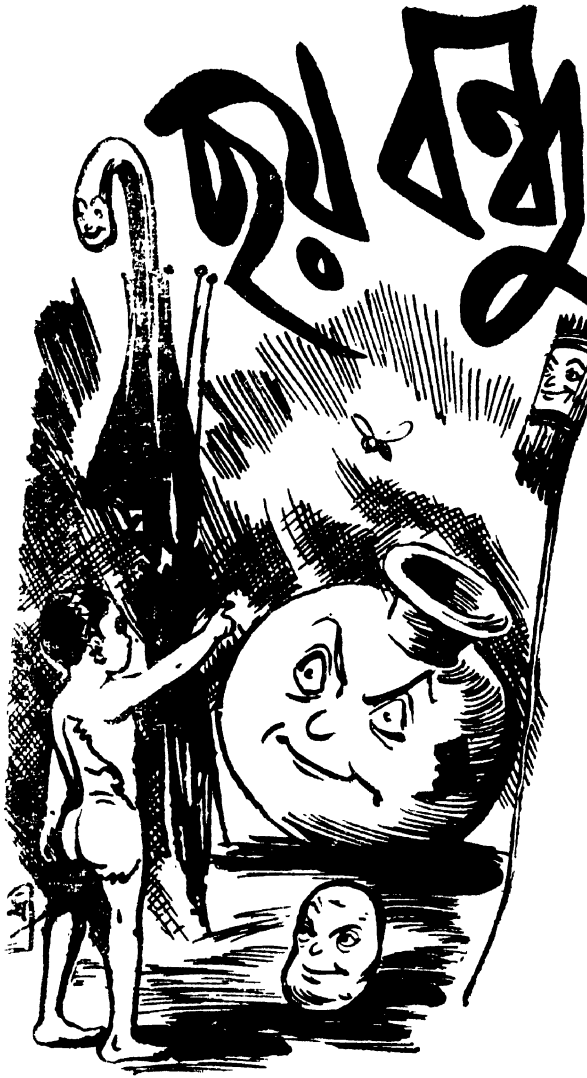
শ্রীমনোজ বসু

বাড়ির লোকজন পুজোর সময়টা পশ্চিমে হাওয়া-বদল করতে গেছে। ঘরবাড়ি আর গোয়ালের গাইগরুটা টহলরাম নামে ভৃত্যের জিম্মায়। মনিবেরা চলে গিয়ে টহলরামের স্ফূর্তির অবধি নেই। কোন্ এক দেশোয়ালি কুটুম্ব আছে চাল-আটা দিয়ে এসেছে, তারাই রেঁধেবেড়ে দেয়। খায় সেখানে, আর দিনরাত টহল দিয়ে বেড়ায়।

ঘরের দরজায় ভারী ভারী তালা। টহলরাম আসে রাত দুপুরে, ঘুমে ঢুলুঢুলু তখন। ঘরের তালা খোলে না, যেখানে হোক একটা মাদুর বিছিয়ে প'ড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। ঘুম ভাঙে প্রহরখানেক বেলায়, রোদে নিতান্তই যখন গা পুড়ে ওঠে। সেই সময়টা গাইগরুর কথাও মনে পড়ে যায়। বোঝাখানেক খড় আর এক বালতি জল গোয়ালে রেখে তক্ষুনি আবার হাওয়া। এই হ'ল বাড়ির পাহারা দেওয়া ও গরুর খবরদারি করা। এই লোকের উপর সমস্ত ভার দিয়ে গৃহকর্তা নিশ্চিন্তে বাইরে গিয়ে আছেন।

ক'টা দিনের ভিতরেই গরুর হাড্ডিসার চেহারা, বারাণ্ডার উপরে ইঞ্চিটাক ধুলো। ঘরের ভিতরটায় কেমন অবস্থা, তালা খুলে কে আর দেখতে যাচ্ছে!

বারাণ্ডার একদিকে আঁস্তাকুড়। আজেবাজে বাতিল জিনিস ফেলে সেখানে। তার মধ্যে পাঁচটা জিনিস গায়ে গায়ে অনেককাল ধরে পড়ে আছে—পঞ্চবন্ধু। তা' ছাড়া মাছি

একটা অবরে-সবরে তাদের মধ্যে এসে বসে। মাছিকে নিয়ে তারা ছয়।

ফাটা-পুতুল। যতই হোক মানুষের আকৃতি, সেই সুবাদে তাকে দলপতি করেছে। পুতুলের কথামতো অন্যেরা চলে।

পুতুল একদিন বলল, লোকজন কোনদিকে কেউ নেই—কিসের ভয়ে তবে আর আমরা এই নোংরা জায়গায় পড়ে থাকি ?

অন্য পাঁচ বন্ধু সাড়া দিয়ে উঠে: বটেই তো, কিসের ভয় !

চলো তবে উপরে উঠে পড়ি। বারাণ্ডা দখল করে নিইগে।

সকলে সমকণ্ঠে বলে, চলো চলো, বারাণ্ডায় চলো—

মার্চ করে তারা সব বারাণ্ডায় উঠে পড়ল। ফুটো-হাঁড়ি, ভাঙা-ছাতা, ঝাঁটার কাঠি, পচা-আলু—ফাটা-পুতুল আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। বারাণ্ডার উপর পঞ্চ-বন্ধু জাঁকিয়ে বসেছে। মাছিও উড়তে উড়তে এসে পড়ল।

চতুর্দিকে সগর্বে একবার চোখ ঘুরিয়ে ফাটা-পুতুল বলে, বাড়িটা তবে আমাদের ?

অপর পাঁচজন কলবর করে ওঠে: আমাদের ! আমাদের !

বাড়ি তবে আমরাই সাফসাফাই করে নিইগে। চুলোয় যাক টহলরাম। তার ভরসায় থাকব না। নোংরার মধ্যে থাকলে গা ঘিনঘিন করে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়। কি বলো তোমরা ?

যুগপৎ ঘাড় নেড়ে সকলে সায় দিল: ঠিক কথা !

উঁচুতে এসে গোয়ালের গরু এবারে সামনাসামনি নজরে আসছে। পুতুল বলে, সকলের আগে ঐ গোয়াল। গোয়ালটা পরিষ্কার করে ফেল। গরু হলেন ভগবতী—কষ্ট পেয়ে শাপমন্যি দিচ্ছেন। দুধ বন্ধ করে দিলে খাবে কি তখন ! ঘোড়ার ডিম ?

হুকুম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠল।

মাছি বলে, কে কি করবে, বলে দাও পুতুল-কর্তা।

দলপতি পুতুল কাজ ভাগ করে দিচ্ছে: হাঁড়িরাম, পুকুরঘাটে জল ভরতি করে নিয়ে তুমি গোয়ালে চলে যাও। হাঁড়িরাম জল ঢালবে, আর কাঠি সিং তুমি ঝাঁটপাট দেবে। তার আগে আলুচরণ আর মাছিকুমার দু'জনে মিলে গরুটা গোয়াল থেকে বের করে দাও। আলুচরণ দড়ি ধরবে, মাছিকুমার পিছন থেকে তাড়াবে।

ভাঙা-ছাতা বলে, আমি ?

পুতুল-কর্তা বলে, পেখম মেলে তুমি তৈরি থাকো। রোদে ওদের কষ্ট হচ্ছে বুঝলে ছুটে গিয়ে ছত্রধারণ করবে।

হাঁড়ি ঘটর্-ঘটর্ করে পুকুরঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলে নামল। জলে দাঁড়িয়ে জলও ভরে নিল। ভার নিয়ে উঠে আসতে কষ্ট হচ্ছে। ফুটো দিয়ে ওদিকে জলও পড়ে যায়। আবার জল ভরে, আবার পড়ে যায়। মহা মুশকিল। সিঁড়ির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে হাঁড়ি শেষটা খান-খান হয়ে গেল।

ঝাঁটার কাঠি গোয়ালের দরজায় অপেক্ষা করছে। এতক্ষণের মধ্যেও জল এসে পৌঁছয় না—কী ব্যাপার! পুকুর-ঘাটে হাঁড়ির হাল দেখতে চলল। আহা রে, চাড়া হয়ে পড়ে আছে হাঁড়ি, আর্তনাদ করছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছে—পুরানো ঘাট, বড় বড় ফাটল—তারই এক ফাটলে আচমকা কাঠি সিং পড়ে গেল। একেবারে পাতালে।

ওদিকে গরুর দড়ি ধরে আলুচরণ আগে আগে চলেছে, মাছিকুমার পিছন থেকে তাড়াচ্ছে। গরু মুখ বাড়িয়ে আলুটা মুখে তুলে নিল—চপর-চপর করে চিবোচ্ছে। আর ঠিক এই সময়ে গোবর ত্যাগ করল—মাছিকুমার চাপা পড়ে গেল গোবরের নিচে। জীয়ন্ত কবর।

পুতুল-কর্তা অধীর হয়ে উঠছে। সামান্য একটু কাজে চার চারটে মরদ পাঠালাম—শব্দসাড়া নেই কারো। অলস অকর্মণ্য! ভাঙা-ছাতাকে বলে, দেখ তো ছত্রপতি, কী করছে ওরা সব। হাঁক পাড়ো।

বারাণ্ডার কিনারে গিয়ে ছাতা উঁকঝুঁকি দেয়: দেখতে পাচ্ছিনে কর্তা।

চার চার জনে যাবে কোথায়? চাতালের উপর উঠে ভাল করে দেখ।

বারাণ্ডার লাগোয়া চাতাল—বেশ খানিকটা উঁচু। হুকুম পেয়ে ছাতা তার উপর উঠছে। হেনকালে বাতাসের ঝাপটা এসে ছাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ছাতা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে: নিয়ে গেল ও কর্তা, ধরুন ধরুন। বাঁচান—

পুতুল তাকিয়ে দেখে, তাই তো, বাতাসেও শত্রুতা সাধছে। এক লম্ফে চাতালে উঠতে গেছে—ঝোঁক সামলাতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়ল। চিনামাটির তৈরি পুতুল, ভায় ফাটা। ভেঙে শত চুর।

প্রতিহিংসা

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এ কাহিনী এতদিন কাউকে বলিনি। জানতাম বড়দের বলে লাভ নেই, তারা একটি বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সব কিছু তারা যুক্তির কষ্টীপাথরে যাচাই করতে চায়।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যেগুলো যুক্তি-নির্ভর নয়। তাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। চোখ কান বুজে খালি বিশ্বাস করে যেতে হয়। তাই আমরা বলি অলৌকিক ঘটনা। কারণ পৃথিবীতে সচরাচর যা ঘটে, ঘটতে পারে, সেই মাপকাঠিতে এ কাহিনীর বিচার চলে না।

এমনই এক অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল। কাজকর্মের অবকাশে সে কাহিনী মনে পড়লে এখনও চমকে উঠি। মাঝরাতে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখি মাঝে মাঝে তারই ছায়া। ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর বসে বাকি রাতটুকু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাটাতে হয়।

আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগের কথা।

আমি তখন লোচনপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এক ইতিহাস ছাড়া অন্য সব বিষয়গুলোয় মোটামোটি ভালই ছিলাম। অঙ্কে বিশেষ ভাল। অনেক চেষ্টা করেও ইতিহাসের সাল-তারিখগুলো কিছুতেই কণ্ঠস্থ করতে পারতাম না। মোগল আর পাঠান বাদশাহের নামগুলো গোলমাল হয়ে যেত। সতীদাহ প্রথা রোধ করা বেন্টিংক না ডালহৌসি কার অক্ষয়কীর্তি, সেটা মাথা চুলকে চুল উঠিয়ে ফেললেও মনে রাখতে পারতাম না।

ফলে ইতিহাসের পরীক্ষার দিন আমার অবস্থা রীতিমত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত! বাড়ী থেকে স্কুল যাওয়ার পথে যতগুলো মন্দির পড়ত, সবগুলোতে মাথা ঠেকাতাম। রাস্তার দু'পাশের বড় সাইজের পাথরের নুড়িও বাদ দিতাম না।

আমার সঙ্গে পড়ত পশুপতি সামন্ত। ইয়া জাঁদরেল চেহারা। অমাবস্যাকেও হার মানানো গায়ের রং। ছেলেবেলায় মা বাবা দু'জনেই মারা গিয়েছিল। থাকত দূর সম্পর্কের এক পিসীর কাছে। সেখানে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত ছিল না।

এই পশুপতি অন্য সব বিষয়ে জুত করতে পারত না, কিন্তু ইতিহাসে একেবারে নামকরা ছাত্র। ইতিহাসের শিক্ষক নিবারণবাবু পর্যন্ত তার উত্তর লেখার তারিফ না করে পারতেন না। আমরা যখন এক পানিপথের যুদ্ধেই আধমরা হবার উপক্রম হয়েছি

তখন পশুপতি সমস্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যেত।

কিন্তু অঙ্কে পশুপতি সামন্তের অবস্থা কহিল। সোজা সোজা অঙ্কগুলো কষতেও সে হিমসিম খেয়ে যেত। একটা বানর চর্বিমখানো বাঁশে ঘণ্টায় দু'ফিট উঠছে আর নামছে এক ফিট, বাইশ ফিট বাঁশের আগায় উঠতে তার কত দেরি হবে, এমন একটা নিরীহ প্রশ্নে পশুপতি মুখটা এমন করে বসে থাকত, মনে হ'ত তার অবস্থা ওই বানরটার চেয়েও মারাত্মক।

গরমের ছুটিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পশুপতি অঙ্কের পর অঙ্ক কষে গেছে, গোটা ছয়েক খাতা শেষ, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা করতে পারত না। বেচারী নিজেই বলত, আমার দ্বারা হবে না ভাই। অঙ্কটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকবে না।

আমাদের আমলে প্রাইভেট টিউটর রাখার এত রেওয়াজ ছিল না, তবু আমরা পশুপতিকে বলেছিলাম, একটা ভাল দেখে অঙ্কের মাষ্টার বাড়ীতে রেখে দে বরং।

পশুপতি কোন উত্তর দেয়নি। চলছল চোখে আমাদের দিকে চেয়েছিল।

তার মনের ব্যথাটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। পিসী কোনরকমে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর সাধারণ জামাকাপড়ের বদলে তাকে দিয়ে রাজ্যের কাজ করিয়ে নেয়। ছুটির দিন আমরা দেখেছি পশুপতি বসে বসে বেড়া বাঁধছে। এর ওপর প্রাইভেট টিউটরের বাড়তি খরচের কথা বললে পিসী তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দেবে।

মনে মনে আমি কিন্তু পশুপতিকে হিংসা করতাম। কারণ যে ইতিহাসের লবণাক্ত সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাই, কূল পাই না, সেই ইতিহাসেই পশুপতি অবলীলাক্রমে প্রথম হয়। রেকর্ড নম্বর পায়। ইতিহাসের যে তারিখগুলো আমার কাছে শূলের খোঁচার সামিল, সেই সব সন-তারিখগুলো পশুপতি এমনভাবে আউড়ে যায় যেন অতি সাধারণ ব্যাপার।

আর একটা কারণও ছিল। আমি আশা করছিলাম পশুপতি আমায় অনুরোধ করবে। আমি অঙ্কে ভাল, মাঝে মাঝে তাকে যাতে অঙ্কের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু পশুপতি এ বিষয়ে কোনদিন একটি কথাও বলেনি, অনুরোধ তো দূরের কথা।

আমরা ক্লাসে সবসুদ্ধ আটচল্লিশ জন ছেলে, তার মধ্যে টেস্টে পাশ করলাম চল্লিশ জন। পশুপতিও একজন। অঙ্কে সে পাশ করেনি, কিন্তু হেডমাষ্টারের হাতে পায়ে ধরে ফাইন্যালে বসার অনুমতি পেল। প্রতিশ্রুতি দিল, মাঝখানের সময়টা সব ছেড়ে শুধু অঙ্ক কষবে।

আমার অবস্থা ঠিক বিপরীত। ইতিহাসে ফেল করলাম না বটে, তবে কোনরকমে

কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলাম। একেবারে টলমলে অবস্থা। আমিও ঠিক করলাম, ছুটির বেশী সময়টুকু ইতিহাসেই নিয়োজিত করব।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হ'ত শহরে। বিবিগঞ্জে। আমাদের গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে। বাবার এক আলাপী উকিল ছিল সেই শহরে, আমি পরীক্ষার আগের দিন সেখানে গিয়ে উঠলাম। ক্লাসের অন্য ছেলেরা কে কোথায় উঠেছিল খোঁজ রাখিনি। তখন খোঁজ রাখার মতন মনের অবস্থাও নয়।

পরীক্ষার হলে সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল।

ইংরাজী, বাংলা দুটো পরীক্ষা নির্বিবাদে শেষ হ'ল। পশুপতির সীট পড়েছে ঠিক আমার সীটের পিছনে।

তৃতীয় দিনে অঙ্ক।

হলে ঢোকবার মুখেই পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একেবারে সামনাসামনি।

কপালে আধুলি সাইজের সিঁদুরের টিপ। পকেট বোঝাই ফুল আর বেলপাতা। এত রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও পশুপতি মুখে নির্ভীক ভাব ফোটাতে পারেনি। দুটি চোখে আসন্ন বিপদের ছায়া।

পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল।

চারটি অঙ্ক শেষ করে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি শুরু করেছি, হঠাৎ চেয়ারটা নড়ে উঠল।

পিছনে পশুপতি। ভাবলাম পা সরাতে গিয়ে চেয়ারে হয়তো লেগে গিয়েছে। আবার পরীক্ষার খাতায় মনোনিবেশ করলাম।

আবার নড়ে উঠল চেয়ার।

আড়চোখে পিছনে দেখতেই কানে ফিসফিস করে শব্দ এল।

অঙ্কগুলো দেখা না। আমি একটাও পারছি না।

গোটা তিনেক গার্ড অবশ্য এধারে-ওধারে ছিলেন। তাঁরা খুব কড়া এমন মনে হ'ল না। দু'জন তো হাতে খোলা বই নিয়ে পায়চারি করছেন। ছাত্রদের দিকে নয়, তাঁদের নজর বইয়ের পাতায়।

আর একজন একেবারে কোণের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি যদি এক পাশে একটু সরে বসি, আমার খাতা দেখে অঙ্কগুলো টুকে নিতে পশুপতির কোন অসুবিধা হবে না। সব টোকবার দরকার নেই। গোটা চার পাঁচ অঙ্ক টুকে নিলেই যথেষ্ট। .পাশ নম্বর হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি নিজের শরীরটা দিয়ে খাতাটা আরো ঢেকে বসলাম। যাতে কোন দিকে কোন ফাঁক না থাকে। পশুপতি আমার কষা একটা অঙ্কও দেখতে না পায়।

মনকে বোঝালাম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এভাবে পশুপতিকে সাহায্য করা অন্যায়। ধরা পড়লে দু'জনেরই সর্বনাশ।

অবশ্য এ সব নীতিকথার অন্তরালে আমার মনের হিংসাটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। পশুপতি আমার পিছনে, কাজেই ইতিহাসের দিন তার কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাব এমন ভরসা কম। তাছাড়া নিতান্ত বেখাপ্পা প্রশ্ন যদি না আসে, তা'হলে ইতিহাসে হয়তো কোনরকমে আমি পাশ করে যেতে পারি। কিন্তু পশুপতির খেদোক্তি শুনে মনে হচ্ছে, একটা অঙ্কও সে এ পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি।

আরো কয়েকবার চেয়ারটা নড়ে উঠল। পশুপতির করুণ অনুনয়ের সুর কানে এল। আমি অনড়, অটল।

দেখলাম সময় শেষ হবার আধ ঘণ্টা আগে পশুপতি অঙ্কের খাতা জমা দিয়ে টলতে টলতে বাইরে চলে এল।

পরের দিন ইতিহাস। আমার অগ্নিপরীক্ষার দিন। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ইতিহাসের বইগুলো নিয়ে বসলাম। দরকার হ'লে অনেক রাত অবধি পড়ব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

কিন্তু যতই পড়তে লাগলাম, মনে হ'ল বিশেষ সুবিধা করতে পারছি না। মোগল সম্রাটদের ছুঁচালো দাড়িগুলো যেন সর্বাঙ্গে ফুটতে লাগল। আগে বাবর না আকবর কিছুতেই মনে করে উঠতে পারলাম না। দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল হর্ষবর্ধনের বাপের নাম গোবর্ধন। ফরাসীদের পীঠস্থান ফরাসডাঙ্গা পটলডাঙ্গার কাছে কিনা সেটা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

আসল কথা, একে ইতিহাসের জ্ঞান খুব গভীর নয়, তার ওপর আসন্ন বিপদের উত্তেজনা সব মিলে যেটুকু এত কষ্ট করে এতদিন ধরে কণ্ঠস্থ করেছিলাম সব বেমালুম ওলট-পালোট করে দিল।

সর্বনাশ, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

হঠাৎ খুট করে শব্দ। দরজার দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম।

চৌকাঠের ওপর পশুপতি। সেই রকম কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। পকেট ভর্তি ফুল বেলপাতা।

একি রে তুই?

চলে এলাম। একটা গোপনীয় খবর আছে।

গোপনীয় খবর?

প্রশ্ন করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল রাত ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উকিলবাবুদের গেট বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে লোক ঢোকার কোন উপায় নেই।

তুই ঢুকলি কি করে?

'চলে এলাম। একটা গোপানীয় খবর আছে।'

গেটের কাছে চাকর দাঁড়িয়েছিল একটা, তাকে তোর কথা বলতে গেট খুলে দিল।

কথা বলতে বলতে পশুপতি এগিয়ে এসে আমার তক্তপোশের ওপর বসল।

আমার তো এ শহরে চেনাজানা কেউ নেই। আমি এখানে এক চায়ের দোকানের পিছনে চারপাই পেতে আশ্রয় নিয়েছি। একটু আগে সেখানে দু'জন শিক্ষক এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাসের প্রশ্নপত্র করেছেন। চায়ের দোকানে বসে তাঁরা সেই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, আমি পার্টিশনের আড়াল থেকে বসে বসে শুনেছি।

বলিস কি ? আমি উত্তেজনায়, আনন্দে টান হয়ে বসলাম।

আমি প্রশ্নগুলো বলছি তুই লিখে নে। তোর কথাই আগে মনে পড়ল, তাছাড়া তোকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছি, তোর আস্তানা চিনি, তাই ছুটে আগে তোর কাছেই চলে এলাম।

পশুপতির এত কথা আমার কানে গেল না। আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে একেবারে তৈরী। হাতে সময় কম। প্রশ্নগুলো জানতে পারলে সারারাত ধরে একবার চেষ্টা করব।

লেখ, অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী, আকবর ও আওরঙ্গজেবের তুলনামূলক সমালোচনা, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, শিবাজীর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী, লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এই কটাই আমি শুনতে পেয়েছি। পশুপতি বলল।

যথেষ্ট, যথেষ্ট, উৎসাহে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, এই কটা ঠিকমত লিখতে পারলেই হয়ে যাবে। পাশ করার ভাবনা গেল। হয়তো ভাল নম্বরও পেয়ে যেতে পারি।

এতক্ষণ পরে পশুপতির জন্য আমার মায়া হ'ল। বেচারিকে কয়েকটা অঙ্ক দেখালেই হ'ত। ইতিহাসের প্রশ্ন জানতে পেরে ছুটে আগে তো আমার কাছেই এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম অঙ্ক কেমন হ'ল ?

স্পষ্ট দেখতে পেলাম পশুপতির মুখে বিষন্ন একটা ছায়া নামল। একটু যেন বিমর্ষভাব।

অন্যদিকে চেয়ে বলল, ওই একরকম। যা হয়ে গেছে তার কথা আর ভাবছি না। পিছন দিকে দেখলে নিজের বড় ক্ষতি হয়। আমি চলি। তুই পড়।

পশুপতি বেরিয়ে গেল।

প্রায় সারা রাতই পড়লাম। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেল। কোনরকমে স্নান সেরে, দু'টি মুখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হলে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন পরীক্ষা শুরু হতে আর মিনিট দুয়েক।

বেশ খুশী হয়েই প্রশ্নপত্রটা টেনে নিলাম, তারপর অনেকক্ষণ আর চোখের সামনে কিছু দেখতে পেলাম না। পুঞ্জীভূত ধোঁয়া, কখনও গাঢ়, কখনও একটু তরল।

সারা প্রশ্নপত্রে অশোকের নামগন্ধ নেই। বাবর আর আকবরের তুলনার বদলে সাজাহানের সৌন্দর্য-প্রিয়তার প্রশ্ন রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নয়, মারাঠা রাজ্যের পতনের কারণ নির্ণয় করতে দেওয়া হয়েছে। শিবাজীর জীবনী কোথাও নেই, তার পরিবর্তে হায়দার আলীর উত্থানের কাহিনী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, রেগুলেটিং অ্যাক্ট।

মোট কথা পশুপতির বলা একটি প্রশ্নও আসেনি।

কিছুক্ষণ পর গোটা প্রশ্নপত্রটাই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, দু'চোখ জলে ভরে এসেছে।

এমনই করেই বুঝি পশুপতি আমার ওপর প্রতিশোধ নিল।

কিন্তু বিস্মিত হবার আমার আরো একটু বাকি ছিল।

ঘণ্টা বাজতে কোনরকমে খাতাটা জমা দিয়ে বাইরে চলে এলাম। একটু দাঁড়ালাম, যদি পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়।

পশুপতিকে দেখতে পেলাম না, রাজীব এসে সামনে দাঁড়াল। আমাদের হেডমাষ্টারের ছেলে।

ব্যাপারটা শুনেছ?

কি ব্যাপার?

পশুপতি কাল পরীক্ষার হ'ল থেকে বেরিয়ে রেলের তলায় মাথা দিয়েছে।

সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। জড়ানো কণ্ঠে বললাম কে বললে?

বাবাকে খবর পাঠানো হয়েছিল। বাবা পশুপতির পিসীকে নিয়ে আজ সকালে এসে পৌঁচেছেন। বাবার কাছেই শুনলাম, কোমর থেকে একেবারে দু'খণ্ড হয়ে গেছে।

ক'টার সময় হয়েছে এটা?

আকন্দপুর এক্সপ্রেস এখান দিয়ে ছটা তিরিশে যায়, সেই সময়েই।

কিন্তু ও যে—

কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। যে পশুপতি সাড়ে ছ'টায় শেষ হয়ে গিয়েছে সে রাত সাড়ে ন'টায় বহালতবিয়তে আমার ঘরে গিয়ে আমাকে ইতিহাসের একগাদা প্রশ্ন বলে এসেছে, এমন আজগুবি কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং আমাকেই পাগল সাব্যস্ত করবে।

মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে সরে এলাম।

শেষ মুহূর্তে হলে ঢুকেছিলাম, সারাক্ষণ উত্তেজিত অবস্থা, কাজেই পিছনের সীটে পশুপতি এসেছে কিনা সেটা আদৌ লক্ষ্য করিনি।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

মৃত্যুর পরেও কি পরলোকগত আত্মার বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি থাকে?

তা যদি নাই থাকবে, তবে পশুপতি ওভাবে প্রতিশোধ নিতে কেন আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াবে!

অপূর্ব আত্মত্যাগ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর দেশে ফিরে যাবার সময় হয়েছে।

বারো বছর যাবৎ হিউয়েন সাঙ ভারতে আছেন। অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু শিখেছেন। এবারে তিনি দেশে ফিরে যাবেন।

আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। হিউয়েন সাঙ প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর মন বড় বিষণ্ণ। একটানা বারো বছর কাটল ভারতে। এতকালের চেনাজানা আশ্চর্য দেশ। স্বভাবতই একটা মায়া জন্মেছে। কত সহপাঠী, কত কত বন্ধু। ছেড়ে যেতে হবে তাদের, আর দেখা হবে না জীবনে। এমন পবিত্র ভূমি! এমন বিশ্ববিদ্যালয়! সবকিছু ছেড়ে যেতে তাঁর মন সরছে না।

অবশেষে বিদায়ের দিন এল। নিজের ঘরের জানালার কাছটিতে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের চূড়ার দিকে একবার তাকালেন। কতকালের কত কথা, কত স্মৃতি ভেসে এল মনে। ভাবছেন, হায়, এই পবিত্র শিক্ষামন্দিরও ছেড়ে যেতে হবে চিরতরে? এমন স্থান আর কোথায় মিলবে? অজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল। তিনি জিনিসপত্র আর একবার গোছগাছ করে নিলেন। আর কী-ই বা জিনিস! নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র তেমন বেশি কিছু ত' ছিল না? তবে গোটা কতক বাক্স ভর্তি করেছেন প্রাচীন পুঁথিপত্র আর শাস্ত্রগ্রন্থাদি দিয়ে। সে এক অমূল্য সম্পদ। এতকাল ধরে এদেশে তিনি সংগ্রহ করেছেন এসব।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এসে ঘিরে বসল হিউয়েন সাঙকে। বন্ধুদের চোখ ছলছল করছে।

এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এসে উপস্থিত। অতি সৌম্য শান্তমূর্তি। তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র এই হিউয়েন সাঙ। সেই ছাত্র আজ বিদায় নিচ্ছেন চিরতরে। তাই তাঁর মনও ভারাক্রান্ত।

অবশেষে বিদায় নেবার সময় হ'ল। হিউয়েন সাঙ বিষণ্ণ হৃদয়ে আচার্যের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বললেন: আমাকে আশীর্বাদ করুন।

—বৎস, তোমাকে আমি বরাবর আশীর্বাদ করে এসেছি। আজ নতুন করে আর কী আশীর্বাদ করব?—বৃদ্ধ আচার্য হাত রাখলেন ওর মাথায়।

—আমি একজন পর্যটক তীর্থযাত্রী। আপনার উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা ত' দেওয়া হ'ল না? আর, কীই বা দেব বুঝতে পারছি না।

আচার্য মৃদু হেসে বললেন, ধনসম্পদ দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে না তোমাকে। এতকাল এদেশে থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছ, এদেশের মহান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শের দ্বারা যে প্রেরণা লাভ করেছ, তা ভুলে যেও না, তুমি তা প্রচার ক'রো। তা হলেই গুরু-দক্ষিণা পাওয়া হবে আমার।

হিউয়েন সাঙ মাথা নত করলেন চোখে জল এসে পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র বিদায় দিতে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বিদেশী অতিথিকে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্ঞানগুপ্ত ও ত্যাগরাজ জড়িয়ে ধরলেন হিউয়েন সাঙকে। বিদায় ক্ষণে প্রাণ কেঁদে উঠল ওদের। আচার্যকে বললেন, যদি অনুমতি করেন ত' আমরা দু'জন ওকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আচার্য জানতেন, হিউয়েন সাঙ এখানে আসা অবধি ওরা তিনজন নিকট বন্ধু, এক্ষণে ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে কষ্ট হওয়ারই কথা। এই ভেবে তিনি বললেন: বেশ ত', ভাল কথা। তোমরা নদী-পথে কিছুদূর গিয়ে আর একটা নৌকো করে ফিরে এস।

সাঙ্গ হ'ল বিদায় নেবার পালা। ওরা তিনজন নদী-তীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

নদী-তীরে পৌছে হিউয়েন সাঙ আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল। যে পবিত্র দেশে তিনি এতকাল বসবাস করলেন, বিদ্যালাভ করলেন, আজ তার সঙ্গে চিরতরে বিচ্ছেদ।

জ্ঞানগুপ্ত আর ত্যাগরাজ ধরাধরি করে পুঁথিপত্র ভরতি বাক্সগুলো নৌকায় তুললেন। তারপর উঠে বসলেন ওরা তিনজন।

মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দিল। মাঝখানে হিউয়েন সাঙ, আর দু'পাশে দু'বন্ধু। তিন বন্ধু গল্পগুজবে মেতে গেলেন। কোন দিকে খেয়াল নেই। এদিকে কখন ভীষণ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, চারদিক অন্ধকার করে ফেলেছে। ঝড় এল ব'লে। নৌকা নদীর মাঝখানে, বিশাল নদী।

আচমকা বাতাস উঠল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড ঝড়। মাঝিরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে নৌকা তীরে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সামাল দিতে পারছে না। এদিকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকার ভিতরে জল উঠতে লাগল, টলমল করতে লাগল নৌকা।

সহসা মাঝিদের একজন বলে উঠল: নৌকার ভার কমাতে হবে নয়ত রক্ষা নেই! প্রাণে বাঁচতে চান ত' শীগগির বাক্সগুলো জলে ফেলে দিন।

হিউয়েন সাঙ নিতান্ত অসহায় বোধ করলেন। শেষকালে জলাঞ্জলি দিতে হবে এই অমূল্য সম্পদ?

বন্ধুদের মুখেও কথা সরে না। ওরা কেবল ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন বাক্সগুলোর দিকে। আর ভাবছেন, এই অমূল্য সম্পদ ত' তাঁদের নিজেদের দেশের দান বিদেশকে। তা বিসর্জন দিতে হবে নদীর জলে?

নীরবে চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন ওরা দু'জন। তারপর এক বন্ধু হিউয়েন সাঙকে বললেন, বন্ধু, মাঝি ঠিক কথাই বলেছে, নৌকার ভার কমাতে হবে, নয়ত রক্ষা পাওয়া যাবে না। তা বলে তুমি যে অমূল্য সম্পদ নিয়ে যাচ্ছ তা নদীতে ফেলতে হবে না। আর একটা উপায় আছে যাতে করে এসব রক্ষা পাবে।

এই বলে দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকালেন। এবং হিউয়েন সাঙ ব্যাপারটা আন্দাজ করার আগেই ওরা ঝাঁপ দিলেন জলে, আর উঠলেন না।

রক্ষা পেল অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ।

গাঁট্টা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাল নাকি রে শিবুর কাছে
　　বলেচিস্ তুই নন্দা—
যে, মুখ্যু আমি নিরেট বোকা…
　　আহাম্মক আর অন্ধা!

সামনে আমার বল্ তো, দেখি—
　　সাহস যদি থাকে!
পিছনে তো সবাই বলে—
　　ডাইনী রাজার মাকে!…

…তাই নাকি রে! হাবুল-চন্দর—
　　দেখচি যে রোখ্ ভারী…
বলেচি যা—সামনে তা তোর
　　স্পষ্ট বলতে পারি!…

শুধুই মুখ্যু নিরেট বোকা,
　　তুই একটা ছুঁচো,
মিথ্যে-জেঁকো, আস্ত বাঁদর—
　　তুই তো কাঠের কুঁচো!

তুই রে, ভীতু বেহায়া তুই—
　　পাজীর ধাড়ি মস্ত…
হাত যে গুটোস্?…মারবি নাকি—
　　আয় বাগিয়ে হস্ত!

…ও কি, কোথায় চলিস?… আমায়
　　মারনা দুটো গাঁট্টা!…
"না ভাই, বাড়ী যাচ্ছি…হেঁ হেঁ…
　　করতে ছিলুম ঠাট্টা!"

বারবাডোসের ডাকটিকিট

সন্ধানী

ক্যারেবিয়ান সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছোট্ট একটি বৃটীশ দ্বীপ বারবাডোস। এই দ্বীপটির নামকরণের মধ্যে ভারী একটি মজা আছে। প্রথম এখানে যারা আসে, অর্থাৎ যারা প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে, তারা পর্তুগীজ। তারা এই দ্বীপে অসংখ্য ডুমুরের গাছ লক্ষ্য করে এটির নামকরণ করে 'ফিকাস বারবাডেনসিস'। এরপর ১৬২৭ সালে ইংরেজ উপনিবেশকারীরা এখানে প্রথম এসে বসবাস করতে থাকে।

আখের চাষ এখানকার একটি প্রধান উৎপাদন এবং সেজন্য চিনির ব্যবসা বারবাডিয়ানদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আখ চাষের কাজে নিযুক্ত থাকে, এবং আখ থেকে চিনি, গুড় বা 'রাম' জাতীয় একশ্রেণীর যে মদ হয়, তা থেকে জীবিকা অর্জন করে।

এ ছাড়া বারবাডোসের জীবনে সমুদ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বহু বিদেশী ভ্রমণকারী নানা জায়গা থেকে যেমন এখানে সমুদ্রের বিস্তৃত বেলাভূমি ও সূর্যালোকের আকর্ষণে আসেন, তেমনি এখানকার অধিবাসীরাও বারবাডোসের চতুর্দিকে সমুদ্র থেকে নানা ধরণের প্রচুর মাছ পায় খাদ্য হিসাবে।

সম্প্রতি এখানে ডাকটিকিটের নতুন একটি সিরিজ প্রকাশিত হয়েছে। এই টিকিটগুলি থেকে দ্বীপের অধিবাসীরা সমুদ্রের উপর যে কতটা নির্ভরশীল তা স্পষ্টত বোঝা যায়। এই সিরিজে আছে বিভিন্ন মূল্যের ১৪ রকম ডাকটিকিট এবং প্রত্যেকটি টিকিটে আছে নানা রঙের সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণীর ছবি।

এখানে যে গলদা চিংড়ি, স্ট্যাগহর্ন প্রবাল, সী লায়ন, সামুদ্রিক চাঁদা প্রভৃতির ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ছাড়া আরও বহু প্রকারের বাটার ফ্লাই, এঞ্জেল প্রভৃতি মাছের ছবি আছে এই সিরিজে রাণীর ছোট্ট ছবিটির সঙ্গে। যাদের জীবজন্তুর ডাকটিকিটের উপর বেশী ঝোঁক, এই টিকিটগুলি তাদের কাছে নিশ্চয়ই আকর্ষণের হবে।
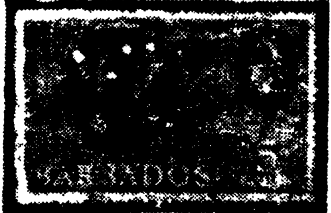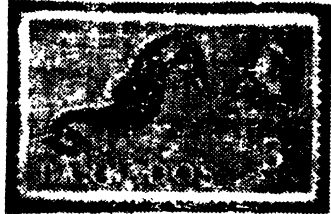
দৈত্যপুরী

শ্রীবিমল দত্ত

স্বপনকুমার রাজার এক ছেলে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা ও রাণীর নয়নের মণি। রাজপুরী তার রূপে ঝলমল্। দাসদাসী তার খুশীতে টলমল্। দাঁড়ের পাখী ডাকে, "স্বপনকুমার"।

হাতীশালে হাতী স্বপনকুমারকে দেখলে শুঁড় দোলায়।

ঘোড়াশালে ঘোড়া স্বপনকুমারকে দেখলে ঘাড়ের কেশর ফোলায় আর লেজ দোলায়।

বাগানের মালী তাকে ফুলের মালা আর তোড়া এনে দেয়।

রাজপথে বেরুলে দু'দিকের বাড়ী থেকে মেয়েরা বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ--খই ছড়ায় আর ছাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে তার রূপ—যেন দেবশিশু।

এ হেন স্বপনকুমারকে একদিন রাজপুরীতে পাওয়া গেল না। রাজা শোকে শয্যা নিলেন—রাণীর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে বুক ভাসতে লাগল।

রাজার সৈন্যরা দেশময় খুঁজতে লাগল। রাজ্যময় শোকের ছায়া নামল

দাঁড়ের হীরামন পাখীর ডাক আর শোনা যায় না।

রাজবাড়ী নিঝুম নিস্পন্দ। রাজ্যের কারো মুখে হাসি নেই।

কিন্তু কোথায় স্বপনকুমার? যতদূর খবর পাওয়া গেছে—সন্ধ্যের সময়ে বাগানে বেড়াতে গিয়েছিল স্বপনকুমার; তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি।

এমনি করে সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর গেল।

সাত-সাতটি বছর চলে গেল।

রাজপুরী থেকে এক মাইল দূরে শহরের প্রান্তে ছিল বৃন্দাবন কামারে কামারশালা। সে সারাদিন ধরে লাঙলের ফাল তৈরী করে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। রাত্রে স্বপ্ন দেখল সে। একটা লাল ঘোড়ায় চড়ে এক রাজপুত্তুর তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার ঘোড়ার কেশরগুলো সোনালী, হাওয়ায় উড়ছে আর ঘোড়াটা তার লাগাম চিবুচ্ছে আর লেজ দোলাচ্ছে। স্বপনকুমারের মাথায় সোনার টুপি—গায়ে জরীর পোশাক।

বৃন্দাবন অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হ'ল—এ ত' স্বপনকুমার তাদের রাজপুত্তুর। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল—হ্যাঁ ত'—

স্বপনকুমারই ত' বটে! তেমনি সোনালী চুল, নীল চোখ, হাতের আঙুলগুলো চাঁপার কলির মতো!

তখন সেই রাজপুত্তুর বললে, "বৃন্দাবন, আমাকে মুক্ত করতে হবে। সাত বছর আগে আমাকে মন্দোমুন্দাদিত্য নামে এক দৈত্য চুরি করে তার রাজপ্রাসাদে চাকর করে রেখেছে। এই শহরের প্রান্তে যে পাহাড়, তার মধ্যে দৈত্যের প্রাসাদ। আমার চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। যদি আজ রাত্রেই আমাকে খালাস করতে পারো ত' তোমাকে প্রচুর ধনরত্ন দেবো।"

বৃন্দাবন স্বপ্ন দেখছে, কি সত্যিই এই সব ঘট্‌ছে তা সে ঠিক করতে পারলে না। তবু লোকটা ছিল চালাক। তাই বললে, "এটা স্বপ্ন না সত্যি তা কি করে বুঝবো?"

রাজপুত্তুর বললে, "বেশ ত' এর প্রমাণ দিয়ে যাবো। তবে প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে উদ্ধার করবে!"

বৃন্দাবন বললে, "নিশ্চয়ই। আমাদের স্বপনকুমারের জন্যে আমি জান কবুল করছি।"

তখন স্বপনকুমার দিল তার লাল ঘোড়া ছুটিয়ে। সেই ঘোড়া তার সামনের পা দিয়ে বৃন্দাবনের কপালে খুব জোরে এক চাট্ মেরে চলে গেল। বৃন্দাবনের কপালে একটা ঘোড়ার খুরের লাল ছাপ রয়ে গেল। তা' হলে এটা স্বপ্ন নয়! বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো বৃন্দাবন। তারপর কাপড়চোপড় পরে সেজেগুজে ছুট্‌লো তার মিতে সনাতনের বাড়ী। সনাতন ছিল ভারী আমুদে আর গল্পে। তার ছিল একটা নৌকো। তার নৌকোয় চড়ে তারা নদী-পথে চল্‌লো পাহাড়ের দিকে। বৃন্দাবন সঙ্গে নিল লাঙলের একটা ফলা।

এই পাহাড়ে তারা অনেকবার গেছে। নৌকো থেকে নেমে তারা পাহাড়ে চড়তে লাগ্‌লো। পাহাড়টা ঠিক সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে আকাশে। দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল।

মাঝরাতে তারা পাহাড়ের মধ্যে এক বিরাট খাদের শেষে এসে দাঁড়াল। দৈত্য মন্দোমুন্দাদিত্যের প্রাসাদের ফটক এইখানে। মাঝরাতেই এই ফটক দেখা যায়। অন্য সময়ে এখানে এলে কেউ কিছুই দেখে না—দেখে শুধু পাহাড়ের পাথর দাঁত বার করে রয়েছে।

তারা এইখানে অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ তারা দেখলে যে পাহাড়ের একটা ফাটল ক্রমশঃ বাড়ছে—দেখতে দেখতে সেটা প্রকাণ্ড পাথরের দরজার মত খুলে

বিরাট এক সিংহাসনে বসে রয়েছে মঙ্গোমুঙ্গাদিত্য

গেল। সনাতনকে বাইরে রেখে লাঙলের ফালটা হাতে শক্ত করে ধরে বৃন্দাবন ঢুকে পড়লো দৈত্যের রাজ্যে।

চওড়া একটা পথ ধরে সে চলতে লাগলো। দু'ধারে পাহাড় কেটে সব বিকটাকার মূর্তি করা হয়েছে, কি বিরাট সব হাঁ, কী ছুঁচলো দাঁত—কারো মাথায় শিং, কারো চোখ জ্বলছে, মনে হয় সত্যিকারের দৈত্য। কিন্তু ভড়কাবার পাত্র নয় বৃন্দাবন। কামারের ছেলে সে। কত শক্ত লোহা সে পিটিয়ে নরম করেছে। সে সটান চললো এগিয়ে। চলতে চলতে সে একেবারে মঙ্গোমুঙ্গাদিত্যের রাজসভায় এসে হাজির হ'ল। বিরাট এক সিংহাসনে বসে রয়েছে বিকটাকার দৈত্যটা। তার ইয়া লম্বা দাড়িটা বটের ঝুরির মত পাহাড়ে শিকড় চালিয়েছে।

বৃন্দাবন কামারকে দেখে সে এক ঝটকায় তার দাড়িটা টেনে নিল। পাহাড়ের পাথরগুলো আলগা হয়ে চারদিকে বৃষ্টির মত ছড় ছড় করে ছিটিয়ে গেল। দুই চোখ থেকে সার্চলাইটের মত আগুন ছড়িয়ে আর মুখ দিয়ে ভক্‌ভক্ করে আগুন বার করে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কে তুই? কোন্ সাহসে এখানে এসেছিস্?"

বৃন্দাবন একদম ভয় করলে না। সে বললে, "আমি স্বপনকুমারকে নিয়ে যেতে এসেছি—সে এখানে সাত বছর চাকরি করছে।"

দৈত্যের মুখটা প্যাঁশে হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, কোন্ সাহসে এই মানুষের বাচ্চাটা এখানে ঢুকেছে। তা ছাড়া তার একশো চাকরের একটি কমে যাবে ভেবে তার মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। ভাবতে লাগল আবার, এই একটি চাকর যোগাড় করতে

তাকে কত বেগ পেতে হবে।

তখন দৈত্যের মাথায় এল এক মতলব। সে হিহি হোহো করে এমন হাসতে লাগল যে, পাহাড়টা যেন ভূমিকম্পের বেগে কাঁপতে লাগল। সে ভাবলে বৃন্দাবনটাকে এমন একটা কঠিন কাজ দেবে যে, সে সে-কাজ করতে পারবে না আর তার জন্যে তার প্রাণদণ্ড হবে।

দৈত্য ঠাট্টা করে বললে, "পুচকে বন্ধু, স্বপনকুমারকে নিয়ে যেতে পারো—এতে আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু এই একশো চাকরের মধ্যে তোমাকে বার করতে হবে স্বপনকুমারকে খুঁজে। কিন্তু প্রথম বারেই যদি তাকে বেছে বার করতে না পারো ত' তোমার প্রাণ যাবে।"

বৃন্দাবন এতেও ভড়কালো না। স্বপনকুমারকে সে হাজার লোকের মধ্যেও বার করতে পারবে। কিন্তু যখন তাকে একশ' চাকরের সামনে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন ত' তার চক্ষুস্থির!

একশ' স্বপনকুমার সামনে দাঁড়িয়ে—সোনালী চুল, নীলচে চোখ, লাল ঘোড়া, সবুজ পোশাকের উপর জরীর কাজ, মাথায় সোনার টুপি। বৃন্দাবনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল—সর্বনাশ! এর মধ্যে কি করে সে স্বপনকুমারকে খুঁজে বার করবে? বৃন্দাবন বোকার মত চারিদিকে তাকাতে লাগল। ঘরের দেয়াল কেটে পাথরের সব বিশ্রী উৎকট মূর্তি খোদাই করা—কেউ চোখ রাঙাচ্ছে, কেউ ভেংচি কাটছে, কেউ দাঁত খিচোচ্ছে, কেউ হাঁ করে গিলতে আসছে।

একশ' চাকর ঘোড়ার পিঠে বসে। সব্বাই হুবহু এক রকম,—এক বয়স, এক রকম ঢ্যাঙা, এক রকম মুখ যেন এক ছাঁচে ঢালাই করা।

বৃন্দাবন সময় নিতে লাগল। প্রাণ ত' তার যাবেই, তবুও একবার চেষ্টা করে দেখবে সে হাড়হদ্দ।

সে বললে, "দৈত্যরাজ, আপনি এদের ত' খাশা রেখেছেন—এরা সবাই সমান মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট—আপনার মত দয়ালু মনিব এরা আর কোথাও পাবে না। এখন দেখছি লোকে অযথা আপনার নিন্দে করে।"

দৈত্যরাজ খুশী হ'ল। বললে, "কামারের পো, তুমি ত' বেশ বুদ্ধিমান্, তা ছাড়া তোমার বিবেচনাশক্তি আছে দেখছি।" এই বলে সে তার লোহার থামের মত হাত বাড়িয়ে দিলে বৃন্দাবনের হাত ঝাঁকানি দেবার জন্যে। বৃন্দাবন লক্ষ্য করলে যে তার আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মত।

সেও বুদ্ধি ধরে খুব। কাপড়ের ভেতর থেকে বার করে দিলে লাঙলের ফলাটা। সেইটাই যেন তার হাত। দৈত্য সেটা মুচড়ে একেবারে ভেঙে ফেললো আর বললে, "বাঃ! তোমার হাতটা ত' বেশ কড়া দেখছি।"

বৃন্দাবন বললে, "তা হবে না? লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে আমার হাত শক্ত হয়েছে।"

তার কথায় সব চাকর হেসে উঠলো। আর সেই ফাঁকে বৃন্দাবন শুনলে একজন যেন তাকে ডাকছে, "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন।" বৃন্দাবন ঠিক বুঝতে পারলে, এইটি স্বপনকুমার।

সে এগিয়ে গিয়ে তার ঘোড়ার রাশ টেনে বলে উঠ্‌ল, "এই আমাদের স্বপনকুমার।"

সব চাকর একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো, 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, বিদায় স্বপনকুমার –বিদায়!"

সঙ্গে সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকতে লাগ্‌ল। পাহাড় ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল—চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল—তারপর কী সব বিশ্রী বিকট চীৎকার—শত শত দৈত্য যেন আস্ফালন করছে। ··

ভোরের আলো ফুটতে বৃন্দাবনের ঘুম ভাঙল। সে পাহাড়ের খাদের মধ্যে পড়ে রয়েছে। পাহাড়ের সে ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। আর তার কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে স্বপনকুমার। তার সে ঘোড়া, সে পোশাক নেই—সে রাজবাড়ীতে যে পোশাকে থাকত এ সেই পোশাক।

বৃন্দাবন ঘুমন্ত স্বপনকুমারকে ঠেলে ঠেলে জাগালো। তারপর তাকে নিয়ে সনাতনের নৌকো করে তারা ফিরে এল শহরে।

তখন রাজ্যময় মহা ধুম।
ছেলে-বুড়োর নাইক ঘুম॥
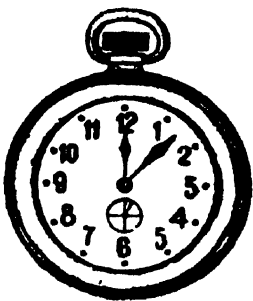
দুই কাঁটার খেলা

ছবিতে একটি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ। ঘড়ি দেখতে তো তোমরা সবাই জানো। আচ্ছা, বলতে পার, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা কাঁটা আর একটাকে ডিঙিয়ে যাবে কতবার?

(উত্তর আগামীবার পাবে)

কর্পূরের ইতিকথা

শ্রীঅমরনাথ রায়

কর্পূর তোমরা অনেকেই ব্যবহার করেছ। সেই যে সাদা রঙের দানাদার পদার্থ—জলে ফেললেই তাড়াতাড়ি গুলে যায়। আবার বাতাসে বেশীক্ষণ ফেলে রাখলে ধীরে ধীরে উবে যায়। হ্যাঁ, ওরই নাম কর্পূর।

কর্পূর তার্পিন জাতীয় একটি রাসায়নিক পদার্থ। পাওয়া যায় এক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে। সে উদ্ভিদ দ্বিবীজপত্রী—নাম 'সিন্নামোমম কামাফারা'। এ উদ্ভিদ ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পরিধিও কম নয়—প্রায় ৩ মিটার। চীন, জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে এ উদ্ভিদের চাষ হয়। আমাদের দেশেও হিমালয় ও নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ হয়।

সিন্নামোমম কামফোরা গাছের অংশের সব তৈল কোষেই কর্পূর উৎপন্ন হয়। কোষের মধ্যে কর্পূর থাকে তেলা পদার্থরূপে। এই কর্পূরপ্রধান তেলা পদার্থ তৈল কোষের প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে কোষের বাইরে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে গাছের দেহকলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়। গাছের দেহ থেকে সেই কর্পূর কি ভাবে নিষ্কাশন করা হয়, তা বলি।

প্রথমে ঐ গাছের ডাল টুকরো টুকরো ক'রে কাটা হয়। সেই টুকরোগুলির সঙ্গে ঐ গাছের কিছু পাতা ও ছাল মেশানো হয়। সেই মিশ্রণকে একটি মাটির পাত্রে রেখে তার মধ্যে গরম বাষ্প পাঠানো হয়। গরম বাষ্পের সংস্পর্শে এসে ঐ কর্পূরপ্রধান তেলাপদার্থ বাষ্পের আকারে বেরিয়ে আসে। তারপর ঐ মাটির পাত্রের উপর দিকের শীতল অংশে কঠিন রূপে জমা হয়। সাদা দানাদার ঐ কর্পূরকে তারপর মাটির পাত্রের গা থেকে চেঁচে বের করে নেওয়া হয়। সাধারণত: ৪০-৫০ বছরের পুরনো গাছ থেকেই কর্পূর নিষ্কাশন করা হয়। এক একটি গাছ থেকে প্রায় ৫ কিলোগ্রাম কর্পূর পাওয়া যায়। এ তো গেল প্রাকৃতিক কর্পূরের কথা। আজকাল তার্পিন তেলের রাসায়নিক উপাদান 'পাইনিন' থেকেও সংশ্লেষিত কর্পূর তৈরি হচ্ছে। সংশ্লেষিত কর্পূর হচ্ছে কৃত্রিম কর্পূর।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে কর্পূর ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুরাণে কর্পূরের উল্লেখ দেখা যায়। উল্লেখ দেখা যায় সুশ্রুতের গ্রন্থে। এখনও আমাদের দেশে পূজা ও আরতিতে কর্পূর ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের কিছু পরিমাণ বীজবারক গুণ আছে। কর্পূরকে বিশোধন করে তাই দিয়ে অনেক রকমের ওষুধ তৈরি হয়। পেটের অসুখ, বাত, চুলকানি প্রভৃতি রোগের ওষুধে কর্পূরের ব্যবহার দেখা যায়। আর ব্যবহার

দেখা যায় সুগন্ধি দ্রব্য, প্লাষ্টিক দ্রব্য ও বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনে।

তোমরা জান যে তাপ পেলে কঠিন পদার্থ প্রথমে তরলে পরিণত হয়। তারপর আরও তাপে সেই তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। পদার্থের অবস্থান্তরের এইটাই সাধারণ নিয়ম। কর্পূরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ কর্পূর ঊর্ধ্বপাতিত হয়। তার মানে—তাপ পেলে কঠিন কর্পূর বাষ্পাকারে উবে যায়। তরলে পরিণত হয় না। আবার ঐ বাষ্পকে ঠাণ্ডা কর। তরল কর্পূর কিন্তু এবারেও পাবে না। সেই কঠিন কর্পূরই আবার ফিরে পাবে।

চলেছে রেলগাড়ি

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

নামো। নামো। এখানে নামো।
নামে না কোনো লোক।

কিসের টানে চলেছে রেলগাড়ি ?
কেন এমন শব্দে কাঁপে
আগুনভরা শোক ?
ছেলেরা যায় নিজের নিজের বাড়ি।

গভীর রাতে হঠাৎ তারা
উধাও শূন্য পানে

রেলগাড়িটা চলে···চলে···চলে···
জানলা দিয়ে সকল ছেলে
শুধায় কানে কানে :
'ভিজবো নাকি মেঘের শাদা জলে ?'

কোথায় মেঘের জলের ধারা ?
অনেক দূরে এলে—
চাঁদ বুড়িটা বাড়িয়ে রয় হাত
'যাবো' 'যাবো' চেঁচিয়ে বলে
যখন সকল ছেলে—
রেলের গাড়ি চলবে সারা রাত।

এই পৃথিবীর পাখি ডাকে
যখন গাছে গাছে
লম্বা সাত হাত বাড়ান সূয্যি মামা।
রেলগাড়িটা থামে যদি
তখন ঘরের কাছে
কোনো ছেলের হয় তবু কই থামা !!

ভেজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আমরা তর্ক করছিলাম, কি যে বল মেজদা, হাসিতে আবার ভেজাল চলে নাকি? ও নাকি তেল ঘি দুধ দই আটা মশলা সাগু চিনি ওষুধ—

মেজদা আমাদের থামিয়ে দিলেন, থাক্, আর ফর্দ বাড়াতে হবে না—থই পাবিনে। এমন কোন্ দ্রব্য আছে পৃথিবীতে বলতে পারিস—যা মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক চালনার ধাক্কায় খাঁটি থাকতে পারছে? নির্ভেজাল বস্তু কোথাও পাবিনে—সংসারে নয়—সাহিত্যেও নয় অর্থাৎ বাস্তবে নয়, কল্পনাতেও নয়। সাহিত্যে তো ন'টি রসের কারবার—তারও মধ্যে কত ভেজাল চলছে ভাবতে পারিস?

আমরা বললাম, অত সব বড় বড় কথা বুঝব না—হাসির মধ্যে কেমন করে ভেজাল চলে দেখিয়ে দাও।

মেজদা হাসল, দেখিয়ে দাও অর্থাৎ মাষ্টারী কর। ওটি খুব সোজা নয় রে—তার চেয়ে একটা গল্প বলি শোন। শুনতে শুনতে যদি প্রাণখুলে হাসতে পারিস বুঝব হাস্যরসটা খাঁটি—তার সঙ্গে যদি চোখ ছলছলিয়ে ওঠে—তাহলে?

বললাম, হাসির গল্প হলে শুধুই হাসব—তাতে চোখের জল আসবে কেন?

মেজদা বলল, কেন সে জবাব পরে, কিন্তু জিনিসটা তাহলে ভেজাল হবে কিনা?

ভেজাল। আমরা এক বাক্যে সায় দিলাম।

তাহলে শোন। গুছিয়ে বসে মেজদা সুরু করল: আমাদের বাড়ীতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। তোরা তখন কেউ হামা টানছিস, কেউ আধ-আধ বুলি কপচাচ্ছিস কিংবা হাঁটি হাঁটি পা পা—কেউ বা জন্মাস নি। তখন ঠাকমা বুড়ি বেঁচে ছিল—আর তেতলায় ছিল রান্নাঘর—ঠাকুরঘর। বাড়ীটা ধোঁয়ায় ভরে যায় বলে বাবা ওই ব্যবস্থা করেছিলেন—আর ঠাকমা বুড়ী সিঁড়ির ছোট ঘরটিতে তাঁর গোপাল ঠাকুরকে এনেছিলেন নিরিবিলি হবে বলে। একজন উড়ে বামুন ছিল—সেই রান্নার কাজ করতো। আমরা কিন্তু দোতলার বারান্দায় খেতে বসতাম। ঠাকুর অন্নব্যঞ্জন নামিয়ে এনে পরিবেশন করত। রান্নার হাঙ্গামা খুব বেশি রকম করতে দিতেন না বাবা—ডাল ভাজা একটা তরকারি। মাছ অবশ্য কোন কোন দিন থাকতো। আর থাকতো দই। এটি নিত্য-নিয়মিত ভাবে পেতাম।

বাবা একবার কাগজে পড়েছিলেন—দই পেটের যাবতীয় দূষিত জিনিস, রোগ-জীবাণু

নষ্ট করে গ্যাস জন্মাতে দেয় না। দই খেলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

আমরা ঠাকমা গোপাল ঠাকুরের ভোগের জন্য পঞ্চগব্যের শ্রেষ্ঠ ওই গব্যটি নিত্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ওর থেকে মাঝে মাঝে ঘি পাওয়া যেত উপরি পাওনা—তার সঙ্গে ঘোল ফাউ হিসাবে।

খুব ভোরে উঠে ঠাকমা যেতেন গঙ্গাস্নানে। ফিরে এসে গোপালের পূজা আর বাল্যভোগ। অর্থাৎ দই আর দু'টি সন্দেশ। দুপুরে স্বপাকে আতপ চালের অন্ন আর সামান্য তরকারি তার সঙ্গে—ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন। সন্ধ্যায় দুধ-মিছরি বৈকালী ভোগ। এর সঙ্গে অবশ্য যে সময়ের যা ফলটলও থাকতো। যাই হোক, সকালের দই ভোগটা আমরা সবাই মিলে ভোগ করতাম। চমৎকার দই পাততো বুড়ী। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই অনুযোগ উঠছিল—দই ভাল পাতা হচ্ছে না। দইয়ে সর পড়ছে না।

দুধ অবশ্য গোয়ালাই দেয়—জানা গোয়ালা—তবে এমন হচ্ছে কেন? এখন ঠাকমার সঙ্গে ওর খিটিমিটি নিত্যই লেগে ছিল। একদিন তো খুবই তুলকালাম বাধিয়ে দিল বুড়ী।

গোয়ালা কঠিন কঠিন দিব্যি গেলে বলল, আমি যদি দুধে জল দিয়ে থাকি, আমার যেন—

ঠাকমা বলল, দুধ যদি খাঁটি—দইতে সর পড়ছে না কেন?

দই ঠিকমত পাতা হয় না। দম্বলের ভাগ ঠিক হয় না।

আমি যেন নতুন দই পাতছি। বলে আজন্মকাল এই কম্ম করছি। ঠাকুরের জিনিস, শুদ্ধাচারে পাতি—

তর্কে ফল নেই বুঝে গোয়ালা বদল হ'ল। পর পর তিনবার, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

সবাই তখন ভাবতে বসল—কি এ রহস্য? এত ব্যবস্থা করেও দইয়ে সর পড়ছে না কেন?

মেজদা বলল, নিজের প্রশংসা করব না—ও নাকি আত্মহত্যার সামিল—তবে বাড়ীর সবাই আমার বুদ্ধির উপর কিঞ্চিৎ আস্থা রাখতেন। ঠাকমা বলতেন, মেজ-ছেলে হবে না,—ওদের বুদ্ধি একটু জেয়াদাই হয়—প্যাঁচট্যাচগুলো মাথায় আসে। তা, তুই বাপু এর একটা হেস্তনেস্ত কর। ক'দিন আর গোপালকে সরতোলা ফ্যাক্‌ফেকে দই খাইয়ে রাখব। এতে যে পাপ হবে।

সত্যি বলতে কি সেই দইয়ের আস্বাদ আমাদের রুচিকেও রীতিমত পীড়ন করছিল, যদিচ পাপবোধটা আমাদের তেমন তীব্র ছিল না। তা'ছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়েও আমরা

বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা চাইছিলাম এর প্রতিকার হোক। এবং কি উপায়ে এটা বন্ধ করা যাবে তাও ভাবছিলাম।

তখন কলেজের থার্ড ইয়ার। দেশী-বিদেশী অনেকগুলো ডিটেক্‌টিভ বই পড়া হয়ে গেছে। গোয়েন্দাদের অপরাধ ধরার কৌশলগুলি মুখস্থ বললেই হয়। বিশেষ করে শার্লক হোমসের গল্পগুলি মনে হতো যুক্তি আর বুদ্ধির কসরতে তুলনাহীন! এ সবই মগজে জমা হচ্ছে দিন দিন—নিজের বুদ্ধির উপর আস্থা বাড়ছে। এখন এমন মনের ভাব যে—শার্লক হোমস না হই অন্তত পক্ষে পাঁচকড়ি দে'র অরিন্দম বা দেবেন্দ্রবিজয় হতে পারব। তোরা বোধকরি পাঁচকড়ি দে'র নাম শুনিস নি?

আমরা ঘাড় নাড়তে মেজদা তালু-জিহ্বা সংযোগে 'চুক' করে উঠলেন—বেচারা!

বললাম, আমাদের জন্যে দুঃখু করতে হবে না—এমন অনেক ভাল ভাল গোয়েন্দা-গল্প আমরা পড়তে পাই।

মেজদা হাসলো, ভাল গোয়েন্দা-গল্প! দূর দূর, দুম-ফটাস গুলি চললেই বুঝি ভাল গল্প হয়? ওতে মাথাই গরম হয় শুধু!

আমরা অধৈর্য হয়ে উঠলাম, বেশ—বেশ, না হয় তোমাদের কালের গোয়েন্দারা খুব বুদ্ধিমান ছিল—তর্ক করব না, এখন গল্প বল।

তর্ক তোরাই করছিস—তাই কথাটা বললাম। যাক—তারপর শোন। ঠাকমা আমাকে বলল, নবু, এর হেস্তনেস্ত তোকে করতেই হবে। গোয়ালা জল মিশোচ্ছে, কি আর কেউ কারসাজি করছে, কি অপদেবতার কাণ্ড—এ তোকে ধরতেই হবে। একটেরে ছাদের ওপরে ঠাকুর ঘর—আমি নিজে হাতে দই পেতে ঢাকা দিয়ে রাখি—নিজের আঁচলে সর্বক্ষণ চাবি বাঁধা থাকে—তবু এমন হচ্ছে কেন?

বললাম, আমি ভার নিচ্ছি। বেশ ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দেবে কিন্তু। আচ্ছা—তুমি তো বলছ সর্বক্ষণ তোমার আঁচলে চাবি থাকে—ও ঘরে কেউ ঢুকতে পায় না। তাহলে তো সন্দেহ করতে হয়, এমন জীবগুলিকে যাঁরা সর্বক্ষণ ওই ঘরেতে থাকেন। যেমন ইঁদুর, আরশুলা, টিকটিকি কিংবা তোমার গোপাল ঠাকুর—

ঠাকমা ঝেঁজে উঠলো: ঠাট্টা-মসকরা রাখ—কম্মের তো দুঃখীরাম! আমার ঠাকুর—

বললাম, বাঃ রে—বদনাম নেই ঠাকুরটির? গোকুলে ননী চুরি, মাখন চুরি, কোন্ কাণ্ডটাই বা বাকি রেখেছেন? আচ্ছা মানছি—এঁরা কেউ এসব করেন না, অথচ চাবি সর্বক্ষণ তোমার আঁচলে, আর কেউ ঢোকে না ঘরে—

ঠাকমা বলল, আমি কি বললাম—কেউ ঢোকে না ঘরে? তোর মা-কাকীরা নৈবিদ্যি করতে, কি প্রণাম করতে আসে না? ফলমূলের লোভে তোরা উঁকি-ঝুঁকি মারিস নে? বামুন ঠাকুর সকালবেলায় ফুলের মোড়কটা রেকে যায় না, না ভোগ হয়ে গেলে দইয়ের হাঁড়িটা নিয়ে আসে'না?

আমার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললাম, থাক থাক, আর বলতে হবে না—এতেই কাজ চলে যাবে।

ঠাকমা অবাক। বললেন, কি কাজ?

বললাম, কাল থেকে তোমার গোপাল ঠাকুরের একটা কাজের ভার আমাকে দেবে বল? তাহলে তিন দিনের মধ্যেই দইয়ে সর না পড়ার রহস্য আমি ধরে দেব।

ঠাকমা বললেন, কি বলছিস! দইয়ে সর না-পড়ার আবার রহস্য কি!

আছে—আছে। যখন ফাঁস করে দেব, হাসতে হাসতে তোমার পেটে খিল ধরে যাবে। এখন বল, কাজটা আমাকে করতে দেবে তো? আর কাউকে বলবে না এ কথা। আমি রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে তসরের কাপড় পরে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে তোমার গোপালের ঘরে চুপি চুপি এসে দই পেতে রেখে যাব। কেমন, রাজী?

চোখ কপালে তুলে ঠাকমা বললেন, তুই পাতবি দই? তবেই হয়েছে! দম্বল ঠিক না হলে দুধ ছ্যাকরা-ছ্যাকরা হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। এ তবু যাও বা ভোগে লাগছে—

বললাম, ভোগ, না কর্মভোগ! না হয় আরও দু'তিনটে দিন ঘোলই খাবেন ঠাকুর। মাত্তর দু'তিনটি দিন বইতো না। আর দম্বলের আন্দাজ না হয় তোমার কাছ থেকেই শিখে নেব।

অনেক কষ্টে বুড়ীকে রাজী করালাম। পরের দিন সামনে গাই দুইয়ে নিজে কিনে আনলাম দুধ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে দিয়ে ঘন করে জ্বাল দেওয়ালাম। মিষ্টি মিষ্টি ক্ষীরের গন্ধ বা'র হতে লাগল। নিঃশ্বাস টেনে টেনে চমৎকার একটি স্বাদের তৃপ্তি অনুভব করলাম। অবশ্য সেটা ঠাকমাকে বললাম না—তাহলে উনি চমকে উঠে বলতেন, ছি ছি! ও কি কাণ্ড! গোপালকে নিবেদন করার আগে ও তো তোর ভোগেই লাগলো। বলিসনে—বলিসনে অমন কথা!

যাক—উনি দম্বলের আন্দাজ করে দিলেন—আমি দই পাতলাম। ফল যথাপূর্বং। দইটা চমৎকার জমলো—কিন্তু সরটুকু দেখলাম না। কেন? তবে কি বামুন ঠাকুর আমাদের পাতে দই দেবার আগে সরটুকু সরিয়ে রেখেছে? না—তাই বা কি করে হবে? আমি তো সকালে উঠেই ঠাকুর ঘরে ঢুকে সন্দেহ নিরসন করে এসেছিলাম। তখনও সর

দেখিনি। তবে?

পরের দিনও অবিকল সেই ঘটনা। কেমন রোখ চেপে গেল—এর একটা হেস্তনেস্ত করবই—আরও দুটো দিন দেখব। আর সেই দুটো দিনে সবচেয়ে মোক্ষম দাওয়াইটি ছাড়ব। একেবারে পুরো ডোজে—হয় রোগ অথবা রোগী কিংবা দুটোই একসঙ্গে নির্মূল হবে!

তারপর?

তারপর? মেজদা হেসে বলল, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সেই এক ডোজেই অব্যর্থ ফললাভ।

কি রকম—কি রকম?

তখন সবে সূর্য উঠেছে—ঠাকুমা গঙ্গা থেকে ফেরেন নি—বামুন ঠাকুর বাজার সেরে এসে হাত না ধুয়ে ফুলের মোড়কটা রাখতে গেছে ঠাকুর ঘরে—আমিও তক্কে তক্কে উঠে এসেছি সিঁড়িতে—ফলটা কি হয় প্রত্যক্ষ করতে। ব্যস—মাত্র তিন চার মিনিট—তারই মধ্যে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ উঠল,—দোতলার ছাদে সুরু হ'ল দাপাদাপি।

বাপ্প রে—মরি গিলা—মরি গিলা।

কান-ফাটানো চীৎকার আর দাপাদাপিতে সারা বাড়ীর লোক উঠে এসেছে ছাদে। আশপাশের বাড়ীর কয়েকটা জানালাও খুলে গেছে—ছাদের আলসেতে অনেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঠাকুর তখন ছাদের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত দাপাদাপি করছে আর চেঁচাচ্ছে—বাপ্প রে মরি গিলা—

এমন সময় গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকমা এলেন ছাদে। পরনে তসরের কাপড়—এক হাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে গামছা-সমেত ভিজে কাপড়।

ঠাকমাকে দেখে ঠাকুর দড়াম করে ওঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে ককিয়ে উঠলো, ঠাকুমা—মরি গিলা—মরি গিলা—

কি—কি—ব্যাপার কি? সবাই জিজ্ঞাসা করছে।

আমাকে দেখে ঠাকমা বললেন, ওরে নবু, দেখ-দেখ—ঠাকুর এমন করছে কেন? মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে, হাত পা খেঁচছে—ওমা—এ যে শিবচক্ষু হয়ে উঠলো—!

দেখেশুনে আমারও শিবচক্ষু হবার উপক্রম। ডোজটা কি কড়া হয়ে গেল? আদালত পর্যন্ত গড়াবে নাকি!

তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে ঢুকে যে পাত্রে দই পেতেছিলাম, সেটা নিয়ে এলাম। হুঁ, যা ভেবেছি তাই! আজও দই-এর উপরকার সরটুকু চেঁচে-পুঁছে তুলে নিয়েছে লোভী

বামুন—আর তার ফলে--

ঠাকমা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, করলি কি হতভাগা, ঠাকুরের দই নষ্ট করলি ?

পাত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে শিউরে উঠলেন, ও মা গো—দই খাবলালো কে ?

বললাম, ভয় নেই—তোমার গোপালের দই উই তাকে তোলা আছে—তবে সরটা আজও পাবে না। আশা করছি—কাল থেকে সরসুদ্ধ দইটুকু ওঁর ভোগে লাগবে।

ঠাকমা তবুও হাঁ করে চেয়ে আছেন দেখে দই-এর পাত্র ওঁর সামনে নামিয়ে দিলাম, দেখ, ভাল করে দেখ—এই বস্তুটি কি ?

সবাই ঝুঁকে পড়ে বিস্ময়ে ছ'চোখ কপালে তুললো, ও মা গো—এ যে পাথুরে চুন !

ঠাকমার পায়ের উপর ঠাকুর আছড়ে পড়ে ককিয়ে উঠলো, ঠাকুমা মরি গিলা—

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসির দমকে ছাদ ফেটে যাবার উপক্রম।

আমরাও হাসতে হাসতে বললাম, ঠাকুরটা তো ভারী বোকা মেজদা—দই কি পাথুরে চুন ধরতে পারল না!

মেজদা বলল, পারবে কেমন করে—চুনের উপরে সরের কামুফ্লেজ ছিল যে, সর দিয়ে এ্যাইসা ঢেকে দিয়েছিলাম—

আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

মেজদা বলল, আগে শোনই সবটা—তারপর হাসবি। সবাই খুব হাসছে—ঠাকুমা কিন্তু ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠছেন। হঠাৎ সকলকে ধমক দিয়ে উঠলেন, তোরা কি রে—একটা মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে আর তোদের রঙ্গ বাড়ছে! গরীবের বাছার যদি ভালমন্দ কিছু হয়—কি সর্বনাশ হবে বল দেখি—একটা পরিবার যে অকূলে ভাসবে! শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক—ওকে সুস্থ করার ব্যবস্থা কর।

ঠাকমার চোখে জল দেখে আমাদের মুখের হাসি নিবে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটলাম ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে শিউরে উঠলেন। ইস্—মুখের ভিতরটা ভীষণ হেজে গেছে যে—পয়লা নম্বরের পাথুরে চুন বোধ হয়। একে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাও—একটা চিঠি দিচ্ছি।

বোঝ ব্যাপার—হাস্যরসে তখন কি পরিমাণ ভেজাল এসে মিশছে!

আমরা শুকনো মুখে বললাম, ঠাকুর সেরে উঠেছিল?

আমাদের ছলছলে চোখের পানে চেয়ে মেজদা হেসে উঠলো, কেমন ভেজালের মহিমা বুঝছো?

অশোক বনে সীতা

শ্রীপরিচয় গুপ্ত

রামের শোকে সীতা যখন
অশোক বনে কাঁদে,

চেড়ী দু'টো খোশ মেজাজে
কাওয়ালি গান সাধে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভীল বিদ্রোহের একটি দৃশ্য

সিপাহী যুদ্ধের আগে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভারতবর্ষের মানুষ বহু প্রাচীন সভ্য জাতি। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন দেখতে দেখতে এই জাতি এই জগতের সব কিছু নশ্বর বলে ধরে নিয়েছে এবং ধর্ম্মপ্রাণ হয়েছে। শাশ্বত ও অবিনশ্বর কি, এই কথা ভাবতে ভাবতে তারা পৃথিবীর সব সেরা দর্শনশাস্ত্র রচনা করেছে—জীবনটাকে তারা মায়া বলে ধরেছে, তাবলে অন্যায়ের কাছে তারা কোনদিন মাথা নত করেনি। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, মধ্য যুগে আরবেরা যখন তরবারীর মুখে

ইসলামধর্ম প্রচার করলো, তখন তারা যে দেশে গেল সেই দেশের সকল মানুষকেই মুসলমান করলো, কিন্তু প্রথম বাধা পেল এই ভারতবর্ষে।

ধর্মচর্চার জন্য ভারতবাসী শান্তি ভালবাসে, কিন্তু তা বলে অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে পারে না, এ ধারণা ভুল। অন্যায় যখনই সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ তখনই তাকে প্রতিরোধ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যথেচ্ছাচার সুরু করে। পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর পরে সিপাহী যুদ্ধে তার প্রচণ্ড প্রকাশ আমরা দেখেছি। কিন্তু এই একটি শতাব্দী, অর্থাৎ চার পুরুষ ধরে ভারতবাসীরা কি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনাচার চুপ করে সহেছিল? না। সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বহুস্থানে বহুবার এই অনাচারের প্রতিরোধ করেছিল। তারই কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি :

পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই থেকে মণিপুর অবধি নানাভাবে অসন্তোষ দেখা দেয়।

১৮১৭ সালে খান্দেশে ভীলরা বিদ্রোহ করে। প্রায় ৮০০০ ভীল এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিদ্রোহীদের দমন করতে ইংরাজদের দু'বছর লাগে, বৃটিশ বাহিনী বহু ভীল-বসতি ধ্বংস করে, বহু ভীল প্রাণ হারায়। আট বছর পরে (১৮২৫) আবার ভীলরা বিদ্রোহ করে। সেবার তাদের নেতা ছিল সিউরাম নামে এক কামার। সে বিদ্রোহও দমিত হয়। এর ছ' বছর পরে উচেৎ সিং-এর নেতৃত্বে আবার এক বিদ্রোহ হয়।

এই সময় পাঞ্জাবে এক কালীসাধক দেখা দেন, তিনি বলেন—'আমি ফিরিঙ্গিদের অনাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যই জন্মেছি।' ইংরাজরা তাকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু আকালীরা তাঁকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু শেষ অবধি ফিরিঙ্গি ফৌজের সঙ্গে আকালীরা পেরে ওঠে না।

সাহারাণপুরে গুজররা বিদ্রোহ করে ১৯২৪ সালে। তাদের নেতৃত্ব করেন কুঞ্জের তালুকদার বিজয় সিং। বিজয় সিং কেল্লা তৈরী করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এক খণ্ডযুদ্ধে প্রায় ২০০ বিদ্রোহী মৃত্যু বরণ করে, এবং বিজয় সিং-এর পতন হয়।

রোহটক জেলায় জাঠ, মেওয়াটি ও ভট্টি-রা বিদ্রোহ করে, এদের নেতৃত্ব করেন সুরজমল নামে এক সামন্ত।

বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ করেন জায়গীরদার নানাপণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় পিণ্ডারী দলের সর্দার সেখ দল্লা।

কচ্ছ অঞ্চলের কোলিরা বিদ্রোহ করে চারবার—১৮২৫, ১৮২৮, ১৮৩৯, ১৮৪৪। তৃতীয় বারের নেতা ছিলেন তিনজন ব্রাহ্মণ, তাঁরা বিদ্রোহী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রঙিন ফুলের হাসি

ফটো : শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

কিন্তু শেষ অবধি টেঁকেনি। চতুর্থ বারে বিদ্রোহীরা নাসিক, আমেদাবাদ ও সাতারা দখল করে বসেছিল, তাদের দমন করতে ইংরাজদের লেগেছিল চার বছর।

দিবাকর দিক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে বিজাপুরে এক বিদ্রোহ হয় ১৮২৪ সালে, সেখানেও এক স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিছুদিনের জন্য। পাঁচ বছর পরে এখানে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়, তার নেতৃত্ব করেন রায়াপ্পা নামে এক গ্রাম্য চৌকিদার। এক সহকর্মী তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে; রায়াপ্পার ফাঁসি হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব থাকার জন্য ধারওয়ারের বিধবা জমিদার-পত্নীকে ইংরাজরা বন্দী করে ও বন্দীশালায় বিষ খাইয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

বিশাখাপত্তনে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৩০ সালে, এখানকার নেতা ছিলেন বীরভদ্র রাউজ। এঁকে ধরে দেবার জন্য ইংরাজ সরকার ৫০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিন বছর পরে বীরভদ্রকে ধরা সম্ভব হয় ও বিদ্রোহ দমিত হয়।

গঞ্জাম জেলার জমিদার ধনঞ্জয় ভঞ্জ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ১৮৩৫ সালে। পাহাড়ী জাতি 'খন্দ'রা তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, এই বিদ্রোহ আয়ত্ত করতে লাগে পুরো দুটি বছর।

১৮৪২ সালে সগর জেলায় বিদ্রোহ করে দু'জন জমিদার—মধুকর শা ও জওয়াহির সিং। তারপরেই গোণ্ডজাতি বিদ্রোহ করে সর্দার দলের শা'র নেতৃত্বে।

বেলেরি ও কুর্নুলে বিদ্রোহ করে জমিদার নরসিং রেড্ডি। পরে নরসিংহের ফাঁসি হয়।

আসামের পার্বত্য অঞ্চলে খাসিয়ারা বিদ্রোহ করে ১৮২৯ সালে বড়মাণিকের নেতৃত্বে। তিন বছর ধরে এদের পরিচালনা করেন তিরুত সিং, গদাধর ও হরনাথ।

তারপর কুকি, নাগা ও কোলরাও বিদ্রোহ করে। কুকিরা ১৮২৬ সাল থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে চারবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ছোট নাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডারা বিদ্রোহ করে। এদের অনেক সর্দার যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করে। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধো ভগৎ-এর নাম পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে দশ বছর ধরে অশান্তি চলে—১৮২৭ থেকে ১৮৩৭।

মানভূম অঞ্চলে কোলদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন, দেওয়ান গঙ্গানারায়ণ। এর দলে 'চুয়াড়' জাতিও ছিল।

উড়িষ্যার খোন্দ জাতি বিদ্রোহ করে, নেতা ছিল চক্র বিষয়ী নামে এক সর্দার।

বাংলার রাজমহল অঞ্চলে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। সিধু ও কানু নামে দুই ভাই তাদের চালনা করেন। শুধু কুঠার ও তীরধনু দিয়েই বীরভূম, রাজমহলে ও ভগলপুর অবধি

তারা দখল করে বসে। ক'মাসের মধ্যেই ইংরাজরা এদের পর্যুদস্ত করে। তারপর এদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয় (১৮৫৫-৬)।

ময়মনসিংহ জেলায় পাগল-পন্থীরা কয়েকবার বিদ্রোহ করে। এরা গারো ও হাজংদের দলে টানে। প্রথমে এদের নেতা ছিলেন দরবেশ করম শা। পরে তাঁর ছেলে টিপু শা। এদের অসন্তোষ চলে ১৮২৫ থেকে ১৮৩৩ অবধি।

নাগপুরে রোহিলারা বিদ্রোহ করে আপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে।

রওয়ালপিণ্ডিতে নাদির খাঁ এক বিদ্রোহের সূচনা করেন। কথা ওঠে রণজিৎ সিংয়ের নির্বাসিত ছেলে পেশোয়ারা সিং পালিয়ে এসেছে জেল থেকে, তাকে সিংহাসনে বসাতে হবে। প্রচারটা মিথ্যা।

১৮৪৪ সালে লবণের উপর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সুরাটের জনসাধারণ আদালত ঘেরাও করে। পথের উপর কামান পেতেও তাদের ভয় দেখানো যায়নি, তারা সাড়া তোলে —মারেঙ্গে বা মরেঙ্গে। শেষ অবধি লবণ-কর কমাতে হয়। বছর চারেক পরে এখানে নতুন ওজনের বাটখারা চালাবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ মানুষ দোকান-পাট বেচাকেনা বন্ধ করে দেয়। শেষে গবর্নমেণ্টকে আবার পুরানো বাটখারাতেই ফিরে যেতে হয়।

সিপাহী যুদ্ধের প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকে এই সব বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশে যে শাসন ও শোষণ চালাচ্ছিল, দেশের মানুষ তাতে খুশি হতে পারেনি। এক একটা বিদ্রোহে বহু ধন প্রাণ নষ্ট হয়েছে সত্যি, তবু সাধারণ আদিবাসী অবধি অনাচারের প্রতিরোধ করতে দাড়িয়েছে। এবং এই ছোট ছোট অসন্তোষের ব্যাপক পরিণতিই হয়েছিল সিপাহী যুদ্ধ। তারই ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশের শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিতে হয়। অনাচারের প্রতিবিধান করার মতো নৈতিক সাহস ভারতবাসীর নেই—এটা বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখা মিথ্যা প্রচার মাত্র—আমাদের মত একটা বিশাল জাতিকে ধোঁকা দিয়ে রাখার চেষ্টা।

আগমনী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আগমনী বাজে আসে দুর্গা যে
আমাদের এই দীনের ঘরে,
একটি বছর কী ভাবে যে যায় —
ভাবলে সেকথা অশ্রু ঝরে!

দিকে দিকে যত হতাশা ও গ্লানি
তবু তারই মাঝে ডাকি যে, মাগো
দনুজদলনী অভয়া-বরদা
দশভুজা তুমি আবার জাগো!

ভালো আর মন্দ

শ্রীমতী বেলা দে

এক দেশে ভালো আর মন্দ নামে দুই বন্ধু বাস করতো। ভালো ছিল অর্থশালী আর মন্দ ছিল গরীব। এই ভালো আর মন্দের মধ্যে এতো বন্ধুত্ব ছিল যে, তারা একসঙ্গে থাকত, খেতো, ঘুমাতো। কাজেই যেখানে যেতো দু'জনেই যেতো।

একদিন মন্দ ভালোকে বলল—ভাই, চলো কোথাও বেড়াতে যাই। ভালো খুব খুসী হয়ে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলো। যখন বেরুবে, তখন মন্দ ভালোকে বলল, এসো, আমরা এক হাজার করে টাকা সঙ্গে রাখি। ভালোর টাকার অভাব ছিল না তাই বন্ধুর কথা মত হাজার টাকা সঙ্গে নিলে, আর মন্দ টাকার বদলে এক থলে পাথর ভরে নিল।

দু'জনে বেড়াতে বেরিয়ে অনেক দূর এসে পড়ল। সে কি ভয়ানক জঙ্গল! খানিক বাদে ভালোর খুব জল তেষ্টা পেলো—কিন্তু কোথাও জলের চিহ্ন নেই। ভালো মন্দকে বলল, ভাই বড় তেষ্টা পেয়েছে, যা হোক করে আমায় একটু জল এনে দাও। মন্দ বলল—এখানে কোথায় জল পাব? তুমি যদি এখানে একটু অপেক্ষা কর, খুঁজে দেখতে পারি, জল কোথায় পাওয়া যায় কিনা! এই বলে, খানিক দূর গিয়ে একটা কুয়ো থেকে এক ঘটি জল ভরে এনে ভালোকে বলল—আগে পাঁচশো টাকা দাও, তবে জল দেবো। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কাজেই তাড়াতাড়ি মন্দর হাতে পাঁচশো টাকা তুলে দিলে। মন্দ ভালোর গলায় একটুখানি জল ঢেলে দিলে কিন্তু তাতে তেষ্টা মিটল না, কাজেই আবার জল চাইলে সে। মন্দ বললে—পাঁচশো টাকায় যেটুকু জল হয় তাই দিয়েছি, আরো পাঁচশো টাকা দিলে আবার জল দিতে পারি। ভালো আরো পাঁচশ টাকা দিলে, মন্দ আবার সামান্য একটু জল দিলে, এতেও তার তেষ্টা মিটল না, আবার সে জল চাইল। মন্দ বললে—এবার জল দিতে হলে তোমার একটি চোখ খুবলে নিতে হবে। ভালো বলল—তাই নাও বন্ধু, তার বদলে জল দাও। মন্দ ভালোর একটি চোখ নষ্ট করে দিলে। ভালোর তাতেও তেষ্টা গেল না, সে আবার জল চাইল—এবারে আর একটি চোখও জলের বদলে দিতে হ'ল। ভালো একেবারে অন্ধ হয়ে গেল।

মন্দ তখন ভালোকে সেই গভীর জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় রেখে চলে গেল। খানিক পরে ভালো কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে লাগল। দেখতে দেখতে রাত হয়ে এলো আর চলতে পারে না, একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। অন্ধকার রাতে সেই

পাথরের আড়ালে এলো এক সিংহ আর এক শেয়াল। সিংহ শেয়ালকে বললে—ভাই শেয়াল, এমন কথা বলো, যা শুনতে শুনতে রাতটা কেটে যায়। শেয়াল বলল—ভাই সিংহ

সিংহ ও শেয়ালের কথা ভালো সব শুনলো।

এই পাথরের কাছে যে গাছটা আছে সেই গাছের এমন গুণ যে, এর পাতার রস অন্ধের চোখে লাগালে সে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। আমি তো বললাম, এবারে তুমি কিছু বল সিংহ ভাই। সিংহ বললে—ঐ গাছের নীচে এত ধনদৌলত আছে যে, সাতটা রাজার সম্পত্তির চেয়েও বেশী। এবার তুমি আরো কিছু বল শেয়াল পণ্ডিত। শেয়াল বলল—

এখান থেকে একটু দূরে এক ছাগলওয়ালা আছে তার ছাগল দুধের এমন গুণ, যে তাই দিয়ে মালিশ করলেই, কারো যদি ধবল থাকে সেরে যাবে। আর এখানকার রাজার এ রোগ আছে, ঐ দুধ মালিশ করলেই সেরে যাবে। এই শুনতে শুনতে দিন হ'ল, সিংহ ও শেয়াল চলে গেল। ভালো এ সব কথা শুনেছিল, সকাল হতেই হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে গাছের কাছে পৌঁছে পাতা চট্‌কে চোখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে গেল। তারপর সেই ছাগলওয়ালার বাড়ী গেল—সেখান থেকে দুধ নিয়ে রাজার বাড়ী এলো, সেখানে গিয়ে সব কথা বলল। সব শুনে রাজা খুসী হয়ে বললেন—দাও আমার ধবল ভালো করে। ভালো সেই ছাগল দুধ রাজার গায়ে মালিশ করে দিতেই একটু একটু করে ধবল সেরে যেতে লাগল। সবাই তো দেখে অবাক!

রাজা খুসী হয়ে বললেন—আমি ওর সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, ভালোর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেল। দু'জনে খুব সুখে ঘরকন্না করতে লাগল। এমন সময় একদিন 'মন্দ' সেখানে এসে হাজির। ভালো পুরনো দিনের সব কথা ভুলে গিয়ে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরলো। ভালোর স্ত্রীও মন্দকে খুব যত্ন করে খাওয়ালো। ভালো বলল—তোমরা দু'জনে বসে গল্প কর, আমি আসছি। ভালো চলে গেল। মন্দ বলল—ভাগ্যের জোরে ওর এমন সৌভাগ্য হয়েছে। না হলে ও তো আমার বাবার ঘোড়ার গা হাত পরিষ্কার করার কাজ করত। তোমার বাবা কি করে এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলেন তাই ভাবছি! এই সব বলে মন্দ চলে গেল, আর রাজার মেয়ে ভীষণ রেগে বসে রইল। একটু পরে ভালো এলো, বৌ কথা বলে না। ভালো রাজার কাছে গিয়ে বলল—রাজকুমারী ওঠেও না, কথাও বলে না। রাজা এসে বললেন—কি হয়েছে মা? রাজকুমারী বলল—তুমি একটি ঘোড়ার চাকরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ? আমি এ প্রাণ রাখব না। রাজা ভীষণ রেগে, তখুনি জল্লাদকে ডেকে বললেন—এখুনি একে ফাঁসি দাও। জল্লাদ ফাঁসি দেবার আগে ভালোকে বলল—তোমার কিছু বলবার আছে? ভালো বলল—একবার রাজামশাইকে দেখতে চাই। জল্লাদ রাজার কাছে তাকে নিয়ে গেল। ভালো সেখানে এসে রাজাকে বলল—তুমি আমায় ফাঁসিতে চড়াচ্ছ, আমার কাছে অনেক ধনরত্ন আছে, তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। কিন্তু তোমার রাজত্বে যত ঘোড়া, হাতী, উট আছে সব নিয়ে চল, না হলে অত ধনরত্ন আনা যাবে না। রাজা তাই করলেন—ভালো যে গাছটি দেখালো, সেটির গোড়া খোঁড়া হ'ল—কিন্তু যতই খুঁড়তে লাগল ধনরত্নের আর শেষ নাই! রাজার যত ধন ছিল, ভালোর ধনরত্নের কাছে একটা বিন্দুর মতো মনে হ'ল। তখন রাজার যথার্থ চোখ খুলল—কন্যাকে

বললেন—তুমি যাকে সামান্য চাকর বলেছ, সে যে রাজার রাজা। আমার মত হাজার হাজার রাজা সে কিনতে পারে! রাজা ক্ষমা চাইলেন ভালোর কাছে। ভালো রাজকন্যাকে নিয়ে আবার সুখে সংসার করতে লাগল।

মন্দ ভালোকে সুখী দেখতে পারে না, সুচ দিয়ে নিজের চোখ অন্ধ করে সেই পাথরের কাছে পড়ে রইল। রাত্রে সিংহ আর শেয়াল এলো। সিংহ বলল—শেয়াল এমন কথা বল যাতে রাত শেষ হয়ে যায়। শেয়াল বলল—কি আর বলব, গাছের পাতার আর সে গুণ নেই। সিংহ বলল—হ্যাঁ ভাই, গাছের তলায় সে ধনরত্নও আর নেই। শেয়াল বলল—দুনিয়া পালটে গেছে, তাই ছাগলেরও আর সে দুধ নেই। সিংহ বললে—কিছু কোথাও আছে নাকি? শেয়াল বলল—যা আছে ঐ পাথরের কাছেই আছে। দু'জনে তখন মন্দকে ধরে ছিঁড়ে দু'খানা করে খেয়ে ফেললো।

ভালো করলে ভালো হয়—ভালোর শেষ ভালোই হয়!
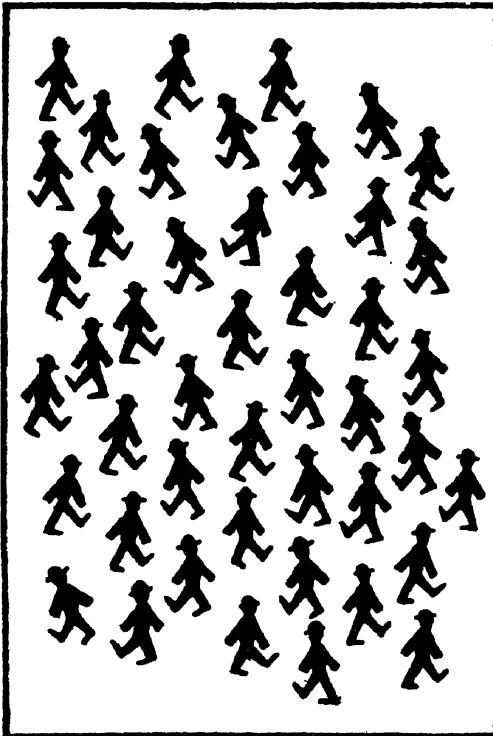
দৃষ্টিশক্তির পরখ

তোমরা চোখে পরিষ্কার দেখতে পাও নিশ্চয়ই এবং গুণতেও জানো। বলতো ক'জন লোক পাশের এই ছবিটিতে এক সঙ্গে ড্রিল করছে।

উপরের ছবিতে একজন ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। সে কোন্ দিকে মুখ করে আছে জানা যাচ্ছে না। আচ্ছা, যদি বলা হয় পূর্ব অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে হাত দুটি কোন্‌টা কোন্ দিকে থাকবে বলতে পারো?

(উত্তর আগামীবার পাবে)

'তার হাতে একটা দশ-সেরি রুই মাছ, দেখেই প্রসন্নবাবু খুশি হয়ে উঠলেন।'

ভদ্রতা-শিক্ষা

(বহুদিন পূর্বে ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত একটি সত্য ঘটনার ছায়াবলম্বনে)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(উকিল হরিহরবাবুর বৈঠকখানা। উকিলবাবু চেয়ারে বসে আছেন, সামনে স্তূপাকার নথিপত্র, দলিল ইত্যাদি। তিন পাশে টেবিল ঘিরে আর তিনটি খালি চেয়ার। ঘরের একধারে একটা চাটাই বিছানো তক্তাপোশের উপর ডেস্ক রেখে তাঁর মুহুরী এককড়ি মকদ্দমার দলিল লিখছে, হরিহরবাবু মুখে মুখে তাকে কি লিখতে হবে বলে যাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর মক্কেল এবং বন্ধু জমিদার প্রাণকৃষ্ণবাবুর চাকর মদন দরজা ঠেলে ঢুকল। মদন ভদ্রঘরের ছেলে অবস্থা খারাপ হওয়ায় পড়াশোনা বেশি করতে পারেনি, তাই জমিদার-বাড়ি চাকরের কাজ করছে। তার হাতে একটা দশ-সেরি রুই মাছ, দেখেই প্রসন্নবাবু খুশি হয়ে উঠলেন।

মদন—(স্বগত) আজ সাত বচ্ছর ধরে জামিদারবাবুর বাড়ি থেকে এদের বাড়ি ভেট নিয়ে আসছি—তা' কমপক্ষে পঞ্চাশবার এলুম-গেলুম, কিছু না হবে তো পাঁচ হাজার টাকার মাল এনে দিয়েছি বাড়ি ব'য়ে। তা এমন কেপ্পন, একদিন একটা টাকা বকশিশ ঠেকালে না। থালা-ভরা সন্দেশ এনেছি, ঝুড়ি-ভরা আম এনেছি, তা একদিন বললে না, দুটো মুখে দিয়ে যা। তার ওপর আবার তেতলায় তুলে দিয়ে যা, মাছটা কেটে দিয়ে যা, ফরমাসের অন্ত নেই! আশায় আশায় অনেক দিন ব্যাগার খেটেছি, মন যুগিয়ে চলেছি, আর না। আজ এই বৈঠকখানাতেই মাল খালাস ক'রে পালাব, বাড়ির ভেতর আর ঢুকছি না। (টেবিলের সামনে ধড়াস করে মাছটা মেঝেয় ফেলে) এই নিন, জমিদারবাবু মাছ পাঠিয়েছেন আপনাদের জন্যে। আমি এখন অনেক জায়গায় ঘুরব, আজ তা' হলে আসি। (যেতে উদ্যত)

হরিহর—দাঁড়া, ব্যাটা, দাঁড়া; ব্যাটা আমার ঘোড়াতে জিন দিয়ে এসেছে! বলি হ্যাঁরে মদনা, তোর আক্কেলটা কি রকম? বৈঠকখানা ঘরটা কি মাছ রাখবার জায়গা? বলি এতদিন বড়োলোকের বাড়ি কাজ করছিস, একটু সভ্যতা-ভদ্রতা কাকে

বলে শিখলি না? তোর বাবু আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁকে যদি জানিয়ে দিই তুই এইরকম ক'রে বাইরের ঘরে মাছ ফেলে দিয়ে চলে গেছিস, তা'হলে তোর দশাট কি হবে বল্‌তো? ব্যাটা, ভদ্দর লোকের সঙ্গে কি ক'রে ব্যবহার করতে হয় জানিস না? আদবকায়দা আর কবে শিখবি?

মদন—(স্বগত) যত আদবকায়দা আমার বেলা, আর ওঁর মুখে 'ব্যাটা', 'মদ্‌না', তুই-তোকারি ছাড়া কথা নেই। ঝাঁটা মারো অমন ভদ্রতায়। (প্রকাশ্যে) আমি মুখ্‌খু পাড়াগেঁয়ে মানুষ, না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি, হুজুর কিছু মনে করবেন না। আমি কি বাবুদের কাছে ঘেঁষতে পারি যে দু'টো ভাল কথা শিখব? আমি তো চাকর মহলেই থাকি, ভদ্দর লোকের আদবকায়দা কি করে জানব বলুন?

হরিহর—না, না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। পাঁচদিন দেখেও তো শেখে লোকে, দিন দু'চার বারও তো দাঁড়াস বাবুদের কাছে। আচ্ছা দাঁড়া, আমিই তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। মনে কর তুই যেন উকিলবাবু, আর আমি যেন মদন। এইবার তুই এই চেয়ারে বোস, আমি ঘরের বাইরে যাচ্ছি, সেখান থেকে মাছ নিয়ে ঢুকব। যা, বোস চেয়ারে। (মাছটা মেঝে থেকে তুলে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন)

মদন—সে কি হুজুর! আপনি একটা কত বড়ো মান্যগণ্য লোক, আমি আপনার পায়ের নখের যুগ্যি নই; আমি কি আপনার চেয়ারে বসতে পারি? মহা পাপ হবে যে?

হরিহর—আমি বলছি যখন, তখন তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? যা বোস, কোনো দোষ হবে না। (মদন বসল। হরিহরবাবু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে টোকা দিলেন) একবার আসতে পারি, হুজুর?

মদন—কে ও, মদন নাকি? এস, এস।

হরিহর—(দরজা ঠেলে ঢুকে একগাল হেসে মাথা নুইয়ে মাছসুদ্ধ দু'টো হাত কপালে ঠেকিয়ে) প্রণাম হই হুজুর, আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাস মদনই বটে। তা আজ্ঞে, আজ আমাদের খিড়কির পুকুরে কিছু মাছ ধরা হ'ল। কর্তাবাবু তো আপনার নাম করতে অজ্ঞান, বললেন, "আগে হরিহরবাবুকে একটা মাছ দিয়ে আয়।" জিনিস অবশ্য সামান্যই, মোটেই আপনার যুগ্যি নয়, তাই কর্তা খুব 'কিন্তু' হচ্ছিলেন। বললেন, "বাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবি, তিনি যেন ক্ষমাঘেন্না করে মাছটা নেন, তা'হলে আমার দিনটা সার্থক হবে, আমি কৃতার্থ হব। আর হুজুর কেমন আছেন, বাড়ির সকলে কে কেমন আছেন, সব জেনে যেতে বলেছেন। তা, হুজুরের শরীর এখন ভালো তো? গিন্নী মা, ছেলেমেয়েরা

সবাই ভালো আছেন তো ? আমাদের বাড়িতে কবে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন ?

মদন—বাবা মদন, তোমাদের কর্তাবাবুর দরাজ হাত বটে! যে জব্বর মাছ পাঠিয়েছেন এ তো বাড়ির লোকে খেয়ে শেষ করতে পারবে না, পাড়ার লোককে ডেকে বিলোতে হবে। চমৎকার মাছটি! বেশ, বেশ, ভারী খুশি হলুম। তাঁকে আর কি বলে ধন্যবাদ জানাব, তিনি তো স্নেহ দিয়ে আমায় কিনেই রেখেছেন। কর্তাবাবু আমাদের খবর জানতে চেয়েছেন বললে না ? বলবে তাঁকে, আমরা সকলে ভালোই আছি তাঁর আশীর্বাদে। তাঁর কুশল-সংবাদ মাঝে মাঝে পেলে খুশি হব। আহা, তুমি ঘেমে গেছ যে। তা পরিশ্রমটা তো কম হয়নি, এই দুপুর রোদ্দুরে এই ভারী মাছটা এক-ক্রোশ রাস্তা ব'য়ে নিয়ে এসেছ, খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়। বসো, বাবা, একটু জিরিয়ে নাও। ওহে এককড়ি (মুহুরীকে) আমাদের মদন তো নিত্যি নানারকম জিনিস নিয়ে আসে, আমারও কেমন ভোলা মন, ওকে কোনদিন হাত তুলে কিছু বকশিশ দিইনি। দাও, দাও, দুটো টাকা দাও ওকে ক্যাস থেকে, আর সৈরভীকে ডেকে বলে দাও, মাছটা নিয়ে যাক বাড়ির ভিতর, নিয়ে গিয়ে কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিক ওকে।

হরিহর—(অবাক হয়ে, স্বগত) ব্যাটা বলে কি! আমাকে বোকা বানিয়ে দিলে! (প্রকাশ্যে হাসতে হাসতে) বেশ, বেশ!

মদন—(পায়ে ধরে) অপরাধ নেবেন না, হুজুর।

হরিহর—তোমাকে আমি শেখাব কি, তুমিই তো আমাকে আদবকায়দা শিখিয়ে দিলে। তোমার সঙ্গে এতদিন সত্যিই আমি খুব অভদ্রতা করেছি। ওহে এককড়ি, দু'টাকা নয়, পাঁচটাকা বকশিশ দাও ওকে, আর বাড়িতে বলে দাও, ভালো করে খাইতে দিতে।

কয়েকটি ছড়া

শ্রীরজত রায়চৌধুরী

(১)

খাবার দাবার যোগাড় সব।
কুটুম বাড়ির কলরব।
ফুশ মন্তর যাদুর লাঠি
শূন্য কড়াই কলসী বাটি॥

(২)

নড়তে চড়তে বারোমাস
এলেন বাবু খেলেন তাস।
উঠতে বসতে দিন যে যায়
ভাতের মাছির কান্না পায়॥

(৩)

কাপড়চোপড় হাল ফ্যাসান
বাবু হলেন ক্যাল্‌কাসান।
ডবল ডেকার চড়তে যান
পিছলে পড়ে পা দু'খান॥

ক্লেরিহিউ

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

॥ ১ ॥

দেবতাবতার বুদ্ধ
বলেন, 'করো না যুদ্ধ।'
তাই শুনে ভাবে শিষ্য
কি করে চলবে বিশ্ব।

॥ ২ ॥

মহাকবি শেক্সপীয়ার
কাব্যে নাট্যে জুড়ি নেই তাঁর
করতেন ভাঁড়ের অভিনয়,
তাতেই গভীর পরিচয়।

॥ ৩ ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
হাসেন, ঘুমোন এবং খান ভাত।
সাজিয়ে 'প্রথমভাগে'র অক্ষর
ছোটান মহাকাব্যের নির্ঝর।

॥ ৪ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী
কোর্টে বসে শুনতেন আরজি।
লিখে 'বন্দে মাতরম্' গান
ভাঙলেন কত কারা-কামান।

॥ ৫ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
দয়ায় কুসুম, বলে পাথর।
জ্ঞানে করে দিগ্বিজয়
লিখলেন 'বর্ণপরিচয়।'

নালিশ

শ্রীগোপাল ভৌমিক

মা তুমি বেজায় একচোখো!
পার যদি ছোড়দাকে রোখো।
তা না করে দেখি দিনরাত
আমাকেই নাও এক হাত।
আমি দোষী, করি চীৎকার,
পিছনে যে কলকাঠি তার
ছোড়দাটা সাধু সেজে নাড়ে
বোঝাতে পারি না বারে বারে।

যা-কিছু বলি না আমি কেন
সব তাতে ছোড়দার যেন
গলাটায় খুসখুস করে;
হাঁচে, কাশে রাগাবার তরে।
এমন কি হাসিটাও তার
উপায় আমাকে রাগাবার।
রাগ যদি করি সাথে সাথে
বকুনিটা জোটে হাতে-নাতে।

পুতুল খেলতে যদি বসি
কাছে এসে করে গড়িমসি।
সুবিধা পেলেই ছোড়দাটা
বাঁকাবেই পুতুলের পা-টা
বিনুনিটা নয়তো আমার
টেনে হবে সে পগার পার।
কেঁদে উঠে গালি খাই ঠিক—
ছোড়দাটা হাসে ফিক্‌ফিক্।

'দেখুন দারগাবাবু, আমার বাবাকে শূলে দিয়েছে ওরা!'...

ফন্দী
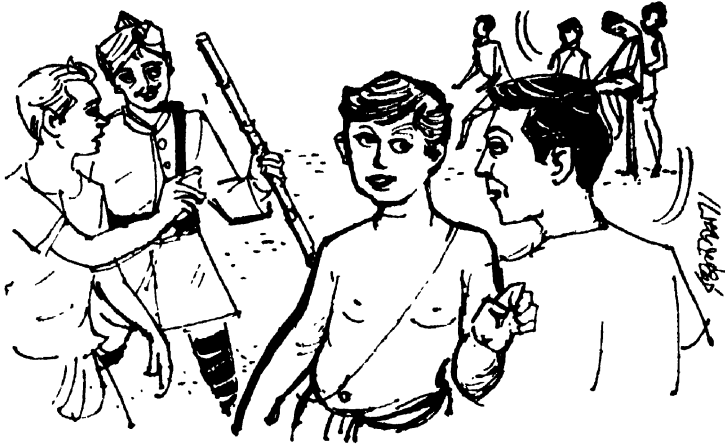
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

নফর নন্দীর অবস্থা বরাবর এমন ছিল না। পয়সার অভাবে আজ তার অবস্থা দু'বেলা অন্ন জোটে না, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন তার বাড়ীতে ঘটা করে দোল-দুর্গোৎসব হ'ত। প্রতিবেশী হলধর চাটুজ্যের সঙ্গে মামলা করেই তার এই দুর্দশা। হলধরের খুড়তুতো ভাই গদাধর নফরের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। ধার পরিশোধ না করেই গদাধর মারা যায়। আদালত থেকে ডিক্রি করিয়ে নফর যখন গদাধরের সম্পত্তি ক্রোক করলে, তখন হলধর দিল বাধা। হলধর কিছুতেই গদাধরের সম্পত্তি নফরকে দখল করতে দেবে না। গদাধরের সম্পত্তিটা সে নিজে হস্তগত করতে চায়। নফর লোকটা খারাপ নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করতে সে চায় না। হলধরের কাছে সে প্রস্তাব করলে, পাওনা টাকাটা পেলেই সে আর হাঙ্গামা করবে না। তাও সব টাকা সে চায় না, আসল টাকাটা হাতে এলেই হ'ল—সুদের টাকা ছেড়ে দিতে সে রাজী। কিন্তু হলধর সে-প্রস্তাবে কান দিলে না। চিরদিন সে লোক ঠকিয়ে এসেছে, নফরকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। গাঁয়ে হলধরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করে সে ফৌজদারী মামলা আনলে নফরের নামে। নফর যখন হলধরের মতলব বুঝতে পারলে সেও উঠে-পড়ে লেগে গেল হলধরকে জব্দ করবার জন্য। মামলা চলল অনেক কাল ধরে—দেওয়ানি, ফৌজদারি সব রকম। হলধরের ভয়ে গাঁয়ের লোক তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে চায় না। দু'একজন যারা দেয়, তাদের মোটা টাকা কবুল করতে হয়। শেষ পর্যন্ত হলধরের চক্রান্তের কাছে হার মানতে হ'ল নফরকে। টাকার অভাবে সে আর ঠিকমত মামলা চালাতে পারলে না—হলধরেরই হ'ল জয়।

মামলায় হেরে যাবার পর থেকেই নফরের স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। নানারকম ব্যাধি আশ্রয় করেছে তার দেহকে। ইদানীং সে আর শয্যা ছেড়ে উঠতে

পারে না। আগেকার সে অবস্থা আর নেই যে ভাল করে চিকিৎসা করাবে। তাছাড়া চিকিৎসার দিকে তার তেমন আগ্রহও দেখা যায় না। ছেলেরা গাঁয়ের কবিরাজের কাছ থেকে নিয়মিত ওষুধ এনে দেয় বটে, কিন্তু সে ওষুধ অধিকাংশ দিনই নফরের পেটে যায় না—সবার অলক্ষ্যে সে ফেলে দেয় জানালার বাইরে। মাঝে-মাঝে ছেলেদের সে বলে, নিঃস্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

সংসারের দুঃখকষ্ট বেড়েই চলে। নফর সব দেখে, মুখে কিছু বলে না। নফরের বড় ছেলে নন্দ বলে, শহরে গিয়ে কাজের চেষ্টা দেখবে সে—দু'পয়সা রোজগার করতে পারলে দুঃখকষ্টের কতকটা লাঘব হবে। নফর সায় দেয় না তাতে—বলে, "চাকরি করতে যাবি, যাস। কিন্তু এখন নয়। চাকরি ছাড়া তোদের গতিই বা কি? জমিজমা যা ছিল সবই তো গেছে। হলধর বামুনকে শাস্তি আমি দেবোই। তোদের সাহায্য না পেলে তা সম্ভব হবে না।"

দিন কয়েক পরের ঘটনা। হলধর চাটুজ্যে বসে আছে তার বৈঠকখানায়। পাড়ার জনকয়েক মাতব্বরও এসে ঢুকেছে খোশগল্প করবার জন্য। নন্দ এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। মামলার আগে নফরের পরিবারের সঙ্গে হলধরের হৃদ্যতা ছিল খুব। নফরের ছেলেমেয়েরা আসা-যাওয়া করত প্রায়ই। কিন্তু ইদানীং বছরখানেক হলধরের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসত না কেউই।

নন্দকে দেখে হলধর অবাক হয়ে বললে, "এতকাল তোকে দেখতে পাইনি যে, নন্দ! হঠাৎ কী মনে করে?"

নন্দ বিনীতভাবে বললে, "আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে একবার, জ্যাঠামশাই—তাই বলতে এসেছি। জানেন তো বাবা রোগে শয্যাগত—চলাফেরা করবার শক্তি নেই। আপনার কাছে ক্ষমা চাইবেন তিনি।"

"ক্ষমা? আমার কাছে?" হলধর অবাক হয়ে তাকাল নন্দর মুখের দিকে।

তারিণী ঘোষাল হুঁকোটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে, "নফরের যে এতকাল পরে সুমতি হয়েছে এ খুব আনন্দের কথা। আরে শূদ্দুরের ছেলে তুই, বামুনের পেছনে লাগা তোর কি উচিত হয়েছিল?"

মাধব ভটচায্যি এক কোণে বসে বারোয়ারী পুজোর ফর্দ লিখছিল, তারিণীর কথায় সায় দিয়ে বললে, "বামুন হ'ল শূদ্রের দেবতা। বামুনকে চটালে সর্বনাশ অনিবার্য। মামলা করে কী ভাল হ'ল ওর? টাকা-পয়সা, ক্ষেত-খামার যা ছিল সব গেল—এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।"

নন্দ মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে, "বাবা যা অন্যায় করেছেন তার জন্য খুব অনুতপ্ত। আপনাদের সকলের কাছেই তিনি ক্ষমা চাইবেন।"

হলধর এতক্ষণ চুপ করে ছিল—ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। এবার যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, "তোর বাবা যে ক্ষমা চাইবে তা আমি জানতাম। আমাকে চিরদিন সে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করে এসেছে—আমি যে ওর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সে কি আর ও বোঝে না?"

তারিণী হলধরকে উদ্দেশ করে বললে, "তাহলে কবে যাচ্ছো তুমি নফরের বাড়ি? আমরাও যাবো সঙ্গে। বেচারা যখন ক্ষমা চাইছে তখন আমাদের ওকে ক্ষমা করাই উচিত।"

হলধর নন্দর পিঠে হাত রেখে বললে, "কাল সকালেই আমরা যাবো তোর বাবাকে বল্‌গে যা, মিছামিছি যেন সে মন খারাপ না করে। তারিণী, কাল তোমরা একটু সকাল সকাল এসো। এখান থেকেই সব রওনা হওয়া যাবে।"

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে করে হলধর নফরের বাড়ি এসে উপস্থিত। নফর রোগশয্যা থেকে তার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে হলধরের পদধূলি নিয়ে বললে, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর, হলধরদা। আমার সর্বস্ব গিয়েছে তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি বলে আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই।"

হলধর আমৃতা-আমৃতা করে বললে, "তুমি আমাদের স্নেহের পাত্র নফর। ক্ষমা চাইবার আগেই তোমায় আমি ক্ষমা করেছি।"

নফর হাত জোড় করে উপস্থিত সকলেরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

নফর চিরদিনই একরোকা ও স্পষ্টবক্তা। অন্যায় সে বড় একটা করত না বটে, কিন্তু একবার একটা জিদ ধরলে তাকে বাগ মানানো সহজ হ'ত না। সেই নফরের এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে তারিণী ঘোষাল সবার পক্ষ থেকে নফরকে জানাল, নফরকে তারা সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

হলধরকে উদ্দেশ করে নফর বললে, "দিন চারেক আগে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, দাদা। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় স্বপ্ন দেখলাম যেন যমরাজ আমার সামনে এসে উপস্থিত। যমরাজ বললেন, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, মরণের পর তোমায় নরকে যেতে হবে আর সেখানে নিদারুণ কষ্ট পাবে তুমি। অত্যন্ত ভয় পেয়ে আমি হাত জোড় করে বললাম, প্রভু

কী এমন অপরাধ করেছি আমি যে আমায় নরকে যেতে হবে? যমরাজ বললেন, তোমার অপরাধ গুরুতর—শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি! আমি কাতরভাবে বললাম, প্রভু, আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত। দয়া করে এমন কোন উপায় বলে দিন যাতে আমি নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারি। যমরাজ বললেন, তোমার মৃত্যুর পর যদি কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ তোমার মৃতদেহকে শূলে বসিয়ে দেন তবেই তুমি নরক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবে।"

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে হলধর ছাড়া অন্যান্য সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।

মাধব ভটচাযি্য শিখা আন্দোলিত করে বললে, "ব্রাহ্মণে ভক্তি নেই বলেই তো কলিতে এত অশান্তি! ব্রাহ্মণকে ভক্তি কর, দেখবে যত কিছু আধি-ব্যাধি দূর হয়ে গেছে।"

নফর অনুনয়ের সুরে বললে, "হলধরদা, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। জীবনভোর তো কষ্ট ভোগ করলাম, মরণের পর যাতে আর কষ্টভোগ করতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে তোমায়। আমি মরে গেলে আমার মৃতদেহটি তুমি শূলে বসিয়ে দেবে এ অঙ্গীকারটুকু তোমায় করতে হবে আজ।"

হলধর একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, ক্ষীণস্বরে বার দুই আপত্তি জানাল, কিন্তু নফরের কাতরতা দেখে শেষটা রাজী হ'ল সে।

মাস দুই পরে, একদিন সকালবেলা নফরের ছোট ছেলে কেনারাম হলধরকে এসে খবর দিলে, নফর মারা গেছে।

প্রতিবেশীদের সামনে নফরকে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য হলধর তৎপর হয়ে উঠল।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে করে হলধর যখন নফরের বাড়ি এসে হাজির হ'ল তখন বেলা দুপুর। এসে শুনল নন্দ বাড়ি নেই, পাশের গাঁয়ে গেছে মাসীকে খবর দেবার জন্য—ফিরবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। বেশী দেরি করা সমীচীন হবে না, শূলে দেবার পর শবযাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্মশানও অনেকটা দূরে—ক্রোশ তিনেক পথ। নফর মারা যাবার আগেই একটা শূল গড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। সবাই মিলে সেই শূলটা পুঁতলো উঠোনের মাঝখানে, তারপর নফরের মৃতদেহটা এনে বসিয়ে দিলে তার ওপর।

হলধর ব্যস্ত হয়ে পড়ল—নন্দ ফিরছে না কেন? নন্দকে যে চাই-ই—বড় ছেলে, বাপের মুখাগ্নি করবে সে।

শূলের ওপর বসানো নফরের মৃতদেহটা ঘিরে গাঁয়ের মাতব্বরেরা যখন উদ্বিগ্নভাবে নন্দর জন্য অপেক্ষা করছে, ঠিক সেই সময় নন্দর গলা শোনা গেল সদর দরজার কাছে।

"ঐ দেখুন, দারোগাবাবু, আমার বাবাকে শূলে দিয়েছে ওরা!" বলতে বলতে নন্দ এগিয়ে আসে। সবাই অবাক হয়ে দেখলে নন্দর পিছনে দারোগা আর জন চারেক কনেষ্টবল।

ব্যাপার দেখে বেজায় ভড়কে গেল মাধব ভটচাযি্য। "ও বাবা পুলিস যে! খুনের দায়ে ধরে নিয়ে যাবে নাকি?" কনষ্টেবলের পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে। দারোগা হুঙ্কার করে উঠল, "পাকড়ো!"

হলধর যেন পাথর হয়ে গেছে, নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে রইল নন্দর মুখের পানে।

পোনার বিপদ

শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুর ভেতর কিছু নয়, বলে যেমন পা ছুঁইয়েছে, ধাঁই করে একটা চাটি মেরে বসল ট্যারা তপু।

খবদ্দার বলে দিচ্ছি বল তুই ছুঁবিনি।

পোনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল ওর দিকে। বারে বা, তুই মারলি কেন?

বেশ করেচি মেরেচি। একশ'বার মারব। আবার বলে পা দিলে আবার মারব। সেদিনের ম্যাচে দু'গজ দুর থেকে একটা শট নিতে পারলি না, আবার কথা!

মিথ্যে বলেনি ট্যারা তপু। সেদিনের ম্যাচে গোলের সামান্য দূর থেকেও ও সট নিতে পারেনি। তার জন্যেই ওরা হেরেছে। ও যদি সে শটটা করতে পারত, তবে গোলের সংখ্যাটা সমান সমান হোত। হারতে হোত না। সেই থেকে দিন পাঁচেক মিইয়ে ছিল পোনা। ট্যারা তপু মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু মনে মনে বোধহয় ঠিক করেই রেখেছিল যে বল ছুঁলেই ওকে মারবে।

মারলে কিছু বলবার নেই। ট্যারা তপুর হাত-পায়ের গুলি আর থ্যাবড়া নাকখানা দেখলে ভয় করে না এমন ছেলে নেই। কাজেই উলটে ওকে মারতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তবু পোনা তেড়েমেড়ে একবার বলল,— দাদাকে বলে দোব।

ওর দাদা ভারী রাশভারি। পাড়ার সব ছেলে তাকে ভয় করে।

ট্যারা তপু একটু দমল না। বললে—বলেই দেখ না। যেদিন বলবি, তার পরের দিন রাস্তায় ধরে প্যাঁদাব। আবার বলবি, আবার প্যাঁদাব; আবার বলবি, আবার প্যাঁদাব। দ্যাখ, বলে দ্যাখ।

পোনা জানত, ট্যারা তপু যা বলেছে, তার অন্যথা হবে না। দাদাকে বলাও চলবে না। তবু এত ছেলের সামনে নিজের মান বাঁচাবার জন্যে একটু তড়পাল,—বেশ, দেখে নেবো।

দেখে নোব—কথাটা যে কত অর্থহীন তা ট্যারা তপু জানে, পোনা নিজেও জানে। ট্যারা তপু হাসতে লাগল—যা যা, কত দেখবি দেখে নিস।

পোনা বাড়ি চলে এল। মনটা ভারী খারাপ লাগছিল। শুধু আজ বলে নয়, বরাবরই ওকে অনেক হেনস্তা সইতে হয়। দেহের মধ্যে মাথাটা ওর বড়। আর হাত-পায়ের

গাঁটগুলো মোটা। পাড়ায় ওর নাম খ্যাংরাকাঠি আলুর দম। অর্থাৎ একটা খ্যাংরাকাঠির মাথায় একটি আলুর দম বসিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয়, তেমনি আর কি।

কিছু বলার নেই। তবু রাগ আর ক্ষোভে কান্না পায়, কাঁদলেও লুকিয়ে কাঁদতে হয়। অন্ততঃপক্ষে একটা ডাগড়াই বন্ধুও যদি থাকত!

পরের দিন থেকে বিকেলে আর বেরোবে না ঠিক করল পোনা। ধুর, বেরিয়ে শুধু মার খাওয়া আর টিটকিরি শোনা! ও বাইরের ঘরের সামনের রোয়াকে গিয়ে বসল।

ঘরের ভেতর দাদা কাজ করছে। কাঁচের নল, কাঁচের 'জার', ছোট ছোট গেলাস নানা ধরণের শিশি। কাঁচের চামচ আরও কত যন্ত্রপাতি। বাবা বলেন, দাদা নাকি কি সব গবেষণা করে। বিজ্ঞানে নাকি দাদার মাথা খুব পরিষ্কার।

ও রোয়াকে বসে বসে দাদার কাজ দেখছিল। কত রকমের জল কাচের নলে আর কাঁচের ছোট ছোট কলসীতে। এটা থেকে ওটায় ঢালছে, আবার ওটা থেকে এটায় ঢালছে। কাঁচের কলসীর নীচে গ্যাসের আগুন জ্বলছে। মাঝে এটার ওটার ভেতর কি সব গুঁড়ো মেশাচ্ছে। মন্দ নয়। গবেষণা মানে ও জানে না। তবে এ খেলাটা মন্দ নয়। একমনে বহুক্ষণ খেলা করা যায়।

কি রে, তুই এখানে কি করছিস?

দাদা ওর দিকে তাকাল।

দেখচি।

কি দেখচিস? বলে দাদা একটা কাঁচের কলসীর সবুজ ফুটন্ত জলে কি একটা গুঁড়ো ফেলে দিল।

পোনা বললে—তোমার রান্না দেখছি, ওই ঝোলে বুঝি মশলা দিলে?

দাদা হেসে ফেলল—বলিচিস ঠিকই। মশলাই দিলুম। বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—এ রান্না বড় শক্ত। মশলা ঝাল একটু কম বেশী হলে সব নষ্ট হয়। একেবারে মাপে মাপে হতে হবে। তুইও বড় হয়ে এ রান্না শিখবি।

পোনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সব দেখছিল।

হঠাৎ দাদা একটা ছোট কাঁচের নলে খয়েরী খানিকটা জল ভরে পোনার দিকে তাকিয়ে বললে—আয় তো ইদিকে।

পোনা ঘরে ঢুকল। দাদার কাছে এগুল।

দাদা বললে—হাঁ কর।

পোনা হাঁ করল। দাদা কাঁচের নল থেকে ওষুধের মত ওই জলটা ওর গলায়

ঢেলে দিলে। পোনা গিলে ফেলল। দাদা যেন আপন মনেই বললে—হয়তো কোন কাজ হবে না। দেখা যাক, তোর ওপর পরীক্ষা করে দেখি কি হয়!

পোনা দাদার কথা ভাল করে বুঝল না। তবে এইটুকু বুঝল, তাকে একটা ওষুধ-বিষুধ কিছু দাদা খাইয়ে দিয়েছে।

সেদিন বিকেলে আর পোনা কোথাও বেরুল না। সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে ঘুম লাগালো। বরাবরই এক ঘুমে ভোর হয়। আজও তাই হোল।

ভোর বেলা পোনা সকলের আগে উঠে রাস্তার রোয়াকে গিয়ে বসে। খাবার সময় মাকে ডেকে মায়ের আঁচল থেকে পয়সা নিয়ে খায়। চন্দ্রপুলিওলা সকাল বেলা রাস্তা দিয়ে যায়, ও চার পয়সা চন্দ্রপুলি খায়।

আজ মাকে ঠ্যালা মারতেই মা তিনপাক গড়িয়ে গেল। উঠে চোখ পাকিয়ে বললে—এমন করে ধাক্কা মারে মুখপোড়া!

পোনা অবাক।—বারে, আমি তো আস্তে—

এই তোমার আস্তে ঠ্যালা মারা, যা বেরো।

মা আবার শুয়ে পড়ল।

পোনা মায়ের আঁচলটা টেনে বাঁধন খুলে পয়সা নিতে গিয়ে যেমন আঁচলটা ধরে টানল, আঁচলটা পড় পড় করে খানিকটা ছিঁড়ে গেল।

দিলি তো কাপড়খানা ছিঁড়ে! তোর আজ হয়েছে কি!

পোনা অবাক। ও তো বেশী জোরে টানেনি। আঁচালটা ছিঁড়ল কি করে?

পোনা উঠল। দোর খুলে বেরুতে হবে। দোরটা বরাবরই খোলা ওর পক্ষে অসুবিধা হয়, অনেক টানা-হেঁচড়া করে খুলতে হয়। দোরটা একবার বন্ধ করলে এমন আঁট হয়ে বসে যায় যে সহজে খুলতে চায় না। পোনা আস্তে আস্তে গিয়ে দোরটা ধরে জোর টানল। টানামাত্র দোরটা তো খুলে গেলই, দোরের লোহার কড়াটা ভেঙে ওর হাতে চলে এল।

কি সর্বনেশে কাণ্ড! লোহার কড়াটা ভেঙে ফেলল পোনা। মায়ের ভয়ে ও ভাঙা কড়াটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে ভাবল কড়াটা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, যাতে মা টের না পায়!

রোয়াকে আস্তাকুঁড়ের দিকে লোহার কড়াটা ছুঁড়তেই ও দেখল, সেটা আস্তাকুঁড়ে না পড়ে বন্ বন্ করে ছুটো বাড়ি পেরিয়ে কোথায় গিয়ে পড়ল! পোনার বুক কাঁপতে লাগল। একি ব্যাপার! সে তো এমন জোরে ছোঁড়েনি। আর গায়ের জোরে ছুঁড়লেও তো

অদ্দুর অব্দি কোন ঢিলও সে পার করতে পারেনি। তাকে ভূতে-টুতে ধরেনি তো! না, ভূতে তো ধরেনি। এই তো দিব্বি সে বসে রয়েছে। সে চারদিকের সব দেখতে পাচ্ছে। ভূতে ধরবে কেন!

পোনা ভয়ে ভয়ে চুপচাপ রোয়াকে বসে রইল। হাত পা নাড়তে তার ভয় হচ্ছিল।

রোদ উঠল। রাস্তার লোকজন দেখে সময় কাটছিল।

ভীষণ খিদে পেয়েছে, বাড়িতে ঢুকতেও ভয় হচ্ছে। কিন্তু কি করতে আবার কি হয়ে যাবে কে জানে!

'ট্যারা তপু ডিগবাজী খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ল।'

রাস্তায় দেখল ট্যারা তপু এক ঠোঙা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ওকে দেখে ট্যারা তপু বলে উঠল—কি রে কাল যে বড় মাঠে গেলি না?

ও বলল—মাঠে আর যাব না।

ট্যারা তপু এগিয়ে এল,—তোর ঘাড় যাবে। মাঠে গিয়ে খেলা দেখবি, খেলতে পাবি না।

তবে রে! ব'লে ট্যারা তপু এগিয়ে আসতেই ও ভয়ে ভয়ে ট্যারা তপুকে একটা ধাক্কা মারল। চোখের পলকে ট্যারা তপু তিনটে ডিগবাজী খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ল। রাস্তা থেকে উঠে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে পালাল।

পোনা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে বুঝতে পারল, কোন কারণে হঠাৎ ওর গায়ের জোরটা বোধহয় বেড়ে গেছে। দেখাই যাক।

রাস্তার পাশে একটা ইটের টুকরো পড়েছিল। তুলে নিয়ে দু'হাতে করে একটু চাপ দিতেই ইটের টুকরোটা গুঁড়ো হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ঠিক। তার গায়ের জোর বেড়েছে। তার গায়ে জোর নেই বলে সে ভগবানকে ডেকেছিল, ভগবান হয়তো তার গায়ে খুব জোর দিয়ে দিয়েছে। ভয় কেটে গেল পোনার। ফুর্তিতে ওর মনটা নেচে উঠল। এইবার সে ট্যারা তপুকে দেখে নেবে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে! বাড়ির ভেতরে ঢুকে মাকে বললে,—খেতে দাও মা।

বোস ওখানে, পাউরুটি দুধ দিচ্ছি।

পোনা তক্তপোশটায় বসতেই তক্তপোশটা মড়মড় করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল পোনা। ও এখন জানে তক্তপোশে একটা ঘুষি মারলে ওটা ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। থাক, মাকে জানাবার দরকার নেই। ও মাটিতে বসল।

ভিজে মাটিতে বসলি কেন, সর্দি-জ্বর হবে যে!

কিচ্ছু হবে না। তুমি খেতে দাও।

মা পাঁউরুটি দুধ দিল একটা বাটিতে। দুধ পাঁউরুটি খেয়ে নিয়ে বাটিটা একটু তুলে সরিয়ে রাখতেই ঠং করে আওয়াজ হয়ে কাঁসার বাটিটায় টোল পড়ে গেল।

একটু আস্তে জিনিস রাখা যায় না। দিলি বাটিটা বেঁকিয়ে! যা পড়তে বসগে যা।

পোনা উঠে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইচ্ছে করে সিঁড়িতে জোরে পা ফেলতেই সিঁড়ি কেঁপে উঠল। একি রে বাবা, সিঁড়ি ভেঙে পড়বে নাকি। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল। বইপত্তর নামিয়ে বইটা জোরে খুলতেই বইখানা দু'খানা হয়ে ছিঁড়ে গেল। খাতা বার করে পেন্সিল চেপে খাতায় লিখতে যেতেই পেন্সিলটা মড় মড় করে ভেঙে গেল। এই মাটি করেচে! ও তো মহা বিপদে পড়ল। আজ ও ইস্কুল যাবে কি করে? কে জানে ইস্কুলে গিয়ে বেঞ্চিতে বসতে গেলে বেঞ্চিটা মড় মড় করে ভেঙে পড়বে কিনা! গায়ের জোর খুব বেড়েছে ভেবে একটু যে আনন্দ হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী হচ্ছে অস্বস্তি আর ভয়। বাড়িতে নড়াচড়াটা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে করতে হচ্ছে। মেজেতে পা ঠুকে জোরে লাথি মারলে কে বলতে পারে মেজেটা হুড়মুড় করে নীচের তলায় ভেঙে পড়বে কিনা! বাড়িতে থাকাই বিপদ হোল, এক কাজ করা যাক, তিনুদের বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ খেলে আসা যাক। বাড়িতে থাকা বিপদের কথা, কখন হাত পা নাড়তে গিয়ে কি হয় কে জানে!

পোনা পাশের বাড়ির তিনুর কাছে চলল। পাশের বাড়ির সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই ভয় হোল, সিঁড়িটা পুরোন, জোর কদমে উঠতে গেলে ভেঙে না পড়ে! আস্তে আস্তে সন্তর্পণে ওপরে উঠে তিনুকে ডাকল। তিনু আর তিনুর বোন লুডো খেলছিল।

ও গিয়ে বলল—আমি খেলব।

খুব আলগা করে আস্তে আস্তে খেলা শুরু করল। ওদের গুটি বেরিয়ে গেল, পোনার ছক্কাও পড়ে না, গুটিও বেরোয় না। বিরক্ত হয়ে পোনা—ছ-অ-ক্কা ব'লে একটু জোরে যেমন দান চেলেছে, চৌকো ছক্কাটা নিমেষে ঘরের বাইরে যেন উড়ে চলে গেল।

দিলি তো ছক্কাটা হারিয়ে?

পোনা আর কথা না বলে উঠল ওখান থেকে। বাড়ি এসে সমস্ত দিনটা প্রায় শুয়ে কাটাল, নড়তে-চড়তে ভয় হচ্ছে, পাছে কিছু একটা ভেঙে পড়ে।

বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুল। মাঠে যাওয়াই ভাল, তবু একটু নড়ে-চড়ে বেড়ান যাবে। সমস্ত বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। ক্রমেই ওর অস্বস্তিটা বাড়ছিল, মনটা একেবারে ভাল লাগছিল না। এত গায়ের জোর হলে তো তার মহা বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

মাঠে এসে পৌঁছতেই ট্যারা তপু ওকে দেখতে পেয়েই ভয়ে ভয়ে ওর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য ছেলেরাও ওর দিকে যেন ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল।

কি রে, তোরা অমন কচ্ছিস কেন? বলে একটা ছেলের কাঁধ ধরে নাড়া দিতেই ছেলেটা ওরে বাপ রে বলে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল। ও নিজেই একটু অবাক হয়ে গেল, এ কি রে বাবা! গায়ের জোরটা যেন আরও বেড়ে গেছে।

কি বলবে কি করবে ঠিক করতে না পেরে ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। ছেলেগুলো ভয়ে অনেকটা দুরে সরে দাঁড়িয়েছে। ও পড়ে থাকা বলটায় একটা সট্ করে ওদের দিকে দেবে ভেবে বলটা মারতেই বলটা শূন্যে উঠে বাবুই পাখীর মত এতটুকু হয়ে মাঠ পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে, এক চারতলা বাড়ির ছাতে গিয়ে পড়ল।

ছেলেগুলো দেখে সবাই ট্যারা তপুর মত ট্যারা হয়ে গেল।

পোনা আর দাঁড়াল না। এর পর কি করতে কি হবে, মাঠে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড শুরু হবে। ও ভয়ে ভয়ে বাড়ীর দিকে ফিরল।

মনটা ওর ভীষণ খারাপ। এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল! তার গায়ের জোর যদি এ রকম বাড়তে থাকে, তবে তো বন্ধু-বান্ধব ওকে দেখে ভয় পাবে, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না, বল খেলতে গেলে বল উড়ে যাবে, লুডো খেলতে গেলে লুডো উড়ে যাবে, ইস্কুলে বসতে গেলে বেঞ্চি ভেঙ্গে পড়বে, বই খুলতে গেলে বই ছিঁড়ে যাবে! এ কি আপদ! এর চেয়ে গায়ের জোর না থেকে সে অনেক ভাল ছিল। পোনা বাড়ির বাইরের ঘরের সামনে এসে কেঁদে ফেললে। দাদা বাইরের ঘরে কাঁচের নল, কাঁচের কলসী নিয়ে গবেষণা করছিল। ওকে দেখে বললে—কি রে কাঁদছিস কেন? এদিকে শোন।

পোনা দাদার কাছে গেল।

কি হয়েছে?

পোনা দাদাকে সব কথা বললে।

দাদা শুনে খুব খুশী।—যাক, আমার পরীক্ষাটা খানিকটা ঠিক হয়েছে, ভয় নেই। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানিস তোর ওজন বেড়ে গেছে। ওজনটা কি জানিস?

পোনা অবাক হয়ে তাকাল।

ওজন মানে হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণ। আমাদের যা কিছু দেখছিস, মাটির ভেতর থেকে পৃথিবী সব কিছু টানছে, মানে আকর্ষণ করছে। যে জিনিসটা যত বেশী টানছে, সে জিনিসটার ওজন তত বেশী। আমি কাল তোকে যে লোশনটা খাইয়ে দিয়েছিলুম, ওটা খাবার পরেই পৃথিবী তোকে বেশী টানতে শুরু করেছে। তাই তোর মনে হচ্ছে গায়ের জোর বেড়েছে। দাদা ওর পিঠ চাপড়াল,—এটা থাকবে না। কালকেই কমে যাবে। দেখি—বলে দাদা পোনাকে দু'হাতে ওঠাবার চেষ্টা করে পারল না।

বাব্বা! এখন তোর ওজন খুব বেড়ে গেছে। দশ মণের ওপর। যা সন্ধ্যের পর খেয়েদেয়ে ঘুমো। কাল থেকে দেখবি ওজন আবার কমে যাবে।

পোনা যেন বাঁচল।—সত্যি বলছ কমে যাবে?

হঁ্যা, কমে যাবে!—যা পালা।

পোনা এতক্ষণে হাসতে পারল।

কে আছেন মায়ের মতন

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

ঠাকুমা আমাকে চকোলেট দিতেন,
দিদিমা আমাকে চকোলেট দিতেন;
  এখন দেন না, আমি যে বড় হয়েছি!

পিসীর কাছ থেকে কত টফি পেতাম,
মাসীর কাছ থেকে কত টফি পেতাম;
  এখন পাই না, আমি যে বড় হয়েছি!

কাকা ব্যাট-বল-ঘুড়ি কিনতেন,
মামা কত কি খেলনা কিনতেন;
  আর কেনেন না, আমি যে বড় হয়েছি!

দাদু লাল-নীল পোশাক আনতেন,
বাবা ছড়া-ছবির বই আনতেন;
  আর আনেন না, আমি যে বড়ো হয়েছি!

মা রাতদিন আমায় কত আদর দিতেন,
মা রোজ রোজ আমায় কত খাবার দিতেন;
  এখনো তা দেন, যদিও বড়ো হয়েছি।

চাঁদের দেশে

শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন

চাঁদ ছিল যে স্বপ্ন সবার,
ছিল জ্যোৎস্নাময়ী,
চাঁদকে এবার জয় ক'রে ভাই
মানুষ হলো জয়ী।

চাঁদের বুড়ি কাটতো সুতো
লক্ষ সে যুগ থেকে,
হকচকিয়ে উঠলো এবার
অচেনা লোক দেখে ;

শুধায় ত্রাসে : 'তোমরা কেগো,
কি তোমাদের নাম ?'
মানুষ বলে : 'পার্থিব নর,
খুঁজি নতুন ধাম।'

হঠাৎ বুঝি পায়ের কাছে
পড়লো পাহাড় ভেঙে !
মানুষ দেখে—পাহাড় তো নয়,
চাঁদ উঠেছে রেঙে।

পাথর দিয়ে পিটোনো তার
শরীরখানা খাসা,
গ্রানাইট দিয়ে ভাঙ্‌লে পরে
গড়তে পারে বাসা।

ইচ্ছাটা যেই প্রকাশ করে
এই পৃথিবীর লোক,
চাঁদের বুড়ি মুষড়ে পড়ে
পেয়ে গভীর শোক।

এবার বুঝি চাঁদ থেকে তার
বিদায় নিতে হয়,
বৃদ্ধকালে এমন শোক আর
কেমন ক'রে সয় !

এমন সময় 'গ্রহণ' লেগে
চাঁদকে দিল ঢেকে,
চাঁদের দেশে হঠাৎ সে কে
আঁধার গেল এঁকে !

ফোটোগ্রাফে চিত্র কিছু
নিয়ে কয়েক জন
চন্দ্র ছেড়ে স্পুটনিকেতে
হলো অদর্শন।

চাঁদের বুড়ি ব'সে ব'সে
ফেলে চোখের জল ;
মানুষ গড়ে চাঁদ-পাহাড়ের
পাথর ভাঙ্গা কল।

এই দিনে এই ইতিহাসের
পরের কথা বলি :
তুমি আমি সবাই এস
চাঁদের দেশে চলি।

পৃথিবীটা মন্দ হ'য়ে
উঠছে দিনে দিনে,
চলো গিয়ে বাস করি ভাই
চাঁদের জমি কিনে।

ইচ্ছা করে যাই

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

কতদিন থেকে বাড়ীটা খালি পড়ে আছে। একেবারে পাশের বাড়ী রিণ্টুদের। তাই রিণ্টু মনে মনে ভাবতো—বাড়ীটায় ভাড়া আসে না বা যাদের বাড়ী তারাও আসে না, কিন্তু যদি আসতো বেশ হতো, তার মত ছেলেমেয়ে থাকলে বন্ধুত্ব হতো, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলবার সাথী খুঁজতে সেই মোড়ের মাথায় পাপিয়াদের বাড়ী যেতে হতো না।

মাও তো বলেন রিণ্টু শুনেছে: কী বাপু খালি বাড়ী আর কতদিন রাখবে, কোনদিন কে ঢুকে পড়বে তখন বুঝবে। বাড়ীওয়ালা কি আজকালকার ব্যপার কিছু বোঝে না?

কেউ যদি ঢুকে পড়ে আর তাদের যদি ছোট ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে আর কেউ না হোক রিণ্টু তো বাঁচে, একটা বন্ধু হয়। রোজ রোজ রাস্তা পার হয়ে মোড়ের কাছে যেতে ভাল লাগে না—আবার না গেলে বিকেলটা একটুও খেলাধুলো হয় না। বিকেলে ছুটে ছুটে না খেলে কি শুধু খেলনা-বাটি নিয়ে খেলতে ভালো লাগে?

রিণ্টু তাই রোজই তাকিয়ে থাকে সতৃষ্ণ নয়নে—বাড়ীটার দিকে। কিন্তু বন্ধ দরজা জানালা একভাবেই থাকে—খোলে না।

তাই যেদিন বিকেলবেলা পাপিয়াদের বাড়ী না যাওয়া হয়, সেদিন ঘাড় হেঁট করে বসে ঘরের ভিতর খেলতে হয়। ঐদিকে রিণ্টু আর তাকায় না—কারণ ইচ্ছা হলেও তো যাওয়া হবে না।

শোবার ঘরে খাটের রুজু রুজু যে জানলা সেটা খুললেই পাশের বন্ধ বাড়ীটার একটা জানলা ঠিক সামনেই দেখা যায়। এই জানলার দিকে তাকিয়ে কতদিন ভেবেছে: কোনদিন সকালে উঠে সে যদি দেখতে পেতো ঐ জানলাটি খুলে গেছে, আর মিষ্টুর মত একটা মেয়ে কিংবা ববির মত একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে—ইস্ কী মজাই না হতো!

কিন্তু অনেক দিন অনেকবার ভেবেছে রিণ্টু আর সব ভাবনাগুলো এমন বিফল হয়েছে যে সে রাগ করে বিরক্ত হয়ে ঐ জানলাটা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। মা যদি জানলা খুলে দেন ও অমনি গিয়ে ধড়াস করে বন্ধ করে দেয়। মাঝে মাঝে রেগে ওঠেন: ওটা কি হচ্ছে রিণ্টু, ঘরে কি হাওয়া-বাতাস আসবে না? কি ভেবেছ তুমি?

—আমি যখন স্কুলে যাবো তখন তুমি খুলে দিও, বড্ড চোখে লাগে আমার, বেশী আলো আসে।

—মেয়ের সব বিচ্ছিরী, আলো-বাতাসের জন্য মানুষ মরছে, আর ওর নাকি চোখে আলো লাগছে—বলতে বলতে মা নিজের কাজে যান।

জানলাটা বন্ধই থাকে।

মনের দুঃখ যখন সহ্য হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন রাত্রে রিণ্টু স্বপ্ন দেখলো—বন্ধ জানলাটা কে যেন খুলে দিয়েছে, আর পাশের বাড়ীর জানলাটাও খুলে গেছে। ঘরটা বেশ দেখা যাচ্ছে, সাজসজ্জার বাহুল্য অনেক, আর তার মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন ভিড় করে খেলছে, ফুঁ দিয়ে ফানুস ওড়াচ্ছে! জলের ফোঁটার মত সার বেঁধে উপর দিকে উঠছে—একটা ছেলে শিশি থেকে কি যেন নিয়ে গাল ফুলিয়ে ওড়াচ্ছে—কমলানেবু, আপেল, বিস্কুট, চকোলেট নিয়ে ছুঁড়ছে ধরছে—ভালো জামাকাপড় পরেছে সবাই, বেলুন ওড়াচ্ছে—বাঁশী বাজাচ্ছে, চুলে রিবন বাঁধা মেয়েগুলো—কেমন ইংরেজী সুরে মাঝে মাঝে গান করছে।

কী অসম্ভব কাণ্ডই না চোখের সামনে ঘটছে।

এতকালের বন্ধ বাড়ীটায় কখনই বা লোকজন এলো, কখনই বা এমন আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হলো—কিছুই তো বুঝতে পারছে না রিণ্টু। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে, মনে ভাবছে এইরকম উৎসব বড়দিনের সময় সে মিসেস ওয়াটলিং-এর বাড়ী দেখেছে। মার বন্ধু আণ্টি ওয়াটলিং—বড়দিনের সময় সব্বাইকে নেমন্তন করেন। মার সঙ্গেও গেছে, আবার মা যখন যেতে পারেন নি—কার্ড আর ফুল নিয়ে সে নিজে গেছে আর ঐ ছোটদের দলে মিশে গেছে।

এইরকম আলো-ঝলমলে বড়দিন বেশ লাগে রিণ্টুর। কেকের স্বাদটাও ভালো। সাহেব পাড়ার সিনেমা হাউসে ছবি দেখতে গেলেই সে বড়দিনের উৎসবের গন্ধ পায়।

কিন্তু ওরা এলো কখন আর ব্যবস্থাই বা হলো কি করে। স্কুল যাবার সময়ও সে দেখছে বন্ধ বাড়ীর গায়ের মস্ত তালাটা।

ওমা! ওরা যে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে? ঐ দেখ মেয়েটা এখনও শুয়ে আছে।

সার্কাসের ক্লাউনের মত সাজ সেজে যে ছেলেটা তার দিকে চেয়ে হাসছে, ওকে কোনদিন দেখেছে বলে তো রিণ্টু মনে করতে পারে না। তবু ভদ্রতা করে একটু হাসতেই হয়। জানলাটা কে যে খুলে দিল, একেবারে খাটের সামনে ওদের দেখা যাচ্ছে। কি করি, জানলাটা বন্ধই বা করি কি করে?

ওদের হাসাহাসি,—মাঝে মাঝে হাত নেড়ে ডাকাডাকি একটুও থামছে না।

কিন্তু এ আবার কি একরাশ অন্ধকার! চোখ দু'টো রগড়ে নিলো রিন্টু—নাঃ, লোকজন আলো ফুল বেলুন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রিন্টু, ওঠো ওঠো আর কতক্ষণ ঘুমোবে? মায়ের কথা শুনে উঠে পড়লো। চারিদিক তাকিয়ে সামনের বন্ধ জানলাটা খুলে দিল। রাত্রির কথা মনে হতে সে ভাল করে তাকালো।

নাঃ, তেমনি বন্ধ! অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে রিন্টু উঠে গেল। সারাদিন ভারী খারাপ কাটলো। মাঝে মাঝে রাত্রির স্বপ্নর কথা মনে হচ্ছে আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

স্কুলের দিদি ক্লাসে বললেন: আজ তোমার কি হয়েছে? অমনি সব সহপাঠিনীরা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। লজ্জায় রিন্টুর মুখ লাল হয়ে উঠলো।

বিকেলে বাড়ী এসে কোনদিকে না তাকিয়ে ঝুপ করে বইপত্তর ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সামনের জানলা বন্ধ হয়নি। আর ওকি? ওদের বাড়ীর জানলাটাও যে খোলা। মাথাটা তুলতেই দেখলো একজন রাজমিস্ত্রী বালতিসুদ্ধ চুন গোলা নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে।

তাহলে? নাঃ, রিন্টু আর ভাববে না। এইজন্য সব সময় তাকে বকুনী খেতে হয়। আর না।

কিন্তু বাড়ীটা কবেই বা রং ফেরানো হলো?

স্কুল থেকে ফিরে রিন্টু আগে গিয়ে ছুটলো তাদের জানলার কাছে। ঝটাক শব্দ করে খুলে দিলো জানলাটা। এখন সে ভাল করে দেখবে ব্যাপারটা কি! হ্যাঁ, ও-বাড়ীর জানলা বন্ধ, কিন্তু কই লোকজন কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও কারুর সাড়া-শব্দ পেলো না। খাবার খেতে খেতে বললে: ও-বাড়ীটায় কবে লোক এসেছে মা, কবেই বা রং করেছে?

মা বললেন: তুমি তো জানলা খুলতে দেবে না, কি করে জানবো বল? কিছুদিন থেকে মিস্ত্রী কাজ করছিল, কি জানি কারা এসেছে কিনা।

আবার উৎসাহ নিয়ে রিন্টু চেষ্টা করে, কেউ আছে কিনা দেখতে, কিন্তু কিছুই তো দেখা যায় না। একদিন রাগ করে বলে উঠলো: দূর ছাই ভুতের বাড়ী, ওতে আবার লোক থাকে নাকি। ভুতরা থাকে, তারাই এসেছে, তাই দেখা যায় না। যদি কোনোদিন কাউকে দেখতে পাই এমন জিব ভেঙাবো, তখন বুঝতে পারবে ওরা। আর সাতজন্মে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো না, অমন বন্ধু চাই না!

ভাবতে ভাবতে রাগে দুঃখে রিণ্টুর চোখে জল এসে গেল। এতদিন ধরে ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে—কিন্তু বন্ধ বাড়ী আর খোলে না। ওদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দু'টো ব্যথা হয়ে গেল যে। আর তাকাবেই না।

তবু দেখে—মনে মনে যতই বলুক চোখ যায়—তারপর ভাবে: বন্ধ তো থাকবেই, কেন যে চোখ যায়! একদিন তপু আর ঝণ্টুকে বলবো ওদের সদর দরজায় এক জোড়া ভূত-পেত্নী এঁকে দিয়ে আসতে। আমার মত সকলেই বুঝে নেবে ওটা মানুষ থাকার বাড়ী নয়। তা যদি হতো তাহলে এতদিন জানলা খুলে যেতো। এর জন্ম হয়তো তপু আর ঝণ্টুকে পাঞ্জা বরফ, আলুকাবলী, আর ঝাল ছোলা খাওয়াতে হবে। আর এই জন্ম মায়ের কাছে আবার দরবার করতে হবে, দু'টো টাকা তো চাইই।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই খেলতে গিয়ে তপু আর ঝণ্টুকে মনের কথাটা বলে ফেললে। তপু আর ঝণ্টু সেরা ছেলে, তার মানে দুষ্টুমিতে তাদের একজোড়ার মত আর দেখা যায় না।

কিছুতেই রাজী হয় না তারা, বলে: দূর ওসব ছেলেমানুষী, কেন না ভূত-পেত্নী এঁকে নোংরা হবে আর তো কিছু নয়।

রিণ্টু বললে: তা হোক, ওদের দরজা ময়লা হবে তাতে আমাদের কি!

আর ময়লা করেই বা আমাদের লাভ কি? ঝণ্টু উত্তর দিলে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো রিণ্টু: আহা, সবই যেন তোরা ভেবে-চিন্তে করিস,—ভারী সাধু সাজা হচ্ছে দেখছি।

অবশেষে তাদের রাজী করানো হলো, পাঞ্জা বরফ, আলুকাবলীর ব্যবস্থায়।

দেখবো না মনে করেও বারে বারেই যেন চোখ ওদিকে যাচ্ছে। জানলাটা কিছুতেই খুলতে দেবে না রিণ্টু মাকে। তার মনের রাগ কেটে গেলে তখন সে যা হয় করবে। সেদিন মা'কে গিয়ে সোজা বললে: দু'টো টাকা দাও না মা!

কেন? একেবারে দু'টো টাকা? বন্ধুদের বইটই নিয়ে হারিয়ে ফেলেছ বুঝি? কিনে দিতে হবে? না কারুর জন্মদিন? মার প্রশ্নের উত্তরে রিণ্টু বললে: না একটাও না। আমার একটা কাজ করে দেবে তপু আর ঝণ্টু। তাই ওদের খাওয়াতে হবে।

কাজ? তোমার কি কাজ থাকতে পারে এমন যার জন্ম টাকা দিয়ে খাওয়াতে হবে? কাল বিকেলে খেলতে এলে ডেকো, আমি খাইয়ে দেবো।

রিণ্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো: ওরা বুঝি ঐসব খাবে? লুচি, পরোটা নয়, আলু চচ্চড়ি আর আলুর দমও নয়, যে তুমি খাওয়াবে। ওরা যা খাবে তা তেমার পছন্দই হবে না। দাও না মা, মোটে তো দু'টো টাকা চাইছি, তাও দিচ্ছ না।

মা হেসে ফেলে বললেন: আচ্ছা আচ্ছা দেবো। কিন্তু তোমার কাজটা কি?

সে তোমার জেনে কি হবে? পরে বলবো তখন।

মায়ের কাছে থেকে দু'টো টাকা নিয়ে রিন্টু ছুটলো পাঞ্চা বরফ আর আলুকাবলীর খোঁজে। পেট ভরে ওদের খাওয়াতে হবে। ওদের দু'জনকে এত তাড়াতাড়ি রাজী করানো গেছে মনে করে খুব খুসী হয়ে উঠলো সে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা নেমেছে।

হঠাৎ বেশ চেঁচামেচি গোলমালের একটা শব্দ কানে আসতেই রিন্টু বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো—তপু আর ঝন্টুর হাত ধরে একজন ভদ্রলোক খুব বকছেন: তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে না? স্কুলে পড়ো না? একি অভ্যাস তোমাদের, নতুন রং-করা দরজা-জানলা, এইরকম ভাবে এসে কালো কালো রং দিয়ে কি হিজিবিজি কাটছো? কোথায় তোমাদের বাড়ী? চলো তো যাই তোমাদের বাবা মার কাছে।

আটকে আটকে তপু বললে: ঐ যে আমাদের বন্ধু রিন্টু—সে বলেছিল।

সে কি বলেছিল আমাদের বাড়ীর দরজায় নতুন রঙের উপর এইসব নোংরা করতে?

রিন্টু ভয়ে পালিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, এখনি ওরা ওর নাম বলে দেবে আর মা বাবার কাছে বকুনি খেতে হবে। মা আবার যেরকম পরিষ্কার! দেয়ালে ঠেস দিতে দেন না, চেয়ারের গায়ে মাথা রাখতে দেন না তেল লাগবে বলে, কতকি করতে দেন না—লোকের বাড়ী নোংরা করবার বুদ্ধি দিয়েছি শুনলে তাকে আর আস্ত রাখবেন না!

রিন্টুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো।

বাইরে তখনও সেই বকাবকির শব্দ আসছে। কতক্ষণ কেটে গেছে রিন্টু মনে করতে পারে না।

আর কোন সাড়াশব্দ নেই বাইরে থেকে। মার কথাও শোনা যাচ্ছে না, বোধহয় কোথাও বেরিয়েছেন।

রিন্টু বন্ধ জানলাটার ছিটকিনিতে টান দিল। শব্দ করে জানলাটা খুলে গেল।

ওমা একি! ও-বাড়ীটার দরজা-জানলা সব খোলা, নতুন কাপড়ের পর্দাগুলো উড়ছে, ঘরের নতুন আসবাবপত্র চোখে পড়ছে, নিয়নের আলোয় ঘর ভরে গেছে।

খাবার টেবিল পাতা আছে পাশের ঘরটায়, কোনাকুনি হয়ে দেখা যাচ্ছে, কারা যেন বসে আছে। বোধহয় খাচ্ছে।

রিন্টু এত অবাক হয়ে গেছে যে আর কিছুই ভাবতে পাচ্ছে না—কি হলো, কেমন করে হলো?

এদিকের জানলার দিকে তাকাতেই রিণ্টুর মত একটি সুন্দর মেয়ে হাসছে দেখতে পেলো। রিণ্টু সেদিকে তাকাতেই বলে উঠলো: আমি রুবি আজ আমরা আমাদের এই বাড়ীতে এসেছি। তোমার বন্ধু তপু আর ঝণ্টু ঐ দেখ এসেছে আমাদের বাড়ীতে। তুমিও এসো।

'একটি সুন্দর মেয়ে হাসছে দেখতে পেলো।'

রিণ্টুর মুখ দিয়ে কথা আসছে না। রুবি বললে: ছোটকাকা ওদের খুব বকছিলেন —সদর দরজায় আলকাতরা দিয়ে ছবি আঁকছিল। ওরা বললে তুমি···

রিণ্টু আর শুনতে পাচ্ছে না। ইস্, কী লজ্জা! কেন যে সে এমন কাজ করতে গিয়েছিল। ভয়ে লজ্জায় চোখ তুলে আবার যখন তাকালো তখন রুবি বলছে: এসো রিণ্টু, আমরা তোমার জন্য বসে আছি, একসঙ্গে খাবো।

আনলা থেকে একটা জামা নিয়ে মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে সিঁড়ি থেকে রিণ্টু চেঁচিয়ে বললে: মা, আমি একটু পাশের বাড়ী থেকে আসছি। আমার বন্ধু এসেছে।

ডাক্তার, ডাক্তার!

শ্রীমতী বাণী রায়

ওই যে ছোট হলদে বাড়ীখানার পাশ দিয়ে বাঁকা রাস্তাটা বা'র হয়েছে, মোড় ফিরলেই তুমি পাবে সেই বিরাট লাল-টুকটুকে বাড়ীখানা। তেতালা বাড়ী। গ্যারেজে মোটরও আছে। অনেকগুলো ঝি-চাকর ঘোরাফেরা করছে, দেখা যায় বাইরে থেকেই।

বেশ বড়লোকের বাড়ী বোঝা যায় সহজে। কিন্তু ওই বাড়ীর মালিক মোটেই বড়লোক ছিল না। দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না সে এতই গরীব ছিল।

তা'হলে লেখাপড়া করে মানুষ হয়েছে বুঝি? পরে টাকাকড়ি করেছে নাকি?

না তো। লেখাপড়া বেশী করেনি। ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারেনি। জমিদারী সেরেস্তার কেরানী বাবা আর পড়াতে পারেনি।

তবে হাতের কাজ শিখেছে বুঝি, নাকি ব্যবসা করে বড়লোক?

হাতের কাজের মধ্যে দিনরাত বসে বসে তাস খেলে। ব্যবসার ধারে-কাছে যাবে কখন? ঘুম থেকে ন'টায় ওঠে। হাতের কাছে চা-বিস্কুট ধরে দিয়ে খাস-চাকর ডাকে, "হুজুর, উঠুন।"

উঠে চা খেয়ে একটু খবরের কাগজ পড়ে নেয়। বসার ঘরে আলমারী ভর্তি বাঁধনো নামী ও দামী বই থাকলেও পড়াশোনা সারা দিনে ওইটুকু।

তারপর তেল মাখতে বসে ছেঁড়া কাপড় পরে। চাকর তেল মাখায়, ডলাই-মলাই করে। তখন ছেলেমেয়েরা যার-যা চাহিদা এসে কানের কাছে শোনায়। সেক্রেটারী বা সরকারমশাই আসেন। সংসারের খরচ, হিসাবপত্রের আলোচনা চলে। তারপরে মার্বেলের মেজে থেকে উঠে যায় বাথরুমে। শাওয়ার-বাথ, জলের টাব মজুদ সেখানে। স্নান সেরে এলে স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি, বাদাম-মিছরির সরবৎ, সেদ্ধকরা একটা আপেল, সরের বাটা, ছানার কাঁচাগোল্লা এনে রাখে। গল্পগুজব করে। তারপর বার হয় একটু বিষয়সম্পত্তির তদারকে, ব্যাঙ্কে, এখানে ওখানে। ফিরে এসে একটায় আহার। পোলাও রোজ চাই, শাদা মিহিচালের ভাতের সঙ্গে। দু'তিন রকম মাছ চাই। ডাল, তরকারী, ভাজা, চাটনী, কি নয়? তারপরে দই, ক্ষীর দুই-ই চাই। অতঃপর ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে ঢালাও কয়েক ঘণ্টা দিবানিদ্রা। সন্ধ্যেবেলা চা নিয়ে আবার চাকরের হাঁক, "হুজুর, উঠুন, সন্ধ্যে হ'ল।" উঠে বসে চা-খায়। সন্ধ্যেবেলা আর কিছু আহার নয়, শুধু একগ্লাস ঠাণ্ডা-করা রেফ্রিজারেটরের ঘোলের সরবৎ ও একগোছা আঙুর। আর বার হয় না বাড়ী সে থেকে। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা একটা গুহার মত ঘরে বসে থাকে

একতলায়। আসল সময় সেইটা। তার কাছে নানারকম লোক আসে। সেই সময়ে তার স্ত্রী-পুত্রপরিবার গাড়ী নিয়ে বেড়ায়। রাত্রি ন'টায় আবার খাবার তৈরি। এবেলা লুচি-মাংস বা পরোটা-রোষ্ট, চপ-কাটলেট, ডেভিল ইত্যাদি। সঙ্গে নানারকম মিষ্টান্ন। খাবার পরে রেডিও শোনে বা লেট্-শোতে সিনেমা যায়। তারপর খাস-চাকর একটা জরির আলোবলাদার রুপোর গড়াগড়া এনে দেয়, পা টেপে ব'সে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

এই জীবন তার। ব্যায়াম করে না, যা-খুশী খায়, মাথাটিও ধরে না জীবনে।

আহা, সুখের জীবন একেই বলে! কিন্তু এই টাকাকড়ি, ধনসম্পত্তির উৎস কোথায়? তবে বুঝি সেই লোকগুলোর সাহায্যে শেয়ার মার্কেট বা ফাট্‌কা-খেলা চলছে?

কিন্তু লোকগুলিকে লক্ষ্য করে দেখলে মোটেই তা মনে হয় না। তারা জীর্ণ-শীর্ণ ক্লান্ত, অসুস্থ গোছের চেহারা। মনে হয়, বুঝি এখনই পটল তুলে ফেলবে। কারুর বা একা আসবার ক্ষমতা নেই, সঙ্গে লোক, ধরে নিয়ে আসছে। সমস্ত বয়সের লোক, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ—সব।

তারা গুহার মত ঘরের পাশের বড় বরখানায় বসে। একে একে ডাক আসে। ওরা বসে থাকে আর ধোঁকে। তারপর হাতে একটা মোড়ক নিয়ে বার হয়। এক মাস, বড় জোর তিনমাসের মধ্যে ফিরে আসে।

অন্য চেহারা! বুড়ো অবশ্য 'যুবো' হয়নি, কিন্তু হয়েছে যেন কায়কল্প করার ফলে অন্য লোক। লাঠি ভর দিয়ে যে বুড়ী এসেছিল, দিব্যি লাঠি ছেড়ে সোজা হয়ে এসেছে। অল্পবয়সী লোক হয়েছে তাগ্‌ড়া জোয়ান। আর তোমাদের মত ছেলেমেয়ে? গালে আপেল ধরেছে তাদের। পেড়ে খেলেই হয়।

তাহলে বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ইনি হচ্ছেন ডাক্তার, প্রকাণ্ড ডাক্তার!

এরা রোগী, ওষুধ নিয়ে যায়। একেবারে সেরে যায়, ফিরে আসে দেখাতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে।

কিন্তু যে স্কুল-ফাইনাল্‌টা পাশ করতে পারেনি, সে ডাক্তারী পড়বে কেমন করে?

পড়লই বা কবে? সারা দিনের মধ্যে কোন চর্চা নেই, কোনও ডাক্তারের সঙ্গে মুখচেনাও নেই।

বাড়ীতে ছেলেমেয়ের হাম জ্বর হ'ল, মাম্‌স্ হ'ল পাশের বাড়ীর ছোঁয়াচ লেগে।

এল প্রকাণ্ড ডাক্তার কল পেয়ে।

স্ত্রী তীর্থে গেল। ফিরে এসে হ'ল কলেরা, পথের খাবার খেয়ে।

এল শহরের সেরা ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার আসে কমই ও বাড়ীতে। উড়োরোগের ছোঁয়াচ ও-বাড়ীতে কখনও-সখনও ভেসে এলেও রোগ নেই। স্বাস্থ্য সকলের দারুণ ভাল।

তবে ডাক্তার !

তিনি একটি মাত্র রোগের ওষুধ দেন। প্রথমে দেন একডোজ, ভাল হয়ে এলে আর একডোজ। প্রথমে টাকা দিতে হয় দর্শনী হিসাবে, দিব্যি মোটা টাকা এবং ওষুধের দাম। কন্‌ট্রাক্ট বেসিস্। সেরে গেলে দ্বিতীয় দফায় টাকা, যার কাছে যত পায়।

ওষুধের নামটি কেউ জানে না ! গুহার মত ঘরের পাশে একটি আধুনিক ঝকঝকে ল্যাবরেটরি। সেখানে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে একা কি করে কে জানে ! ঘরে কেউ ঢোকে না। চাকরবাকর পর্যন্ত না। সন্ধ্যা বেলায় সে নিজের হাতে ঝাঁটপাট দিয়ে রাখে।

এত বড়লোকের হাতে ঝাঁটা ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

তবে যদি কোনক্রমে ঘরখানায় উঁকি দিতে পার দেখবে—কিছু নেই। এককোণে একটি লোহার সিন্ধুক মাত্র। ওপরে একটি বিকট কাঠের ছাঁচে তোলা মূর্তি বসানো। দেখতে মানুষের মত, কিন্তু মানুষ বলে মনে হয় না। তিনি ইষ্টদেবতা এক বুড়োর মূর্তি।

সেই সিন্ধুক থেকে বার হয় শিকড়। দু'ভাগ করা। একভাগ প্রথমে, দ্বিতীয় ভাগ শেষে।

এটাই ওষুধ। একটি মাত্র রোগের ওষুধ সে জানে। লিভার ভালকরার ওষুধ। আর, লিভারই তো সব—লাইফকে ধরে রাখে লিভার। তাই লিভার যাদের ভাল, তাদের কোন রোগই কাবু করতে পারে না।

ওর ওষুধে সারাজীবন লিভার ভাল থাকে।

অমন ওষুধটা শিখল কোথায় ?

শিকড়-বাকড় যখন, তখন নিশ্চয় ওর মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

উঁহু ! ও নিজেই ছেলেবেলায় দারুণ লিভারের ব্যারামে ভুগতো। ওর বাবা-মা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। গরীবের ঘর, ওষুধ-পথ্য কোথায় ? ডাক্তার দেখাবারও পয়সা নেই।

তবে ?

সেই গল্পটি বলতেই এসেছি আজ।

তোমরা আমার সঙ্গে এস। চল কলকাতার কাছে একখানা পুরনো গাঁয়ে যাই। মার্টিনের ছোট ট্রেন ধরে হুস্‌হুস্ করে ছোট ছোট ষ্টেশন পেরিয়ে চল যাই।

গাছপালা ঢাকা গ্রামটির একখানা কুঁড়ে ঘরে ওই লোকটিকে দেখা গেল। তখন বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলে সে। মাটির দাওয়ায় বসে কাশছে। রোগা জিরজিরে মূর্তি, যেন

কাঠি। খেতে পারে না, হজম হয় না। অবশ্য খাবার ঘরে নেই বেশী কিছু, পথ্যই যোগাড় হয় না।

ছেঁড়া কাপড়-পরা মা একখানা ভাঙা কুলোয় খুদ বাছছে। লোকের বাড়ী চেয়ে-চিন্তে চাল-ভাঙানী খুদ যোগাড় করেছে। এখন রেঁধে দেবে ছেলেকে। ছেলে ভারী অসুস্থ। যত্ন-আত্তি করার শক্তি কোথায়! কি হয়েছে বুঝতে পারছে না কেউ। কেবল ভুগছে।

ছেঁড়া-ময়লা পিরাণ, তালি দেওয়া চটি পরা, বাবা এল। এই খর রোদে মাথায় একটা ছাতা নেই। সেরেস্তায় তিরিশটি টাকা মাত্তর পায়। দু'বেলা খাওয়া যোটে না। বাবা দাওয়ায় বসে গামছার বাতাস খেতে খেতে বলল, "ব্যবস্থা করে এলাম খোকাকে ডাক্তার দেখাবার।"

মা বলল, "শিবচরণ ঠিক করে দিল?"

শিবচরণ এদের বন্ধু, মুদী। দয়া করে ধারে চাল-ডাল দেয়।

"হ্যাঁ, কলকাতার ওই যে বড় ডাক্তার এখানে এসে বসেছেন ওই পোড়ো বাড়ীখানা কিনে। একদিক সারানো হয়েছে বাড়ীর মাত্র, প্রকাণ্ড বাড়ী। আজ সন্ধ্যেয় ওঁর ওখানে যেতে হবে। একটা পয়সা লাগবে না।"

মা খুশী হয়ে বলল, "খুব নামডাক হয়েছে এরি মধ্যে। এবার খোকা আমার সেরে উঠবে। আহা, এতদিন ধরে একটা ভাল ডাক্তার দেখাতে পারিনি। কি যে হয়েছে বাছার! ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে।"

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ জমিদারের দারোয়ান ডাক দিয়ে গেল। জমিদারের বুড়ী মা-এর গণেশ পূজার সখ হয়েছে। ফর্দ ধরতে হবে।

বাড়ীর কাজের জন্যে মনিবের কাজে গাফিলতির সাধ্য নেই। অগত্যা বাবা ছেলেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল কখন কোথায় যেতে হবে। ছেলে আগে যেয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসুক। বাবা কাল সকালে যেয়ে ভাল করে শুনে আসবে।

সন্ধ্যাবেলায় ঝোপে-ঢাকা পোড়ো বাড়ীখানার কাছে খোকা পায়ে-পায়ে এল।

পোড়ো বাড়ীখানার ভুতুড়ে নাম ছিল বিলক্ষণ। জমিদারদের এক খুড়োমশাই থাকতেন এখানে। ওর মৃত্যুর পর সকলে কিছুদিন ভয়-টয় পেয়ে বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছিল। বনজঙ্গলের মধ্যে বনজঙ্গল-ঢাকা বাড়ীখানা পড়ে থাকত। কেউ কখনও যেত না। সারা বাড়ী ঝোপেঝাপে ভরা।

এর মধ্যে কলকাতার একজন বড় ডাক্তার শহরের হাসপাতাল থেকে রিটায়ার করে

'এই যে খোকা, এসো।'

পাড়াগাঁয়ে বসবাস করতে এলেন। প্রকাণ্ড বাড়ীখানা জলের দরে পেয়ে তিনি ভাবলেন খুব জিতলাম। জমিদারেরা পোড়ো বাড়ী ঘাড় থেকে নামিয়ে ভাবলেন খুব জিতলাম।

খোকা আস্তে আস্তে বাড়ীখানার সামনে এল। বাবা বলেছেন দক্ষিণমুখো ফটক দিয়ে ঢুকতে। ওদিকটা সারানো হচ্ছে। বিরাট দোতলা বাড়ী; উত্তরমুখো ফটক ভাঙা-চোরা অংশে পড়েছে। বাড়ীর সামনে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ছোটছেলে দুর্বল-শরীরে আসতে বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলেছে। বাড়ীর সামনে নির্জন, সামনের দিকে শীতের দিনে দরজা-জানালা বন্ধ। যেন চাপা রহস্যে থম্‌থমে। দক্ষিণ-উত্তর কোণটা ঠিক করার চেষ্টা করতেই একটা গলা শোনা গেল, "এই যে খোকা, এসো। শিবচরণ তোমার কথাই বলছিল।"

খোকা আশ্বস্ত হয়ে স্বরের লক্ষ্য ধরে এগিয়ে একদিকে দরজার কাছে হারিকেন লণ্ঠন দেখতে পেল। ভদ্রলোক বালাপোষ মুড়ি দিয়ে হাতে আলো ধরে পথ দেখাচ্ছেন।

ছোট একটা ঘরে ফরাস পাতা। সেখানে বসলেন ভদ্রলোক। ওকে সম্মুখের বেঞ্চে বসালেন।

"ব্যারামটা লিভার, বুঝলে ?"

"আপনি তো দেখলেন না।"

"ওহে, আমার দেখতে হয় না। আমি সমস্ত জানি। বড় কষ্ট পাচ্ছ। বাবা-

মায়ের একই সন্তান তো। তুমি মরে গেলে ওরা সইতে পারবে না।"

"অ্যাঁ? আমি মরে যাব নাকি?" খোকা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"মরার মধ্যে ভয় কি আছে! সবাই তো মরেই যায়। কিন্তু তোমাকে আমি ভাল করে দেব। একদম। জীবনে লিভার খারাপ হবে না। ওষুধটি দেখিয়ে দিচ্ছি; নিজের হাতে তুলে নেবে, এস।" খোকা অবাক হয়ে বলল, "আপনি কি কবিরাজ নাকি যে, গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিচ্ছেন? কলকাতার ডাক্তারেরা তো কাঁচের শিশি ভ'রে মিক্‌শ্চার দেন।"

"কলকাতার ডাক্তারেরা ছাই জানে।" ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "জানো খোকা, দেশী গাছগাছড়ার কাছে বিলিতী ওষধ লাগে না। আমি প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। এস।" তিনি মাথা-কান-ঢাকা বালাপোষ আরও গায়ে টেনে নিয়ে ওকে ডাকলেন।

খোকা ওঁর পেছনে বার হয়ে এল। সামনেই গাছ, ঝোপঝোপ। সারা জায়গা ছেয়ে আছে ওই একই গাছ। গাছের পাহাড়—গন্ধমাদন যেন।

"নাও তোল। শিকড়সুদ্ধ নাও। খালিপেটে সাতদিন সকালে রস করে খাও। ব্যস্, আর দেখতে হবে না।"

টিম্‌টিমে লণ্ঠনের আলোয় গাছটা তুলে নিয়ে খোকা বলল, "এগুলো ওষুধ নাকি, সারা বাড়ী ভরা? আমরা ভাবি আগাছা।"

"হুঁ, আগাছা! কত কষ্ট করে গাছগুলো লাগিয়েছিলাম।"

নিজের মনে বুড়ো ভদ্রলোক বলে চললেন, "কেউ জানল না, কি অমূল্য রত্ন রয়েছে এখানে। গুরুর কাছে দৈব ওষুধ পেয়েছিলাম। পরখ করে লোককে দেখাবার সময় পেলাম না।"

খোকা কেমন চমকে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে বুড়ো বললেন, "কলকাতার ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার! হুঁ! যদি জানত এই বাড়ীতে এখানে কি আছে, বড়লোক হয়ে যেত!"

খোকার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। "আপনি কি কলকাতার ডাক্তার নন?" চিৎকার করে উঠল সে।

"আমার দায় পড়েছে কলকাতার ডাক্তার হতে। কিন্তু ছোকরা এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? এক্ষুনি লোক জমে যাবে যে। চললাম।"

ভদ্রলোক ধোঁয়া হয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন! আর খোকা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু ওর চিৎকার শুনে তক্ষুণি দক্ষিণ দিকের অংশ থেকে কলকাতার ডাক্তারবাবুরা এসে গেছেন। খোকা ভুল করে উত্তর দিকে গিয়েছিল। সেখানে জমিদারদের খুড়োমশাই থাকতেন।

তারপরে?

তারপরে যা দেখতেই পাচ্ছো আজ। খোকা যত ছোটই হোক, লেখপড়া না-ই করুক, শিকড়ের কথা কাউকে বলেনি।

সেই শিকড় আজ তার সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। একবার খেলেই কাজ হয়, কিন্তু লোকজনকে হাতে আনতে দু'বার ব্যবস্থা করেছে সে মাথা খাটিয়ে।

বিশ্বাস না হয় দেখগে যাও। লিভার খারাপ থাকলে এক্ষুণি যাও, ছুটে যাও॥

সাঁতারু মিহির সেন

শ্রীরাণা বসু

বসফরাস প্রণালী পার হবার পর এক গ্লাস পানীয় হাতে মিহির সেন

উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল সাগরের বুকে সাঁতার প্রধানতঃ অভিযান হলেও খেলাধুলোরই অঙ্গ। ভালো সাঁতারু হতে গেলে যেমন সাঁতারের উন্নতধারার কলা-কৌশল শিখতে ও জানতে হয়, তেমনি বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন হয়। স্পোর্টসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, উৎসাহী দর্শকের বাহবা ও হাততালির মধ্যে আপন নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ আছে, কিন্তু জীবনহানির তেমন ভয় নেই। কিন্তু সাঁতার অভিযানে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি।

অজানাকে জানার আনন্দ, অজেয়কে জয় করার নেশাই অভিযানের প্রেরণা। সাগর-সংগ্রামী মিহির সেন সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন নতুন অভিযানের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন এবং দুর্জয় সংকল্পে একের পর এক সাফল্যও অর্জন করেছেন। সাঁতারু মিহির সেন গত ২৩ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর প্রায় এক মাসের ভেতর জিব্রাল্টার, দারদানেলেস ও বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে তাঁর সাত সমুদ্দুর সাঁতরাবার স্বপ্ন সফল করেছেন।

এ পৃথিবীতে চেষ্টার অসাধ্য যে কিছু নেই সাঁতারু মিহির সেন তা বারেবারে প্রমাণ করেছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার প্রথম চেষ্টার আগে সাঁতারু হিসেবে তাঁকে খুব কম লোকই চিনতেন। একবার নয়, দু'বার নয়, চার বছরে পাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ভারতের প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেন তখন অনেকেই ভেবেছিলেন মিহির সেন আর কখনো দূর পাল্লার সাঁতারে পাড়ি জমাবেন না। কিন্তু সাত বছর পরেও দেখা গেল অজানাকে জয় করার আগ্রহ তাঁর মন থেকে মোটেই মুছে যায় নি। ভারত মহাসাগরের বুকে বিপদসংকুল পক প্রণালীর বাইশ মাইল জলরাশি সাঁতার কেটে পার হওয়া সংগ্রামী মিহির সেনের সাঁতারু জীবনের এক উজ্জ্বল সাফল্য। আন্তর্জাতিক সাঁতারের ইতিহাসে এমন দ্বৈত কীর্তির উদাহরণ পাওয়া গেলেও ভারতে, মিহির সেনই প্রথম এবং পথপ্রদর্শক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পক প্রণালী পার হবার আগে মিহির সেন বলেছিলেন: 'দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে অজানা দূরের আহ্বান, উত্তাল সমুদ্র আর ঝড়ো হাওয়ার ডাক পৌঁছে দিতে হবে— ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থাতেই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করি এবং ইংলিশ চ্যানেল জয়ের প্রচেষ্টায় ব্রতী হই। সাঁতার সম্পর্কে আমার গভীর জ্ঞান এবং অর্থবল বিশেষ ছিল না, কিন্তু আমার মনের জোরই ছিল দুর্জয়কে জয় করার পাথেয়। সিংহল ও ভারতের মাঝে পক প্রণালী পার হওয়া ইংলিশ চ্যানেলের চেয়েওবিপদসংকুল। এখানে হাড়-জমানো ঠাণ্ডা নেই, জেলী মাছের অত্যাচার নেই, কিন্তু আছে হাঙ্গর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আর বিষাক্ত সাপের মরণ ছোবল। তবু সব বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই আশায় অভিযানে নামছি যে, আমার এই উৎসাহ ভারতের তরুণ মনকে স্পর্শ করবে। তারা আরো বেশি সংখ্যায় দুর্জয়ের ডাকে সাড়া দেবে।'

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেলের একুশ মাইল জলরাশি পার হতে সময় লেগেছিল চোদ্দ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ১৯৬৬ সালের ৫ এপ্রিল সিংহলের তালাইমানার থেকে সাঁতার আরম্ভ করে পরের দিন ভারতের ধনুষ্কোটিতে পৌঁছতে তাঁর সময় লাগে পঁচিশ ঘণ্টা চুয়াল্লিশ মিনিট।

ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী অতিক্রমের পর মিহির সেনের স্বপ্ন ছিল সাত সমুদ্দুর জয় করা। মিহির সেনই জগতের প্রথম পুরুষ যিনি পাঁচটা অভিযানে সাত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটে সাফল্যের তটভূমি স্পর্শ করেছেন।

অতলান্তিক ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী জিব্রাল্টার প্রণালীর দূরত্ব স্পেনের উপকূল থেকে মরক্কোর দিকে চিউটা পর্যন্ত তেইশ মাইল। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অগস্ট এই জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করতে মিহির সেনের সময় লাগে আট ঘণ্টা এক মিনিট।

মর্মর সাগরের গালিপলি (তুরস্ক) থেকে এজিয়ান সাগরেও মোহনা পর্যন্ত দারদানেলেস প্রণালীর দৈর্ঘ্য প্রায় চল্লিশ মাইল। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জলে নেমে দারদানেলেস প্রণালী অতিক্রম করতে মিহির সেনের সময় লাগে তেরো ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট।

কৃষ্ণ সাগরের রুমেলিফেলার থেকে মর্মর সাগরের লিনডারস টাওয়ার পর্যন্ত বসফরাস প্রণালীর দূরত্ব ষোল মাইল। ১৯৬৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এই বসফরাস বিজয়ে মিহির সেনের সময় লেগেছিল চার ঘণ্টার কিছু কম।

মিহির সেন আজ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে পৌঁচেছেন। বিদেশিনী স্ত্রী বেলা সেন ও তিনটি মেয়েকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। মিহির সেন পেশায় ব্যারিস্টার হলেও জলের বুকে নতুন নতুন অভিযানের চাপা বাসনা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। ব্যারিস্টারের কালো পোশাকের আড়ালে নতুন কীর্তির বাসনাকে তিনি অতি সযত্নে লালন করে চলছিলেন, অনেকেরই তা অজানা ছিল। আজ সবাই জানলো, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। লক্ষ্য স্থির থাকলে, দুর্জয়কে জয় করার নেশা মাথায় চাপলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোনো বাধাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না।

শরতের ডাক

শ্রীঅতীন মজুমদার

সূয্যিমামা ছড়িয়ে দিয়ে আলো
নতুন ক'রে বাস্‌লো সবায় ভালো।
দোয়েল-শ্যামা ছড়িয়ে দিয়ে গান,
আনন্দেতে ভরিয়ে দিল প্রাণ।
সুবাস দিল বনের যত ফুল
ছুট্‌লো হাওয়া খুশীতে বিল্‌কুল্।

মেঘ-মেয়েরা স্বপ্ন-রঙীন মনে
ভিড় জমাল সুদূর গগন-কোণে।
নদীর পারে বস্‌লো চখার মেলা,
কাশ-বনেতে সুরু খুশীর খেলা।
ছুটির বাঁশী বাজালো শরতে,
এলেন ঘরে মোদের শারদে।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

সকলের রামকৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০

তোমরা সকলেই জান বিখ্যাত লেখক অচিন্ত্যকুমার বড়দের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের (চার খণ্ডে) জীবনী লিখে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছোটদের জন্যে লেখা অচিন্ত্যকুমারের এই বইখানিও একটি অপূর্ব সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যে সকল ভারতীয় মনীষীদের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, যাঁদের সম্বন্ধে ঠাকুরের আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল, তাঁদের ও ঠাকুরের সম্পর্কের কথাই লেখা আছে সচিত্র ও সুন্দর এই বইখানির মধ্যে। এ থেকে তোমরা অনেক কিছুই জানতে পারবে ও জ্ঞানলাভ করবে। সকলেরই এমন শিক্ষণীয় একখানি বই পড়া প্রয়োজন।

গড়-জঙ্গলের কাহিনী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩.৫০

শিশু-সাহিত্যের প্রবীণ লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনেক বই লিখেছেন তোমাদের জন্যে। তাঁর **'ভোম্বল সর্দার'** একখানি বিখ্যাত বই। এই বইখানি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'গড়-জঙ্গলের কাহিনী'ও খগেনবাবুর একটি আশ্চর্যসুন্দর ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস। বইখানির পরিচয় সম্পর্কে গোড়াতেই লেখা আছে: 'বাংলা দেশে তখন শেষ হয়ে আসছে মুসলমান শাসন, আর দৃপ্ত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বিদেশী শাসকের।...ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে...পরাধীনতার পাশ ছেদনে ব্রতী ভূস্বামীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও সাহসিকতার এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে গড়-জঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে।' অত্যন্ত আকর্ষণীয় এর ঘটনা। পড়তে পড়তে ছাড়তে পারবে না তোমরা। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অনবদ্য এবং প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—রাণা বসু। বাক-সহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯। মূল্য ১.০০

বিজ্ঞান-সাধক মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র বাঙলার তথা ভারতের স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ। বিজ্ঞানচর্চার উন্নতি ব্যতীত তিনি নানাধরণের জাতীয় উন্নতির পথ খুলে দিয়ে গেছেন। এই বইখানির মধ্যে আচার্যের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি সহজ ও হৃদয়স্পর্শীভাবে তোমাদের জন্য লিখেছেন রাণা বসু। মূলতঃ তিনি কবি হলেও, নানাধরণের রচনাও করে থাকেন। এই বইখানি পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে তাঁর হাত কত মিষ্টি। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল এবং কভারে প্রফুল্লচন্দ্রের ছবিটিও সুন্দর।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৪৫
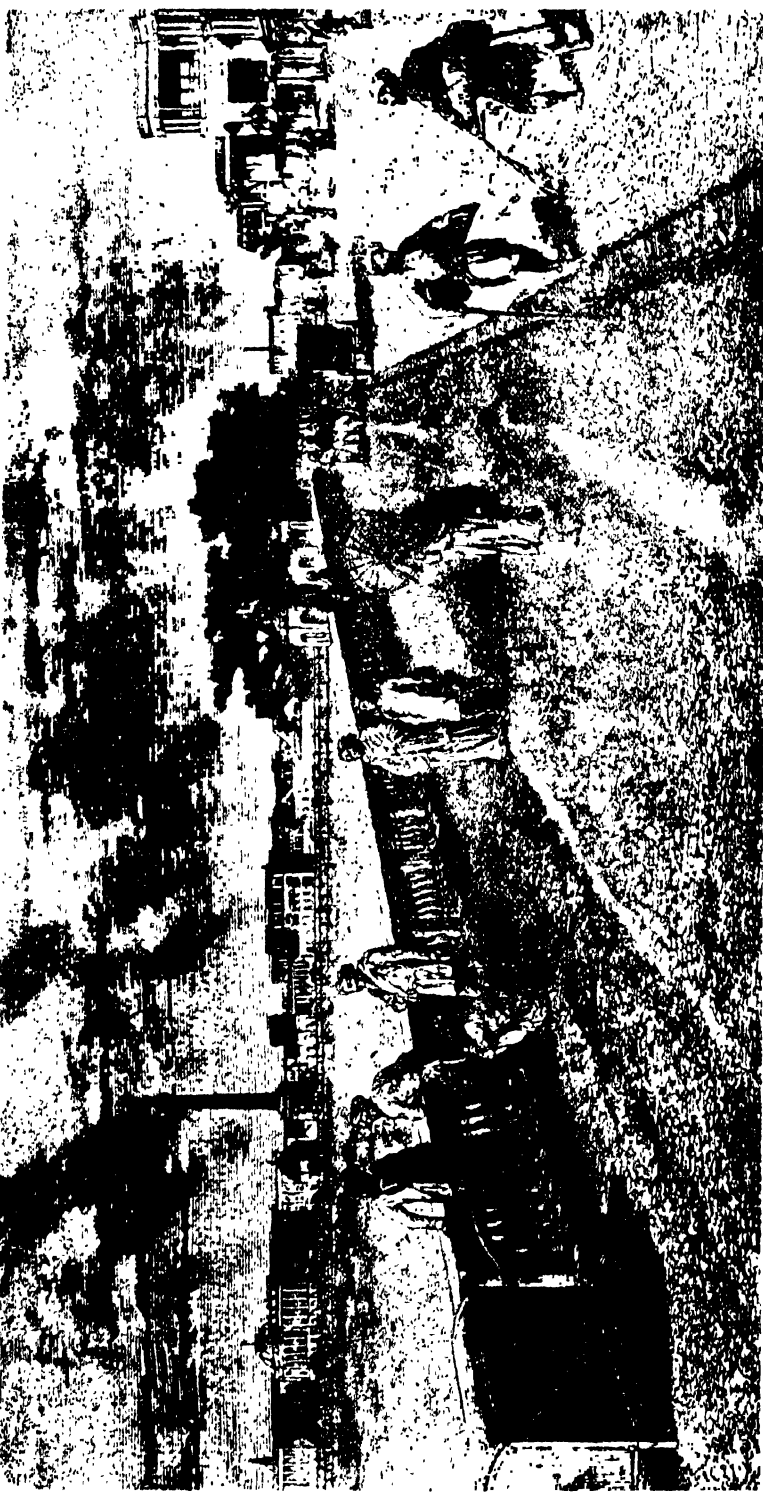
প্রাচীন কলকাতায় ধর্মতলা অঞ্চলের একটি দৃশ্য

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র

৪৭শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৭৩ [৮ম সংখ্যা

মৌচাক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝর্‌ছেরে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়,
দাওয়ায় ব'সে ভাবিস্ কি আর
আয়রে তোরা বেরিয়ে আয়।

কোন্ খানে চাক খুঁজতে হবে
কোন্ বাগানে কোন্ বনে,
তুড়ুক নেচে ফুড়ুক উড়ে
শালিক হ'ল চনমনে।

ভোম্‌রা চলে বন্‌বনিয়ে
হন্‌হনিয়ে আমরা যাই,
ঠিক্ দুপুরে আগুন হাওয়া
গন্‌গনিয়ে ছুটছে ভাই।

শুক্‌নো পাতার পাঁপর-ভাজা
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায়;
জামরুলে ফুল ঝাম্‌রে পড়ে
আমরুলী-রঙ্ আমপাতায়।

হাওয়ার সাথে ছুটছি মেতে
রোদের তাতে মুখ্-রাঙা,
কঞ্চি হাতে খুঁজ্‌ছি কেবল
কোথায় মধু চাক-ভাঙা ?

মৌমাছি যা হাবিস্ করে
ফুলের ফুটোয় শুঁড় দিয়ে,
তাই নেব ভাই, তাই নেব আজ—
ফিরবো না তোর গুড় নিয়ে।

কুড়ুক পাখীর কান-জুড়োনো
আওয়াজ ধ'রে চল্ চলে,
কাঠ্‌বিড়ালীর পিছন পিছন
ঘুর্‌বো কাঁটার জঙ্গলে।

লিচুর পাতায় বগ্‌লী যেথায়
বানিয়েছে লাল-পিঁপ্‌ড়েরা,
সেই বনে চল্ সেই গহনে
মৌমাছিদের সেই ডেরা!

সর্‌ষে-ফুলের মৌ ঝাঁঝালো,
পদ্মফুলের মৌ মিঠে,—
মৌচাকেরই লাখ কুঠরীর—
মধ্যে কে রয় কোন্ পিঠে ?—

দেখতে হবে চাখ্‌তে হবে,
চল্ ছুটে ভাই যাই সবে,—
মৌচাকে মৌমাছির পুঁজি
মন্ যে ভোলায় সৌরভে।

অরণ্যের ডাক

(সত্য ঘটনা)

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কথাটা মনে হলে আজো হাসি পায়। আমি তখন কিশোর। সবে ষোলয় পা দিয়েছি। য়্যাডভেঞ্চারের নেশা শিশুকাল থেকে। এই সময় একবার অরণ্যের ডাক এল। কিশোরীদা অর্থাৎ কিশোরীমোহন চৌধুরী শিকারে যাবেন। সঙ্গে নিলেন আমাকে।

কিশোরীদা, পূর্ণ যুবক। বত্রিশ বছর বয়স। বড়লোক। খাঁটি মানুষ। কোন বদ নেশা নেই। একমাত্র সখ তাঁর শিকার। শিকারের নামে তিনি পাগল। এবার যাবেন ভাওয়ালে গজারী জঙ্গলে। বাঘ শিকারে। গজারী জঙ্গলে নেকড়ে বাঘ প্রচুর। এই তাঁর প্রথম বাঘ শিকার। এর আগে হরিণ, খরগোশ, পাখী শিকার করেছেন প্রচুর।

আমাদের গাড়ী ছুটলো, ভাওয়াল অরণ্যের দিকে। শিকারে চলেছি, মন আনন্দে ডগমগ। কিশোরীদা'র মন গর্বে ফুলে উঠেছে। তাঁর বিশ্বাস, মানুষের যত সাহস, যত বীরত্ব লুকিয়ে আছে শিকারে। আমি কিন্তু তা স্বীকার করি না। আমার ধারণা শিকারে কোন বীরত্ব নেই, সাহস নেই। এর কারণ—গাছে চড়ে, মাচায় বসে, বন্দুক দিয়ে প্রাণী হত্যার মধ্যে কি বীরত্ব থাকতে পারে, আমার ধারণার বাইরে!

আমাদের নিয়ে রেলগাড়ী ছুটে চলেছে হুহু শব্দে। ঢাকা হতে আঁড়িখোলা। তারপর নৌকো করে অরণ্য-পথে যাত্রা।

এবার লোকালয় ছেড়ে অরণ্যের দিকে চলছি। নৌকো চলছে—ছল্ ছল্ শব্দ তুলে। শীতলক্ষা নদীর দু'তীরে সবুজ মাঠ। হাওয়ায় ধানের শিষ দুলছে। পথ ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে আসছে। সামনেই পশুরাজ্য। দূরে অস্পষ্ট ঘন সবুজ বনশ্রেণী। নদীর ওপাড়ে গ্রামের চিহ্ন নেই। আকাশ উত্তপ্ত। সূর্য কিরণ ছড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখীর দল উড়ে যাচ্ছে শূন্য-পথে। নির্মল সুন্দর প্রকৃতির শোভা। দূরে একপাল বগ বসে আছে চরে গা-ঘেষে। মাছের নেশায় তারা মশগুল।

কিশোরীদা বন্দুক হাতে তুলে নিলেন।

বললুম, বন্দুক কেন কিশোরীদা?

কিশোরীদা কথা বললে না। ইশারা করে বন দেখালেন।

বললুম, ওদের হত্যা করে কি হবে কিশোরীদা?

কিশোরীদা বললেন। তুই তো জানিস না, বগের মাংস খুব উপাদেয়। একবার খেলে ভুলবিনে তুই।

—কিন্তু নিরীহ বক মারার পক্ষপাতী আমি নই। কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম।

—গুড়ুম।

চমকিয়ে উঠলাম শব্দ শুনে। চেয়ে দেখি দুটো বক চরে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। বাকিগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে গেলো। কি কর্কশ ওদের কণ্ঠস্বর।

রাতটা ভালোই কাটলো। বগের মাংস দিয়ে উদর পূর্ণ করে ঘুম দিলাম। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গতে, দেখি আমাদের নৌকা একটা খালের ভিতর প্রবেশ করছে। এখন আর দুই পাড়ে ধানক্ষেত নেই। দুই ধারে নিস্তব্ধ বনশ্রেণী। শাল, তেঁতুল, বট, কত রকম জানা না-জানা গাছ নজরে পড়লো।

নৌকো এগিয়ে চলছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। এখানে গ্রামের চিহ্ন নেই। লোকজন নেই। শুধু পাখীরা ডালে বসে কোলাহল করছে। শীতল বায়ু বইছে। আমরা ছই-এর বাইরে এসে বসলাম।

কিশোরীদা আবার বন্দুক হাতে নিলেন।

বললাম, আবার বন্দুক কেন কিশোরীদা?

—দু' একটা ঘুঘু শিকার করব। ওদের মাংস চমৎকার।

—বাধা দিয়ে বললাম, না কিশোরীদা। ওদের মেরে কাজ নেই। এই সুন্দর সুপ্রভাতকে অসুন্দর করবেন না।

কিশোরীদা আমার মুখের দিকে চাইলেন। বন্দুক নামালেন। কোন কথা বললেন না। মনে হ'ল, তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা হোক। তাই বলে এই নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করতে দেব না।

বেলা দশটার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করে নৌকো ছেড়ে দিলাম। তার কারণ গন্তব্যস্থান এখান থেকে মাইল দুই দূর। সেখানে মাচা করা আছে। লোকজনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। শিকার হবে রাত্রে। মাচানের কাছেই গ্রাম। সেখানে খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম করে, সন্ধ্যের সময় এসে মাচায় বসব আমরা। নেকড়া যখন শিকারে বের হবে, তখনই তাকে গুলি করে খতম করা হবে। কাজেই নৌকো আমাদের প্রয়োজন নেই।

ঘাটে নেমে আমরা এগিয়ে চললাম। কিশোরীদা আগে বন্দুক কাঁধে চলেছেন। আমার পিঠে খাবারের ঝোলা। নিঃশব্দে পথ চলছি। চারিদিকে গাছপালা ঝোপ-ঝাপ। মাথার উপর আকাশ দেখা যায় না। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে। পাখীদের কূজন আর নেই। চারিদিকে কেমন যেন নিস্তব্ধ থমথমে ভাব। দুরন্তপনার বদনাম আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে। একবার আসামের টাইগার হিলে, রাত কাটিয়ে

ছিলাম তখন বয়স মাত্র সাত। সেদিন কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। আজ কিন্তু গাটা ছমছম্ করছে। কোথাও একটু খস্‌খস্ আওয়াজ হলেই চমকিয়ে উঠছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। বুকের ভিতর দুরদুর করছে।

কিশোরীদা বলেছিলেন, নেকড়ে বড্ড ধূর্ত। তারা গাছেও চড়তে জানে। কোন গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে আমাদের দেখছে কি না কে বলতে পারে!

চলছি তো চলছি, চলার বিরাম নেই। সঙ্গে সাজ-সরঞ্জামও কম নয়। বুলেট আর কার্তুজের থলিটা কিশোরীদা'র কাঁধে। যদি নেকড়ে আমাদের আক্রমণ করে, আমার করবার কিছু নেই। মাথার উপর দিগন্ত জোড়া আকাশ গাছপালায় ঢাকা। নিচে চারিদিকে ঘন অন্ধকার। তার মধ্যে আমারা দুটি প্রাণী।

হাত-ঘড়ির দিকে চাইলাম। একটা বাজো-বাজো। জল তৃষ্ণাও পেয়েছে খুব। ফ্লাস্ক খুলে জল খেয়ে গলা ভিজালাম। কিশোরীদা'র পিপাসাও নেই, ভয়ও নেই। দিব্বি বন্দুক ঘাড়ে রেখে চলেছেন।

বললাম, আর কত দূর কিশোরীদা?

—বোধ হয় এসে গেছি ভাই। এই বাঁ দিকে গেলেই ওদের পাব। আর দশ মিনিট কষ্ট কর।

পায়-পায় আরো কিছুটা দূর এগিয়ে গেলাম। ঝোপঝাপ লতাপাতা ক্রমশঃই পথ রোধ করে দিচ্ছে। পায়ে চলার পথের চিহ্ন নেই। পথ রুদ্ধ। যেদিকে যাই পথ নেই। অরণ্য যেন চারিদিক হতে আমাদের ঘিরে ধরেছে, আমরা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিশোরীদা বললেন, পথ হারিয়েছি ভাই।

বললাম, তা হলে উপায়? ফিরে চল কিশোরীদা!

এবার কিশোরীদা'র মুখও ম্লান হয়ে এলো। বললেন, কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না ভাই। এমন বিপদে তো কোনদিন পড়িনি। কি হবে ভাই! কিশোরীদা হতাশ হয়ে পড়লেন।

বললাম, যা হবার হবে, এসো একটু বিশ্রাম করা যাক। হেটে হেটে পা যে ধরে গেলো।

বন্দুকটা ভাল করে ধরে, কিশোরীদা একটা গজারী গাছের শিকড়ের উপর বসে পড়লো। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। ক্ষিধেও লাগছিল, মন্দ নয়। দু'জনে কিছু খেয়ে নিলাম, শরীরও সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

একটু রসিকতা করে বললাম, আমরা এসেছি পরের প্রাণ নিতে কিশোরীদা।

এখন আমাদের প্রাণ যে যেতে বসেছে! এই প্রেতপুরী ভেদ করে যে ফিরে বাড়ী যাব, সে ভরসা নেই!

কিশোরীদা, কোন কথা বললেন না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে তখন তিনটে। তিনি চলতে লাগলেন। শুধু বললেন, সাবধান—আয়।

আবার চলছি। অরণ্য যত ঘন হচ্ছে, সূর্যের কিরণ তত কমে আসছে। ম্লান হয়ে আসছে দিনের আলো। এতক্ষণ মনের ভিতর যে ভয় ছিলো, এখন তো নেই। মরতেই যখন হবে, মিছে ভয় করে কি হবে। কিন্তু ভয় এমনি জিনিস, একবার ঘাড়ে চেপে বসলে, যেতে চায় না। সর্বদাই মনে হচ্ছে, এই বুঝি কেউ ঘাড়ে এসে পড়বে।

অরণ্যের মধ্যে ঘুরছি তো ঘুরছি। কিন্তু পথের নিশানা পাচ্ছি নে। এদিকে দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে। এবার শুধু ভয় আমার নয়, কিশোরীদা'র মনেও ভয় ঢুকেছে। মুখ কালো হয়ে গেছে। একবার আমাকে বললেন, ভয় পেয়েছিস?

আমি একথার উত্তর দিলাম না।

কিশোরীদা বললেন আবার, ভয় কি? রাতটা না হয় জঙ্গলেই কাটাব। ভোরে একটা না একটা উপায় হবেই।

এবার উত্তর দিলাম। বললাম, কিন্তু তুমিও তো কম ভয় পাওনি কিশোরীদা?

আমার কথা শুনে কিশোরীদা একটু মৃদু হাসলেন। কথার জবাব দিলেন না।

ভয় উত্তেজনার ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি। হঠাৎ নজরে পড়লো, দিনের আলো। ঝোপের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো বাইরে প্রচুর।

বললাম, কিশোরীদা চলুন এই পথে যাই, আলো দেখা যাচ্ছে?

কিশোরীদা কথা বললেন না, কিন্তু সেই পথই নিলেন। এটাও পায়-চলার পথ নয়। একবার হামাগুড়ি দিয়ে, একবার দাঁড়িয়ে চলছি।

এবার আমরা এসে পড়লাম খোলা জায়গায়। সামনে জলাভূমি। অসংখ্য পাখী বসে আছে। অন্য সময় হলে কিশোরীদা ছাড়তেন না, বন্দুক ছুঁড়ে দু'চারটা মারতেনই। কিন্তু এখন তাঁর মন ভাল নয়। অরণ্য আমাদের বন্দী করেছে। মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মন ভাল হবার নয়।

কিশোরীদা তাঁর ঘড়ির দিকে চাইলেন। বললেন, চারটা বেজে গেছে। এ সময়টা খুব খারাপ। সাবধান হওয়া উচিত।

—কেন? খারাপ কিশোরীদা? আমি প্রশ্ন করি।

—এই সময় বাঘ বের হয় জল খেতে। চল একটা গাছে উঠে বসে থাকি। আজ রাতটা জঙ্গলেই কাটাতে হবে।

—বললাম, তাই চল। পথ যখন হারিয়েছি, তখন কপালে আজ কি ঘটবে কে বলতে পারে!

নিকটেই একটা ঝোপের কাছে গাছ ছিল। আমরা সেই গাছে উঠে বসলাম। বাঁয়ে জলা। সূর্যের আলো পড়ে চক্‌চিক্‌ করছে। ডাইনে গভীর ঘন-জঙ্গল, প্রেতপুরীর মতন শূন্য, নিস্তব্ধ। সেদিকে চাইলেই বুক কেঁপে ওঠে।

দু'জনে বসে আছি বোকার মতন। কারো মুখে কথা নেই। সামনেই জঙ্গলের ভিতর খস্‌খস্‌ আওয়াজ উঠলো। কিশোরীদা সেই দিকে চাইলেন। বললেন, বোধ হয় বাঘ। জল খেতে যাচ্ছে। সাবধান থেকো।

পা হড়কিয়ে পড়ে গেলুম।

বাঘ! নাম শুনেই গাটায় কাঁটা দিয়ে উঠলো। ভয়ে ভয়ে সেই দিকে চাইলাম। কিন্তু কোথায় বাঘ। ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো একটা ধাড়ী শূয়োর। তার পেছনে পেছনে চার পাঁচটা বাচ্চা। ঘোৎ-ঘোৎ শব্দ করে মাটি শুঁকছে!

কিশোরীদা বন্দুক তুললেন।

আমি বাধা দিলাম। বললাম, ওকি করছেন, কিশোরীদা?

—ধাড়ীটাকে মারব—

—না-না মেরে কাজ নেই। মা মরলে বাচ্চারা অনাথ হবে—কিশোরীদা—প্লিজ—

কিশোরীদা'র আমার নিষেধ শুনলেন না, নিশানা করলেন।

গুড়ুম—

কিশোরীদা'র পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাধা দিতে গিয়ে পা হড়কিয়ে পড়ে গেলাম। একদম নীচে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল শূয়োরের দল। ঐ পর্যন্ত। তারপর কি হ'ল মনে নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল, রাত ন'টা। আমাকে ঘিরে বসে আছে অনেকগুলো লোক।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে, কেমন এক ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছিনে। একটু একটু করে মনে জাগছে জঙ্গলের কথা, পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এ কোথায়—এখানে আসার তো কথা নয়!

ক্ষিণ কণ্ঠে বললুম, আমি কোথায়?—কিশোরীদা কোথায়?

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কাছেই বসেছিলেন। বললেন, কিশোরীবাবুকে এখানে ডাকবো?

—না থাক। এখানে এলাম কি করে। এখন সবই মনে পড়ছে।

আমরা কিশোরীবাবুর প্রজা। মাচান করে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আসবেন বলে। সারা দিন কেটে গেল। আপনারা এলেন না। উঠে যাব যাব ভাবছি, এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ কানে গেলো। আপনারা যে গাছে উঠেছিলেন, তারই একটু দূরে আমরা বসেছিলাম। শব্দ শুনে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, গাছের নিচে একটা দামের মধ্যে আপনি পড়ে অজ্ঞান। কিশোরীবাবু বোকার মতন বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। লোকটা থামলো।

—তারপর?

—তারপর আর কি! আপনাকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসি। আপনি বড্ড বেঁচে গেছেন বাবু। রাত হলে কি যে হ'ত ভগবান জানেন।

শুনে চুপ করে রইলাম। নড়তে গেলাম পারলাম না। তিন দিন সেই গ্রামে থেকে, চতুর্থ দিন অতি কষ্টে বাড়ি ফিরলাম। সঙ্গে অবশ্য কিশোরীদাও ছিলেন।

লাল গোলাপের খেদ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর না হতে আলোর ডাকে যখন ভাঙে ঘুম,
বাতাস এসে জাগিয়ে দেয় ঠোঁটেতে দিয়ে চুম,
সবার আগে তোমার কথা তখন পড়ে মনে,
কোথায় তুমি কখন এসে দাঁড়াবে ফুল বনে!
মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দেবে সবার পানে চেয়ে,
আনন্দেতে উঠবে দুলে তোমায় কাছে পেয়ে।
সোহাগ ভরে হাত বুলিয়ে কাউকে দিয়ে দোলা,
আদর ক'রে গালটি টিপে হাসবে প্রাণ-খোলা।
পরশ পেয়ে দরশ পেয়ে আমরা সবে মিলি,
পুলকে সারা আত্মহারা হাসবো খিলি খিলি।
তখন শুধু এই কথাটি ভাববো মনে মনে,—
আমায় বুঝি আজকে বুকে রাখবে সযতনে!
পাখীর ডাকে আমাদের স্বপন ভাঙে যেই,
দেখি যে সবই তেমনি আছে তুমিই শুধু নেই।

সব কথা যার হয়নি বলা

(জোনাকী)

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

জোনাকী

জোনাকীর সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। জোনাকী অন্ধকার রাত্রে ঝোপ-জঙ্গলে মিটির-মিটির আলো দেয়। কবিরা ছড়া ও কবিতায় জোনাকীকে সুন্দর, নিরীহ ও পরোপকারী বলে বর্ণনা করেন—
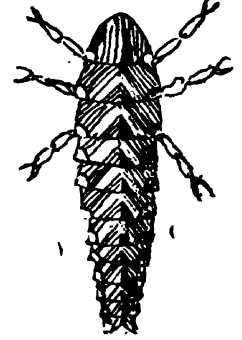
"জোনাকী ও জোনাকী,
তুই অন্ধকারে ঘুরে ফিরে
রতন কিছু খুঁজিস নাকি ?"

না, মণি-মুক্তো সে কিছুই হারায় নি। ভিজে স্যাঁৎসেতে ঝোপ-জঙ্গলে সে আহার খোঁজে। জোনাকী মোটেই নিরীহ, ভালোমানুষটি নয়। সে হিংস্র ও মাংসাশী। তার শিকার ধরবার পদ্ধতিও ভদ্রলোকের মত নয়—চোরাগুপ্তি মার দিয়ে এরা শিকারকে কাবু করে এবং খাওয়ার আগেই হজম করে ফেলে। কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে না ? তবে শোন :

জোনাকী মাটির নীচে বা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক ধীর মন্থর গতিতে। এদের ছোট ছোট ছ'খানি পা আছে। পুরুষ জোনাকী বড় হলে গুবরে পোকার ডানার আবরণের মত একটা ডানার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখে। কিন্তু স্ত্রী জোনাকীর বড়ই দুরবস্থা। তার না আছে কোন আবরণ, না আছে উড়ে বেড়াবার আনন্দ কারণ তার পাখাই নেই। পুরুষ জোনাকীর পোষাকের জাকজমক খুব বেশী। ঘন মেটে তার রঙ বুকের নীচে বাদামী। দেহের প্রত্যেকটি অংশের প্রান্তভাগে দুটি উজ্জ্বল লাল ফোঁটা দিয়ে সাজানো।

জোনাকীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার বিষয় হচ্ছে দুটি—

একটি সে অলসভাবে উড়ে উড়ে বেড়ায়—খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কিভাবে কোথায় হয় এবং আর একটি হচ্ছে, তার উত্তাপহীন ঐ মিটির-মিটির আলো কি করে জ্বলে।

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলেছেন, তুমি কি খাও আমাকে দেখাও, তা হলে তুমি কি আমি বলে দিতে পারব।

এই জিজ্ঞাসাটা প্রত্যেক কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধেই খাটে। তাদের খাদ্য কি জানতে

জোনাকীর প্রধান খাদ্য শামুক

পারলে তাদের জীবনযাত্রা ও স্বভাব সম্বন্ধেও আমরা বলতে পারি। জোনাকীকে দেখতে নিতান্ত নিরীহ মনে হলেও এরা মাংসাশী এবং শিকারী। শয়তানের মত এরা শিকারকে কাহিল করে। এদের নিয়মিত খাদ্য হচ্ছে শামুক। ঝোপ-জঙ্গলে, দেওয়ালের গা বা কঁচু গাছের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—ছোট ছোট শামুকের খোলা পড়ে আছে। খোলাগুলির ভিতরে কিন্তু কিছু নেই। অথচ তারা যেখানে ছিল—ঘাসের গায়, কি বাঁশের বেড়ায়, সেইখানেই আছে! জোনাকীই এই কাজটি করে।

কি করে শামুককে ক্ষুদ্র জোনাকীতে খেয়ে ফেলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কোনও রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হলে তাকে ক্লোরোফরম করে নিতে হয় তোমরা নিশ্চয় জানো। জোনাকীও শামুককে আক্রমণ করবার আগে তার দেহে খুব সন্তর্পণে ক্লোরোফরম করে নেয়।

প্রথমে জোনাকীটি শামুকটিকে পরীক্ষা করে দেখে। শামুক কিন্তু তার দেহের সম্পূর্ণ অংশটুকুই আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখে—কেবল শুঁড়টাকে রাখে একটু বের করে।

জোনাকী তার অস্ত্র বের করে। অস্ত্রটি খুবই সাধারণ, কিন্তু অণুবীক্ষণ বা আতসী কাঁচ দিয়ে ছাড়া এটা দেখা যাবে না। এই অস্ত্রে দুটি সরু হুল আছে। তাদের মুখটা বেঁকিয়ে বঁড়শির মত করা। এ দুটি খুব ধারালো এবং চুলের মত সরু। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখা যাবে—একটা খুব সরু ছিদ্র ঐ বঁড়শির নিচে দিয়ে চলে গেছে। এই হ'ল জোনাকীর অস্ত্র।

এই অস্ত্র দিয়ে জোনাকী বার বার শামুকের শুঁড়ে আস্তে আস্তে চাপ দেয়। এটা তাকে স্পর্শ করে মাত্র, আঘাত করে না। একবার ঐ জিনিসটি প্রয়োগ করে জোনাকী থেমে জায়। নজর রাখে, ফল হচ্ছে কিনা। এইভাবে আট দশ বার, মৃদু স্পর্শ করে শামুককে সে অসাড় করে দেয়। তারপর বিদ্যুৎ বেগে সে তার ঐ বঁড়শির মত আঙটা দিয়ে শামুকের গায়ে এক রকম বিষাক্ত জিনিস ঢুকিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য শামুকটিকে সে আগেই এমন অসাড় করে দেয় যে, তার কোন ব্যথার অনুভূতি থাকে না।

এইরকম শয়তানী করে শামুকটাকে জোনাকী অসাড় করে মেরে ফেলে। তারপর তাকে খাওয়ার ব্যবস্থাও অসাধারণ। একটা জীব-দেহকে খেতে হলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে

নেওয়া হয়। টুকরো টুকরো করে ছিড়েও খায় কুমীর কিংবা বাঘে। জোনাকী কিন্তু তা করে না—সে তাকে পান করে। খাওয়ার আগে তাকে তরল করে পরিপাক ক'রে তবে খায়। খাওয়ার সময় শকুনের পাল যেমন মরা গরুর উপর এসে পড়ে, অনেকগুলি জোনাকীও একটা শামুকের উপর তেমনি এসে ঝুঁকে পড়ে, এবং শামুককে ২।১ দিনের মধ্যে শেষ করে তার শূন্য খোলাটি রেখে দেয়।
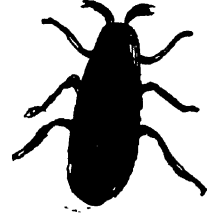
পুরুষ জোনাকী

এবার জোনাকীর আলোর কথা।

জোনাকী যদি তার ঐ ক্লোরোফরম করবার গুণ ছাড়া আর কিছু না জানত, তবে জন সমাজে তার পরিচয় ঘটত না। কিন্তু ঐ আলোর জন্যেই সে জগৎবিখ্যাত।

স্ত্রী জোনাকীর দেহের শেষ তিন অংশ জুড়ে থাকে আলোর যন্ত্রপাতি। প্রথম দুটি অংশের প্রত্যেকটিতে নীচের দিকে থাকে একটা আলোর বেল্ট বা কোমরবন্ধের মত জিনিস। তৃতীয় অংশের উজ্জ্বল অংশটা অনেক ছোট এবং এখানে মাত্র দুটি বিন্দু আছে। এই বিন্দু দুটি পিঠের ভিতর দিয়ে আলোকিত হয় এবং সেটা উপর ও তলা উভয় দিক দিয়েই দেখা যায়। এই বেল্ট বা কোমরবন্ধ ও বিন্দুর থেকে একটা সুন্দর সাদার সঙ্গে নীলাভ আলো আসে।

পুরুষ জোনাকীর কিন্তু আলোর জৌলস কম। তাদের ঐ শেষের অংশের দুটি বিন্দুতেই মাত্র আলো দেয় এবং সে আলো পেট ও পিঠ উভয় দিকেই দেখা যায়। কিন্তু স্ত্রী জোনাকীর কোমর বন্ধের ঐ জোর আলো কেবল পেটের দিকেই থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ঐ কোমরবন্ধ বা বেল্ট দেখলে ধরা পড়বে ওর চামড়ার উপর একরকম সাদা গুঁড়ো ছড়ানো আছে। এইটাই আলোর উৎস। এর কাছেই থাকে এক রকম অদ্ভুত বাতাস-নল। এর ছোট বোঁটার মত মাথায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমের মত থাকে। এই লোমগুলি ঐ সাদা গুঁড়োর উপর ছড়ানো-- কখনো বা ঐ সাদা গুঁড়োর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া।

জোনাকীর শ্বাসযন্ত্রের দ্বারাই তার ঐ আলো আসে। কতকগুলি বস্তু আছে যা বাতাসের সঙ্গে মিশলে আগুন জ্বলে ওঠে। এরূপ বস্তুকে দাহ্য (Combustile) বলে এবং বাতাসের সঙ্গে মিশে তাদের আলো উৎপাদনকে অক্সিডাইজেসন (Oxidization) বলা হয়। জোনাকীর আলো এই অক্সিডাইজেসনের ফল। ঐ গুঁড়োর মত বস্তুগুলি 'অক্সিডাইজড' হয়। জোনাকীর শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গে যে নল আছে তার থেকেই বাতাস আসে।

জোনাকী তার আলোক ইচ্ছামত বেশি-কম করতে বা নিবিয়ে দিতে পারে। নল

স্ত্রী-জোনাকী

দিয়ে বাতাসটা বেশি করে নিলে আলো বেশি উজ্জ্বল হবে, কম করে নিলে কম আলো হবে এবং বাতাস আসা বন্ধ করে দিলে আলো নিবে যাবে।

কিন্তু আর একটা মজার ব্যাপার এই—জোনাকীকে ছুরি দিয়ে কেটে দু'খণ্ড করে ফেললেও পিছনের ঐ অংশ থেকে আলো জ্বলবে। আলো জ্বালায় তার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ, ঐ সাদাগুড়োর মত জিনিস তখন সোজা বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং জোনাকীর শ্বাসযন্ত্রের নলের মাধ্যমে অক্সিজেন আসবার কোন দরকার করে না। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশেই যে ঐ সাদা গুড়োগুলি আলোকিত হয়, তার আর একটা প্রমাণ সাধারণ জলের মধ্যেও জোনাকীর আলো আসতে পারে, কিন্তু জ্বাল দেওয়া অক্সিজেন শূন্য জলে তার আলো দেখা যাবে না।

জোনাকীর আলো কতখানি উজ্জ্বল? খুব অন্ধকারে ছাপানো বইয়ের একটা লাইনের কাছে জোনাকীর আলো নিলে অক্ষরগুলি একটা একটা করে দেখা যাবে, কিন্তু তার বেশী নয়।

জোনাকীর জীবনে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সন্তানের স্নেহ-মমতা বলে ওরা কিছু জানে না। যেখানে-সেখানে মাটিতে বা ঘাসের ডগায় ওদের ডিম ছাড়ে, তারপর আর তাদের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না।

বলত সোনা কে আমি?

শ্রীমতী বিভা সরকার

প্রশ্ন—এই কোটরে চুপটি
বসে থাকি ঘুপটি
বলত সোনা কে আমি?
কোটর ছেড়ে রোজ নামি?
ঘুটঘুটে আঁধারে
যখন লাগে ধাঁধারে
শিকার কোথায় সেই খোঁজে
ইঁদুর ছুঁচোর যাও ভোজে।

উত্তর—জানি তুমি কে।
রূপে গুণে লক্ষ্মী,
তুমি পেঁচা পক্ষী;
পক্ষী পেঁচা লক্ষ্মীটি
অন্ধকারের সঙ্গিটি।

প্ল্যানচেটের আত্মা ভূত নয়

শ্রীমতী আভা পাকড়াশী

তোমরা তো ভূতের গল্প শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালবাস, তাই না? আর প্ল্যানচেট করলে যে আত্মা আসে একথাও শুনেছ তো? আমি যখন তোমাদের মত ছিলাম তখনকার কাণ্ডটা একবার শোন! আমাদের বাড়ীতে অলৌকিক ব্যপার আর আত্মা-টাত্মা নিয়ে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হয়। বাবার বন্ধুরা বসার ঘরে এসে আসর জমান আর অমনি অন্য সব আলোচনার মধ্যে থেকে 'অলৌকিক' মানে, সব ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তাগুলোই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

আমার ঠাকুমা আবার খুব ভাল মিডিয়াম। মানে, তাঁর কাছে আত্মা খুব শীগ্‌গির আসে। আমার ছোটকাকা তো প্রায়ই ঠাকুমার কাছে আসেন তিনি পুজো করতে বসলেই ছোটকাকার কথা মনে করে কাঁদেন আর অমনি ছোটকাকা আসেন। ঠাকুমা কেমন করে যেন তা বুঝতে পারেন, তাঁর পিঠে নাকি গরম নিঃশ্বাস পড়ে, আর তিনি তখন খাতা-পেনসিল নিয়ে বসেন—আর কাকা তাঁর সঙ্গে লিখে লিখে কথা বলেন। কাকা ছিলেন পাইলট। প্লেন-ক্র্যাসে মারা গেছেন পাঁচ বছর হ'ল। পাশের বাড়ীর মাসীমা একবার ঠাকুমার কথা বিশ্বাস করেন নি—তখন কাকা ইংরেজীতে তাঁর কথার উত্তর দিলেন—ঠাকুমার হাত দিয়েই সব লেখা হ'ল—কিন্তু ঠাকুমা আমার মোটেই ইংরেজী জানতেন না। তখন সেই ভদ্রমহিলার তো চক্ষুস্থির!

সুতরাং আত্মা যে অমর, আর ঠিক মত মনে করতে পারলে, ভাবতে পারলে, তাঁরা যে আসেন এমনি একটা ধারণা আমাদের ছিল। কিন্তু কেমন করে কি করতে হয় সে সব কিছু জানা ছিল না। পড়াশোনা আর খেলাধুলো নিয়েই থাকতাম, অত সব মন দিয়ে শুনিও নি কোনদিন। দু'একটা মজাদার ভুতুড়ে ঘটনা কানে গেছে, সেটা গিয়ে আবার বন্ধুদের কাছে বলেছি। তারা একটু "ও বাবা," "ও মাগো" বলে আঁতকে উঠেছে—ব্যাস্, আবার ভুলে গেছি।

কিন্তু আমি ভুলে গেলে কি হবে আমার নতুন বৌদি আমাকে ভুলতে দিলে তো! তার মহা উৎসাহ এই সব ব্যাপারে। মোটে দু'মাস হ'ল বিয়ে হয়ে আমাদের বাড়ী এসেছে। এতদিন স্কুল খোলা ছিল, তায় পরীক্ষা দিলাম, তাই ভাল করে তার সঙ্গে আলাপই জমাতে পারিনি। কিন্তু এখন আমার গরমের ছুটি, ছোড়দারও কলেজ বন্ধ, সকলেরই অঢেল সময়। তাই তার আবদার রাখবার চেষ্টাই করতে লাগলাম। কিন্তু মনে একটা ভয় ছিল যে, ঐসব অপরিচিত লোকের পরিচিত মানুষরা না জানি কি অমানুষিক কাণ্ড করে

বসে! তবু বৌদি যখন বলছে সাহস করে রাজী হলাম শেষ পর্যন্ত। বৌদি বলল, এসো আমরা তিনজনে মিলে একদিন দুপুর বেলা প্ল্যানচেট করি। সে নাকি বাবার বসার ঘরে আড়িপেতে শুনেছে, কে যেন এক ভদ্রলোক বলছিলেন—তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা প্ল্যানচেট ক'রে জেনেছেন, তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কে কিরকম ভাবে পাশ করবে আর ওঁর ছেলের চাকরীটা পাবে কিনা! তবে সেই বা পারবে না কেন! আমি বললাম—কিন্তু প্ল্যানচেট কাকে বলে আমরা তাইতো জানি না। তারপর কেমন করে করতে হয় সেই বা কে বলে দেবে? বৌদি অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে—আঃ, বলছি তো আমি সব শিখিয়ে দেব—কিন্তু একটা প্ল্যানচেটের মেসিন তো তোমরা আগে কিনে আনো। ওদিকে মা রান্নাঘর থেকে ডাকছেন—বউ মা, লুচি বেলবে এসো! বৌদি ছুটল।

নাঃ, দুপুর বেলাই বেষ্ট! বাবা-মা ঘুমোবেন, বড়দা থাকবে অফিসে, তখন বৌদির কাছ থেকে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে হবে দেখছি—ছোড়দার এই কথা শুনে বুঝলাম উৎসাহটা তারও কিছু কম নয়। একে তো বি. এস-সি. থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছে, তার উপরে স্টেটসম্যান দেখে সমানে চাকরীর দরখাস্ত পাঠাচ্ছে—তাই ফলাফলটা আগে ভাগে জেনে নিতে চায় আর কি!

পরের দিন বড়দা অফিসে বেরিয়ে গেছে, বাবা যথারীতি বসার ঘরে, আমি রাস্তায় একচোট ক্রিকেট খেলে সেইমাত্র বাড়ী ঢুকেছি—বৌদি বোধহয় নারকোল নাড়ু পাকাচ্ছিল, একটা নাড়ু আঁচলের তলা থেকে বার করে চট করে আমার মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে কানে কানে বলল—এই, ছোড়দা গেছে সেইটে আনতে! আজ দুপুরে কোথাও যেন বেরিয়ে পোড় না মশাই।

ব্যাটটা ঠুকে বললাম, ঠিক আছে।

আসল কথাটা কিন্তু আমার মনে ছিল না— এখন বৌদির কথা শুনে ছোড়দাটা কখন আসবে, আর প্ল্যানচেটের মেসিনটা কি রকম বা দেখতে, এই জন্য বেশ একটু উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশ্য কাল কিন্তু ছোড়দা বলছিল—যাঃ, যত সব গাঁজা, মেসিনে চড়ে ভূত আসবে, সে আবার বলবে কবে চাকরী হবে, কেমন করে পাশ করবে! বৌদিকে বলল—যত সব মেয়েলী ছুঁচিবাই তোমার। কে কি বলল আর উনি মেতে উঠলেন। বৌদি তখন রেগে গিয়ে ঠাকুমার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে—বলল—বুড়ো মানুষ! তিনিও বুঝি মিথ্যে কথা বলেন? ছোড়দা বলল—উনি তো ছেলের শোক ভুলতে বসে বসে গল্প তৈরী করেন। বৌদি চটেও উঠল খুব।

যাক, শেষ পর্যন্ত তো ছোড়দাটা এলো! অনেকগুলো দোকান খুঁজেছে বোধ হয়। তখন আবার খাবার সময়, মা সমানে তাড়া লাগাচ্ছেন চান করার জন্য। পড়ার ঘরে ওর

বই-এর সেল্‌ফ-এ কাগজে মোড়া মেসিনটি রেখেছে, সেটা কোন রকমে ইশারায় আমাদের বলে দিয়েই নাইতে ছুটল। আমি তক্ষুনি পড়ার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে মেসিনটি একটু নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। কাগজের মোড়কটা খুলতে খুলতেই কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ জাগছিল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বৌদিও এসে পেছন থেকে বলল, এই, আমিও একটু দেখিনা ভাই! আহা বেচারী, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ছুটোছুটি করতে করতে, আমার চেয়ে আর কতই বা বড়! ঐজন্যই গম্ভীর মানুষ বড়দাকে ও অত ভয় পায়! ছোড়দা বলে তোমার তো বর! ও বলে ধ্যাৎ! এখনো বলল—ধ্যাৎ! এই নাকি মেসিন! একটা তিন-কোণা প্লাই-উডের টুকরো তাতে তিনটে চাকা লাগানো। পানের ছুঁচলো দিকটায় একটা ফুটো, সেখানে কম্পাসে পেনসিল আটকাবার মত ব্যবস্থা। চাকাগুলো সব পেতলের। ব্যাস, এই!

অনেকক্ষণ পরে দুপুর হ'ল। ঠাকুমারই পুজো সেরে সবচেয়ে দেরি হয় খেতে, তারপর বৌদির ছুটি, কিন্তু আজ তাঁর একাদশী। দুধ, ফল খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। গরমের দুপুর। চারিদিক বেশ নিঃঝুম। বৌদি কোমরে কাপড় জড়িয়ে প্ল্যানচেটের প্ল্যান বোঝাচ্ছে আমাদের। বলছে—আঃ, আমি কি একা পারি, ধরনা একটু সেলফ্‌টা। হ্যাঁ, এই বেশ হয়েছে। ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমাদের পড়ার ঘরে- সব সরিয়ে নড়িয়ে বেশ একটু জায়গা বার করা হয়েছে—তিনটি চেয়ার গোল করে সাজান, মাঝখানে একটি তেপায়া টেবিল। একপাশে একটি টিপয়ের ওপর সাদা ফুলস্কেপ কাগজ এক গোছা, আর একটি টেবিল-ল্যাম্প—ঠাকুরঘরের ধূপদানিটা আর গোটাকয়েক ধূপ বৌদি কাল সন্ধ্যে দিতে গিয়ে সরিয়ে এনেছে। আর নিজের ঘরের নীল বাল্বটা ছোড়দাকে দিয়ে খুলে এনে দেয়ালের আলোটায় লাগিয়েছে। জানলাগুলো সব বন্ধ, নীল আলো জ্বলছে, ধূপ জ্বলছে—বেশ একটা ছায়া-ছায়া, ভয়-ভয়, গা-ছমছম করা ভাব। জিজ্ঞেস করলাম, এবার কি করতে হবে? ছোড়দা বলল—দাঁড়ানা, মন স্থির কর। চুপ করে একটা চেয়ারে বোস। যাকে আমরা আনতে চাই, তাকে ভাবতে হবে। তার পুরো চেহারাটা মনে করে ধ্যান করার মত আর কি!

বৌদি বলল—কিন্তু এমন লোককেই ডাকতে হবে যে আমাদের তিনজনেরই চেনা হবে। তবে তো!···

ছোড়দা বলল—তাহলে রবীন্দ্রনাথ! কিংবা সুভাষচন্দ্র!

বৌদি বলল—না না, ও সব মনীষী-টনিষী নয়, কি সব বড় বড় কথা বলবেন এসে! কিন্তু না, আমার মাসীমাকে যে আবার তোমরা চেন না। তিনি তো এইমাত্র তিনমাস হ'ল মারা গেছেন!

ছোড়দা বলল—তুমিও তো আবার আমাদের ছোটকাকাকে চেন না?

আমি বললাম—না না কাকু নয়, নতুন কেউ! শেষ পর্যন্ত—গত মাসে আমাদের পাশের বাড়ীর যে বউটি গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে, তার নাম করতেই বৌদি আঁতকে উঠে বলল—হোক গে, সে আমার বেশ চেনা মেয়ে, কিন্তু না বাব', ও যে অপঘাতে মরেছে! তাহলে—গেজেট মাসীমা! এই মাত্র কুড়ি দিন আগে তো মারা গেছেন! বেশ তাই! বৌদি একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজী হ'ল। ভদ্রমহিলা ভীষণ খাণ্ডারনি ছিলেন। ও মাথার কাপড় খুলে ছাতে উঠেছিল বলে দারুণ বকুনি খেয়েছিল তাঁর কাছে, আর ছোড়দার সিগারেট খাওয়া দেখতে পেয়ে মাকে বলে দিয়েছিল বুড়ী। আর আমি তো ওর কুলগাছে চড়ে, ওকে খেপিয়ে দিয়ে ইচ্ছে করে ওর বকুনি শুনতাম। কিন্তু তিনজনেই আমরা তাকে চিনি, অগত্যা তাকেই তিনজনে আমরা ভাবছি। আমাদের তিনজনের ডান হাত আলতো করে মেসিনটি ছুঁয়ে রয়েছে। মেসিনটিতে পেনসিল আটকিয়ে একটি ফুলস্কেপ কাগজের ওপর রাখা হয়েছে ঐ মাঝখানকার টিপয়ে। মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল—কিছুই হ'ল না। বৌদির পায়ে ধাক্কা দিলাম—বৌদি বিরক্ত হয়ে বলল—আঃ, বোস না চুপ করে। আরও পাঁচ মিনিট কাটল—বুড়ী কি রকম নেচে নেচে গাল দিত তাই ভাবছি, হঠাৎ মেসিনটা নড়ে উঠল—আমি ভাবলাম ছোড়দা নাড়াচ্ছে, আর ছোড়দা ভাবছে বৌদি। কিন্তু তাকিয়ে দেখি বৌদির মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মেসিনটা কিন্তু নড়েই চলেছে। এবার ছোড়দা জিজ্ঞেস করল—আপনি কে?

মেসিন একপাক ঘুরে থামল—

ছোড়দা পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দেখল—লেখা আছে—ঢং।

এবার বলল, আপনি তো মাসীমা, আপনাকে আমরা প্রণাম করছি। এখন মেসিন চুপ। এবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মাসীমা আমি পাশ করব তো! এবার মেসিনটি নড়েই চলেছে—থামতে আলো জ্বালল ছোড়দা, বড় বড় করে লেখা হয়েছে—'আদিখ্যেতা'। চমকে উঠলাম আমরা। মুখটাকে বেঁকিয়ে—'আদিখ্যেতা' কথা বলাটা ছিল মাসীমার মুদ্রাদোষ।

এবার বোধহয় ছোড়দা চাকরীর কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ মেসিনটা যেন ঝাঁকানি দিয়ে নিজে নিজেই চলতে লাগল। আমরা তিনজনে কাঠ হয়ে বসে আছি—বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে লেখা হ'ল, তারপর মেসিনটা কাগজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে থেমে গেল। এবার ছোড়দা আলো জ্বালিয়ে যা পড়ল তাতে আমাদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। লেখা আছে: রাসমোহনকে (আমার বাবা) বল আমি চাপা পড়ে আছি; শশাঙ্ক। অবিকল আমার মামার হাতের সেই টানা লেখা। তাঁরই নাম শশাঙ্ক। তাঁর

বাড়ী উত্তরপাড়া। আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে খবরটা দিতে ছুটলাম। তিনিও আমাকে আর ছোড়দাকে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে দাদার অফিসে টেলিফোন করে দিলেন।

কাগজে লেখা হ'ল মামার নাম : শশাঙ্ক।

ক'দিন ধরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। মামার বাড়ীটা অনেক পুরনো। তক্ষুনি মামার ঘরের পাশের দালানটা ধ্বসে পড়েছে আর তিনি সেই দালানেই বসে তামাক খাচ্ছিলেন। সবসুদ্ধ ধ্বসে পড়ায় সেই দালান চাপা পড়েই তিনি মারা গেছেন। তখন বাড়ীর ওধারটায় কেউ ছিল না। আর মামীমা মাসীমার সঙ্গে সবে কাল কলকাতায় গেছেন। ওঃ, সেই বীভৎস দৃশ্য আমি আজও ভুলিনি!

এর পর থেকে আমরা আর কখনই ঐ মেসিনটি ছুঁইনি। আগে একটা খেলার মত করে নতুন কিছু করার ঝোঁকে আমরা প্ল্যানচেটে বসেছিলাম, কিন্তু প্রথম দিনেই মেসিনটি একেবারে সত্যি ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের ভয় ধরিয়ে দিল। এর মানে, আত্মা মিথ্যে নয়। তারা সত্যিই আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। হয়ত কত তাদের ব্যথা বা কষ্ট আছে, সেগুলো জানাতেও চায়, কিন্তু আমাদের তা শোনার সাহস কই!

তোমরা

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমরাই পারিজাত, ভরেছো এ ধরাতল রঙে আর গন্ধে
মন্দাকিনীর গান শুনি আমি তোমাদেরই হাসি ও আনন্দে :
তোমাদের সোনামুখে সে হাসি দেখার তরে
আবার শরৎ এলো ভুবনের ঘরে ঘরে,
শিউলিতে ফের মাটি ভরলো
কাশফুল নুয়ে নুয়ে পড়লো,
সবুজ টিয়ার ঝাঁক, লাল ঠোঁটে গান নিয়ে নীলাকাশে উড়লো,
নদী-নালা খাল-বিল থই-থই ভাদরের ধারাজলে ভরলো।

এলেন বিশ্বমাতা ঐ চাঁদমুখ দেখে চোখ দুটি জুড়াতে
আলো-হারা ধরণীতে ও চোখের মিঠে আলো দশ হাতে ছড়াতে,
এলেন মা বীণাপাণি বীণাখানি কোলে নিয়ে
বেঁধে নিতে ভাঙা বীণা প্রভাতের সুর দিয়ে,
কমলা এলেন সুখে দুলতে,
ঝাঁপি ভরে হাসি-ফুল তুলতে,
আকাশের আঙিনায় দাঁড়ালেন দেবতারা এই ছবি দেখতে
বসলেন গণপতি তোমাদেরই উজ্জ্বল ইতিকথা লিখতে।

আহা, ঐ হাসি ফুল সবুজের বোঁটা ভ'রে যত বেশী ফুটবে
ধরণীর পোড়া বুক ততই নতুন রঙে ভরে ভরে উঠবে।
তাই কি মা এই বেশে, এমন মধুর হেসে
আশার খড়গ হাতে দাঁড়ালেন কাছে এসে ?
মরা গাঙে ভরা বান আনতে,
মরুতে নতুন মাটি দানতে,
আবার নতুন রঙে আলো করে দিতে এই পৃথিবীর কোনটি
ধরণীকে ধার দাও আজ শুধু তোমাদের ধান-শিষ মনটি।

কানা ঘোড়ার ডিম

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

নিঃসীম হিমসিম খায়।...

আজ দুপুরে অজ পাড়াগাঁয়ের গরীব স্কুলে ভর্তি হয়ে সে বোর্ডিং-এ ঠাঁই পেয়েছে।

অনেক দূর থেকে সে হেঁটে এসেছে। পিঠে করে গাঁঠরি বয়ে এনে অবসন্ন। বোর্ডিং-এর সামান্য খাবার খেয়ে রাত্রিবেলা শুয়ে পড়তে, ঝুম্‌ঝুম্ ঝুমুর বাজিয়ে এসে ঘুমের মাসী-পিসীরা তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। সে আমেজ ভোর অবধি থাকার কথা। অথচ রাত পোয়াবার আগে গরম গরম 'কানা ঘোড়ার ডিম' আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দু'হাতের উল্টো পিঠে চোখ কচলে ভাবল ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীরা বুঝি রঙ-তামাশার মিঠে ছড়া আওড়াচ্ছে :

ঘোড়ার ডিম্‌টা কানা, তা সবার ছিল জানা,
তারা হাত নেড়ে কয়, না না, ফোটা তোমার মানা।
পহর গুণে মোরগ যখন ডাকে,
খেঁক্ খেঁকিয়ে খেঁকশেয়ালী হাঁকে,
বল্‌ল কানা মাকে, আর মান্‌ব নাক' মানা।
থামাও ওদের না, না, মিথ্যা ওজর হানা।
এখন আমার ফট্‌ফটিয়ে ফোঁটা,
পাঁজির পাতায় লেখা আছে ওটা,
তা ঘটা করেই জানা। কিন্তু ওরা কানা।
তাই হন্দ পাজির কথা— টেনে আনা!...

কিন্তু দস্তিদামাল সঙ্গীদের দল-বাধা আহ্লাদের তার ছিঁড়ে যায়। সে দেখে, নিয়মে বাঁধাছাদা বোর্ডিং-এর ফাঁদে সে আটক পড়েছে!...

হ্যারিকেন ল্যাম্প হাতে কে লম্ফ দিয়ে এসেছিল। সবাইকে ঠেলেঠুলে তুলে সে বল্‌ছিল :

ঘোড়ার ডিম কানা, এত ঘুম যে মানা,
ওঠ এখন, নৈলে দোব বগল-তলায় হানা।

ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-পরা, তিন বাঁকা চেহারার লোকটার আস্পর্দায় নিঃসীম অবাক হয়। কেউ প্রতিবাদ করে না,—লক্ষ্মীছেলের মত বিছানা ছেড়ে ওঠে।

এবার লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে নিঃসীম উঠে দাঁড়ায়। আর লোকটা

দাঁত বার করে বলে, "কিগো নতুন আমদানী, কাঁড়ুকুতু খাবার আগে উঠে পড়েছ। তুই খানদানী কানাঘোড়ার ডিম, না অমনি ঘোড়ার কানা ডিম? তা যাই হোস্ না কেন, এখন লাইনে এসে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে স্তোত্তর পড় দিকিন।"

নিঃসীম সবার সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় এবং স্তোত্র পড়ে। সংস্কৃত ও বাংলায় ভগবানের নাম-গান।

লোকটার প্রতি নিঃসীমের শ্রদ্ধা হয়। প্রথমে সে তাকে খ্যাপাটে ভেবেছিল, কিন্তু এখন মনে হ'ল আসলে সে খাপছাড়া নয়। তার 'তুই-তোকারি' কথার মাঝেও কেমন স্নেহের আমেজ আছে—শ্লেষের নয়।···

নিঃসীম গরীব ঘরের ছেলে,—ছেলেবেলায় বাপ-মা নেই। কে তাকে এই আদুরে নাম দিয়েছিল সে তা জানে না। দূর সম্পর্কের এক মামার কাছে সে হেলাফেলায় বড় হচ্ছিল। কিন্তু মামাত ভাইয়ের চেয়ে লেখাপড়ায় সে ঢের ভাল বলে হিংসুটে মামী তাকে দেখতে পারত না। এবং তার প্ররোচনায় মামা তাকে ঐ পাড়াগেঁয়ে স্কুলে ঠেলে দিয়েছে।···

এক সেবাশ্রমের স্কুল। গরীব ও নিরাশ্রয় ছেলেরা এখানে নিখরচায় স্থান পায়। কিন্তু স্বাবলম্বী হবার জন্য তাদের সব কাজ করে নিতে হয়। রান্নাবান্না, ঘর নিকানো, বাসন মাজা, জল তোলা, শাকশব্জি ফলানো ইত্যাদি কাজ, এমন কি গো-পালন।

ছেঁচা বাঁশের বেড়া, শালের খুঁটি, খড়ে-ছাওয়া লম্বা ঘর। মাটির মেঝে তারা গোবর-মাটি লেপে তক্‌তকে রাখে। খাট-পালঙ, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি আয়েশী সরঞ্জাম নেই। মেঝেয় চাটাই ও ছালার চটে ময়লা খদ্দরের চাদর বিছিয়ে তারা শোয়, এবং তাতে ঘুমিয়ে বড় মানুষদের মতই রঙিন স্বপ্ন দেখে।

সাঁঝ পেরুতে মাদুর পেতে ব'সে রেড়ির তেলের বাতিতে পড়ে। ঝড়ের রাতের জন্য ক'টা হ্যারিকেন ল্যাম্প তৈরী রাখে।

গ্রীষ্মকালে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে, শীতের সময় খদ্দরের খাটো জামা ও চাদর। চরকায় সুতো কেটে তারা তা তৈরী করে। খালি পায়ে অথবা কাঠের খড়ম পরে তারা চলে। সেকালে মুনি-ঋষিরা নাকি তাই করতেন। তাতে খট্‌খট কত শব্দ হ'ত তারা আড়ালে পরখ করে দেখত।

স্কুলের সীমানার বাইরে খানিক জমি আছে। ভাগ-চাষীদের সঙ্গে তারা ফাঁকে ফাঁকে চাষ-আবাদ করে। যে ধান পায়, তাতে তারা মুড়ি, খই, চিড়ে ভেজে টিনে পূরে রাখে। তাল, খেজুর ও আখের রস জাল দিয়ে মেটে হাড়িতে সঞ্চয় করে। তা দিয়ে ভোরে ও বিকেলে জল খাবার চলে,—দুপুরে ও রাত্রে সাদা-মাপে আহার।

তেহার পরব ও উৎসবে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য তারা নারকেলের নাড়ু ও সন্দেশ গড়ে। হিংসা নিষেধ, তাই মাছ মাংস অচল। তার বদলে তারা দৈ, ক্ষীর, রসগোল্লা তৈরী করে। স্কুল ও বোর্ডিং-এর বেয়ারা চরণ ওস্তাদ কর্মী। সে সঙ্গে থেকে তাদের শেখায় ও সাহায্য করে; কিন্তু নিজে খায় না। বলে, ও সব আমার পেটে সয় না। আমি যে কানা ঘোড়ার ডিম! কিন্তু তোদের তো যুধিষ্ঠিরের মত বিচক্ষণ আর ভীম, অর্জুনের মত জোয়ান ও যোদ্ধা হতে হবে। তোরা গাছের ফল-ফলারি পেড়ে খাবি,—কানামাছি, কাপাটি, গোল্লাছুট, দাড়িবান্ধা খেলবি। কুস্তীর আখড়া তৈরী করে, দেশরক্ষার জন্য শরীর মজবুত করবি।"···

এ ভাবে চরণ তাদের সাথী হয়ে মন কেড়ে নেয়। তাকে 'চরণ-দা' বলে সবাই ডাকে, আর চরণ ঝাঁজি মেরে বলে, "ঝা ঝা, অমন জাঁদরেল 'কানা ঘোড়ার ডিম' কেটেছেঁটে রোগাপটকা 'চরণ' নাম—আহারে! অত আক খেয়েও আঁক শিখলি না,—মিষ্টি খেয়েও কষ্টি তেতো কথা বলিস্!"

তাদের গলদ কোথায় তারা জানতে চায়, কিন্তু চরণ এ ভাবে এড়িয়ে যায়, যে তারা নামের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না।···

সবাই সকালে তার ঠেলা খেয়ে জাগে, আর সে মুখ খিঁচিয়ে বলে, "যতো সব কুম্ভকর্ণের নাতি-পুতি—কানা ঘোড়ার ডিম! কাঁতুকুঁতু না খেয়ে ঘুম ভাঙ্গে না। ওঠ, লাইনে দাঁড়িয়ে মুখে নাম, আর হাতে কাম কর দিকি।" কিন্তু তাদের হাতের কাম সে কেড়ে করে। কারু কাছ থেকে নিজের মতলব মেটাবার চেষ্টা করে না।···

এ গাঁয়ের বাসিন্দা সে। বে-থা করেনি। স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপনে তার অবদান কম নয়। নিজের জমিজিরাতের খানিক সে দান করেছে। পড়শীদের কেউ তার নিজের সংসারের কথা স্মরণ করালে সে স্কুল ও বোর্ডিং দেখিয়ে বলে, "ঐ তো সংসার! এরই ঠেলায় 'কানা খোড়ার ডিম' হয়ে আছি। অতগুলো ছেলের যত্ন তদ্বির করতে হিম্‌সিম্ খাই,—আবার গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া! রক্ষে কর!"

কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে সে আদৌ লালায়িত নয়। স্কুল ও বোর্ডিং-এর বরাদ্দ মাইনে সে আখেরের জন্য তুলে রাখে না। ছেলেদের বিলিয়ে দেয়। তাই যখন সবার মাইনে বৃদ্ধির সময় আসে, স্কুলের তুখোড় কর্মকর্তারা বলেন, "ওর দরকার নেই। আমাদের কাছে দরবার করছে না যখন, স্কুলের ফাণ্ডে জমা হয়ে টাকার অঙ্ক বাড়াক।"

নিঃসীমের দৃষ্টি এড়ায় না। সে তার কিম্ভুত নাম ও অদ্ভুত ত্যাগের রহস্য জানতে চায়। কিন্তু চরণ ধমক দিয়ে বলে, "জানাজানির কি আছে? তোর নাম নিঃসীম,—তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে। তুই যদি নিজকে রিম্‌ঝিম্ বলে প্রচার করিস্, তাতে কার কি এসে যায়?" তারপর রঙ্গ করে বলে, "আসাল নাম হ'ল গিয়ে: হরে কর কম্বা

(হরেক রকম বা)। ঘোড়ার ডিম দেখেছিস্ কখনো? তা কি হয়? তাতে কানা ঘোড়ার ডিম! কেমন মজাদার। টাকা জমিয়ে কি তার চেয়ে মজা হয়?"

জবাব না পেয়ে জোরাল তর্ক ফাঁদা নিঃসীমের স্বভাব নয়। সে চুপ মেরে যায়।...

কিছুদিন পর গ্রীষ্মের ছুটি এল। ছেলেরা যে-যার বাড়ী বাড়ী চল্ল, কিন্তু নিঃসীমের যাবার স্থান নেই। চরণ তা বুঝে বল্ল, "কি রে বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করবি? কিন্তু একলা থেকে ভয় পাবি না তো? বরং খুঁৎখুঁতি ছেড়ে আমার ভাঙ্গাঘরে জুৎ করে আয়। তুই ছুঁৎ আর আমি অছুৎ। তবে ঘরে ঠাকুর আছেন। পুরুতের মত ভোগ নিবেদন করে নিখুঁত বানিয়ে দোব। তাতে চন্নামৃত ছিঁটিয়ে দিলে খুব জুত করে খাবি।"

'নিঃসীম চরণের বাড়ী গিয়ে অনেক তৃপ্তিতে খেতে লাগল।'

নিঃসীম রাজী হয়ে বলে, "ভগবান কাউকে ছুঁৎ-অছুঁৎ করে পাঠান নি।"

চরণ খুসী হয়ে বলে, "ঠিক বলেছিস্। জাতের জুতো মারা তফাৎ আসলে বেজাতদের তৈরী।"

নিঃসীম চরণের বাড়ী গিয়ে অনেক তৃপ্তিতে খেতে লাগল। স্রেফ নিরামিষ,—সেদ্ধ, ডাল, চচ্চড়ি, পাতরি, ডাল্না, টক্। কখনো কখনো সন্দেশ, পিঠে, পায়েস।

নিঃসীম বলে, "আর খাব না, জাত-মারা জিনিস দিচ্ছ যে!"

চরণ ঘাড় কাৎ করে বলে, "কিরকম?"

নিঃসীম বলে, "নয় কেন? এমন আহারে গরীব জাতের কথা ভুলে যাব যে। আহা রে!"

চরণ বলে, "এই কথা! কিন্তু তোর মত খেয়ে জাত ভোলার কথা কেউ তোলে নি তো!"

নিঃসীম অবাক হয়। শুধু তাকে নয়, অনেক গরীব ছেলেকে সে খাইয়েছে।

তাতে তো ফতুর হবার কথা। কিন্তু তা সে হয় না, কোত্থেকে তার নামে মনিঅর্ডারে টাকা আসে। ভারী চতুর ব্যবস্থা তো!

একদিন চরণদাস বাড়ী ছিল না। বুড়ো পিওন এসে হাঁক দেয়, "কৈ গো চরণদাস, বাড়ী আছো তো,—না ভিন্ গাঁয়ে হেমোপাথি (হোমোপ্যাথি) বাক্স নিয়ে পরের উপকারে বেরিয়েছো!"

নিঃসীম বুঝতে পারে না। পিওন বুঝিয়ে বলে, "ছুটির দিনে এ গাঁ সে গাঁ মাগ্‌না চিকিচ্ছে করে বেড়ায়। কবে নাগাল পাব কে জানে? বরাদ্দের টাকা ফি মাসে বিদেশ থেকে আসে। তুমি তো ইস্কুলের ছাত্র—লেখাপড়া জান। ওর নাম দস্তঘাৎ (দস্তখৎ) দিয়ে টাকা রাখ দেখি। বুড়ো মানুষকে হাঁটাহাঁটি করিও না।"

নিঃসীম খুঁৎখুঁৎ করে বলে, "কিন্তু ওর নাম দস্তখৎ করে কি করে টাকা রাখি!"

পিওন বলে, "বোর্ডিং-এর ছাত্ররা দস্তঘাৎ করে টাকা রাখে, তাতে গোল হয় না। আরে তুমি যদি সোরগোলের ভয় পাও, না হয় বকলমে সই দাও। চরণ ফিরে এলে বুঝিয়ে দিও। ব্যস্। খেস্-কুটুম নয়,—ফি মাসে টাকা পাঠিয়ে খালাস। দস্তঘাৎ নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না।"

নিঃসীম অবাক হয়ে বলে, "খেস্-কুটুম নয়, তবে ফি মাসে টাকা পাঠায় কেন?"

বুড়ো পিওন বলে, "নাক টিপলে দুধ বেরোয়, অথচ উকিল-মোক্তারের জেরা! তা সুধাচ্ছ যখন ভেঙ্গে বলি। পুরানো কথা, তখন চরণ ছিল জোয়ান তাগড়া। সে ইস্কুল আর বোর্ডিং-এর বেয়ারা, আর হেডমাষ্টারের পেয়ারের লোক ছিল। কড়া ও করিতকর্মা হেডমাষ্টারের তদ্বিরে সে বছর ইস্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা মঞ্জুর হ'ল। হেডমাষ্টার পরীক্ষার জন্য ছাত্র বাছাই সুরু করলেন। যেন কেউ পট্‌কান খেয়ে তার মুখে চুনকালি না মাখায়।"

নিঃসীম জিজ্ঞেস করল, "টেষ্ট পরীক্ষার বাছাই বুঝি?"

পিওন বললে, "ঠিক। কিন্তু দস্যি হারামাদ ছেলে 'দুরন্ত' বই টুকেপার হবার কারসাজি করল। পেট টিপে গা মুচড়ে, পেটের অসুখের দোহাই পেড়ে সে বারবার বাইরে যেতে লাগল। হেডমাষ্টারের নজর তার ওপর ছিল। তাকে হাতে-নাতে ধরার জন্য চরণকে ইঙ্গিত করে তার পেছনে পাঠালেন। চরণ তাকে বমাল সমেত ধরে ফেলল—পায়খানায় বসে সে একটানা বই টুকছিল।

হেডমাষ্টার তাকে এলাউ করলেন না। তার মিনতি ও কান্নাকাটি মানলেন না। তখন দুরন্ত এক চমকান কাণ্ড করে বসল। তাকে তাকে থেকে এক অন্ধকার রাতে চরণকে নিরালায় ঠেঙ্গিয়ে কানা ও নুলো করে দিল। খোনা-স্বরে বলল, হেডমাষ্টারের

চর, তোকে মেরে 'কানা ঘোড়ার ডিম' বানিয়ে দিলেম। আমার পিছু লাগা। জানিসনে, হাতি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল!"

নিঃসীম অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "তারপর?"

পিওন বলল, "অনেক দিন হাসপাতাল থেকে সে কানা চোখে ও নুলো চেহারা নিয়ে ফিরল। কে তার এ হাল করেছে হেডমাষ্টারের বুঝতে বাকি রইল না। তিনি পুলিশের কাছে এজাহার দিলেন, দুরন্তর সাজার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চরণ বলল, অন্ধকারে সে কাউকে চিনতে পারেনি। অগত্যা পুলিশ মামলায় মামুলী রিপোর্ট দিল। হেডমাষ্টার নুলো চরণকে চাকুরিতে বহাল করলেন। বললেন, যতটুকু পার বোর্ডিং-এর দেখাশুনো কর।"···

বুড়ো পিওন বলতে লাগল, "কয়েক বছর কেটে যেতে দুরন্তর দুর্দান্তপনার কথা সকলেই ভুলে গেল। কিন্তু আমি গাঁয়ের বুড়ো পিওন 'কানা ঘোড়ার ডিমের' কথা ভুলিনি। অনেক দিন পর তার নামে ফি মাসে কুড়ি টাকা মনিঅর্ডার আসতে থাকে কৃতজ্ঞ রায়ের কাছ থেকে।

চরণ মনিঅর্ডার ফিরিয়ে দিয়ে জানায়, তাকে সে চেনে না। আমি দুরন্তর কথা স্মরণ করাতেও সে পরের টাকা নিতে রাজী হয় না। কিন্তু একবার মনিঅর্ডারে এই বলে টাকা আসে যে, তার বিস্তর দেনা আছে। মাসে মাসে সে শুধবে—ফেরত দিলে দুঃখ পাবে।···

চরণ বলে, "বাঃ রে, ভারী রগড় তো পিওন দা। নিজেকেই নিজে কোনও গতিকে চালাই, আর পরকে দোব কর্জ! কি গরজ রে! দেখ তো কি মুস্কিলে ফেলেছে। তোমার তো এ তল্লাটের সব নখদর্পণে—দেখ তো আশপাশে এ নামের কেউ আছে কিনা।"

খুঁজে খুঁজে তা না পাওয়ায় সে বলল, "কি আর করা? গরীব ছেলেদের বেঁটে দি।" তাই সে দেয়। কিন্তু এ অবধি তা নিয়ে কোনও গোল হয়নি।···

পিওন নিঃসীমকে সোনা-মাখা কথা শুনিয়ে চলে যায়। চরণের 'কানা ঘোড়ার ডিম' নাম তার কাছে চিক্‌মিক্ করে ওঠে।···

চরণ ফিরে এলে নিঃসীম তাকে মনিঅর্ডারের টাকা দিয়ে পিওনের মুখে শোনা কথা কয়। চরণ বলে, "ক্ষেপেছিস্! পিওন উদোর গল্প বুদোর কাঁধে চাপিয়েছে।"

স্কুল খুলতে নিঃসীম বোর্ডিং-এ ফিরে যায়। দিন গড়িয়ে চলে, এবং যথাসময়ে সে ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠে। ততদিনে স্কুল ম্যাট্রিক পরীক্ষার সেণ্টার হয়েছিল। নিঃসীম টেষ্টে ভাল নম্বর পেয়ে এলাউ হয়। হেডমাষ্টার তাকে দিয়ে বৃত্তির আশা করেন। তার তদ্বির করার জন্ত হারাণকে বলেন। হারাণের মনে পেছনের আর একটি দিনের কথা মনে পড়ে।···

পরীক্ষার ফল বেরনো অবধি হারাণ নিঃসীমকে কাছে রাখে। নিঃসীম বৃত্তি পেয়ে পাশ করে। হারাণ, হেডমাষ্টার ও অন্যান্য মাষ্টারদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাদের আশীর্বাদ ও চরণের সাহায্য নিয়ে সে শহরের কলেজে পড়তে যায়। তার কলেজের খরচ বইবার ক্ষমতা চরণের নেই, তবু তাকে সে এড়াতে পারে না। চরণ বলে, "গুচ্ছের পোষ্য থাকলে বাড়ী ঘর বিক্রী করে পড়াতে হ'ত তো। না হয় তোকে একটু-আধটু সাহায্য করলেম।...যদি দাঁড়াস গরীব ছেলেদের সাহায্য করিস।"

নিঃসীম সেভাবে নিজেকে গড়তে চেষ্টা করে। বোর্ডিং-এ নিরিবিলি থেকে ভালরকম পড়াশুনা করার জন্য সে টুশানী যোগাড় করে, এবং আই-এ, বি-এ বৃত্তি নিয়ে পাশ করে। ছুটিতে সে চরণের কাছে যায়, আর চরণ আনন্দে গদগদ হয়।

এম-এ পড়ার সময় সে এক বড়লোকের বাড়ী টুশানী জুটিয়ে নেয়। মস্ত কণ্ট্রাক্টার —তাঁর অনেক টাকা, মস্ত বড় বাড়ী, গাড়ী আছে। কাজের চাপে তিনি বাইরে থাকেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে নিঃসীমের মুখে সেবাশ্রমের স্কুল ও বোর্ডিং-এর বেয়ারা চরণের কথা উঠল। বুড়ো পিওনের মুখে শোনা আদ্যন্ত কাহিনী, গরীব ছেলেদের মধ্যে মনিঅর্ডারের টাকা বণ্টন, এবং কানা ও নুলো শরীর, অপরের সেবায় দান প্রভৃতি কথা শুনে সহসা কৃতজ্ঞ রায়ের চোখে অশ্রুর বান ডাকল। তিনি রুদ্ধস্বরে বললেন, "দুরন্ত ও কৃতজ্ঞ রায় এক ব্যক্তি। উদ্ধত বয়সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অমন গর্হিত কাজ করে ফেলি। তারপর পুলিশ কেস হয়ে মারধোর খেয়ে জেল খেটে নাস্তানাবুদ হবার ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাই।"

নিঃসীম বলল, "শুনেছি পুলিশকে এমন কি হেডমাষ্টারকেও সে আসামীর নাম বলেনি। বলেছিল, কাউকে চিনতে পারেনি। তাই পুলিশ কেসে খতম রিপোর্ট দেয়। আর সে কানা ও নুলো শরীরে 'কানা ঘোড়ার ডিম' সেজে ছেলেদের সেবা করে চলেছে।

কৃতজ্ঞ রায় সব স্বীকার করে বললেন, "অথচ আমি ভয়ে ভয়ে নাম পাল্টালাম, স্কুলের পড়া ছাড়লাম। কিন্তু একদিন স্বপ্ন দেখলাম, চরণদা অভিসম্পাতের বদলে যেন আশীর্বাদ দিয়েছেন। কি করে এক কণ্ট্রাকটারের সঙ্গে জুটে গেলাম, এবং নিজে বড় কণ্ট্রাকটার হয়ে দাঁড়ালাম। বিস্তর টাকা পয়সা হতে, হঠাৎ বেচারা চরণের কথা মনে পড়ল। সেই থেকে প্রতি মাসে তাকে মনিঅর্ডার পাঠাই? কিন্তু এমন ত্যাগ ও সহৃদয়ের কথা শুনিনি। তিনি যখন আমাকে ক্ষমা করেছেন আমার মাপ চাইতে হবে। যাবে আমার সঙ্গে?"

নিঃসীম রাজী হয়। কৃতজ্ঞ রায় টাকা-পয়সা, কাপড়চোপড় ও খাবারসহ নিঃসীমকে নিয়ে রওনা হয়, কিন্তু তারা তার সন্ধান পায় না। চরণ দাস নামে নয়, 'কানা ঘোড়ার ডিম' নামেও নয়। অথচ ক'মাস আগেও নিঃসীম তাকে দেখে গেছে!...

সেদিন কিসের ছুটি উপলক্ষ্যে অনেকেই বাইরে গিয়েছিল। 'কানা ঘোড়ার ডিম' নাম মুছে গিয়েছিল, কেউ চিনতে পারে না। হেডমাষ্টার ফিরে এসে বললেন, "আপনারা চরণ দাসকে খুঁজছেন? এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন বুঝি? আর ক'মাস আগে যদি আসতেন। এক দুর্দান্ত দুরন্ত ছেলে তাকে অহেতুক মেরে কানা ও নুলো বানিয়েছিল। তবু সে কিছুতেই তার নাম বলেনি। সেরে উঠে স্কুল ও বোর্ডিং-এর ছেলেদের কত যত্ন তদ্বির করেছে—দুরন্ত ছেলেটার দেওয়া কদর্য নাম 'কানা ঘোড়ার ডিম' গায়ে মেখে সবাইকে চন্দন ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সেবা যত্ন, সাহায্য ও চিকিৎসা করে সে নিজের রোগ পুষে, পথ্য না খেয়ে, অচিকিৎসায় মারা গেছে।···

তার মৃত্যুর কথা শুনে নিঃসীম ও কৃতজ্ঞ রায়ের চোখ বেয়ে জল পড়ল।

হেডমাষ্টার বললেন, "দুঃখ হবার কথা। এই স্কুলে তার যথেষ্ট অবদান। মৃত্যুর পর তার একটা দানপত্র পাওয়া গেছে। তাতে তার ভিটে-বাড়ী, জমি-জমা যথাসর্বস্ব স্কুলকে দিয়ে গেছে। স্বাক্ষর করেছে—চরণ দাস, ব্রাকেটে 'কানা ঘোড়ার ডিম' !···"

কৃতজ্ঞ রায় চেয়ে দেখে, তার দেওয়া নোংরা নাম যেন চরণ দাসের ছোঁয়ায় কালো আকাশে তারার মত জ্বল্‌জ্বল্ করে ফুটেছে!···

খানিক সুস্থ হয়ে কৃতজ্ঞ রায় বলল, "তার জন্য কিছু কাপড়চোপড়, খাবারদাবার এনেছিলাম। ছাত্রদের সে বিলোতে ভালবাসত। তাই দিন। কিছু টাকাও এনেছিলাম।···

তার খড়ো ঘর তারা ঘুরে ঘুরে দেখেন।

কৃতজ্ঞ রায় টাকা বার করে বলে, "তার স্মৃতি হিসাবে ঘরটি পাকা করুন।" হেডমাষ্টার অবাক হয়ে বলেন, "কিন্তু আপনাদের পরিচয় না জেনে অত ডোনেশন কি করে নি?"

নিঃসীম বলে, "আমরা দু'জনেই এ স্কুলের ছাত্র। আমি এখনো কলেজে পড়ি, আর ইনি বড় কণ্ট্রাকটার।"

হেডমাষ্টার আপত্তি করেন না। সেদিনের দুরন্ত রায়কে তিনি কৃতজ্ঞ রায়ের মধ্যে খুঁজে পান না। তিনি খাতায় লিখে ডোনেশন নেন।

তারা বিদায় নিতে চাইলে হেডমাষ্টার বলেন, "তাকি হয়? এখানে স্নানাহার ও বিশ্রাম করুন। তারপর চরণ দাসের দানে স্কুল ও বোর্ডিং-এর উন্নতি দেখে বুঝতে পারবেন, দুরন্ত ছেলেটা তাকে 'কানা ঘোড়ার ডিম' বানাতে চেয়ে পারেনি!···খাওয়াদাওয়ার পর স্কুল ও বোর্ডিং-এর উন্নতি দেখে তারা রওনা হয়। সারা ট্রেন কৃতজ্ঞ রায় মুখ গুঁজে থাকে। সেদিনের দুরন্ত ও কানা ঘোড়ার ডিম মুহুর্মুহুঃ তার চোখের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জেগে ওঠে!•••

জানোয়ারী কাণ্ড

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশেরই দুরন্ত-সেয়ানা এক জংলী-হাতীর বাচ্চা জাম্বো কিভাবে সাগর-পারে সুদূর ইউরোপের জার্মানীতে পৌঁছে সেখানকার নামজাদা সার্কাসের দলে ভিড়ে নানান্ কসরতের কেরামতী দেখিয়ে বিদেশের দর্শক-মহলে যে অসামান্য খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর পসার জমিয়ে তুলেছিল, সে কাহিনী তোমরা ইতিপূর্বেই শুনেছো। তাছাড়া তোমাদের হয়তো আরো মনে আছে যে, জাম্বোর এই বিচিত্র কীর্তিকলাপের গল্প-গুজব শুনে পরম-কৌতূহল ভরে ইউরোপেরই কোনো এক রাজ্যের সৌখিন সম্রাট স্বয়ং চিঠি লিখে জার্মানীর সেই সার্কাসের দলটিকে সাদর-আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—ভারতবর্ষের জংলী-হাতীর বাচ্চার আজব-কসরতের খেলা দেখানোর জন্য। এই চিঠি পেয়ে সার্কাসওয়ালা তো মহা-খুশী⋯এমন সৌভাগ্য চট্ করে সচরাচর বড় একটা জোটে না⋯একরত্তি ঐ জংলী-জানোয়ার জাম্বোর দৌলতে সে সুযোগ যখন মিলেছে, তখন তার যোগ্য-ব্যবস্থাও করা দরকার। কারণ, রাজা-রাজড়ার সৌখিন-খেয়াল⋯সার্কাসের কসরত-কেরামতী দেখিয়ে তাঁদের খুশী করতে পারলে, শুধু মোটা টাকা দক্ষিণাই নয়—সেই সঙ্গে দামী-দুর্লভ আরো কত কি বকশিশ-উপহারও আদায় হবে রাজ-দরবার থেকে! কাজেই সার্কাসওয়ালা থেকে সুরু করে জন্তু-জানোয়ারদের তদ্বিরদার-সহিস পর্যন্ত সার্কাসের দলের লোকজনেরা সবাই সোৎসাহে মেতে উঠলো—পয়মন্ত জংলী-জানোয়ার জাম্বোকে রীতিমত তোয়াজ-আদর-যত্ন করে আরো নানান্ নতুন-নতুন খেলার কায়দা-কসরত শিখিয়ে আরো বেশী কেতাদুরস্ত পাকা-ওস্তাদ বানিয়ে তোলার চেষ্টায়।

কিন্তু মুস্কিল বাধলো জাম্বোকে নিয়ে! কারণ, বয়সে কাঁচা এবং জংলী-জানোয়ার হলেও, সেয়ানা-বুদ্ধিতে আর খামখেয়ালী-দুরন্তপনায় জাম্বো ইতিমধ্যেই এমন পাকা-দড় হয়ে উঠেছিল যে, তার ফন্দী-ফিকির-শয়তানী-দৌরাত্ম্যের দাপটে সার্কাসের দলের লোকজনকে হামেশাই রীতিমত নাজেহাল হয়ে নানান্ দুর্ভোগ-দুর্দশা সহ্য করতে হতো। তাছাড়া সার্কাসের দলের সবাইকার কাছে সারাক্ষণ তোয়াজ-আদর-আস্কারা পেয়ে, সেয়ানা-দুরন্ত জাম্বো বেশ ভালোই বুঝেছিল যে, তাকে নাহলে রাজ-দরবারে সার্কাসের খেলার আসর মোটেই জমবে না। কাজেই সুযোগ বুঝে, নিজের খেয়াল-খুশী মতো সে এখন যত কিছু বেয়াড়া-আবদার আর দুষ্টমি-দুরন্তপনার দাপট সুরু করে দিলো। অর্থাৎ, যখনি যে বায়না করে বসবে, তখনি সেটি মেটানো চাই⋯নাহলেই ব্যস্! জাম্বোর মেজাজ গেল বিগড়ে⋯সহজে আর টলানো যাবে না তাকে—এমনই নাছোড়বান্দা জেদ! নিজের

মর্জি-মাফিক আবদার না মিটলেই জাম্বো রীতিমত বেঁকে দাঁড়ায়···সার্কাসের দলের কারো কোনো কথা শুনবে না···নতুন খেলার কায়দা-কসরত শিখবে না···ঠায় চুপচাপ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, নয়তো হরেক-রকমের উদ্ভট-দৌরাত্ম্যের দাপটে লোকজনের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে—সারাক্ষণই তার মাথায় এইসব ফন্দী-ফিকির, শয়তানীর দুষ্টু মতলব কিলবিল করছে!

জাম্বোর এই দুর্জয়-দুরন্ত বেয়াড়া-একরোখা জেদের দৌরাত্ম্যে সার্কাসের দলের লোকজনেরা তো হয়রান-নাজেহাল ·কাজেই জংলী-জানোয়ার জাম্বোকে যথারীতি তালিম দিয়ে আরো পাঁচটা নতুন-খেলার কায়দা-কসরত শিখিয়ে দুরস্ত করে তোলা তো দূরের কথা, রাজ-দরবারে গণ্যমান্য-অভিজাত দর্শকদের আসরে হাজির হয়ে সার্কাসের কেরামতী দেখিয়ে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের ইজ্জৎ-রক্ষা করবে কি উপায়ে—সে দুর্ভাবনায় রাতে দলের কারো চোখে ঘুমটুকুও নেই!

ওদিকে ভিন্-রাজ্যের দরবারে সার্কাসের খেলা দেখানোর দিন ক্রমেই ঘনিয়ে এলো, অথচ সার্কাসের মালিক, ম্যানেজার, ওস্তাদ-খেলোয়াড়,মায় জন্তু-জানোয়ারদের তদ্বিরদার-সহিস সকলের শত চেষ্টাতেও জাম্বোর সেই বেয়াড়া একরোখা দুরন্ত জেদের এতটুকু পরিবর্তন ঘটবার কোনো লক্ষণই নজরে পড়লো না। লোকসান আর বেইজ্জৎ হবার দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে সার্কাসওয়ালা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলো!··· তাই তো···এখন উপায়?···

দুর্ভাবনায়-দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে সার্কাসের দলের লোকজনেরা সবাই যখন নিতান্তই নিরাশ এবং প্রায় হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম করেছে, এমন সময় জাম্বোর তদ্বিরদার-সহিসের মাথায় হঠাৎ জাগলো—আজব এক মতলব। অর্থাৎ, সেয়ানা-দুরন্ত একরোখা-জেদী হলেও, জাম্বো আসলে কিন্তু ছিল দারুণ পেটুক। সাধারণতঃ হাতীদের যে সব খোরাক দেওয়া হয়, তার চেয়েও আখ, কলা, পেঁয়াজ আর এমনি নানান্ টুকিটাকি সৌখিন-মুখরোচক খাবারের দিকেই জাম্বোর ছিল রীতিমত ঝোঁক। জাম্বোর চরিত্রের এই দুর্বলতাটুকু কিন্তু তদ্বিরদার-সহিসের বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল। তাই সার্কাসের কায়দা-কসরত শেখানোর সময় কিংবা আসরে খেলার কেরামতী দেখানোর ফাঁকে জাম্বো কোনোরকম বেয়াড়া-দুরন্তপনা বা ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের আদেশ অমান্য করে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তুললেই, ধুরন্ধর সহিস তখনি সেই জংলী-জানোয়ারকে টুকিটাকি এমনি নানান্ সৌখিন-মুখরোচক খাবারের লোভ দেখিয়ে সুকৌশলে শায়েস্তা আর বশ করে রাখতো। পেটুক-জাম্বোও সে সব সুস্বাদু খাবারের স্বাদে মেতে নিমেষের মধ্যেই যেন কোন আজব মায়া-কাঠির স্পর্শে তার দৌরাত্ম্যের দাপট ভুলে দিব্যি শান্ত-সুবোধ আর রীতিমত অমায়িক-সজ্জন

হয়ে উঠতো! এবারেও জাম্বোর একরোখা-বেয়াড়াপনা শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে ধুরন্ধর সহিস বার-বার সেই সনাতন দাওয়াই প্রয়োগ করেছিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। কারণ, এতদিন ক্রমান্বয়ে এভাবে তোয়াজ-আদর আর প্রশ্রয় পেয়ে পেটুক জাম্বোর লোভ হয়তো এমনই দুর্বার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সাবেকী টোট্‌কা-দাওয়াইয়ে আর তাকে ভুলিয়ে বশ করে রাখা সম্ভব নয়···নতুন-ধরণের অন্য কোনে মুখরোচক খাবার পরিবেষণ করা চাই, নাহলে তাকে কিছুতেই আর বাগে আনা যাবে না!

জাম্বো খেলা দেখাচ্ছে।
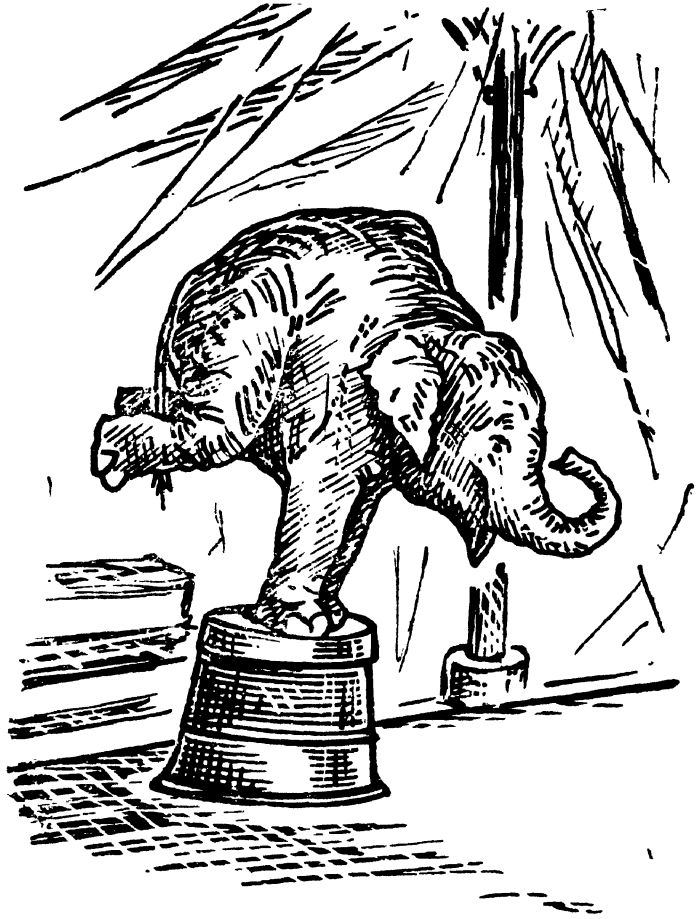
কিন্তু জাম্বোকে সহজেই ভোলানো যাবে—নতুন ধরণের সেই মুখরোচক-খাবারটি যে কি, সেটা আর কোনোমতেই ধুরন্ধর সহিসের মাথায় আসছিল না! কাজেই অনেক ভেবে-চিন্তে সার্কাসওয়ালা আর ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরামর্শ করে,বুদ্ধি মান সহিস শেষে একটা উদ্ভট-আজব উপায় ঠাওরালো। দীর্ঘকাল সার্কাসের দলে কাটিয়ে জংলী জন্তু-জানোয়ারদের তদ্বির-তদারকীর কাজ করে সহিসের হঠাৎ মনে হলো যে, বাঘ-সিংহ প্রভৃতি দুর্দান্ত হিংস্র বুনো-জানোয়ারদের বেয়াড়া-দৌরাত্ম্যের দাপট শায়েস্তা করে খেলার আসরে নামিয়ে তাদের খেলোয়াড়ের বশে রেখে শান্ত-শিষ্টভাবে হুকুম-মতো কসরত-কায়দা দেখানোর জন্য সচরাচর অন্যান্য সার্কাসওয়ালারা যেমন মদ, আফিং কিংবা মরফিয়া—এমনি কোনো একটা মাদক-নেশার কুঅভ্যাস ধরিয়ে দেয়, অবাধ্য দুষ্টু জাম্বোকেও এক্ষেত্রে তেমনি ধরণের টোটকা দাওয়াই দিলে হয়তো সহজেই কাজ হাসিল হয় এবং এ যাত্রা

রাজ-দরবারে সম্ভ্রান্ত দর্শকদের আসরে কসরতের কেরামতী দেখিয়ে কোনোমতে নিজেদের মান-ইজ্জৎ আর রুজি-রোজগারের উপায়টুকু বজায় রাখা যাবে।

এ মতলব মাথায় আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ধুরন্ধর সহিস ছুটে হাজির হলো—সার্কাসওয়ালার খাস-দপ্তরে। সে তাঁবুতে বসে সার্কাসওয়ালা তখন রীতিমত চিন্তাকুল হয়ে পাকা-ওস্তাদ খেলোয়াড়-মশাইয়ের সঙ্গে জাম্বোর বেয়াড়াপনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সহিসের মতলবের কথা শুনে তার বুদ্ধির তারিফ করলেও, সার্কাসওয়ালা কিন্তু জাম্বোকে মাদক-নেশার কুঅভ্যাস শিখিয়ে বশে আনতে রাজী হলেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ খেলোয়াড়-মশাই দেখলেন যে কুঅভ্যাস হলেও, আপাততঃ সঙ্গীন বিপদ থেকে রেহাই পেতে হলে, বিচক্ষণ সহিসের মতলব মতো সাময়িকভাবেও অন্ততঃ জাম্বোকে শায়েস্তা করে নিজেদের বশে আনা চলবে! কারণ, তিনি জানতেন যে, এমনি সব মাদক-সেবনের ফলে, দুরন্ত জংলী জানোয়ারদের হিংস্র-অবাধ্য স্বভাব অনেকটা নরম হয়ে আসে এবং নেশাখোর জানোয়ারেরা তখন কেনা-গোলামের মতো নিতান্তই শান্ত-শিষ্টভাবে সুচতুর মানুষ-খেলোয়াড়ের প্রত্যেকটি হুকুম অক্ষরে-অক্ষরে মেনে পরম-বাধ্য হয়ে কাজ করে চলে। নিত্য-নিয়মিত এই মাদক-অভ্যাস হলে, জন্তু-জানোয়ারদের বেশ ভালোই ধারণা জন্মায় যে, অবাধ্য হয়ে খেলোয়াড়ের কথামতো না চললে কিংবা কোনো বেয়াড়াপনা করলেই তাদের নেশার উপকরণটিও আর যথাযথ মিলবে না। কাজেই, সেই দুর্লভ মাদক-সেবনের লোভে দিব্যি শান্ত-সুবোধ নিরীহ-অনুগতের মতো তারা তখন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকটি হুকুম মেনে একের পর এক সার্কাসের কসরত-কেরামতী দেখিয়ে যায়—এতটুকু ওজর-আপত্তি বা প্রতিবাদ জানানোরও সাহস থাকে না·· এমনি নির্জীব-দুর্বল নেশার দাস হয়ে ওঠে তারা ক্রমেই!

তাই দুরন্ত-চঞ্চল বেয়াড়া-একজেদী হলেও, একরত্তি জংলী-হাতীর বাচ্চা জাম্বোকে এমনি নেশার দাস বানিয়ে তুলতে সার্কাসওয়ালার ছিল প্রবল আপত্তি···কিন্তু আশু বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সে আপত্তির সুদৃঢ়-প্রাচীরেও ফাটল ধরলো···অনিচ্ছা-সত্বেও, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সার্কাসওয়ালাকে শেষে বিচক্ষণ খেলোয়াড়-মশাই আর সহিসের প্রস্তাবে সায় দিতে হলো—বিশেষভাবে, তাদের যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আর যখন গত্যন্তর নেই!

সার্কাসওয়ালার অনুমতি আদায়ের পর, ধুরন্ধর সহিসকে সঙ্গে নিয়ে ওস্তাদ-খেলোয়াড় মশাই সটান এসে হাজির হলেন সার্কাসের বিরাট তাঁবুর প্রান্তে, জন্তু-জানোয়ার-দের আস্তাবলে—জাম্বোর কুঠরির সামনে জাম্বো তখন পায়ে বেড়ী-এঁটে দারুণ গোঁসা-ভরে গুম্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে আরেক দুষ্টুমির ফন্দী-ফিকিরের চিন্তায় মশগুল!

খেলোয়াড়-মশাই আর সহিসও কম সেয়ানা নয়! আস্তাবলে এসেই ওস্তাদ-খেলোয়াড়-মশাই তো গোড়াতেই জাম্বোর শুঁড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, পিঠ চাপড়ে, রীতিমত তোয়াজ-আদর সুরু করে দিলেন। আর ধুরন্ধর সহিসও ইতিমধ্যে ছুটে গিয়ে চটপট কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড গামলা যোগাড় করে এনে, সেই গামলায় প্রায় সের দশেক বড় বড় পেঁয়াজ ঢেলে তার সঙ্গে কয়েক বোতল কড়া-মদ মিশিয়ে, উদ্ভট ধরণের এক টোটকা-আরকের দাওয়াই বানিয়ে সযত্নে জাম্বোর সামনে পরিবেষণ করলেন।

আচম্‌কা যত্ন-আদরের এমন ঘটা দেখে জাম্বো প্রথমে একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই প্রকাণ্ড গামলা-ভর্তি সেই পেঁয়াজ আর আরক মেশানো উদ্ভট-দাওয়াইয়ের ঝাঁঝালো মধুর বিচিত্র গন্ধ পেয়ে, শেষ পর্যন্ত সে আর লোভ সামলাতে পারলে না···নিতান্তই পেটুকের মতো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে গামলার ভিতরে তার লম্বা-শুঁড়টিকে ডুবিয়ে দিয়ে শোঁ-শোঁ করে এক নিঃশ্বাসেই আরকটুকু সব শুষে নিয়ে, তারপর পরমানন্দে টপাটপ খেতে সুরু করলো রসাল-ঝাঁঝালো মুখরোচক সেই বড়-বড় পেঁয়াজগুলি!

কিন্তু জীবনে কখনও যে কোনোরকম মাদক সেবন করেনি, এক-দমে এতখানি কড়া আরক গোগ্রাসে গিলে, নেশার ঘোরে সে তো নিমেষেই কাবু হয়ে পড়বে—এ ব্যাপারটা ওস্তাদ-খেলোয়াড় আর ধুরন্ধর সহিস, দুজনেরই বেশ ভালাভাবে জানা ছিল। কাজেই জাম্বোর হালচাল আর কাহিল অবস্থা দেখে তারা মনে-মনে বেশ খুশী হলো··· যাক্, দাওয়াই ধরেছে তাহলে!···বাছাধন শায়েস্তা হয়েছেন এত দিনে!···দেখি, এবারে উনি কত আর বেয়াড়াপনা করেন—সার্কাসের কায়দা-কসরত রিহার্সাল আর আসরে নেমে খেলার কেরামতী দেখানোর সময়!

ওদিকে ঝোঁকের মাথায় গোগ্রাসে গামলা-ভর্তি রসাল পেঁয়াজ আর ঝাঁঝালো কড়া আরক খেয়ে জাম্বোর অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল···সারা দেহে কেমন যেন অবশ-ভাব, মাথাও ঝিম্‌ঝিম্ করছে···চলতে-ফিরতে গেলে। চতুষ্পদ যেন বেশ একটু টল্‌মল্ করে ···চোখের সামনে আশপাশের দুনিয়া যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে···কেমন একটা আজব অনুভূতি···মনে হচ্ছে—শান্তভাবে নিজের শরীরটাকে সাবধানে সামলে রাখা দরকার! জাম্বোর জীবনে, এ এক অদ্ভুত-বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

আস্তাবলে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে জাম্বো নিজের মনে-মনেই এ সব কথা ভাবছে, এমন সময় ওস্তাদ-খেলোয়াড়মশাই আদর করে তার পিঠ চাপড়ে বললেন,—কৈ হে···জেদ তো বজায় রইলো তোমার···এবারে চলো—সার্কাসের আসরে, নতুন খেলার কায়দা-কসরত শিখবে!

আজব-আরকের নেশার ঘোরে জাম্বোর আচ্ছন্ন-ভাব তখনও কাটেনি···কাজেই

ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের কথায় সে আর কোনো আপত্তি জানালো না···শান্ত-শিষ্ট সুবোধ-বালকের মতো সহিসের পিছু-পিছু গিয়ে সে হাজির হলো সার্কাসের বিরাট তাঁবুর ভিতরে—চারিদিকে দর্শকদের ভিড়-শূন্য গ্যালারী-ঘেরা খেলা দেখানোর সুপ্রশস্ত আসরে।

সেই ফাঁকা আসরের এক কোণে বিমর্ষ-চিন্তাকুলভাবে গালে হাত রেখে বসেছিলেন বিপন্ন-সার্কাসওয়ালা। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে খেলোয়াড়-মশাই আর সহিসের সঙ্গে দুরন্ত জাম্বোকে নিতান্তই নিরীহ ভঙ্গীতে রিহার্সালের আঙিনায় এগিতে আসতে দেখে, তিনি সোৎসাহে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তারিফ জানালেন,—আঃ, বাঁচালে! সত্যিই বাহাদুর বটে, তোমরা দু'জনে! অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছো, দেখছি! এজন্য মোটা বকশিশ দেবো তোমাদের···আজই!···

আসরে দলের অন্য সব লোকজনের সামনে সার্কাসওয়ালার এমন উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতির ঘটায় দেমাকে-অহঙ্কারে ওস্তাদ খেলোয়াড় মশাইয়ের তো আর মাটিতে পা পড়ে না! সদম্ভে লম্বা গোঁফে পাক দিতে দিতে গ্যালারীর কিনারায় এগিয়ে গিয়ে সার্কাসের বাজনদারদের পানে তাকিয়ে তিনি মুরুব্বী-চালে ফরমাশ করলেন,—বাজাও বাজনা! সুরু করো রিহার্সাল!

বাজনদারদের ফরমাশ করেই পাকা ওস্তাদ খেলোয়াড়-মশাই গম্ভীরভাবে সহিসের হাত থেকে সার্কাসের খেলা দেখানোর ইয়া লম্বা চাবুকখানা টেনে নিয়ে আসরের মাঝখানে জাম্বোর দিকে এগিয়ে গেলেন। জাম্বোর তখনও নেশার ঘোর কাটেনি···তাই আসরের এক কোণে সে এতক্ষণ ঠায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের ঝিমন্ত বেকায়দা-ভাবটা সামলে নিচ্ছিল। হঠাৎ খেলোয়াড়-মশাইয়ের সজোরে চাবুক-হাঁকরানোর শব্দে তার চমক ভাঙলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতেই খেলোয়াড়-মশাই লম্বা চাবুক নেড়ে ইশারা করে বললেন,—যাও আর বেয়াড়াপনা নয়, লক্ষ্মী-ছেলেটির মতো এবার সুরু করো দেখি, তোমার নতুন-নতুন সব খেলার রিহার্সাল!···

এই বলেই খেলোয়াড়-মশাই ফিরে তাকালেন তাঁবুর কোণে সার্কাসের বাজনদারদের দিকে। বাজনদারের দল ইতিমধ্যেই তাদের বাঁশী-বেহালা, ঢাক-ঢোল, কাঁসর-করতাল বাজনাগুলির সুর মিলিয়ে রেখেছিল। কাজেই খেলোয়াড়ের ইশারা মাত্রই সুরু হলো—বিচিত্র ছন্দে-গাঁথা সার্কাসের ঐক্যতান-গৎ! বাজনার সেই সুর-ছন্দের দোলায় মাদকের মোহে ঝিমন্ত-আচ্ছন্ন জাম্বোর মন নেচে উঠলো, সে ভুলে গেল তার অবাধ্যতা আর বেয়াড়া-দুরন্তপনার ফন্দী-ফিকির। রীতিমত শান্ত-অনুগতভাবে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের প্রত্যেকটি আদেশ মেনে সে নিখুঁত-ভঙ্গীতে একের পর এক সার্কাসের নতুন-নতুন খেলার কায়দা-কসরতের রিহার্সাল চালাতে লাগলো।

দুরন্ত-অবাধ্য জংলী-জানোয়ার জাম্বোর স্বভাবের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে সার্কাসের দলের লোকজন সবাই তো অবাক ! গুণ বটে ধুরন্ধর সহিসের···ঐ উদ্ভট টোটকা দাওয়াই প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গেই রোগের উপসম। বেমালুম সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একেবারে।

সকলেই মহা খুশী ! যাক্, এবার তাহলে মুস্কিল-আসান্ হলো ! অবাধ্য-বেয়াড়া ঐ একরত্তি বুনো হাতীর দুরন্ত বাচ্চাটাকে দেখছি, শেষ পর্যন্ত শায়েস্তা করা···বশ মানানো সম্ভব হয়ে উঠলো ! এখন জাম্বোকে বেশ ভালোভাবে তালিম দিয়ে সার্কাসে নতুন-নতুন খেলার কায়দা-কসরতগুলো রপ্ত করিয়ে নিলেই রাজ-দরবারের আসরে হাজির হয়ে···

মুরুব্বী-চালে বুক ফুলিয়ে আস্ফালন করে ওস্তাদ খেলোয়াড়-মশাই সবাইকে আশ্বাস দিলেন,—সে দুর্ভাবনা আর নেই ! দেখছো তো, কেমন কাবু করেছি বাছাধনকে ! লোকে কথায় বলে,—ঘুঘু দেখেছো, কিন্তু ফাঁদ ছাখোনি ! হুঁ !···আমার সঙ্গে চালাকী ! দেখি এবার, জাম্বো-বাবাজীর জারিজুরি কতখানি।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, কার্যতঃ দেখা যায় যে অনেক সময় ঠিক তেমনটি ঘটে না··· বরং বিপরীত ফলই নজরে পড়ে। এক্ষেত্রেও, ঠিক তাই ঘটলো !···অর্থাৎ, আসরে রিহার্সাল দেবার সময় এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ দৌড়-ঝাঁপ-পরিশ্রমের ফলে, জাম্বোর নেশার ঘোর আর ঝিমন্ত ভাবটুকু ক্রমেই মিলিয়ে এসেছিল··কাজেই রিহার্সাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েই সে আবার বেয়াড়া জেদ ধরে বসলো··· খেলার আসর ছেড়ে কিছুতেই আস্তাবলে ফিরে যাবে না ! 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'—এবারে এই হলো, তার ধনুর্ভঙ্গ পণ ! সার্কাসের দলের কারো সাধ্য নেই যে কোনো উপায়েই তাকে খেলার আসর থেকে এক-পা অন্য কোথাও নড়াতে পারে—এমনই দুরন্ত-দুর্জয় জাম্বোর গোঁ !

আবার এক নতুন বিভ্রাট !···জাম্বোর এই দুর্জয় জেদের দাপটে সার্কাসের দলের লোকজনদের হয়রানি আর দুর্ভোগের তো অন্ত নেই··উপরন্তু, অশান্তি-দুশ্চিন্তার বোঝা !

জাম্বোর কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই··তার আবদার রক্ষা না করলে, কারো কোনো কথা শুনতে সে রাজী নয়—এমনই অটল জেদ ! কাজেই নানান্ চেষ্টা করে নাজেহাল হয়ে সার্কাসের দলের লোকজনেরা শেষে নিতান্তই দায়ে পড়ে আগের বারের মতোই আরেক গামলা-ভর্তি পেঁয়াজ আর কড়া মাদক-মেশানো উদ্ভট-আজব সেই টোট্কা-দাওয়াই ঘুষ দিয়ে সে-যাত্রা কোনো রকমে জাম্বোর দুর্জয় জেদের মোকাবিলা করলে।

কিন্তু তাতেই যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটলো, তা নয়···বরং এই ঘটনার পর থেকেই জাম্বোর বেয়াড়া জুলুমের মাত্রা যেন আরো বেড়ে উঠলো—বিশেষ, এমন উৎকট নেশার

স্বাদ যখন সে পেয়েছে একবার, তখন তাকে সামলানো দায়! কাজেই নিজেদের কর্মফলে, সার্কাসের দলের লোকজনের দুর্ভোগ-অশান্তির সীমা রইলো না! কারণ, রাজ-দরবারে সার্কাসের খেলা দেখানোর দিন ঘনিয়ে আসছে…সেজন্য রোজই রিহার্সাল চলে এবং সুযোগ বুঝে ফন্দীবাজ পেটুক নাছোড়বান্দা জাম্বোও সকাল-বিকাল হামেশাই জেদ ধরে বসে—পেঁয়াজ আর আরকের টোটকা-দাওয়াই না পেলে সে কারো কথাই শুনবে না… কোনো কাজ করবে না—নিছক ধর্মঘট!

জাম্বোর রকম-সকম দেখে বেচারা সার্কাসওয়ালা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো! নিত্য দু'তিন দফা এভাবে কাঁচা-পয়সা খরচ করে কাঁড়ি-কাঁড়ি পেঁয়াজ আর বোতল-বোতল দামী আরক জোগানো…সার্কাসের দল তো দেখছি আর ক'দিনের মধ্যেই দেউলিয়া হয়ে লাল বাতি জ্বাললো বলে! অথচ, মুখ বুজে জাম্বোর দাপট সহে চলা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই! কারণ, ইউরোপের মতো অঞ্চলে ছুট্‌ বললেই তো আর হাতী মিলবে না সহজে এবং মিললেও, আনকোরা সেই নতুন হাতীকে সার্কাসের এত সব কসরতের কায়দা শিখিয়ে পাকা-পোক্ত, কেতা-দুরস্ত করে তোলাও বড় সোজা কাজ নয়—রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার! তাছাড়া আমন্ত্রণ-লিপির সঙ্গে অগ্রিম কিঞ্চিৎ অর্থ বায়না হিসাবে পাঠানোর সময় সম্রাট বাহাদুর স্পষ্টই লিখে জানিয়েছেন যে, সার্কাসের অন্য সব খেলার জন্য তিনি তেমন উৎসুক নন…তাঁর একান্ত বাসনা—সুদূর ভারতের জংলী-হাতীর বাচ্চা জাম্বোর আজব-কেরামতীর প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করা।

অগত্যা সার্কাসওয়ালা বেচারী কি আর করে…নিতান্ত নিরুপায়ভাবে মোটা টাকা লোকসান দিয়ে আরো কয়েক দিন পেটুক শয়তান জাম্বোকে তার উদ্ভট নেশার খোরাক জুগিয়ে, রীতিমত তোয়াজে রেখে, বহু কষ্টে নতুন-নতুন খেলার কসরত শিখিয়ে কেতা-দুরস্ত করে তুলে, অবশেষে যথা সময়ে সার্কাসের যাবতীয় তল্পীতল্পা, লোকজন আর জন্তু-জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে, সদলে পাড়ি দিলেন ভিন্‌ দেশের সেই সৌখিন সম্রাট বাহাদুরের রাজ-দরবারে।

সেখানে হাজির হয়ে সম্রাট বাহাদুর আর রাজ-দরবারের গণ্যমান্য অভিজাত দর্শকদের জমজমাট আসরে সার্কাসের কসরত দেখানোর সময় জংলী-জানোয়ার জাম্বো আরো যে-সব আজব মজার বেয়াড়া কাণ্ড বাধিয়েছিল, সে কাহিনী আজ আর নয়…পরে আরেক সময় তোমাদের বলবো।

পরাজয়

(নেপালের লোক-কথা)

শ্রীতপনকুমার দেব

দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য সারা ভারতবর্ষ জয় করে চলেছেন উত্তর দিকে। হিমালয়ের গা-বেয়ে দুর্গম পর্বতমালা অতিক্রম করে বাঘমতীর অনুসরণে এসে পৌচেছেন নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাটমাণ্ডুতে। নেপাল তখন তন্ত্রশাস্ত্রের পীঠস্থান, মহাপণ্ডিতদের মেলা। সেই পণ্ডিতকুলের মধ্যমণি মহাতান্ত্রিক অমরসিংহ। জ্ঞান তাঁর অসীম, আর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অসামান্য। সেকালে ভারত ও নেপালে সুপরিচিত অমরসিংহ।

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রীয় বিচারের আহ্বান এলো দু'পক্ষ থেকে। পণ হ'ল সাতদিন বিচার চলবে আর পরাজিত পণ্ডিতকে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হবে। আর তন্ত্রগুরু অমরসিংহ একটি প্রার্থনা করলেন যে, দু'জনের মাঝখানে থাকবে পরদার আড়াল—কারো মুখদর্শন চলবে না। শঙ্করাচার্য বললেন, 'তথাস্তু'। মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্যের কোন সর্তেই বাধা নেই। তাঁর আছে অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর অমানুষিক সাধনা।

স্থান—কাটমাণ্ডুর অনতিদূরে তন্ত্রপীঠ গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের নিকটবর্তী বাগমতীর তীরে, আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পশুপতিনাথের স্বর্ণমন্দির। সেদিনটি আজ কারো মনে নেই। বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রক্তাম্বরধারী তান্ত্রিক অমরসিংহ পরদার আড়ালে মন্ত্রে আর যন্ত্রে আহ্বান করলেন বাগ্‌দেবীকে। দেবীর আবির্ভাব হ'ল।

আরম্ভ হ'ল শাস্ত্র-বিচার। মানুষে আর মানুষে নয়। একদিকে মহামানব শঙ্করাচার্য আর অন্য দিকে অমরসিংহের কণ্ঠে স্বয়ং মহাদেবী বাগ্‌দেবী।

ছ'দিন ধরে চলল বিচার। প্রতিদিন পরাজয় মেনে নিচ্ছেন শঙ্করাচার্য। কাটমাণ্ডু উপত্যকার চারিদিকের হিমালয় শিখরে শিখরে আসন নিয়েছেন অশরীরী দেবতারা। সব স্তব্ধ, শান্ত। শঙ্করাচার্যের পরাজয়ে পুনর্জীবিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম চিরতরে মুছে যাবে হিন্দুস্থান থেকে।

বিচারের ধারা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন আর একজন। তিনি অমরসিংহের কন্যা। শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনায় খ্যাতিলাভ করেছেন। এই বিচারের পরিণতি কি হবে অনুমান করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। আগামী কাল সপ্তম দিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরবিদায় নেবেন চিরতরুণ শঙ্করাচার্য এই পৃথিবী থেকে! তাঁর ভস্মাবশেষ বাগমতীর জলে ধুয়ে নিয়ে যাবে কোন অজানা সাগরে!

মন তাঁর বিচলিত হ'ল। এই কি স্থায় বিচার? তান্ত্রিক অমরসিংহ দৈবশক্তিতে জয়লাভ করে যাচ্ছেন।

অস্ত গেল সন্ধ্যাসূর্য। রাত্রির আঁধার জমাট বেধে এল। তান্ত্রিক কন্যা এগিয়ে গেলেন শঙ্করাচার্যের আবাসে। আদেশ করলেন শঙ্করাচার্যকে—কাল বিচার আরম্ভের ক্ষণে সরিয়ে দিতে পরদা। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সুযোগ না দিয়ে আঁধারে মিলিয়ে গেলেন তান্ত্রিক কন্যা। হতবাক শঙ্করাচার্যের মনে জেগে রইল চিরজিজ্ঞাসা—'কে'?

সপ্তম দিনের বিচারের সুরুতেই পরদা খুলে গেল। লজ্জায় পালালেন বাগ্‌দেবী। আরম্ভ হ'ল শেষ বিচার। ছ'দিনের পরাজয়ের গ্লানি মুছে গেল সপ্তম দিনের জয়-গৌরবে। অধোবদনে পরাজয় মেনে নিলেন তান্ত্রিক অমরসিংহ।

অমরসিংহ তাঁর চিতার চারিপাশে সাজিয়ে নিলেন তাঁর আকৈশোরের পরিশ্রমজাত অমূল্য গ্রন্থমালা। অমরসিংহের চিতাভস্মে সবই মিশে গেল, শুধু শেষ মুহূর্তে শঙ্করাচার্য আপন হাতে রক্ষা করলেন একখানি গ্রন্থ—অমরকোষ। আজও তা অমর হয়ে আছে।

বিজয়ী শঙ্করাচার্য সেই পুণ্যস্থানে স্থাপন করলেন পশুপতিনাথকে। আজও দাঁড়িয়ে আছেন পশুপতি অক্ষয় অমর হয়ে, সেদিনের স্মৃতি নিয়ে।

শঙ্করাচার্য আবার এগিয়ে চললেন উত্তর দিকে তাঁর বিজয় অভিযানে। কাটমাণ্ডু উপত্যকা ছাড়িয়ে দূর পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেলেন শঙ্করাচার্য।

অদ্বিতীয় পর্যটক

নেলসন আর্নেষ্ট জাতে নরওয়েজিয়ান। চরণ-জুড়িতে ভর করে তিনি দুনিয়া পাড়ি দিতে পারতেন। পায়ে হেঁটে তিনি সারা ইউরোপ চষে ফেলেছেন। প্যারিস থেকে পায়ে হেঁটে তিনি মস্কো পৌঁছেছিলেন ঠিক চৌদ্দ দিনে। পথে তেরটি নদী তিনি সাঁতরে পার হয়েছিলেন। একবার তিনি কনস্তান্তিনোপল থেকে আলাস্কায় এসেছিলেন ৫৬২৫ মাইল স্রেফ পায়ে হেঁটে, পাহাড়-জঙ্গল মাড়িয়ে, সাঁতার দিয়ে নদী পেরিয়ে।

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কলকাতা থেকে নৌকো চড়ে তো বাঁটুল রওনা দিল তার পথে কুড়িয়ে পাওয়া কাকার সঙ্গে। কানপুরে যাবে সে, খুঁজে বের করবে তার বাবাকে। মা মারা গিয়েছিল বলে বাবা তাকে মামীর কোলে তুলে দিয়ে কোম্পানীর কমিসারিয়েটে চাকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল কানপুরে।

মাঝে মাঝে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আর খোঁজ নিয়েছে। বাঁটুলকে বাবা চেনে না, বাঁটুলও বাবাকে চেনে না।

কাছে অবশ্য মামীমার লিখে দেওয়া কাগজটুকু আছে।

'জোয়ান বএস বাজখেঞে গলা দিব্ব রঙ গোঁফে তাঁ দেয় ও যে লোককে পাজ্জী মোনে করে তাঁদিগে গড় করে না তা বেতীত গলায় কাটা দাগ পরামাণিকে ক্ষোড় চিরেছিল নাম গোপালবাবু বাড়জ্জীবাবু।'

এই কাগজটুকু ভরসা। অবশ্য রূপচাঁদবাবু যখন থেকে বাঁটুলকে গোপাল বাঁড়ুজ্জের কাছে পৌছে দেবার ভার নিয়েছেন, তখন থেকে বাঁটুলের অন্য চিন্তা নেই।

কলকাতা থেকে আসবার সময়ে তারা শুনল বটে, বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে নামে একটা লোক সায়েবদের মারতে গিয়েছিল বলে তাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রূপচাঁদবাবু সে খবরটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলেন না।

নৌকো দিব্যি ভেসেভেসে চলল। কলকাতার গঙ্গা ছেড়ে ওরা যতই উত্তর দিকে উজিয়ে চলতে লাগল, ততই বাঁটুলের মন অসম্ভব সব আশায় নেচে নেচে উঠতে লাগল। বাবার সঙ্গে দেখা হবে তার। বাবার চাঁদ সূর্যের মত ক্ষমতা আছে। বাবা তার মামা চরণ গাঙ্গুলীকে জব্দ করে ফেলবে।

তখন বাঁটুল মামীমাকে, পদ্মাইকে আর রাধিকে নিয়ে বাবার কাছে চলে আসবে। অনেক দেশ ঘুরে, বেড়িয়ে, তারপর তারা আঁটুল গাঁয়ে ফিরে যাবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বাঁটুল লাল হলুদ সুতো দিয়ে পাখী ধরবার একটা জাল বুনে ফেলল। সুতোর থলিটা ওর কাকীমা, রূপচাঁদবাবুর গিন্নী এনেছিলেন। পদ্ম বলেছিল, ও বাঁটুল দাদা, আমাকে একটা পাখী ধরবার জাল বুনে দেবে? আমি জাল দিয়ে চন্দনা পাখী ধরব?

সেই কথা মনে করেই বাঁটুল জালটা বুনে ফেলল। আঁটুল গ্রামে থাকতে সে তো কতবার জাল দিয়ে পাখী ধরেছে। মামীমা যখন খই-মুড়ি ভাজে তখন উঠোনে বাঁটুল খই ছড়িয়ে দেয়। চ্যাপের মোয়া তৈরি করবার সময়ে চ্যাপের খই।

আর টিয়া-চন্দনা এমন বোকা, ঠিক সন্ধ্যের মুখে খই খাবার লোভে উঠোনে এসে নামবে। রাধীর সঙ্গে যখন বাঁটুলের ভাব থাকত, তখন রাধী কিচ্ছু করত না। কিন্তু আড়ির সময়ে? বাঁটুল যেই জালটা ছড়াবে, অমনি রাধি হাততালি দিয়ে পাখা উড়িয়ে দেবে।

দিয়েই মার খাবার ভয়ে মায়ের কাছে এক দৌড়। রান্নাঘরে, যেখানে বসে মামীমা রান্না করছে, সেখানে গিয়ে বলবে, 'ও মা, সেই গল্পটা বল না গো! সেই যে তোমাদের গোয়ালঘরে বাঘ এসেছিল?'

নইলে তাড়াতাড়ি মামীমার কাছে গিয়ে বলবে, 'সলতে পাকাই, পিদীমে মোটে সলতে নেই।'

বাঁটুল ঠিক করল জাল পেতে পদ্মকে একটা পাখী ধরে দেবে। রাত্তিরে তো আর নৌকো চলে না। রাতে নৌকো বাঁধা থাকে। সকালে জলখাবার খেয়ে রাস্তার জিনিসপত্র কিনে তবে নৌকো ছাড়া হয়। ভোর ভোর নেমে গেলেই অনেক পাখী ধরা যাবে।

ওরা তখন কাশীর কাছাকাছি। আগের দিন নৌকো বেঁধে রাখা হয়েছিল, আজ ছাড়া হবে।

বাঁটুল এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে জালটা নিয়ে নেমে পড়ল।

খুব বড় আমবাগান। আমবাগানের নিচে দিয়ে দিয়ে ভোরের অন্ধকার লেগে আছে। বাঁটুল একটু ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগল। ফাঁকা জায়গায় নির্ঘাৎ পাখীরা এসে বসবে।

খুঁজতে খুঁজতে বাঁটুল চলেছে তো চলেইছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল ভীষণ হইহই। অনেক লোক যেন একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে, 'গোরে আয়ে গোরে আয়ে', আর খুব একটা কান্নাকাটি গোলমাল।

এই সেরেছে! 'গোরে আয়ে' আবার কি জন্তুরে বাপু! বাঘ-টাঘ আসছে না কি? বাঁটুল তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে বসল। আঁটুল গ্রামের বাগদীবুড়ো অবিশ্যি বলত, 'আমাদের বাঁটুল বাঘের পেটে যাবে গ! লিচ্চয় দেখে লিও। ছোঁড়াটার ভয়ডর লাই!'

বাঁটুল বলত, 'কই, বাঘের পেটে তো আমি যাইনি?'

বাগদীবুড়ো বলত, 'আরে, তোর মা যি মরে গেলছে, উ-ই তোকে সামালে সামালে লিয়ে বেড়ালছে। লইলে তোকে ভূত-পেতনী খেয়ে লিত।'

বাঁটুল মনে মনে হাসত। তার মা, যে নাকি কবে মরে গিয়েছে, যে নাকি যেমন ভিতু ছিল, তেমনি নরমসরম, সে তাকে বনে-বাদাড়ে আগলে আগলে বেড়াচ্ছে।

বাগদীবুড়ো বলত, 'লইলে তুই যখন বাঘের ছানা ধরবি বলে বনে গেলছিলি বুনোদের সাথে, যখন বনবরাটা হাঁ করে এসে পড়ল, তোকে বাঁচাল কে? তুই যে চড়কের সন্নেসীদের সঙ্গে বাণ-ফুঁড়া খেলতে গিয়ে পেট ফুটো করে এলি, তোকে রাখল কে? তোর মা এখন ছেঁয়া হয়ে ছানাটিকে আগুলে রাখছে।'

বলত, 'ভোরের বেলা, লইলে সাঁঝ বরাবর যে ঠাণ্ডা বাতাসটি গায়ে লাগে, উ-টি তোর মায়ের আঁচলের বাতাস। ছেঁয়া হয়ে আছে তো? তাই জানিয়ে দেয় আমি আছি।'

এখন বাঁটুল কি করে? বুকের ভেতরটা যেন ধুকধুক করছে। কোথায় নৌকো, কোথায় নদী, পিটুলি গাছের মগডালে বসে বাঁটুল দেখতে লাগল।

ঐ পুব-বরাবর ছোট একটা গ্রাম। গ্রামের যত মানুষ, বুড়ো-বুড়ী, পুরুষ, মেয়ে, ছাগল, গোরু, সব পালাচ্ছে। দৌড়ে পালাচ্ছে, চীৎকার করছে, চেঁচাতে চেঁচাতে ঐ উত্তরের বনের দিকে পালাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছোট্ট গ্রামটা ছেড়ে সবাই চলে গেল। শুধু কে যেন একটা গোরু বুঝি গোয়ালে বেঁধে রেখে গিয়েছে, তার কাতর 'হাম্বা হাম্বা' ডাক শোনা যেতে লাগল।

তারপরই বাঁটুল দেখতে পেল ওদের। ঘোড়ার পিঠে নীল উর্দি পরা চার-পাঁচজন সায়েব। গ্রামের পথ দিয়ে ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে এল আর চলে গেল কাশীর দিকে। যাবার সময়ে কি একটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল খড়ের গাদায়, আর আগুন জ্বলে উঠল। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম। কোথাও একফোঁটা বিষ্টি নেই, সব যেন হা হা করছে! নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। (ক্রমশঃ)

দুরন্ত লড়াই

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

(১)

একদল নেকড়ে। একদল হায়নায়—
লেগে গেছে যুদ্ধ দক্ষিণ চায়নায়।
দুই দলই আওড়ায়—
'হা-রে-রে-রে চ'লে আয়।'
খবরটা হাওড়ায় পৌঁছুল বেতারে।
পঙ্কজ গান বেঁধে ছড়াল তা সেতারে।

(২)

হাফ-সার্ট প্যান্টে দুই দল সাজলো।
দুই দিকে তূরী ভেরী নাকাড়া বাজলো।
মুখোমুখী দর্শন,
দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ,
হয় থুতু-বর্ষণ গালাগালি সঙ্গে।
আঁচড়ানি কামড়ানি চলে রণরঙ্গে।

(৩)

হায়নার মেয়েগুলো মুখ দেখে আয়নায়।
মা'রা হয় জ্বালাতন কচিদের বায়নায়।
চায় তারা ডালমুট,
চকোলেট, বিস্কুট ;
কেউ কেউ ঝুট্‌মুঠ্‌ রামধুন গাইছে।
কেউ কেউ ফুর্তিসে ঝর্ণায় নাইছে।

(৪)

নেকড়ের বউগুলো হাত-বোমা ছাড়ছে
হায়নার ছানাদের গর্তে মারছে।
ছোক্‌রারা পট্‌কায়
আগ্‌ দিয়ে সট্‌কায় ;
দুম্‌-ফট্‌ শুনে ঝট্‌ উঠ্‌ছে মট্‌কায়।
হায়নারা নেক্‌ড়ের পিণ্ডি চট্‌কায়।

(৫)

শেষকালে দুই দলে গুলিগোলা চল্‌ল।
শ'য়ে শ'য়ে হায়না ও নেক্‌ড়ে মর্‌ল।
ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ
করে যত বুদ্ধ
দুনিয়াটা শুদ্ধ তোল্‌পাড় করল।
মড়া-পচা গন্ধে সারা বন ভর্‌ল।

(৬)

বাঘ হাতি ভাল্লুক সিংহ গণ্ডার—
মিলে সবে পুজো দেয় ভদ্রচণ্ডার।
তবু কই শান্তি,
সমরের ক্ষান্তি ?
ঘোচাতে ভ্রান্তি পাণ্ডারা জুট্‌ল।
জেনেভার জঙ্গলে বৈঠকে ছুট্‌ল।
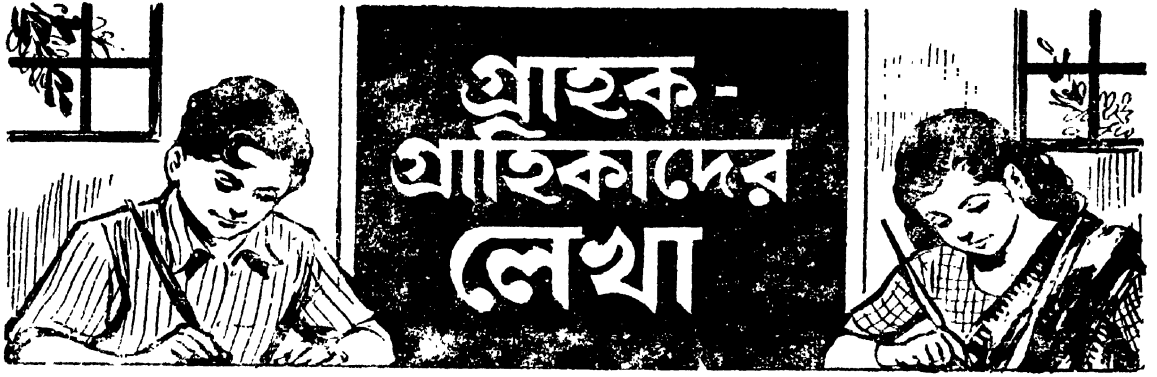
ক্যাঙ্গারু

ছুটির দিনে সকালবেলায় শরতের মিঠে রোদে বসে রণ্টু, মণ্টু কি একটা ছবির বই দেখছিল।

—আরে, আরে! এটা কি প্রাণী রে? রণ্টু বলল।

—ও তো খরগোশ। মণ্টুর উত্তর।

—না না, দু'পা তুলে কি খরগোশ থাকে নাকি! এটা অন্য কিছু হবে। বেশ ঐ তো ছোট্‌দা আসছে, শুধিয়ে নি।

ছোট্‌দা সেখানে যেতেই মণ্টু, রণ্টু এক-সঙ্গেই প্রশ্ন করে উঠল, 'ছোট্‌দা এটা কি?'

—ও এই ছবিটা! কেন তোরা কি বলছিস?

রণ্টু বলল, মণ্টু বলছে ওটা খরগোশ। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—বেশ দাঁড়া বলে দিচ্ছি এটা কি।

এই বলে ছোট্‌দা আমাদের সঙ্গে বসে বললে—এই প্রাণীটির নাম হচ্ছে ক্যাঙ্গারু। বাস অস্ট্রেলিয়ায়। ক্যাঙ্গারুর উচ্চতা সাধারণতঃ পাঁচফুট। এদের বাচ্চাকে বলে জোয়ী। এই জোয়ীরা কত ছোট জানো? প্রায় এক ইঞ্চি। চার মাসের মধ্যে জোয়ীরা ঘাস খেতে শেখে; তখন লোমও গজায় এদের গায়ে কিছু কিছু।

নীচের দিকে ওদের দুটি লম্বা পা; চারটি করে আঙুল। এর মধ্যে একটি আঙুল লম্বা এবং নখও খুব ধারালো। উপরের হাত দুটোতে পাঁচটা করে আঙুল।

ক্যাঙ্গারুরা ভীষণ বুদ্ধিমান। এক এক দলে চব্বিশ-পঁচিশটি ক্যাঙ্গারু বাস করে। এরা নিরামিষভোজী।

এদের পেটের কাছে একটি থলি থাকে; তাতে বাচ্চারা থাকে। লেজটি আড়াই হাতের মত লম্বা।

এদের প্রকৃতি নিরীহ, কিন্তু রাগলে ভীষণ। ক্যাঙ্গারুরা খুব শক্তিশালী। দু' হাতে ধাক্কা দিয়ে এরা মানুষ, কুকুর প্রভৃতিকে পর্যন্ত কুপোকাত করতে পারে।

এতক্ষণ সকলে মন দিয়ে শুনছিল। ছোট্দা থামলে মণ্টু শুধাল, আচ্ছা ছোটদা, ক্যাঙ্গারুকে ইংরেজীতে কি বলে বল না।

—ক্যাঙ্গারুকে ইংরেজীতেও বলে, Kangaroo.

মা খেতে ডাকছেন বলে তিনজনেই উঠে পড়লাম।

—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

রোদ্দুরে বৃষ্টি

ভাদ্রের রোদ্দুরে
এল বুঝি তেড়েফুড়ে
বৃষ্টি, বৃষ্টি!
রোদ্দুরে বৃষ্টি-এ
কি যে অনাসৃষ্টি-এ
বৃষ্টি, বৃষ্টি!
একদিকে রোদ্দুর
চিকচিকে ঝলমল
আর দিকে বৃষ্টির
মোটা ফোঁটা, তোড়ে জল!
একদিকে নীলাকাশ
আর দিকে কালো মেঘ;
একদিকে কি গুমোট!
আর দিকে বায়ু-বেগ।
রোদ আর বৃষ্টির
এই মিল খুব ভালো:
ঝগড়াটে দু'জনের
মেলা-মেশা আলো-কালো!

—শ্রীলপিতা বসু

একটুখানি হাসো

শিক্ষক: যে কোন খেলা করে তাকে কি বলে?

ছাত্র: আজ্ঞে, খেলোয়াড়।

শিক্ষক: বেশ। আচ্ছা, যে-কোন বিষয় যে জানে তাকে কি বলে?

ছাত্র: জানোয়ার!

শিক্ষক: হতভাগা, এতদিনে এই শিখলি?

ছাত্র: কেন স্যার? যে খেলা জানে সে যদি খেলোয়াড় হতে পারে, আর যে সব কিছু জানে সে জানোয়ার হতে পারে না।

* * *

এক বিয়েবাড়ীতে বরযাত্রী কয়েকজন বড়ই অভদ্রতা করছে দেখে কন্যাপক্ষের একজন বিরক্ত হয়ে তাদের বললেন, 'আপনারা এতো বর্বর কেন?'

শুনে বরযাত্রীরা চলে গেল এবং সেই ভদ্রলোককে বললো, 'জানেন আমরা বরের বন্ধু, আমাদের কত সম্মান? আমাদের বরের ডবল খাতির করা উচিত।' ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'হুঁ, সেই জন্যেই তো আপনাদের বর্বর (বর+বর) বললাম। অর্থাৎ কিনা ডবল বর।'

—শ্রীভাস্কর সেন

মেঠুড়ে

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় ২৩ তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সার্ভিস দলের সাঁতারুরাই আবার প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি পেয়েছেন।

গত ক'বছরই সার্ভিস দলের সাঁতারুরা ভারতীয় সাঁতারের পুরোভাগে রয়েছেন। এবার অধিকাংশ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে সার্ভিস দল ১৫৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। পয়েন্ট হিসেবে ৫৪ পয়েন্ট পেয়ে বাঙ্গালা দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সার্ভিস ও বাঙ্গালা দলের পয়েন্টের তুলনা করলে বোঝা যায় সার্ভিস দলের সাঁতারুদের নৈপুণ্য কত বেশি।

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার যাঁরা নতুন নতুন রেকর্ড করেছেন তাঁদের ভেতর সার্ভিসের থামা সিং, বাঙ্গালার রাজীব সাহা, সুনীল ঘোষ, প্রীতি সমাদ্দার এবং রাজস্থানের কুমারী রিমা দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে রিমা দত্তই একমাত্র সাঁতারু যিনি একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং দুশ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন দুটো রেকর্ড করেছেন।

নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা

নেহরু হকির গতবারের বিজয়ী শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে এবারে সেমি-ফাইন্যালের তৃতীয় দিনের খেলায় 'রেড' দলের কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। গতবারের বোম্বাই একাদশ সেমি-ফাইন্যালের দ্বিতীয় দিনে 'ব্লু' দলের কাছে ২—১ গোলে হেরে যায়। হকি ফেডারেশনের 'রেড' ও 'ব্লু' দলই শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় টসে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়। টসে জয়ী হয়ে 'রেড' দল পায় বিজয়ীর সম্মান। হকি ফেডারেশনের 'রেড' ও 'ব্লু' হিসেবে দুটো বাছাই দলে মোট বাইশজন খেলোয়াড়ের ভেতর পনের জন ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী।

ডেভিস কাপ

টোকিওতে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় কোনো অপ্রত্যাশিত ফলাফল নয়। কারণ, এর আগে ভারত যে পাঁচবার ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সে পাঁচবারই জয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে ভারত ছ-বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করল। প্রথম দিনের দুটো সিঙ্গলস খেলার ভেতর রমানাথন কৃষ্ণন জাপানের ওসামু ইশিগুরোকে হারিয়ে দিলেও প্রেমজিত ও ওয়াতানারের খেলা সমান সমান অবস্থায় অসমাপ্ত থাকায় ভারতের জয় সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয় দিন অসমাপ্ত খেলায় ওয়াতানাবে প্রেমজিতলালকে হারিয়ে দেন। ফলে ডবলসের খেলায় গুরুত্ব যায় বেড়ে। কৃষ্ণন ও প্রেমজিত উন্নত কলা-নৈপুণ্যের সুন্দর পরিচয় দিয়ে স্ট্রেট সেটে জাপানী জুটি ইশিগুরো ও ওয়াতানাবেকে হারিয়ে দেন। পরের দিন ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণন এবং জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড় ইশিগুরোর বিরুদ্ধে প্রেমজিত অতি সহজেই জয়ী হন।

বরের খিদে

পরিচয় গুপ্ত

বাসর থেকে পালিয়ে গিয়ে
ক্ষিদের জ্বালায় পথে বসে
টেঁপুর দাদা টপ্পা।
খাচ্ছে খালি টপ-টপাটপ
চক্ষু মুদে গপ-গপাগপ
পেটের কথা ভাবছে নাকো
বৌ-এর কথা ভাবছে নাকো
পকেট খালি গিলছে খালি?
গরম আলুগপ্পা।
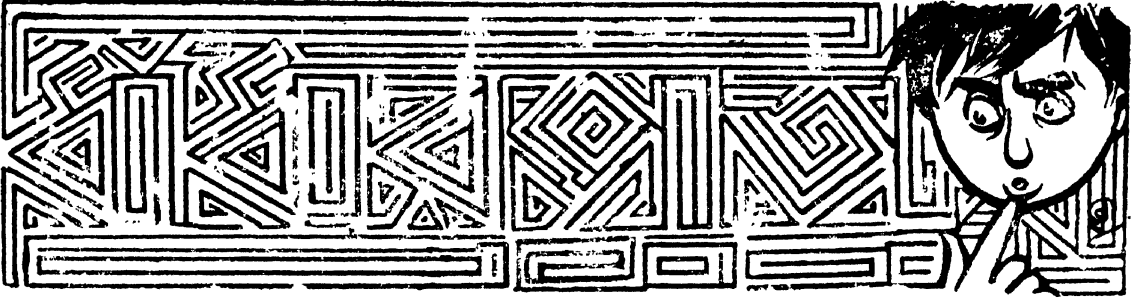
বাজিকর

কাঠের বাক্সের কারসাজি
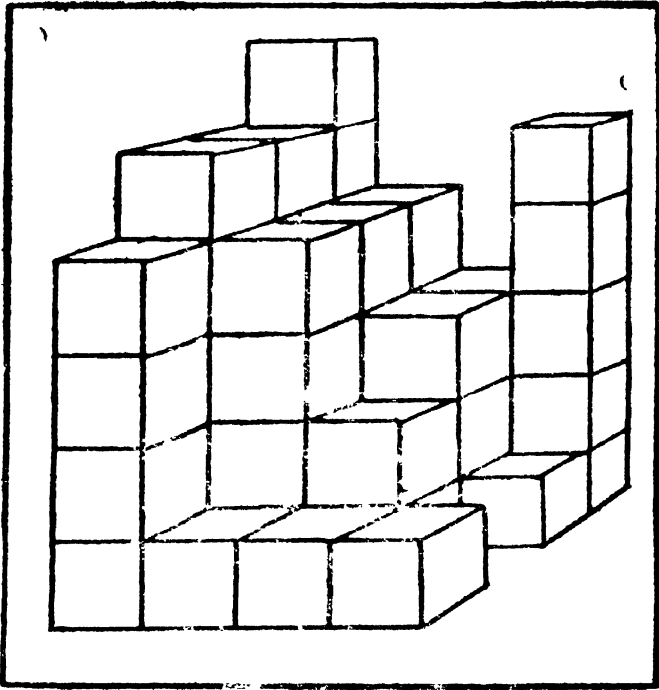
পাশের ছবিটিতে কাঠের টুকরো সাজানো আছে টাল ক'রে। এখন এই টালটি দেখে তোমরা কি নিচের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারো?

(ক) মোট কতগুলি টুকরো আছে বলতে পারো?

(খ) মোট কতগুলি টুকরোকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।

(গ) মেঝের উপর কতগুলি মোট টুকরো আছে?

(উত্তর আগামীবার পাবে)

গত দু'মাসের ধাঁধা'র উত্তর

আশ্বিন

দুটি ছবি কি এক রকম-এর উত্তর হচ্ছে, না। দুটি ছবির পার্থক্য হচ্ছে: (১) টুপি একরকম হয়নি, বাঁ দিকেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। (২) টুপির সঙ্গে লাগানো গাছের পাতার মত দেখতে পালকটিও একরকম নয়। ডান দিকেরটি বাঁ দিকের চেয়ে কিছু বড়। (৩) বাঁ দিকের ছবিতে ঘোড়সওয়ারের গেঞ্জিতে তিনটি সাদা দাগ আছে, কিন্তু ডান দিকেরটিতে আছে চারটি। (৪) বাঁ দিকের ছবিতে ডান পায়ের প্যাণ্টের প্রান্ত

ছেঁড়া, কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে তা নয়। (৫) বাঁয়ের ছবিতে ঘোড়ার কপাল ও ডাইনের ছবিতে ঐ স্থান একরকম হয়নি।

১। **পুলিশ ব্যারাক**-এর উত্তর: ১ম—১ম রাস্তার উপর ৪র্থ মোড়ে। ২য়—২য় রাস্তার শেষ মোড়ে। ৩য়—৩য় রাস্তার তৃতীয় মোড়ে। ৪র্থ– ৪র্থ রাস্তার ৬ষ্ঠ মোড়ে। ৫ম –৫ম রাস্তার ১ম মোড়ে।

২। **চাবি ফেলার কায়দা**-র উত্তর: সূর্যের উত্তাপকে কেন্দ্রীভূত করে একখানি আতসী (ম্যাগনিফাইং) কাঁচের সাহায্যে সুতোটিকে পুড়িয়ে ফেললেই চাবিটি তলায় পড়ে যাবে।

কার্তিক

দুই কাঁটার খেলা: ঠিক বারোটার সময় মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার উপরে থাকবে। তারপর থেকে মিনিটের কাঁটা যখন ৬০ মিঃ ঘর যায়, ঘণ্টার কাঁটা যায় ৫ মিঃ ঘর। এই ভাবে প্রতি ঘণ্টায় একবার একটা আর একটাকে ডিঙ্গিয়ে যায়। ২৪ ঘণ্টায় এই জন্য ২৩ বার একটা আর একটাকে ডিঙ্গোবে। কারণ, রাত্রি বারোটার পর থেকে বেলা বারোটা ও তারপর রাত্রি বারোটা, মোট ১১+১২=২৩ বার।

দৃষ্টিশক্তির পরখ: তাড়াতাড়ি গুণবার সময় উপরের বাঁ-কোণ থেকে কোনাকুনি লাইন কল্পনা করে নিলে, ১+৩+৫+৭+৭+৭+৬+৪+৪+১=৪৫ জন।

ট্রাফিক পুলিশ: পূর্ব দিকে পুলিশটির মুখ থাকলে তার ডান হাত থাকবে দক্ষিণ দিকে এবং বাঁ হাত থাকবে উত্তর দিকে। আবার তার মুখ উত্তর-পূর্ব দিকে থাকলে ডান হাত থাকবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং বাঁ হাত থাকবে উত্তর-পশ্চিম দিকে।

এ ধারণা ভুল

অনেকের বিশ্বাস, একবার যেখানে বাজ পড়ে, দ্বিতীয়বার আর সেখানে বাজ পড়ে না—এ ধারণা ভুল।

অনেকের ধারণা, বাদুড়-চামচিকারা অন্ধ, তা সত্য নয়।

অনেকে এই কথা বিশ্বাস করেন যে, সাহারা মরুভূমিতে কখনো বৃষ্টি হয় না—এ বিশ্বাস ঠিক নয়।

অনেকে বলেন, হাতী নাকি ইঁদুর দেখলে ভয় পায়—এ ধারণাও ভুল।

সত্যশঙ্কর সুর

ব্যাঙের ডাক তোমাদের সকলেরই পরিচিত। বর্ষাকালেই চারিদিক থেকে এদের ডাক শোনা যায়। কিন্তু ব্যাঙ কেমন করে ডাকে লক্ষ্য করেছ কি? সাধারণতঃ দেখা যায় সব প্রাণীই ডাকবার সময় মুখ খোলে, অর্থাৎ মুখ না খুলে ডাকতে পারে না। ব্যাঙের ক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। এরা ডাকবার সময় মুখ বন্ধ করে রাখে। মুখ বন্ধ রাখলেও এরা অদ্ভুত কায়দায় বিচিত্র শব্দ উৎপাদন করতে পারে। এরা ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বাতাসকে স্বরনালীর ভিতর দিয়ে একবার সামনে আবার পিছনে চাপ দিতে থাকে। এর ফলেই বিচিত্র শব্দ উৎপন্ন করে।

* * *

এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির কথা তোমরা সবাই জানো। এক্স-রের সাহায্যে আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, সে কথা তোমাদের অজানা নয়। জার্মানীর উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক উইলহেলম্‌ কনরাড রঞ্জন (রণ্টগেন্) ১৮৯৫ সালে এই রশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করবার জন্য গবেষণা করছিলেন এবং ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় কল্পনাতীতভাবে তিনি এই রশ্মির সন্ধান পান। কিন্তু একে X-ray বলা হয় কেন, জানো? বৈজ্ঞানিক ভাষায় কোন অজ্ঞাত কিছুকে বলা হয় 'X'। ক্যাথোড রশ্মি থেকে উদ্ভূত এই বিস্ময়কর রশ্মির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরেই তিনি এর নাম দিয়েছিলেন—X-ray।

* * *

সাধারণের বিশ্বাস, তিমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাছ। কিন্তু তিমি প্রকৃতপক্ষে মাছ নহে, স্তন্যপায়ী প্রাণী। হোয়েল শার্ক নামক এক জাতের হাঙর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাছ। এই মাছ লম্বায় প্রায় ৬০ ফুট এবং ওজনে প্রায় ২৫০০০, পাউণ্ড হয়। এদের দেহাকৃতি বিরাট হওয়া সত্বেও স্বভাব মোটেই হিংস্র নয়। এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজপ্রাণী শিকার করে জীবনধারণ করে।

পূজোর পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল—দেরি হলেও ৺বিজয়ার স্নেহ-ভালবাসা ও শুভকামনা রইল। আশা করি তোমাদের পূজা ভালই কেটেছে। প্রতিবছর পূজার পইর পড়ে পরীক্ষার পালা—এবার তোমাদের পড়াশুনার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে—সারাবছর ধর্মঘট, স্কুল বন্ধ, অসহযোগ এই সবেই কেটেছে—কাজেই এবছর এই অল্প সময়ে তোমাদের খুব তৎপর হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। সময় অল্প অথচ বছরের পড়া অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। কাজেই তোমাদের অনেক বেশী মন ও পরিশ্রম দিয়ে তৈরী হতে হবে। সে বিষয় আশা করি তোমরা ভেবেছ।

ছেলেবেলা থেকেই নানা ধরনের উপদেশ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ তোমরা, আবার একটু একটু করে বড় হবে যখন তখন ছোটরাও তোমাদের কাছ থেকে পাবে এটা-ওটা উপদেশ। সুতরাং উপদেশ দেওয়াটা একটা সাধারণ প্রথা। কিন্তু উপদেশ দেওয়ার চাইতে বড় কথা হলো উপদেশ মেনে চলা। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই শুনছো উপদেশ-বাণী বাড়ীর বড়দের কাছে, স্কুলে মাষ্টারমশাই আর দিদিমণিদের কাছে। ছাপার অক্ষরে আর মুখের কথায় উপদেশের ছড়াছড়ি। যদি একবার মাত্র উপদেশ দিলে সবাই মেনে চলতো, তাহলে বারবার একই উপদেশ পুনরাবৃত্তি করতে হতো না। তবু তো আমরা দিনের পর দিন চলেছি উপদেশের মালা গেঁথে। যা সৎ, যা সত্য, যা কাম্য তার কথা যত বেশী আলোচিত হয়, ততই সকলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল।

আজ তোমাদের শোনাচ্ছি বাইবেলের একটি উপদেশ—Love thy neighbour—তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো অন্তর দিয়ে। কথাটা পড়ি, কথাটা কানে আসে, কিন্তু অন্তরে তাকে গ্রহণ করেছি কি আমরা? ছোট একটি গল্প শোনো; আরব দেশের গল্প—বহু বছর আগের ঘটনা।

হাসান আর আবদুল পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে। বয়সে আবদুল বড়। বাড়ীতে তার স্ত্রী আর একটি ছেলে। হাসান মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিছুদিন আগে। মা-বাবা তো অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। চাকরী-বাকরী তখনও পযন্ত জোটেনি। সামান্য ক্ষেত-খামার আছে, নিজের হাতেই চাষবাস করে। যা ফসল হয়

তাতে কোনোরকমে চলে যায়। হাসানও কিছু বড়লোক নয়। দু'টি বলদ আর কিছু জমিজমা আছে, তার উপরে নির্ভর করে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন?

বয়সের তারতম্যের জন্য হাসান আবদুলের মধ্যে তেমন ঘনিষ্টতা গড়ে ওঠেনি। তবে তাদের মধ্যে কোনো অসদ্ভাবও নেই। হাসান কখনও কখনও আবদুলের বাড়ী আসে। আবদুলের ছোট ছেলেটির সঙ্গে তার খুব ভাব। অনেকক্ষণ ধরে তাকে গল্প শোনায়, কথা বলে। ছেলেটির আধো-আধো ভাষার কথা তার খুব ভাল লাগে। আবদুলও মাঝে মাঝে অবসর পেলে যায় হাসানের বাড়ী। নানা উপদেশ দেয়। হাসান আবদুলের পরামর্শ মত কাজ করে।

আরব দেশে চাষবাস খুব ভাল হয় না—এমনিই সে দেশে জলাভাব। তারপর আবার মাস কয়েক ধরে একটুও বৃষ্টিপাত হয়নি; তাই সেবার ফসলের ভালো ফলন হয়নি। জমির দানের উপর নির্ভর করে সংসার চালায় যারা, তাদের সকলের মুখে-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কী জানি সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কি?

আবদুল রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবলো হাসান ছেলেমানুষ—তার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়, আর একটু চেষ্টা করলে তার ফসলের পরিমাণ বাড়তে পারতো। বেচারীর সারা বছর চলবে কিনা ভাবনা হচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে ফতিমার সঙ্গে চললো আবদুলের সলা-পরামর্শ। তারপর ঘরের দরজা খুলে বোধহয় বেরিয়ে গেল যে ঘরে শস্য থাকতো সেই ঘরের দিকে। সেখান থেকে একটি বস্তা-ভর্তি শস্য নিয়ে সে রেখে এলো হাসানের বাড়ীর শস্যের গাদায়। খানিক পরেই হাসানের ঘুম ভেঙ্গে গেল—সে ভাবলো আমি একলা মানুষ কায়ক্লেশে চলে যাবে আমার। কিন্তু আবদুল কি করে প্রতিপালন করবে তার পরিবার? বেশীক্ষণ ভাবলো না হাসান। তার জড়ো-করা শস্যের স্তূপ থেকে একটি বস্তা শস্য চুপিসাড়ে রেখে এলো আবদুলের বাড়ীতে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে ঢেলে দিলো ঘুমের কোলে—কিছুটা ভালো করেছে এই মনে করে। আবদুল তখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

পরদিন সকালবেলা আবদুল তার গুদাম ঘরে গিয়ে দেখলো—অবাক কাণ্ড, তার শস্যের গাদা তেমনি রয়েছে—একটি বস্তা-ভর্তি শস্য দিয়ে এসেছে গত রাতে নিজে মাথায় বয়ে, তবু তো ঘাটতি নেই তার! হাসানেরও হলো ঠিক তেমনি ধরনের অভিজ্ঞতা। দুজনেই ভাবলো বুঝি তারা স্বপ্নের ঘোরে প্রতিবেশীর ঘরে পৌছে দিয়েছে শস্য।

সেদিন রাতেও আবদুল ঘুম ভেঙ্গে উঠে চোখ রগড়ে নিল জলের ঝাপটা দিয়ে—ফতেমাকে ডেকে তুললো, তারপর বস্তা নিয়ে চললো হাসানের বাড়ী। সেখানে বস্তাটি ঢেলে দিয়ে এসে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো। হাসানও শেষ রাতে উঠে বস্তা নিয়ে শস্য রেখে এলো আবদুলের গাদায়। আজ আর স্বপ্ন নয়—চাঁদের আলোতে তার নিজের ছায়া দেখে সে বাড়ী ফিরে আবার শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়।

কিন্তু পরদিন সকালেও দু'জনেরই অবাক হবার পালা, কারুই মজুত শস্যের পরিমাণে ঘাটতি নেই। সেদিন রাতেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি, আবার সকালেও একই অভিজ্ঞতা।

পর পর তিনরাত কেটে যাবার পর, আবদুল আর হাসান দুজনেই চলেছে শেষরাতে শস্যের বস্তা মাথায় চাপিয়ে, কিন্তু অধিক রাস্তা পার হতে না হতেই দেখা হয়ে গেল দু'জনের। এবার বুঝতে পারলো তারা ব্যাপারটা। একমন একপ্রাণ হয়ে দু'জনেই চেয়েছিল দু'জনের সাহায্য করতে পরস্পরের অলক্ষ্যে। হাসানের চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা। আবদুলের চোখও শুষ্ক নয়। বস্তা নামিয়ে রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো হাসানকে নিজের বুকে। কারু মুখে কথা নেই—নিঃশব্দের মুখরতায় ভরে উঠলো দু'জনের অন্তর। যাঁর চোখে কিছুই এড়ায় না, শুধু তিনিই হয়ে রইলেন মর্ত্যে এই অমৃতময় অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

হাসান আর আবদুলের মত আমরাও যদি আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসতে শিখি, তাহলে পৃথিবীতেই আমরা গড়ে তুলতে পারবো শান্তির স্বর্গরাজ্য।

চিঠির উত্তর—

কাশীনাথ পাল, বেহালা—গল্প পাঠিও। বিচার সম্পাদক মশাই-এর চূড়ান্ত।

চিত্ত মাইতি, মেদিনীপুর—তোমার চিঠির মর্ম বুঝতে পারলাম না। ভালো করে পরিষ্কার লিখো, তবে উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

আম্রিতা, মাণিকবাসর—ধাঁধা আরো ভেবে পাঠিও।

কামারুজ্জামান, মোহনপুর—না, ও ঠিকানা আমি জানি না।

দুলাল শর্মা, দেওঘর—মনে সাহস রাখো, অহেতুক ভয় দূর করো।

রবি চক্রবর্তী, কোলকাতা—তোমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাচ্ছি।

শ্রাবণী পত্রনবীশ, অরিন্দম, অর্পিতা, মধুমিতা, যাদবপুর; পত্রলেখা ও চিত্রলেখা দত্ত, কোলকাতা—সকলের চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৪৫ প
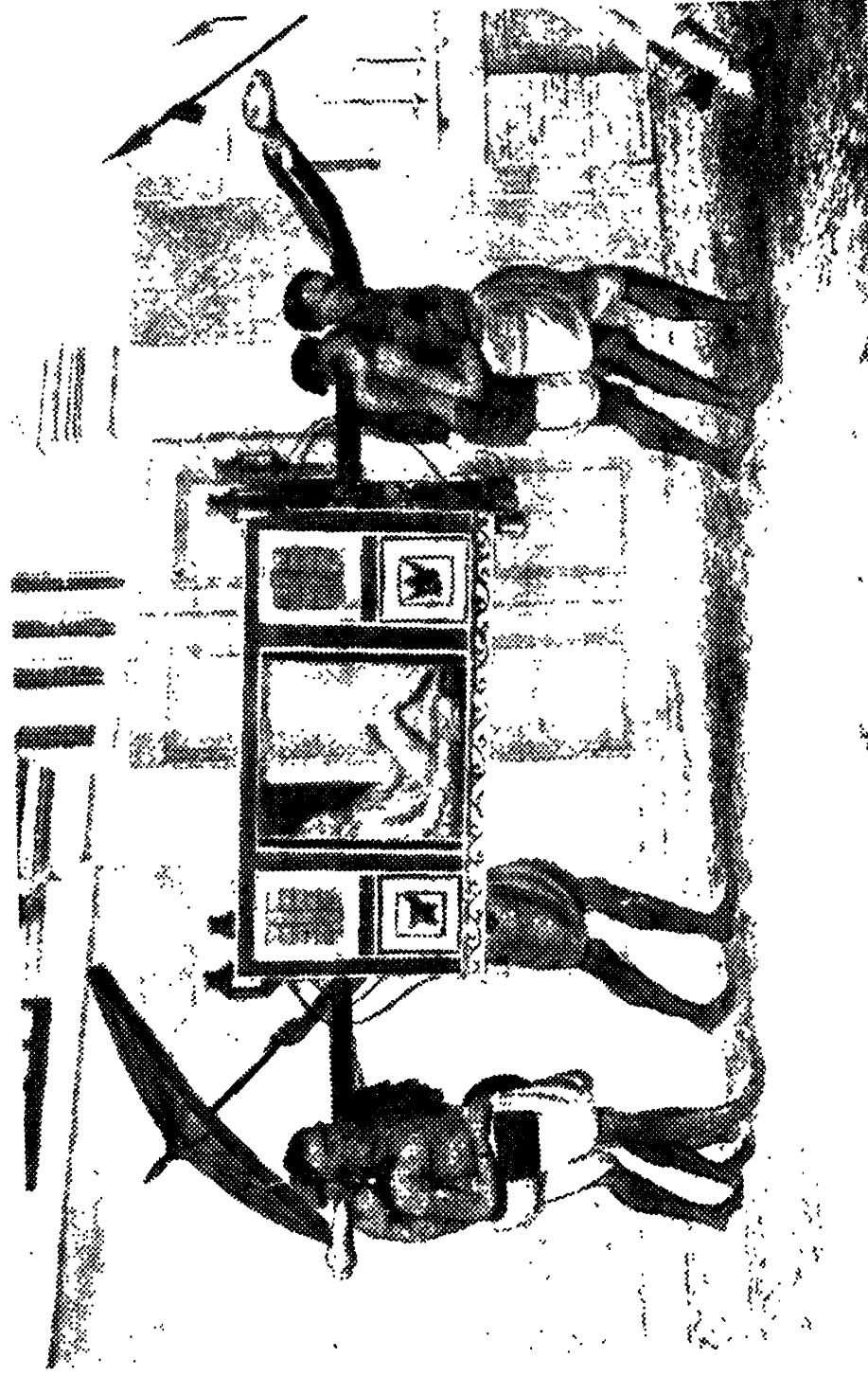
প্রাচীন কলিকাতার পাল্কী

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৭শ বর্ষ] পৌষ : ১৩৭৩ [৯ম সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীবিমল দত্ত

❋

ফুল-মুলুকের ফুল্ল শ্রমিক
মৌমাছিদের জলসাঘর,
লাখ-কুঠ্‌রি মৌ-ঠাসা যে
টাট্‌কা মধুর দান-সাগর।

মাঠের হাসি, বাটের খুশি,
বনের হাসির চোলাই-সার
ও জাদুকর, ও মধুকর,
সাঁত্‌রে বাতাস করলে পার।

বাদ্‌লা দিনের মেঘলা আলোয়
ভিজে হাওয়ায় উড়িয়ে পাল
গুন্‌গুনিয়ে ঝুন্‌ঝুনিয়ে
ফুল-মহলের লুট্‌লে মাল।

শরৎ হাসে শিউলি ফুলে
অপরাজিতার মৌ-গেলাস
পদ্মবনে মৌ-ডাকাতি
ও মধুকর, পুষ্প-ত্রাস!

হেমন্তেরি হিমেল্‌ ভোরে
নীল সবুজের পর্দা ফাঁক
হাজার পাখী আকাশ ছেয়ে
ফিরলে ঘরে একশ লাখ্‌;

ঋতুর চাকা ঘুরছে যেমন
পাখার তোমার বিরাম নাই
বসন্তে, শীত, গ্রীষ্মে তুমি
ঘুরছ ভুবন সকল ঠাঁই—

ও মধুকর মৌচাকেরি,
ও জাদুকর মিষ্টতার
শিল্পী এবং রাসায়নিক
জগৎ-ভরা হৃষ্টতার—

শিখাও মোরে মুন্সিয়ানা
ভিয়ান করা, রসের জ্বাল
ফুল-মুলুকের ক্ষুদ্র শ্রমিক,
শিল্পী কবির ইন্দ্রজাল!

অচিন দেশে

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য

দুটো ঘোড়া।

পক্ষিরাজ ঘোড়া।

একটি সাদা, একটি লাল।

রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র লাফিয়ে উঠল তাতে। ডান হাত দিয়ে দু'জনেই মুচড়ে দিল ঘোড়া দুটোর ডান কান দুটো। দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে পেটে মারল লাথি। ঘোড়া আকাশে উঠল সোঁ-ও-ও-ও করে! উঠছে—উঠছে—আরও উঠছে।

অনেক উঁচুতে উঠল।

একদম ছোট্ট হয়ে গেল।

রাজপুত্র বলল—থাম।

মন্ত্রীপুত্র বলল—থাম।

দু'জনেই তাদের ঘোড়া দুটোর বাঁ-কান দুটো মুচড়ে দিল। থামল ঘোড়া। ঘাড়ের চুল ধরে দিল টান। ছুটল ঘোড়া সামনের দিকে। জোরে খুব জোরে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা। গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, সাঁ-সাঁ করে সব সরে যাচ্ছে পিছন দিকে।

রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়া এগিয়ে চলেছে। কত বন, কত জঙ্গল, কত পাহাড়, কত পর্বত, কত নদী, কত নালা পেরিয়ে, চলেছে—চলেছে—আর চলেছে।

কোথায় যাবে তারা? কে জানে! হয়ত বা চাঁদের দেশে কিংবা মেঘের দেশে, নয় তো তারার দেশে। সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখবে। তাই তো তারা ঘোড়া ছুটিয়েছে অত জোরে।

ছুটতে ছুটতে ফুরিয়ে এল বেলা। পশ্চিমাকাশ উঠল লাল হয়ে। সূর্যকে মনে হচ্ছে যেন মস্ত একখানা থালা। রাজপুত্র বলল—এবার নামব। কাল ভোরে আবার আমরা যাত্রা সুরু করব।

যে কথা সেই কাজ। ঘোড়া দুটোর বাঁ-কান দুটো মুচড়ে দিয়ে কপালে দিল টোকা। ঘোড়া নামতে লাগল স্-স্-স্ করে।

একি! কোথায় নামল তারা! যে দিকে তাকায় শুধু বালু, বালু আর বালু। গাছ নেই, পালা নেই, ঘর নেই, বাড়ী, নদ-নদী কিচ্ছু নেই। ধূ-ধূ-করছে। মরুভূমি যেন।

ঘোড়ার পিঠে বস্তায় ছিল খাবার। বের করল দু'জনে। ঘোড়া দুটোকে দিল,

রাজপুত্র কোমর থেকে বের করল ছুরি।

নিজেরা খেল। চামড়ার থলে থেকে বের করল জল। নিজেরা খেল, ঘোড়া দুটোকে দিল।

খোলা আকাশের নিচে, বালুর উপর শুয়ে পড়ল উভয়ে। দেখতে লাগল আকাশের তারা। মিট্‌মিট্ করছে। একবার জলছে, একবার নিবছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে! দূর থেকে ভেসে আসা এক চিৎকারে ঘুম গেল ভেঙে।

রাজপুত্র বলল—কিসের চিৎকার!

মন্ত্রীপুত্র বলল—তাই তো!

তাকিয়ে থাকল দু'জনে। হ্যাঁ, ঐ তো, দূরে—অনেক দূরে, ঘোড়ায় চেপে মশাল হাতে এগিয়ে আসছে কারা।

রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র উঠে দাঁড়াল।

পাশেই ছিল উঁচু এক বালুর ঢিপি। ঘোড়া দুটোকে নিয়ে তারই আড়ালে লুকোল। হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল দলটি। মরুভূমির দস্যুদল। রাজপুত্র কোমর থেকে টেনে বের করল ছুরি। অন্ধকারেও চকচক্ ক'রে উঠল। ঠিক যখন ঢিপিটির কাছে এসে পৌঁছিল দস্যুদল—রাজপুত্র ছুঁড়ে মারল তার ছুরি। মশাল হাতে যে লোকটা সবার আগে আসছিল, ছুরি গিয়ে বিঁধল তার বুকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। মশাল গেল নিবে।

বেঁধে গেল হট্টগোল। কেউ কাউকে দেখছে না। কেউ কাউকে চিনছে না। সবাই তখন কোমর থেকে তলোয়ার বের করেছে। ঘুরিয়ে চলেছে সমানে বোঁ বোঁ ক'রে। রাত পোহাল। ফরসা হ'ল।

রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র তাকিয়ে দেখল— দস্যুরা সব পড়ে আছে। কারও বা হাত, কারও বা পা, কারও বা মাথা কাটা।

রাজপুত্র চাইল মন্ত্রীপুত্রের দিকে, মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের দিকে। কি যেন ইশারা হ'ল ছ'জনায়।

লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়।

ঘোড়া উঠল আকাশে—সোঁ—ও—ও—ও করে।

ব্যাঙের বিয়ে

শ্রীঅশোককুমার মিত্র
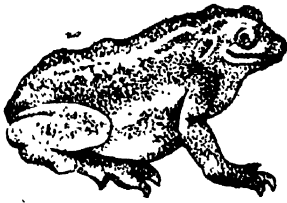
তালপুকুরের কোলার সাথে
সোনা ব্যাঙের বিয়ে,
শেয়াল হবে পুরুতমশাই
পৈতে গলায় দিয়ে।

বাবুই পাখী জ্বালবে আলো
জোনাকী পোকা দিয়ে।
গান গাইবে ঝিঁঝির দল
বাজনা বাজিয়ে।

বিয়ের পর ভোজ রাঁধবে
কাঠবেড়ালীর দল।
ছেলে-বুড়ো আয়রে সবাই
দেখবি যদি চল।

পেরুর ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা

শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

একই উৎসবের প্রকাশ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশের দোলের তাই সুদূর পেরুতে আনন্দমেলা নামে পরিচয়। নামে কি আসে যায়? সত্যিই আনন্দের চেহারা নিয়ে কথা। সেটা ধরতে গেলে অনেক দূরের দেশ পেরুর শিশুমন আর বাংলাদেশের শিশুমনে সামান্য তফাতও নেই।

এটা শিশুদের উৎসব। শিশুদের হলেও উদ্যোগপর্বের ঘটা নেহাৎ কম নয়। ভরসার কথা উৎসবের ঠিক আগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রীষ্মাবকাশের জন্যে বন্ধ থাকে। অনেক দিন ধরেই উৎসব নিয়ে মাতামাতি চলে—সেই সঙ্গে উদ্যোগ আয়োজনও চলতে থাকে। Arequepa (আরুকুইপা) পেরুর সবচেয়ে বড় শহর। এখানেই উৎসবের ঘটা সবচেয়ে বেশী। এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় ১,৪০,০০০ হাজারের মত। এই শহরের চারদিকে ছড়ান রয়েছে হাজার হাজার সাদা বাড়ী। ইঁটের এই সুন্দর বাড়ীগুলো দেখে স্বর্গরাজ্য বলে ভুল করাও বিচিত্র নয়। এই সাদার রাজ্য ঘিরে রয়েছে সুন্দর সতেজ সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। তাই এখানকার লোকেদের এই শহরকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই। তারা বলে এটা হচ্ছে 'পান্নাঘেরা হীরক নগরী'।

উৎসবের ঠিক আগের দিন দলে দলে শিশু রংয়ের দোকানের সামনে ভিড় করে। তাদের মনে আনন্দের জোয়ার—আর এতেই দোকানীদের উৎসাহ। তারা দোকানের সামনে বিভিন্ন আকারের সুন্দর সুন্দর পাত্রে রংয়ের গোলা সাজিয়ে রাখে। শিশুরা নিজেদের রুচিমত রং পছন্দ করে।

দোকানীরাও শিশুদের রং বাছাইয়ে সাহায্য করে।

শুধু রংয়ের গোলাই না—এই উৎসবে মুখোস, নকল নাক, কাগজের টুপি এবং বেলুনেরও প্রয়োজন। তাই দোকানে দোকানে এগুলোরও অপর্যাপ্ত সমাবেশ। এছাড়া নানা ধরনের রঙীন কাগজের খেলনা তো রয়েছেই।

প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনাকাটার পর শিশুরা বাড়ীতে ফেরে এবং কাসকারুনস (Cascarones) তৈরী করে। এগুলোকে এক ধরনের পিচকারীও বলা চলে। ডিমের খোলা দিয়ে এগুলো তৈরী করা হয়। প্রথমে ডিমগুলি হতে কুসুম ও সাদা অংশ বের করে নিতে হয়। এর পরে খালি খোলাগুলিতে বিচিত্র বর্ণের রংয়ের গোলা ভর্তি করা হয়।

উৎসবের একটু আগে একদল সুদৃশ্য নৌকা বিচিত্র কলতান তুলে নগর প্রদক্ষিণ করে। এই নৌকার মহড়া আবালবৃদ্ধবনিতার মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে আনে। রাস্তায় বেরিয়ে-পড়া মানুষের পরনে থাকে দামী পোষাক, আর সেই সঙ্গে মনে ভেসে

বেড়ায় খুসীর জোয়ার। বিচিত্র সাজে মানুষ শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কেউ বা রাজপুত্র সাজে, কার বা রাজকন্যার বেশ, কার বা পাখীর অথবা পশুর অথবা ভাঁড়ের সাজ।

নৌকার মহড়ার পরই আসল খেলা শুরু হয়। এই খেলার শুরু রাস্তায়—শেষ 'লা প্লাজা ডি আরমন' পার্কে। এই পার্ক শহরের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। হাজার হাজার শিশু ও মানুষ হইচই করতে করতে এখানে উপস্থিত হয়। বালকদের সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি 'কাসকারুনস' থাকে। প্লাজার কাছাকাছি কোন একটি বাড়ীর বারান্দায় হঠাৎ দু'টি বালককে হইহই করে ছুটতে দেখা যায়। হঠাৎ একটা ডিমের খোলা একটা ছেলের মাথায় ফাটান হয়। দেখতে দেখতে গোটা ছেলেটাই একটা নীলবর্ণের মানুষের আকার ধারণ করে। অপর ছেলেটিকে লাল রঙে ছোপান হয়। এরাও একেবারে চোরের মার খায় না। এরাও সুসজ্জিত হয়ে এসেছে, সশস্ত্রও। এদের তরফ থেকে আক্রমণকারী বালকদের উপর প্রচণ্ড ধারায় রং বর্ষণ করা হয়। রংয়ের গোলা-ভর্তি থলে এদের সঙ্গেই থাকে। তাই অসুবিধা হয় না।

এরপর অন্য আর এক বর্ণের রং বর্ষণ করা হয়। অচিরেই রংয়ের চেহারা বদলে যায়। লাল রংয়ের জায়গায় হলুদের ইশারা দেখা দেয়।

এরপর রঙের যুদ্ধ বা জলীয় যুদ্ধের শুরু হয়। এই খেলাতে শুধু বালক-বালিকারাই নয়, তাদের মা বাবারাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন বর্ণের বালতি ও পাত্রগুলিকে বারান্দার উপর ব্যবহারোপযোগী করে রাখা হয়। রাস্তার লোকেরাও এই রং-যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এমন সময় হঠাৎ কলরব তুলে একাধিক ট্রাকগাড়ী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। এগুলিতে রং-যুদ্ধের বীর সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে দেখা যায়। তারা আশেপাশের চারদিকের লোকজনের গায়ে অকৃপণ হাতে রংয়ের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। বারান্দার লোকগুলি এবং রাস্তার লোকেরাও এদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হয় না। শীগগিরই বারান্দার রং শেষ হয়। ট্রাকের রংও একসময় নিঃশেষ হয়। এবার আশেপাশের লোকদের 'ইষ্টার উৎসবের' ডিমের মত মনে হয়। বর্ষণের ইতর-বিশেষের জন্য কাউকে কাউকে বহু বর্ণবিশিষ্ট হাম রোগাক্রান্ত বলেও ভুল হয়। সন্ধ্যার মুখটায় মেয়ে-পুরুষ নাচের পোষাকে সজ্জিত হয়। শীগগিরই নৃত্যচঞ্চল হয়ে ওঠে প্রতিটি মানুষ।

তারপর শিশুরা ঘরে ফেরে। মায়েরা বহু যত্নে তাদের পরিষ্কার করেন। কিন্তু এই রং উৎসবের হইহল্লোড়ের চেহারা অনেক দিন লেগে থাকে তাদের পরনের পোষাকে—দোলের পরে আমাদের বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মত।

সংবাদ-বিচিত্রা

আকাশ-বাস

সোজা উঠতে ও নামতে পারে যেসব বিমান তাদের সংক্ষেপে ইংরেজীতে বলা হ "ভি, টি, ও এল" অর্থাৎ ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডিং। ইঞ্জিনীয়াররা এই বিমানের দেহ তৈরী করেছেন সামুদ্রিক জীব ডলফিনের অনুকরণে। এই বিমানের দু'পাশে তিনটি ক'রে ছটি রোটর আছে, যার সাহায্য এটি সোজা আকাশে উঠে যায় এবং তারপর "হেক ফ্যান"-এর সাহায্যে এটি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে উড়ে চলে। এই প্রশস্ত ও বেগবান বিমানগুলিকে "আকাশ-বাস" হিসেবে ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে পরিবহনের সমস্যা অনেকটা মিটবে।

ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের নতুন যন্ত্র

শুরুতেই ক্যান্সার রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার সুবিধা হয়। ওসনাব্রুইক মিউনিসি-প্যালিটির একজন চিকিৎসক কাউন্সিলার ডাক্তার রেগেনবোগেন সম্প্রতি এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার রোগ নির্ণয়ের "চক্ষু" দেহের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। শীঘ্রই তিনি এই যন্ত্রটির পেটেণ্ট নেবেন।

আকরবাহী নতুন জাহাজ

সংবাদে প্রকাশ আকর বহনের জন্য সম্প্রতি একটি নতুন ধরনের জাহাজ তৈরী হয়েছে। এই জাহাজটির নাম "রাইন্সটার ১০৮"। নতুন কায়দায় এই জাহাজটি তৈরী করতে অনেক কম খরচ পড়েছে এবং জল স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা বেশি বলে প্রায় একশো টন বেশি মাল বহন করতে পারে। ১৩৫০ টনের একটি বজরাকে বেঁধে ডিজেল-মোটর চালিত এই জাহাজটি উজানে ঘণ্টায় চোদ্দ মাইল ও ভাঁটিতে ঘণ্টায় পাঁচ থেকে ছয় মাইল চলে এবং খুব কম জায়গার মধ্যে ঘুরতে পারে।

গবেষণাগারে কার্প মাছের চাষ

আমাদের রুই কাতলার মত কার্প একটি সুস্বাদু মাছ এবং য়ুরোপের লোকদের একটি প্রিয় খাদ্য। প্রচুর প্রোটিন সমৃদ্ধ এই মাছের চাষ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিম জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্‌সটিটিউটে বহুদিন থেকেই গবেষণা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন কিভাবে এই মাছের হাড় ও কাঁটা কমিয়ে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। এ কাজে তারা অংশত সফল হয়েছেন। এছাড়া অনেক কম পরিমাণ জলে কার্প মাছের বংশবৃদ্ধি করার উপায় তারা আবিষ্কার করেছেন। ইন্‌স টিটিউটের মৎস্যাগারে তেইশ ডিগ্রী সেলসিয়াস গরম জলে কার্প মাছ এখন সারা বছর ডিম ছাড়ছে।

ভগলুদা আর জটাধরের কাহিনী

শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়

সেই ছেলেবেলার গল্প এটা। সেই যখন আমরা জেলা ইস্কুলের নীচু ক্লাস থেকে সবে উঁচু ক্লাসে উঠতে সুরু করেছি। সেই যখন গোকুল রায়ের বাগানে আম পাকলে উড়ে মালির চোখ ফাঁকি দিয়ে আম পাড়ি ঢিল ছুড়ে, আর চেয়ারে ছারপোকা ছেড়ে দিয়ে জ্বালাতন করি পণ্ডিত মশায়কে ইস্কুলে। সেই তখনকার গল্প এটা। ভগলুদা আর জটাধরের গল্প। ছেলেবেলার কত ঘটনাই তো ভুলে গেছি আজ, চেষ্টা করলেও মনে ভাবতে পারি না, কিন্তু আজও ইচ্ছে করলে যখন-তখন ভগলুদা'র কথা মনে আনতে পারি আমরা, চোখ বুজলে দেখতেও পারি ভগলুদা'র চেহারাটা। আর ভগলুদা'র কথা মনে পড়লেই আমাদের অজান্তে, আমরা মনে-প্রাণে না চাইলেও কখন যেন জটাধরের কথাটাও আমাদের মনে উঁকি দিতে সুরু করে, ঠিক ভগলুদা'র স্মৃতির পেছন পেছন একটা দুষ্টু ছায়ার মত জটাধরের ছায়াটাও ফুটে ওঠে আমাদের মনের পর্দায়।

স্বীকার করি ভোলা যায়না ভগলুদাকে। একথা দিব্যি কেটে জোর গলায় বলতে পারি, ভগলুদাকে একবার যে দেখেছে, সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না তাকে, কারণ ভুলে যাবার মত মানুষই নন তিনি।

ভগলুদাকে ভোলা যায়না আর তার বন্ধু জটাধরকেও। লুকিয়ে লুকিয়ে ভগলুদাকে ডাকতাম আমরা হাতী বলে, জটাধরকে ফড়িং। বিরাট লম্বা-চওড়া, মোটামতন মানুষ ছিলেন ভগলুদা, গায়ের রঙ ছিল টকটকে লাল আর জটাধরের চেহারাটা ছিল ঠিক উলটো, কেমন কাকে ঠোকরানো, ছিবড়ে মতন, যেমন বেঁটে তেমনি লিকলিকে, কালি-গোলা রঙ!

সারাদিন ঘরে বসে আড্ডা দিতেন ভগলুদা। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সঙ্গে, মাঝে মাঝে রাত্রে ধর্মসভার আসরে যেতেন বুড়োদের সঙ্গে খোস গল্প করতে, আর জটাধর সারাদিন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চরকির মত ঘুরত, আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দেখলে চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসত, ধমক দিত বিনা কারণে, আড্ডা দিত বুড়োদের সঙ্গে কচিৎ কখনো।

যতটা ঘৃণা করতাম আমরা জটাধরকে, ঠিক ততটাই ভালোবাসতাম ভগলুদাকে। স্কুলের ছুটির পর, সকালে-বিকেলে আমাদের আড্ডা জমত ভগলুদা'র বাড়িতে। অত বড় পেল্লায় বাড়িটায় একদম একা থাকতেন তিনি, যদিও শিউচরণ নামে একজন কালা চাকর, আর রাতকানা ঠাকুর মহাদেব ছিল। বেশী পাওয়ারের আলো না জ্বালিয়ে ঘুমুতে পারত না

মহাদেব। ভগলুদা বলতেন, রাতকানা বলে আলো না জ্বেলে রাখলে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নগুলোকেও নাকি ভালো করে দেখতে পায়না ও। আর ছিল একপাল পোষা কাক, গোটা দুই গাধার বাচ্চা, কুকুর 'বাদশা' আর বড় পেয়ারের একটা কাবলী বেড়াল 'টুনটুন'। ভগলুদা'র পোষা জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তার কুকুরটা। সারাদিন ভগলুদা'র পায়ের কাছে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুত আর রাত্রে যখন ভগলুদা ধর্মসভার আসরে বুড়োদের সঙ্গে খোস গল্প করতে যেতেন, বাদশা তখন তার সামনে সামনে মুখে একটা ছোটো সাইজের লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেঁটে যেত। অদ্ভুত দেখাত দৃশ্যটা। দু'পাশে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলা রাস্তার উপর দিয়ে কুকুরের মুখে জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন ভগলুদা তখন রাস্তার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে শহরের লোকজন সবাই দেখত দৃশ্যটা। নির্বিকার মুখে একহাতে গড়গড়াটা উঁচু করে ধরে অন্য হাতে নলটা মুখে পুরে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তিনি।

রাস্তার দু'পাশে ইলেকট্রিকের অমন আলো থাকতেও কেন যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাস্তায় হাঁটেন তিনি একথা জিজ্ঞেস করলেই বলতেন ভগলুদা—

বলা তো যায়না ভাই, ইলেকট্রিকের আলো কখন আছে কখন নেই। নিবে যেতে পারে যে কোনো সময়, আর ধর ঠিক সেই সময়ই আমার গড়গড়ার তামাকটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন কী হবে, লণ্ঠনের আলো ছাড়া যে ভালো করে আমার তামাক সাজাই হয় না।

ভগলুদা'র যুক্তির মৌলিকত্বে আমরা বোবা হয়ে যেতাম। বিস্ময়ে ভগলুদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ঠিক দেখতে পেতাম কান দুটো অল্প অল্প নড়ছে তাঁর, বেশ বুঝতে পারতাম কথাটা বলে বড় আনন্দিত হয়েছেন তিনি। কারণ, ঐ কান নাড়াটাই তাঁর আনন্দ প্রকাশের একমাত্র লক্ষণ। আনন্দ হলে কান নড়ত আর রাগলে গোফ-জোড়া নাচত তাঁর। অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করে করে এটা বুঝে ফেলেছিলাম আমরা।

কিন্তু বড় অদ্ভুত একটা স্বভাব ছিল ভগলুদা'র জামা-কাপড় পরবার বেলায়। সারা গরমকালটায় সারাদিন ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে, বাঁদর-টুপিতে নাকমুখ ঢেকে থাকতেন, আর শীতকালটা কাটাতেন স্রেফ খালি গায়ে।

অনেক ব্যাপারে একটু-আধটু পাগলামী ছিল ভগলুদা'র কিন্তু মানুষ হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত ভালো আর আমুদে। কত লোক যে কত রকমে ঠকিয়ে যেত তাঁকে কিন্তু সেদিকে একটি বারও তাকিয়ে দেখতেন না তিনি। ভগলুদাকে সবচেয়ে বেশী ঠকাত তাঁর বন্ধু জটাধর। নতুন জামা কাপড় জুতো ছড়ি যখন হাতের কাছে যা পেতো, তাই বাড়ি নিয়ে যেত সে। এমনকি টেবিল চেয়ারও বাদ দিত না।

মাঝে মাঝে অনুযোগ করে বলতাম আমরা, 'জটাধরকে তোমার জিনিসপত্র এমনি করে দিয়ে দাও কেন ভগলুদা ?'

'নির্বিকার মুখে একহাতে গড়গড়াটা উঁচু করে ধরে অন্য হাতে নলটা মুখে পুরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তিনি।'

'আরে দিই কী সাধে, ও-ব্যাটা আসলে একটা ভিক্ষুক। একেবারে জাত ভিখিরী। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে আমার কান দুটো ঝালাপালা করে দেয়।'

ভালোমানুষ ভগলুদাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যেত আর লোকের বাড়ি

বাড়ি গিয়ে ভগলুদা'র নামে যাচ্ছেতাই করে নিন্দে করে আসত। রাগ হ'ত আমাদের। ভগলুদা'র কাছে গিয়ে বলতাম সব। আমাদের কথাগুলো শুনে রাগে ফেটে পড়তেন তিনি, চিৎকার করে উঠতেন, 'এত সাহস, ও-ব্যটা আমার নামে এইসব বলেছে। দেখে নেবো এবার বাড়িতে এলে, গুলি করে মুণ্ড ফাটিয়ে দেবো ভিক্ষুকটার, একেবারে জন্মের মত খতম করে দেবো !'

রাগে পাড়া ফাটিয়ে চিৎকার করতেন ভগলুদা আর আমরা তার ঐ রাগের উষ্ণতায় আহ্লাদে বরফের মত গলে যেতাম মনে মনে। কিন্তু অবাক হতাম পরদিন ভগলুদা'র বাড়ি গিয়ে। দেখতাম, বারান্দায় তক্তপোষের উপর হাড়-কাঁপানো শীতে খালি গায়ে আধ-শোয়া হয়ে আছেন ভগলুদা, আদরের কাবলী বেড়ালটার লেজ দিয়ে নিজের গায়ে সুরসুরি দিচ্ছেন আর সামনে একথালা খাবার সাজিয়ে ভগলুদা'র দামী কাশ্মীরী শালটা গায়ে জড়িয়ে বসে জটাধর হাসছে মিট মিট করে। আমাদের দেখতে পেয়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লিকলিকে শরীরটা নিয়ে তরতর করে ছুটে আসত আমাদের দিকে।

'যত সব নচ্ছার ছেলের দল। রাতদিন কেবল বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা। যা, যা, বাড়ি পালা।'

ভীষণ রাগ হ'ত তখন আমাদের। দেখতাম, ভগলুদা আমাদের যেন চেনেনই না, এমনি মুখ ভঙ্গী করে তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে। রাগে অপমানে ভগলুদা'র বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম আমরা আর বার বার প্রতিজ্ঞা করতাম, কোনদিন আর যাবো না ওর ওখানে, চোখাচোখি হলে চোখ ফিরিয়ে নেবো। থাকুক ভগলুদা ওর ঐ শয়তান বন্ধুটাকে নিয়ে।

কিন্তু সব প্রতিজ্ঞা আর সঙ্কল্প আমাদের ভেঙে দিতেন ভগলুদা নিজেই।

ভালো করে হয়ত কাক-পক্ষী জাগেনি তখনও। হাড়-কাঁপানো শীতে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমে ডুবে আছি। সদর দরজার সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিতেন ভগলুদা। আর ভগলুদা'র চিৎকারে শীত বা ঘুম সব কোথায় পালিয়ে যেত। কাঁপতে কাঁপতে বিছানা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে আসতে হোত বাইরের রাস্তায়। দেখতাম বাদশাকে সঙ্গে নিয়ে খালি গায়ে পাড়া জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভগলুদা আর আমাকে দেখতে পেয়েই হাত দুটো ধরে হাউমাউ করে কান্না সুরু হয়ে যেত তাঁর।

'ক্ষমা কর ভাই, ক্ষমা করে দে তোদের এই পাষণ্ড ভাগলুদাকে।'

বিস্ময়ে বোবা হয়ে যেতাম আর সেদিন থেকেই আবার ভগলুদা'র বাড়িতে

আমাদের আড্ডা জমে উঠত। চেঁচিয়ে ছোটাছুটি করে আর থালা থালা খাবার উড়িয়ে আমরা দিনের পর দিন ধরে আড্ডা জমাতাম।

বেশ কাটছিল আমাদের, কিন্তু ঘটনা ঘটল একটা।

এমনিতেই জটাধর ছিল ভীষণ ফেরেব্বাজ মানুষ। সারাদিন শহরের পথে পথে লোক ঠকানোর সুযোগ খুঁজত আর এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে মানুষজনদের সর্বনাশের মতলব আঁটত। সবচেয়ে বেশী ঠকতেন ভগলুদা। বার বার যেমন-তেমন অন্যায় করেছে জটাধর, লোকজনদের হাতে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছেন আমাদের ভগলুদা, আর জটাধরের ঋণ শোধ করতে করতে তো ভগলুদা'র অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল।

জটাধরের নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়েছি আমরা, রাগে আমাদের সমস্ত শরীরে আলপিন ফুটেছে, হাত নিসপিস করেছে বেকায়দায় পেয়ে জটাধরকে উত্তমমধ্যম দেবার জন্য। কিন্তু না বার বার আমাদের বাঁধা দিয়েছেন ভগলুদা।

'তোরা তো আর জানিস না জটাধর আমাকে একবার প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন রে!'

কী করে আর কেমন করে জটাধর যে ভগলুদাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল সেই গল্পটা আমাদের বললেন তিনি। আর সেই গল্পটা শুনে হাঁ হয়ে গেলাম আমরা। কবে নাকি একবার মাঝরাত্তিরে একটা জরুরী কাজে বাস ধরতে হবে বলে চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন ভগলুদা, অমনি হেঁচে ফেলল জটাধর। ভগলুদা'র আবার ঐ হাঁচি-টিকটিকির ডাক নিয়ে একটু দুর্বলতা আছে। অগত্যা আর সেদিন বেরুনই হ'ল না তার। পরদিন ভোরে কাগজ খুলে দেখলেন, যে বাসটায় তার যাবার কথা ছিল, সেটা নাকি মাঝ রাস্তায় একটি গাছের গুড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একেবারে উল্টে পড়ে গেছে পাশের ঢালু জমিতে। সেই দুর্ঘটনায় দু'জন মারা যায়, কয়েকজন আহত হয়।

সেই থেকেই জটাধরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় একেবারে কাদা হয়ে আছেন ভগলুদা। তার সব অন্যায়, সব আবদার, মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছেন।

কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটল আর কেমন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেদিন ভোরে আমরা ভগলুদা'র বাড়ি গিয়ে দেখি হুলুস্থুলু ব্যাপার। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভগলুদা'র আদরের কাবলী বেড়াল টুনটুনকে। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছেন ভগলুদা, দূরে দাঁড়িয়ে চাকরটি কাঁপছে ভয়ে, ঠাকুরটা যেন কোথায় গেছে। আমরা সবাই মিলে খুঁজতে সুরু করলাম টুনটুনকে। খাটের তলা, আলমারির কোণ, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চৌবাচ্চা এমনকি ভগলুদা'র ঠাকুরদা'র আমলের ভারী সিন্দুকটাও চাবি খুলে দেখা হ'ল। কিন্তু না, কোথাও নেই ভগলুদা'র টুনটুন। এমন সময় বাজার সেরে বাড়িতে ঢুকল ঠাকুর

জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বাবু?'

'হয়েছে, প্রাণে বজ্রাঘাত হয়েছে, আমার টুনটুন কোথায়?' ঠাকুরের প্রশ্নের জবাবে গর্জন করে উঠলেন ভগলুদা।

'টুনটুন তো বাবু বাড়িতে নেই।'

'কেন গেছে কোথায়, কোন রাজকার্য করতে গেছেন শুনি?' দাঁত কড়মড় করে উঠলেন ভগলুদা।'

'কাল রাত্রে আপনি যখন বাড়ি ছিলেন না, জটাধরবাবু এসে টুনটুনকে নিয়ে গেছেন।'

এঁ্যা, জটাধর টুনটুনকে নিয়ে গেছে।' কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ভগলুদা আর পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন, 'শিউচরণ হামারা বন্দুক লাও, গুলি কর দেঙ্গা জটাধরকো!'

তারপর প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ওভারকোট, বাঁদর-টুপী পরে বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটলেন ভগলুদা জটাধরের বাড়ির দিকে। আমরাও ছুটলাম তার পেছন পেছন।

জটাধরের বাড়ির কাছে আসতেই দেখলাম দু'জন পেল্লায় চেহারার কাবলী সদরদরজার সামনে উবু হয়ে বসে আছে। ভগলুদা গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের সামনে।

'এই দরোজা ছোড় দেও।'

'কিউ দেগা, নেহি দেউঙ্গা।'

এরপর কাবলী দুটোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি সুরু হলো ভগলুদা'র। কিছুতেই তারা দরজা ছেড়ে উঠবে না। কী ব্যাপার? অনেক কষ্টে, অনেক কাটখড় পুড়িয়ে জানা গেল ঘটনাটি।

বেশ কিছুদিন আগে কাবলী দুটোর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল জটাধর। সময় মত সুদও দিতে পারেনি, আর আসল তো নয়ই। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের পনেরো সের ওজন কমিয়ে দিয়েছে জটাধর। ভূতের ভয় দেখিয়েছে মাঝরাত্তিরে, লেলিয়ে দিয়েছে পাড়ার যত খ্যাপা কুকুর। এতোতেও পিছন ছাড়েনি তারা জটাধরের তাই শেষ পর্যন্ত একটি জব্বর কাবলী বেড়াল ঘুষ দেবে বলে কিছুদিনের সময় বাড়িয়ে নিয়েছিল সে। একটা বেড়াল পোষার শখ ওদের বহুদিনের, তার উপরে কাবলী বেড়াল হলে তো কথাই নেই। তা সেই বেড়ালও দেবো দেবো বলে ঘুরিয়েছে সে অনেকদিন আজ তারা একটা হেস্তনেস্ত না করে কিছুতেই নড়বে না জটাধরের দরজা ছেড়ে।

গুম হয়ে মন দিয়ে কাবলী দুটোর কথা শুনলেন ভগলুদা, আর কথা শেষ হতেই

চিৎকার করে উঠলেন গলা ফাটিয়ে : 'এই জটাধর, ছুঁচো, নচ্ছার, বনমানুষ, বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির, আজ তোকে গুলি করে ফেলব একেবারে!'

সমানে চিৎকার করে যেতে লাগলেন ভগলুদা। আর কাবলী দুটো কিছুটা ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল দরজা ছেড়ে। গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেলেন ভগলুদা দরজার দিকে। আমরাও গেলাম তার পিছু পিছু। বন্ধ দরজার কড়াটা জোরে জোরে নাড়তে লাগলেন ভগলুদা, কিন্তু দরজাটা যেমন বন্ধ ছিল তেমনিই রইল।

'জটাধর দরজা খোল বলছি, ইঁদুর কোথাকার, না হলে ভেঙ্গে ঢুকবো আমি।'

ভগলুদা সমানে চিৎকার করে যেতে লাগলেন, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু অনেকক্ষণ পর অস্পষ্ট ফ্যাসফ্যাসে একটা গলা শোনা গেল :

'ভেঙেই ঢোক ভাই ভগলু, আমায় বাঁচা।'

কথাটা শুনে প্রথম একটু অবাক হলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই তার চিৎকার শুনতে পেলাম আমরা।

'হ্যাঁ, পাড়া জানিয়ে আমি তোমার দরজা ভেঙে ঢুকি আর তুমি আমার হাতে হাতকড়া পরাও। তোমার ও সব চালাকির প্যাঁচ আমি ভালো করে বুঝি, ভালো চাও তো দরজা খেলো এখুনি৹।'

'উপায় নেই ভাই আমার, তুমি দরজা ভেঙেই ঢোকো।'

জটাধরের ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলাটা শুনতে পেলাম আমরা আবার। তারপর সবাই মিলে নড়বড়ে দরজাটায় কাঁধ ঠেকিয়ে ধাক্কা দিলাম। বিশ্রী শব্দ করে ভেতরের খিলটা ভেঙে গেল আর আমরা সব হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ঘরের ভেতর ঢুকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো আমাদের। ঘরের ভেতর টেবিল চেয়ার সব উল্টে-পড়ে আছে, খাটের বিছানা-বালিশ সব ছত্রাখান। বালিশ ফেঁটে তুলো উড়ছে ঘরময় আর মেঝের উপর ধূলোর মধ্যে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে জটাধর, আর তার বুকের উপর থাবা তুলে বসে আছে ভগলুদা'র আদরের টুনটুন। ভালো করে চেনাই যাচ্ছে না জটাধরকে। রাতারাতি পাল্টে গেছে হাড়গিলে বেঁটে কুজো জটাধরের চেহারাটা। শরীরের এখানে-ওখানে কাঁটা-ছেঁড়ার দাগ, একটা চোখ গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে, কপালের কাছে কিছু চুল খাবলে তুলে নিয়েছে যেন কেউ!

আমাদের দেখে চিঁহি চিঁহি করে মিনমিনে গলায় কেঁদে ফেলল জটাধর।

'ভগলু, দাদা আমার, বাঁচা আমাকে।'

কথাটা শেষ করেই চোখ কপালে তুলে গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল সে

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দেখছি কাণ্ড-কারখানা, হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন ভগলুদা।

'কেমন ঠ্যালাটা বোঝো এবার, আমাকে ঠকানোর ঠ্যালা বোঝো।'

তারপর একসময় হাসি থামিয়ে নরম গলায় ডাক দিলেন ভগলুদা।

'টুনটুন লক্ষ্মী সোনা, নেমে এসো ওর বুক থেকে।'

থাবা উঁচিয়ে জটাধরের বুকের উপর বসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল টুনটুন আমাদের দিকে, তারপর বুঝি ফ্যাচ করে হেসে ফেলল শব্দ করে, তাকিয়ে দেখলাম ভগলুদা'র মুখের দিকে এক পলক, ভাববিহ্বল দৃষ্টি, গদগদ মুখের চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছেন টুনটুনের দিকে। হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে জটাধরের বুকের উপর থেকে নেমে এলো টুনটুন, এসে ভগলুদা'র পায়ের উপর মুখ ঘষতে লাগল, তার আহ্লাদী গলা দিয়ে কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরুতে লাগল।

এই ঘটনার পরদিন থেকে জটাধরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না আমাদের শহরে। শোনা গেল মনের দুঃখে নাকি সে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ের দিকে চলে গেছে।

তোতাপাখী

সুখরঞ্জন রায়

তোতাপাখী তোতাপাখী কোথা বাসা তোর?
কোথা যাস্ ছুটে ছুটে,
শরীরে সবুজ ফুটে,
গোল গোল চোখ দুটি ঠোঁট লাল ঘোর,
তোতাপাখী তোতাপাখী কাছে আয় মোর।

তোতাপাখী তোতাপাখী কাছে আয় মোর,
দুধ দিব লোটা লোটা,
নোনা আতা মোটা মোটা,
ছোলা ভিজা ঝোলা গুড় আর কলা জোড়,
কাছে আয় কাছে আয় খোলা আছে দোর

আচার্য দীনেশ

শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা

বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্র সেন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে তিনি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দীনেশচন্দ্রের আগে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন যুগ ও সময়ের প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে কেউ কেউ গবেষণা ও আলোচনা করলেও, তাঁর আগে কেউ বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে চেষ্টা করেন নি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি পথিকৃৎ।

যে সাহিত্যের কোনো ইতিহাস নেই, তার অতীত এবং কি অবস্থা থেকে বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তা বোঝবার উপায় নেই। এই ইতিহাস রচনা করে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ফলে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার পথ খুলে গিয়েছিলো। বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের এই অবদান সর্বত্র আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হচ্ছে।

১২৭৩ সালের ১৭ই কার্তিক দীনেশচন্দ্র ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরী গ্রামে মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ঐ হিসেব মত ১৩৭৩ সালের ১৭ই কার্তিক দীনেশচন্দ্র সেনের জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে বাংলার সর্বত্র তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবার জন্য শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে সবার সঙ্গে আমরাও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

দীনেশচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন। মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী ঢাকার সরকারী উকীল ছিলেন। তিনি সরকারী উকীল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত তো ছিলেনই, তাছাড়া তিনি তৎকালীন জনসমাজে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেও গণ্য হতেন। ঐ সময়ে ঢাকা জেলার লোকের মুখে মুখে একটি ছড়া শোনা যেতো। ছড়াটি এইরূপ :—

গণি মিঞার ঘড়ী,
নীলাম্বরের বড়ি,
গোকুল মুন্সীর গোঁফে তা,
গল্প শুনবি তো মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা।

এঁরা সকলেই সে যুগে বিশেষ সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। গণি মিঞা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত দানশীল নবাব, নীলাম্বর সেন বিখ্যাত কবিরাজ, গোকুল মুন্সী ঢাকার

সরকারী উকীল, আর মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারী। সে যুগে যাঁরা ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁদেরই বলা হতো মুন্সী। এই মুন্সীদের ইংরেজ সরকারের কাছে ভারী সম্মান ছিলো।

দীনেশচন্দ্র সেনের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ছিলেন মাণিকগঞ্জ মহকুমার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি মাঝে মাঝে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র 'ইংলিসম্যানে' প্রবন্ধ লিখতেন। বাংলা ভাষায়ও তিনি নাটক, কবিতা এবং গান রচনা করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র পিতার এসব গুণের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি অতি শৈশবে আট বছর বয়স থেকে সুরু করে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত অজস্র কবিতা লেখেন। কিন্তু কবিতা লিখে তিনি সফল হতে পারেন নি। এরপর তিনি গদ্য রচনার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

দীনেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এ সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি। সেই থেকেই তাঁর অনুরাগ ধীরে ধীরে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি বেড়ে যেতে লাগলো।

ঢাকা কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে তিনি বি, এ, পাশ করেন। তিনি বি, এ, পাশ করবার পর শিক্ষকতার পবিত্র বৃত্তি গ্রহণ করলেন। দু'তিন বছর নানা জায়গায় শিক্ষকতা করে তিনি ত্রিপুরার জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় তাঁর বাংলা সহিত্য সম্পর্কে গবেষণার কাজ। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার জন্য তিনি প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ করতে সুরু করেন। এগুলোই ইতিহাস রচনার উপাদান।

প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথিগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে যে পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিলো, তা এক কথায় বলতে গেলে প্রায় অতুলনীয়। তিনি এই সব প্রাচীন পুঁথি ও সাহিত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে, বনে-জঙ্গলে গাঁয়ে-গাঁয়ে যেখানে যখনই কোনো নূতন প্রাচীন পুঁথির খোঁজ পেয়েছেন, তখনই সেখানে ছুটে গিয়েছেন। এসব পুঁথি সংগ্রহ এবং এ সবের রচনার সময় বার করতে গিয়ে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফলে তিনি মাথার অসুখে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েন। এতেও কিন্তু তাঁর উদ্যম কমেনি। সুদীর্ঘ কালের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিই "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" নামে সুপরিচিত।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পরে দীনেশচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে যে এত সব উচ্চ শ্রেণীর প্রাচীন রচনা

রয়েছে, দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে জ্ঞানী ও গুণী সমাজ তার সন্ধান পান।

অল্প সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। প্রথম সংস্করণে যে সব ভুলভ্রান্তি ছিলো তা সংশোধন করে এবং এই সময়ের মধ্যে সংগৃহীত নূতন গ্রন্থের নাম ও আলোচনা যুক্ত করে, তিনি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল, তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য বলিয়া এত বড় একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।"

এই গ্রন্থ রচনার জন্য দীনেশচন্দ্র বাংলা সরকারের কাছ থেকে মাসিক পঁচিশ টাকা করে বৃত্তি পান। বিদেশী সরকারের কাছ থেকে এরূপ বৃত্তিলাভ সে যুগে খুবই কম হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সংগঠনের পর দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হন। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রূপেও দীনেশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

লোক-সাহিত্য সম্পর্কেও দীনেশচন্দ্রের যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এসব সাহিত্য আগে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো। এগুলো সংগ্রহ করেও দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এক স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। যদি ঐ সময়ে এসব সংগ্রহ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা না করা হোত, তাহলে হয়ত আধুনিক সভ্যতার সংঘাতে বাংলা সাহিত্যের এসব অমূল্য সম্পদ এক সময় লোপ পেয়ে যেতো।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি দীনেশচন্দ্রের ছিলো এক স্বাভাবিক আকর্ষণ। তাই তিনি ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে যুগোপযোগী করে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের জন্য রচনা করেছিলেন। এসব কাহিনীর মধ্যে রয়েছে 'রামায়ণী কথা', 'কুশধ্বজ', 'সতী', 'বেহুলা', 'জড়ভরত', 'ধরা দ্রোণ' প্রভৃতি। এসব বইগুলো এক সময় বাংলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলো।

দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার প্রথম যুগের রচনার মধ্যে রয়েছে, 'রেখা', 'কুমার ভূপেন্দ্রসিংহ' (কাব্য), 'তিন বন্ধু' প্রভৃতি। 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' আত্মজীবনীমূলক দীনেশচন্দ্রের অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সে যুগের বহু বিস্মৃত

কাহিনী এই বইখানি থেকে পাওয়া যায়। আর একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ'। বাঙ্গালী সমাজের বহু তথ্য সম্বলিত বিরাট দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থখানাও দীনেশচন্দ্রের গবেষক মনের পরিচয় বহন করে থাকে।

বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের উপাদান তিনি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলেন, এজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমও করে গিয়েছেন। এই হিসেবেই দীনেশচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এ জন্য যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

যাত্রা হবে রাতে

শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী

চণ্ডীতলা চণ্ডীতলা !
যাত্রা হবে রাতে,
ছেলের দল মেরাপ বাঁধে
হাত মিলিয়ে হাতে।

বাক্স-প্যাঁটরা বাদ্যিভাণ্ড
একখানে সব প'ড়ে,
নটের দল নতুন গাঁয়ে
এদিক-ওদিক ঘোরে।

কেউ করছে সিঁথিপাটি
কেউ চিবুচ্ছে আঁখ,
জল আনতে কেউ বা গেছে
কেউ করছে পাক।

অধিকারী টানছে হুঁকো
মাঝে-মধ্যে কাশি,
মহিষাসুর মহড়া দেয়—
হাসে অট্টহাসি।

ছোট্ট দোকান বসেছে এক
চলছে বিকিকিনি।
রাতের বেলা যাত্রা হবে
মহিষমর্দিনী॥

অশরীরী

অ-কু-রা

ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে বীরেন। দিনরাত দুর্গানাম জপ করছে তার স্ত্রী।

অদ্ভুত, অভাবনীয়। কেউ কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছে না। উদ্ধারের কোনও পথ না।

বাড়ীওয়ালা জলধরবাবুকে জানান হয়েছিল। তিনি বিশ্বাসই করতে চাননি ব্যাপারটা।—সে কি মশাই! তাঁরা তো থাকেন পড়ো-বাড়ীতে, আসশ্যাওড়া গাছে। আমার এ নতুন বাড়ী। এখানে তাঁরা আসতে যাবেন কেন? তা ছাড়া আগে তো কোনও ভাড়াটে এমন কথা বলেনি!

তা' হলে এ কার কাজ? জিজ্ঞাসা করেছিল বীরেন। জ্যান্ত মানুষ কারও কাজ নয় নিশ্চয়ই। তারা ঢুকবে কি করে খিল দেওয়া ঘরে?

তা' হলে হয়ত আপনাদেরই জ্ঞাতগুষ্টির কেউ। হয়ত মরেছিল সুইসাইডে, কি···

কখনও না। জোর দিয়ে বলেছিল বীরেন।

তা' হলে তো ভাবনার কথা। স্বস্ত্যয়ন করে দেখুন, পরামর্শ দিলেন জলধরবাবু। পাকা বাড়ীওয়ালা তিনি। ছ'মাসের ভাড়া আগাম নিয়েছেন। এখন যদি ভূতপ্রেতে ভাড়াটের ঘাড় মটকায়, কিছু এসে যায় না তাঁর। ভূত-মুক্তির মোক্ষম বিধান বাতলে দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি সরে পড়লেন!

স্বস্ত্যয়নের দিনই ব্যাপারটা জেনে ফেলেন পাশের ফ্ল্যাটের চন্দ্রবাবু। এর আগে প্রতিবেশীদের কাউকে ভূতের উপদ্রবের কথাটা জানায় নি বীরেন।

কি পুজো দিচ্ছেন মশাই? খুব যে ঘণ্টা বাজছে? হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন চন্দ্রবাবু। বীরেনের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি।

সব কথাই তাকে খুলে বলল বীরেন।

এ ফ্ল্যাটে আসা অবধি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। রোজ সকালেই দেখা যায়, বাড়ীর প্রাইভেট টিউটর ক্ষিতীশবাবুর একখানা ভিজে কাপড় বাইরে দড়িতে টাঙান। ক্ষিতীশবাবু দরজা বন্ধ করে শোন। তার ঘর থেকে কাপড় এনে কে এভাবে চান করতে পারে? এ নিশ্চয়ই তাঁদের কেউ, যাঁরা আসশ্যাওড়া গাছে··

চন্দ্রবাবুর মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল।—বুঝেছি, ইনি সেই মুখুজ্জেবাবুর মা! কি শয়তান এই জলধরবাবু! ছ'মাসের ভাড়া আগাম নিয়ে এই ভুতুড়ে ফ্ল্যাট আপনাকে গছাল?

ভুতুড়ে ফ্ল্যাট? বীরেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

সব চেপে গেছে দেখছি জলধরবাবু। কি ধুরন্ধর লোক বাব্বা! তা' হলে শুনুন। এখানে থাকতেন জলপাইগুড়ির শ্রীমন্ত মুখার্জী মশাই-এর বুড়ী মা। গঙ্গা-কূলে কাটাবেন বলে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন। পুজোআর্চা গঙ্গা চান নিয়ে বুড়ী এখানে থাকত। হঠাৎ একদিন স্ট্রোক। সঙ্গে সঙ্গে একটা দিক পক্ষাঘাত। তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠাবতী বটে। বিছানায় পড়েও ছটফট করত। গঙ্গা নাইতে দে রে আমায়। ওতেই সব সেরে যাবে। জ্যান্তে গঙ্গা নাইতে পারেনি। মরে গিয়ে এখন আশ মেটাচ্ছে।...

স্বস্ত্যয়ন শেষ হ'ল। সেদিন অনেকটা নিশ্চিত মনে শুতে গিয়েছিল বীরেন রাতে। ভোরে উঠে কিন্তু আবার মুষড়ে পড়ল।

রোজকার মত বারান্দার দড়িতে ভিজে কাপড় টাঙান। সেই ক্ষিতীশবাবুর নরুনপেড়ে ধুতি। নিদারুণ প্রেত। স্বস্ত্যয়নেও তুষ্ট হ'ল না। কি করা যায় এখন?

সারা বাড়ীতে থমথমে ভাব। কেউ তাকে দেখেনি। কিন্তু সারাক্ষণ সে জুড়ে আছে এ বাড়ীর সকলের মন!

বীরেন একদিন আপন মনেই বলছিল বুঝি, অদৃশ্য ভূতকে লক্ষ্য করে, আহা গঙ্গা চান করতে হয়, তা আমার ফ্ল্যাটে কেন? গঙ্গা-কূলে তো আরও কত বাড়ীই রয়েছে, সেখানে গেলেই তো হয়!

টুলু জিজ্ঞাসা করে বসে, গঙ্গা চান করলে কি হয় বাবা?

প্রশ্নটা ক্ষিতীশবাবুর কানে যেতেই, বলে উঠলেন, গঙ্গা চানে মহা পুণ্য বাবা! ভৃগু সংহিতায় আছে, ব'লে তিনি গঙ্গা-মহাত্ম্যের শ্লোক আওড়াতে লাগলেন।...

ক্ষিতীশবাবু টুলু-বুলুর প্রাইভেট টিউটর। নতুন ফ্ল্যাটে আসবার পর বহাল করেছে বীরেন, থাকা-খাওয়ার বদলে ছেলে দুটিকে পড়ান. দুপুরে কোর্টে টাইপ করেন।

শেষ রাত। প্রথম কাক তখনও ডাকেনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে আঁতকে উঠল বীরেন। ভয়ে জড়োসড়ো। চোখ ঘোলাটে।

আবার সেই শব্দ। হালকা পালকের মত পায়ে কে যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। সে এসেছে! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ। নিস্পন্দের মত গুণতে থাকে পায়ের শব্দ। একটু পরে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। কাপড় মেলে দিয়ে সে চলে গেল!

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বীরেন।

সকালে আবার স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলে?

নিত্য তাঁর আবির্ভাবে সকলেই সন্ত্রস্ত। সকলেই যেন এ বাড়ীতে অনধিকারী,

ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। এখন তিনি শুধু নিত্য গঙ্গাচানেই তৃপ্ত। কোনদিন হয়ত চটে যাবেন। কে জানে, তখন কার ঘাড় মটকে বসবেন! ভাবতেও আঁতকে ওঠে বীরেন। নিজের বাড়ীতে ও থাকে চোরের মত। সন্তর্পণে। ভয়ে ভয়ে।

সেদিন বিকালে বাড়ী ফিরে দেখে ঘরে কেউ নেই। গেল কোথায় সব। বিমূঢ়ের মত এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল, শুনতে পেল তেতলার ছাদ থেকে ডাকছে টুলু-বুলুর মা। শীগগির উপরে এস। ভয়ানক কাণ্ড···

তেতলার ছাদে মেলাই মেয়ে-পুরুষের ভিড়। বীরেনদের ঝি সরযূ মূর্ছা গেছে। বিকালে ছাদে উঠেছিল কাপড় তুলতে।

জ্ঞান ফিরলে সবাই জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার সরযূ?

বললে না পেত্যয় যাবে, মোটাসোটা, সোনার রং, নরুন পেড়ে ধুতি, হাতে ধরা গঙ্গাজলের ঘটি। দাঁড়িয়ে আছেন ঐ হোতা! দেখেই বুঝনু তিনি! পালাবার চেষ্টা করনু। তা ছুটব কি? আমাতে কি আর আমি আছি!··

সবাই গুটি গুটি নেবে এল ছাদ থেকে।

দিনে-দুপুরেও দেখা দিচ্ছেন তিনি! এখন উপায়?

ক্ষিতীশবাবু হায় হায় করতে থাকেন। গরীবের বস্ত্র নিয়ে টানাটানি। কবে আবার বুঝি টান পড়ে প্রাণ নিয়ে। আর তো থাকতে ভরসা হয় না! একটা বিহিত করুন এর।

বিহিত আর কি করবে বীরেন? একজন বললে, গয়ায় পিণ্ডি দিতে।

কথাটা তার মনে ধরল। সব কথা জানিয়ে সে শ্রীমন্ত মুখার্জীকে চিঠি দিল। পিণ্ডদানের অধিকারী তো সে-ই! সাতদিন পর উত্তর এল:

'মাননীয় মহাশয়, আপনার চিঠির মর্মার্থ অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। আমাদের স্বর্গত মাতাঠাকুরাণী অতীব পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা আমাদের ধারণাতীত। যাহা হউক আপনার অনুরোধ অনুযায়ী গয়াতে সপিণ্ড করনার্থ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাঠাইলাম। আশা করি মাতাঠাকুরাণী ইহাতে ইহলৌকিক অতৃপ্ত বাসনার বন্ধন মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন।'··

আরও কিছুদিন। হিসাব মত গয়ায় পিণ্ড পড়ে যাবার কথা ততদিনে। তবু কিন্তু তাঁর আসার বিরাম নেই। রোজ সকালেই দড়িতে ভিজা কাপড় ঝোলে।

সাংঘাতিক ভূত! পাকাপোক্ত গেড়ে বসেছে এ-ফ্ল্যাটে। একে আর সহজে নড়ান যাবে না। রীতিমত আতঙ্ক সকলের মনে। চাকর জগুয়া একদিন তাঁকে দেখতে

পেয়েছে অন্ধকার সিঁড়ির কোণে। সরযূ ভয়ে আর ছাদে কাপড় তুলতে যায় না। জগুয়া পালাই-পালাই করছে। সরযূও নোটিশ দিয়েছে। ভূতের বাড়ীতে সে আর কাজ করবে না। এমন ঠিকে কাজ অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রাণ গেলে তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না!

ক্ষিতীশবাবুও যাবার জন্য তৈরি। তিনিও একদিন সন্ধ্যার আঁধারে তাঁকে দেখতে পেয়েছেন! নরুনপেড়ে ধুতি পরে বাথরুমের পাশে দাঁড়িয়ে!

এরপর আর কি থাকা যায়? বাগবাজারের কাছে একটা মেসও ঠিক করে নিয়েছেন ক্ষিতশবাবু। ক'দিন পর জগুয়া পালাল। সরযূ কাজ ছাড়ল!

ফ্লাটটা ভাল পাওয়া গিয়েছিল। গঙ্গার কূলে। দিন রাত অবাধ হাওয়া। ভাড়াও খুব বেশী না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে, দালালের সাহায্য নিয়ে পাওয়া। কপাল খারাপ। এত ভাল ফ্লাট টিকল না। ভূতের উপদ্রবের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন ঝি-চাকরের অন্তর্ধান! এ বাড়ীতে আর নয়। শেষে স্থির করে ফেলল বীরেন।

আবার দালালের শরণাপন্ন হ'ল। বাড়ীও একটা মিলল। এবার ভাল করে খোঁজ নিল আশেপাশে। ভূতের উপদ্রব আছে কিনা। সেবার এসব খোঁজ না নিয়ে খুব শিক্ষা হয়েছে!

সামনে একটা ছুটির দিন। সে দিনেই বাসা বদল।

যাবার আগের দিন। গোছগাছ চলছে। এর মধ্যে মেদিনীপুর থেকে এসে হাজির বীরেনের ভাগ্নে নরেশ।

হঠাৎ কি মনে করে রে? নিরুত্তাপ স্বরে জিজ্ঞাসা করে বীরেন এই কয় সপ্তাহ ভূতের সঙ্গে ঘর করে তার জীবনের সব স্বাদ উবে গেছে।

কলকাতায় সেণ্টার বদলে নিয়েছি। এখান থেকে পরীক্ষা দেব এবার···

তার মানে? ভাগ্নের কথাগুলি মামা যেন ভাল বুঝতে পারে না।—এখান থেকে পরীক্ষা দিলে কি পাশ করতে পারবি মনে করেছিস্!

নরেশ গতবছর বি. এ ফেল করেছে। মাতুলের শ্লেষের কারণ বুঝল। মাথা চুলকে বলল, বুঝলে তো মামা। পাড়াগাঁয়ে থাকি। কোশ্চেন-টোশ্চেন যা আউট হয় তা সময় মত আমাদের মেদনীপুর পৌঁছায় না। তাই ঠিক করলাম এবার আর ভুল নয়, কলকাতাতেই সেণ্টার চেঞ্জ করে নিই।···

বোকা হলে কি হয়, তোর বুদ্ধি আছে ভাগ্নে। প্লানটা চমৎকার। কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানিস? এ বাড়ী তো আমরা কালই ছেড়ে দিচ্ছি! নতুন বাড়ীতে আমাদেরই

নরেশ দেখল, নরুনপাড় কাপড়টা ঝুলছে।

আঁটবে না। তুই কোথায় থাকবি? কোথায় পরীক্ষার পড়া করবি?

এই চমৎকার বাড়ীখানা ছেড়ে দিচ্ছ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে নরেশ।

নরেশকে সব কথা বলতে হ'ল। পুণ্যার্থী গঙ্গা ভক্ত ভূতের কথা। শুনে নরেশও যে একটু ভয় না পেল তা নয়। কিন্তু ভেবে দেখল, পত্র পাঠ চলে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। মামা ভাববে ভূতের ভয়ে সেও কাহিল। যেন ভূতটুত বিশ্বাস করে না এমনি ভাব দেখিয়ে তাই বলল, আজকের রাতটা কোন মতে এখানে কাটান যাক তো। তারপর কাল না হয় মেস দেখে নেওয়া যাবে!

এ ব্যবস্থা না করলেই বোধ হয় ছিল ভাল। কারণ রাত্রে তার শোবার ব্যবস্থা হ'ল ক্ষিতীশবাবুর ঘরে। দেখেই তো হৃদকম্প। সর্বনাশ! তারও যে নরুনপাড় ধুতি। ক্ষিতীশবাবুর ধুতিতে অরুচি ধরে যদি সে তার ধুতির দিকে নজর দেয়?

সারা রাত চোখে ঘুম নেই নরেশের। চারিদিক নির্জন নিঝুম হয়ে এল। ক্ষিতীশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন অনেকক্ষণ। হাপরের মত শব্দ উঠছে নাক ডাকার। ভুষো কালির মত ঘন অন্ধকার জমে ঘরখানাতে।

যতই রাত বাড়ে, নরেশেরও মনের বল কমতে থাকে। মাথায় থাক কোশ্চেন

আউট। কোনও মতে এখন প্রাণ নিয়ে বাঁচলে হয় এ রাতে! ভয়ে-ভাবনায় শরীরের নার্ভগুলি সব যেন অসাড় হয়ে আসছে। নতুন লোক দেখে সে যদি চটে যায়? বিশ্বাস কি এসব ভূত-প্রেতকে? লোকের ক্ষতি করতেই এরা ভালবাসে! কখন আসবেন তিনি? কখন? কখন? অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করার চেষ্টা করে, অশরীরী কাউকে দেখা যায় নাকি?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম আসে। তারপর হঠাৎ এক সময় ঘুম ছুটে যায়। ঘরের মধ্যে কার পায়ের শব্দ না? সে এসেছে কি তা' হলে? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! বুকের ভিতরে হাতুড়ির ঢিপ ঢিপ। চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল—ক্ষিতীশ বাবু, ও ক্ষিতীশ বাবু!

কি আশ্চর্য। ক্ষিতীশ বাবু তার বিছানায় নেই। পাশেই শুয়ে ছিল লোকটা। গেল কোথায়? উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি? ভয়ে কাঠ। কাঁপতে থাকে নরেশ। মনে পড়ল, স্তবস্তুতিতে অনেক সময় ভূতেরা তুষ্ট হয়। তাই সে মনে মনে বলতে লাগল: হে ভূত করুণা কর, অধমকে মের না। আর কখনও কোশ্চেন আউটের ফিকিরে ঘুরব না। একটু-আধটু যা চালাকি-চাতুরী খেলি, তাও করব না। সামনে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ম্যাচ। তারপর ছোট্‌কা লিখেছে, পাশ করতে পারলে জার্মানীতে নিয়ে যাবে তার কাছে। সব যে ভেস্তে যাবে। মরলে ভারী কষ্ট হবে। বাঁচবো না আর। দয়া কর, হে ভূত দয়া কর!···

এই রকম সকরুণ প্রার্থনা করছে নরেশ, এমন সময় খুট করে শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এল এক ঝলক আলো। বাইরের দিককার দরজা খুলে গিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো আসছে ঘরে!

দরজা খুলেছেন ক্ষিতিশবাবু। য়্যা, আমায় ভূতের মুখে ফেলে সরে পড়বার চেষ্টা? ধড়মড় করে উঠে নরেশ তার পিছু নেয়।

ক্ষিতীশবাবু দরজা খুলে পথে নামলেন। পথটা গঙ্গার দিকে গেছে। পথে নেবে তিনি গঙ্গার ঘাটের দিকে চললেন। গঙ্গায় নেবে ডুব দিলেন, কাপড় ছাড়লেন। গামছা পরলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন বাড়ীর দিকে। বাড়ী থেকে বের হবার পর ভয়ে ভয়ে নরেশ তার পিছু নিয়েছিল। ফিরে এলও পিছু পিছু।

ক্ষিতীশবাবু কাণ্ডকারখানা দুর্জ্ঞেয়। ভোর রাতে গঙ্গা চান করতে যাচ্ছে, তা অন্ততঃ নরেশকে বলে যাওয়া তো উচিত। অথচ নিঃশব্দে উঠে গেলেন। এ কি ধরনের ব্যবহার? খালি ঘর পেয়ে যদি চোর ঢুকে পড়ত?

বারান্দার দড়িতে কাপড় মেলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন ক্ষিতীশবাবু। তখনও

নরেশের বিস্ময় কাটেনি। সহসা তার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল নরেশ! সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ও কাটল। মনে এল যেন অযুত হাতির বল? ক্ষিতীশবাবুকে ধরে প্রচণ্ড এক ঝাকুনি দিল।—আরে মাষ্টারমশাই, জাগুন তো। দেখুন কি করেছেন···হি-হি হাসছে নরেশ।

ঝাকুনি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ক্ষিতীশবাবু!

এ ব্যাপারটা পরে যখন মনে পড়েছে নরেশের, তখনই সে সেক্সপীয়ারকে ধন্যবাদ দিয়েছে। ভাগ্যিস বি. এ-তে ম্যাকবেথ ছিল, তাই জেনেছিল ঘুমের ঘোরে লেডি ম্যাকবেথের ঘোরাঘুরির কথা, তা থেকেই বুঝতে পেরেছিল ঘুমের ঘোরে ক্ষিতিশবাবুর কাণ্ড-কারখানা···না হলে ভূতের ভয়ে কি অবস্থা হ'ত তার?

রঙীন শাড়ী

শ্রীহরিপ্রসাদ মেদ্দা

খুকুর দেহ চিকন কালো মাথায় কালো কেশ।
যেমন রঙের শাড়ীই পরুক মানায় তাকে বেশ॥
হলুদ শাড়ী সোমবারেতে, সরু খয়ের পাড়।
মঙ্গলবারে ছাপা শাড়ী—বড্ড বেশী মাড়॥
বুধবারেতে হালকা সবুজ, বিষুদবারে কালো।
মাঝে মাঝে আকাশ-রঙা, তবুও লাগে ভালো॥
শুক্রবারে আলোর মতন শাড়ীর সাদা রং।
শনিবারে কট্‌কী শাড়ী পরার সেকি ঢঙ॥
রবিবারে ছুটির দিনে টুকটুকে লাল শাড়ী।
হরেক রকম শাড়ীই আমার মন নিয়েছে কাড়ি॥

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে বাঁটুল যদি পালিয়ে যায়, তবেও হয়। কিন্তু গোয়ালে গোরু বাঁধা রয়েছে, মা ভগবতী, বাঁটুল কিছু না ভেবেই সেদিক পানে দৌড়ে গেল গাছ থেকে নেমে।

গোয়াল থেকে গোরু ছেড়ে দিতে না দিতে ওদিকে কার কাতর চীৎকার শোনা গেল। বাঁটুলের দুই চোখ তখন ধোঁয়ায় অন্ধকার, কিন্তু তার মধ্যেও সে ঠিক খুঁজে খুঁজে পৌঁছে গেল।

বেশ বড় একটা চালাঘর। তাদের ঢেঁকশেলের চেয়ে কিছুটা বড়। ঘরটায় গোরুর গাড়ীর চাকা, লাঙল, চারটি কুঁচোন খড়, সব ঠাসাঠাসি। চালা থেকে ভুট্টা আর মকাইয়ের ছড়া ঝুলছে। আর সেই ঘরেরই কোণে বসে একটা বুড়ী, কি কান্না জুড়েছে, 'মর গেই, জান গেই বাপ রে বাপ!'

বুড়ীর একটা পা খোঁড়া। বাঁটুল তো তাকে পাঁজাকোলা করে ছুটতে ছুটতে বাইরে এনে ফেলল। ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর সে কি চীৎকার আর কি গালাগালি। ঐ ঘরের কোণে আমার টাকা পোঁতা রয়েছে তুই যে আমায় নিয়ে এলি, বুধুয়ার বাপ সব নিয়ে যাবে।

'বুধুয়ার বাপ! তুই বুধুয়ার কে?'

'বুধুয়ার মা!' বলেই বুড়ীর আবার চীৎকার—'মর গেই, জান গেই, বাপ রে বাপ!'

বাঁটুলের খুব রাগ হ'ল। বলল, 'ওরা যখন পালাল, তুমি পালাও নি কেন?'

'আমি কি গোরাকে ভয় পাই যে পালাব?'

'ওরা গোরাকে ভয় পায়।'

'কেন?'

'কেন?' বুড়ী মুখ ভেঁঙচে বললে, 'তা জান না? গোরা লোকদের সেপাইরা মেরেছে আর গোরা লোকরা আমাদের সব মেরে ধরে শেষ করছে?'

'কেন ?'

'কেন ? আমাদের রাজ হবে, তা জান না ? কাশীতে কাশীনরেশের (কাশীর রাজার) রাজ হবে। গোরালোক গোরু খেয়েছে, ওদের গঙ্গায় চুবিয়ে জান খতম করা হবে।

তারপরই বুড়ীর সন্দেহ হ'ল। বলল, 'তুই বাঙ্গালী ?'

'হ্যাঁ।'

'তাই বল! আমি কাশীর কাণ্টুমেণ্টে বাঙালী বাবুদের বাড়ী কাজ করেছি, মেমসায়েব দেখেছি, তাই তো বুধুয়ার বাপ বলে তুই সায়েবদের লোক। তোকে সেপাইরা মারবে। কিন্তু তুই বাঙালী ? অ বুধুয়া, কোথায় গেলি, দেখ এক বাঙালী বিচ্ছু আমাদের গাঁয়ে আগুন দিচ্ছে রে!'

বাঁটুল কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এই সময়ে সে বেশ জনাকয়েকের পায়ের শব্দ শুনলে। একটা লোক, তার গলা অতি বিচ্ছিরি, বাজখাঁই, সে চেঁচিয়ে বললে, 'কাঁহা, রে বিচ্ছু, ভাগ গেই কাঁহা ?'

যেই না সেই গলা শোনা, অমনি বাঁটুল ছুট দিল। একেবারে এমন একটা ছুট, যেন তার যমমা তার পেছনে ধাওয়া করে আসছে। ছুটতে ছুটতে সে তো একেবারে নদীর ধারে।

সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু চড়ক গাছ। সর্বনাশ হয়েছে। নৌকো নেই, কিছু নেই, নদীর ধার সুনসান। হয়তো সেই গোরে আয় শব্দ শুনেই মাঝিরা নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। এখন বাঁটুল কি করে ? রাগে, দুঃখে তার কান্না পেল। কোথায় নৌকো, কোথায় রূপচাঁদবাবুরা, কোথায় কে, এখন সে কেমন করে কি করে ?

এইসব সে ভাবছে আর ভাবছে, হঠাৎ তার কাঁধে হাত পড়ল। কে বলল, 'ধরেছি রে ধরেছি!' একটা যণ্ডামার্কা লোক, তার কোমরে গামছা, হাতে লাঠি। বলল, 'তুমি আমার গাইটা ছেড়ে দিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ। গোয়ালে বেঁধে পালিয়েছিলে কেন ?'

'তুমি কে ? তুমি তো বাঙালী। তুমি গোরাদের লোক ?'

'গোরাদের লোক ?' বাঁটুলের বেজায় রাগ হ'ল। সে বলল, 'মোটেই না। আমি কারো লোক নই। নৌকো থেকে নেমেছিলাম, নৌকো আমাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে।'

'তা আর যাবে না ? গোরারা মাঝিদের দেখে বন্দুক তুলেছিল তা তো জান না ?'

'কেন ?'

'লড়াই হচ্ছে না ? লড়াই হচ্ছে বলেই তো গোরারা আমাদের সব পিটিয়ে তুলোধোনা করছে।'

'তোমরা ওদের মারছ না কেন ?'

'ওদের বন্দুক আছে জান না ? আমাদের মেরে একেবারে ছাতু করে দেবে। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।' আসলে নৌকোর মাঝিরা পাটনা জেলার লোক। কলকাতার গঙ্গা কেন, আরো দূরে, পদ্মা আর মেঘনা বেয়ে পূব দেশে, খড়ে নদী দিয়ে কেষ্টনগরে, রূপনারায়ণ দিয়ে কোলাঘাটে, এই পাটনাই মাঝিরা নৌকো বেয়ে বেয়ে ঘোরে। যাত্রী নেয় জিনিসপত্র বেচে। পশ্চিম দেশ থেকে পুজোর আগে গয়ার পাথরের বাসন, কাশীর গরদ, তসর, মির্জাপুরের মাটির খেলনা, পাটনার হলুদ, কানপুরের কম্বল, সব এ দেশে আনে। যাবার সময়ে খালি নৌকো নিয়ে যাবে ! তাই যাত্রী নিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশে জিনিস বেচে, বাংলাদেশের যাত্রী নিয়ে কাশী, পাটনা, এলাহাবাদ যায়। ওদের সঙ্গে কথা বলে বলে বাঁটুল কাজ চালানো মত হিন্দী শিখেছে। লোকটা বলল, 'এখন আর কি করবে বল ?'

'আমি কানপুরে যাব।'

'কানপুরে যাবে ?'

'হ্যাঁ। আমার বাবার কাছে।'

'বাবার কাছে ?'

'হ্যাঁ।'

লোকটি কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'এখন তুমি আমাদের সঙ্গে গ্রামে থাক। গ্রাম ছেড়ে আমরা আবার জঙ্গলে পালাব, তখন না হয় চলে যেও। আমার ঘরে তোমায় লুকিয়ে রাখব।'

'কেন ? লুকিয়ে রাখতে হবে কেন ?'

'আমাদের বুধনের শালা যে সেপাই, সে তোমায় দেখলে যদি মারে ?'

'মারবে কেন ?'

'সেপাইরা বলে বাঙালীবাবুরা সায়েবদের দলে, তাই বাঙালীদের উপর ওদের বেজায় রাগ।'

'তা' হলে তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাইছ কেন ?'

'তুমি যে আমার গাইটাকে বাঁচালে ? আমার লাল গাইটা ভারী পয়মন্ত ও

আসবার পরই আমার আমগাছটায় ফল ধরল। আমার ক্ষেতে খুব গম হ'ল। আর আমার একটা রুপোর মাদুলী হারিয়ে গিয়েছিল, ইঁদারার পাড়ে সেটা পেয়ে গেলাম। ঐ লাল গাইটা যদি পুড়ে মরত, তা' হলে আমার কি পাপ হত বলত ?'

'তা তো হতই।'

'তা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণ।' লোকটি ওর পইতে দেখিয়ে হাত জোড় করল। বলল, 'চল, একটু আরাম করবে, একটু কিছু খাবে ? তুমি খেলে আমার পুণ্য হবে।'

কিন্তু বাঁটুল রাজী হ'ল না। বলল, 'তুমি আমাকে কাশীর রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।' বাঁটুল শুনেছে কাশীতে অনেক বাঙালী আছে। তারা নিশ্চয় ওকে আশ্রয় দেবে। যদিও, অন্যলোকের বাড়ীতে বাঁটুল কেমন করে নাইবে, কেমন করে ভাত খাবে কে জানে। ভাতটা বাঁটুল একটু বেশী খায়। ওরা কি চূড়ো করে ভাত বেড়ে দেবে ? ভাতের কথা মনে করতেই বাঁটুলের খিদে পেয়ে গেল।

ঐ পথ ধরে চলে যাও। যেতে যেতে রামনগরে পৌছবে। যাকে বলে ব্যাসকাশী। উলটো দিকে কাশীধাম। নদী পেরোতে হবে নৌকো চড়ে।

বাঁটুল সেই দিকেই চলল। কোমরের গেঁজেটা ঠিক আছে এই যা! তাতে টাকা আছে চারটে। আর মামীমার চিঠিটা এখন ভালয় ভালয় কাশীতে পৌছতে পারলে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রজাপতি প্রজাপতি

শ্রীনির্মল ব্রহ্মচারী

প্রজাপতি প্রজাপতি বোঝা অতি শক্ত
কার তরে ওড় তুমি কার তুমি ভক্ত ?
ফুলে ফুলে দুলে দুলে হামা-চুমো খাচ্ছ
শুঁড় লেগে নাকে ওর পায় নাকি হ্যাঁচ্চো ?
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে যেথা যাবে যাও না
ফুলে ফুলে দুলে দুলে যত চুমো খাও না
শেষকালে লালগালে দিয়ে যেও চুমোটা,
খুকুমণি ঘুমোলেই মধু দেব দু'ফোঁটা॥

কাঠ থেকে পশুর খাদ্য

শ্রীসলিল মিত্র

কাঠ থেকে পশুর খাদ্য তৈরী হয়—একথা কেউ যদি তোমাকে বলে, তুমি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দেবে। বলবে হয়তো, যত সব আজগুবী গল্প! কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের যুগে আজগুবী বলে কোনো কথা আছে কি? এই তো দেখো না, আখের ছিবড়ে থেকে, লোহার মরিচা থেকে, কলকারখানার ধোঁয়া থেকে মানুষ কতো বিচিত্র জিনিসই না আবিষ্কার করছে—তা'হলে কাঠ থেকে পশুর খাদ্য তৈরী হবে এ আর আশ্চর্য কি!

ব্যাপারটা তা'হলে খুলেই বলা যাক্—

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কার্ড-বোর্ড তৈরীর কারখানা হ'ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসোনাইট কর্পোরেশন। নানান্ কাজের জন্যে ঐ কারখানায় শক্ত কার্ড-বোর্ড তৈরী হয়।

শক্ত বোর্ড তৈরী করার জন্যে প্রথমে বড় বড় কাঠকে টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়, তারপর সেই টুকরো থেকে খুব পাতলা করে কাঠের আঁশগুলোকে জলে ধুয়ে নেওয়া হয়।

এবার আঁশ-ধোয়া জলটা কি হবে? নিশ্চয়ই ফেলে দেওয়া হবে? হ্যাঁ, আগে তাই করা হ'ত, ফেলে দেওয়াই হ'ত, কিন্তু এখন আর হয় না।

কারখানার গবেষকরা ঐ আঁশ-ধোয়া জল নিয়ে একদিন তাপ দিয়ে দেখলেন—জলটা বাষ্প হয়ে গেলে তলায় পড়ে রইল গুড়ের মত একটা জিনিস। রঙ্‌টা গুড়ের মতই, আর গন্ধটা? বেশ মিষ্টি!

একটি ঘোড়ার মুখের কাছে একদিন ঐ জিনিসটি রাখা হ'ল! সে তো উপাদেয় খাদ্যের মত অম্লান বদনে সেটি খেয়ে ফেললো।

গবেষকরা খুশী হলেন—তুচ্ছ একটা জিনিস থেকে পশুদের খাদ্য-সংগ্রহের সফলতায় তাঁরা আনন্দ পেলেন এবং কারখানার একটা অংশে চললো আঁশ-ধোয়া জল থেকে গুড় জাতীয় জিনিস তৈরীর কাজ। আবিষ্কার হ'ল কাঠ থেকে পশুর খাদ্য।

তাহলেই ভেবে দেখো, যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে কতো সাধারণ জিনিস, যার কোনো মূল্যই আমরা দিই না সে-গুলোও বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে কতো মূল্যবান প্রয়োজনীয় জিনিসে রূপান্তরিত হয়।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমলয়া ধর

আমার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা গল্প শুনতে খুব ভালোবাসো তো? এখন থেকে ১০০ বছর আগে ২৮শে অক্টোবর যাঁর জন্ম হয়েছিলো, তাঁর কথাই তোমাদের আজ বলবো। নাম তাঁর মিস্ মার্গারেট্ নোবল। নাম শুনেই ভাবছো বোধহয়, ইনি তো বিদেশিনী। হ্যাঁ তাই, ইনি বিদেশিনী ছিলেন বটে, কিন্তু মনে-প্রাণে ছিলেন আমাদেরই বন্ধু। সুদূর আয়র্ল্যাণ্ড ছিলো তাঁর জন্মভূমি, তবু এই ভারতবর্ষের মাটি তাঁকে হাতছানি দিয়ে যেন ডাক দিয়েছিলো। তাই তিনি দেশ, ধর্ম সবকিছু ছেড়ে এসেছিলেন আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষে। বিলাত-দেশের সঙ্গে আমাদের কত তফাত, আচার-ব্যবহার সবকিছুতে। স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছো তো? তাঁর প্রভাবে মিস্ মার্গারেট্ নোবেলের সবকিছু বদ্‌লে গিয়েছিলো এমনকি নামটা পর্যন্ত। ভারতে এসে তাঁর নতুন নাম হয়েছিলো নিবেদিতা। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যাতে স্বামীজীর দেওয়া নামটা সার্থক হ'য়ে ওঠে। সেজন্য তিনি ভালোবেসেছিলেন আমাদের, আর মানবকল্যাণেই উৎসর্গ করেছিলেন নিজের জীবন।

১৮৬৭ সনের, শরতের এক সোনার প্রভাতে পৃথিবীর সাথে পরিচয় হয়েছিলো একটি ছোট্ট মেয়ের। পিতা ধর্মযাজক স্যামুয়েল নোবেল্, মাতার নাম ছিলো মেরী। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগলো। কোন জিনিস দেখলে তোমাদের মনে যেমন অনেক প্রশ্ন জাগে, এই মেয়েটির মনেও তেমনি অনেক প্রশ্ন জাগতো। নানা রকম প্রশ্ন করে মেয়েটি তো তার মাকে বিরক্ত করে তুলতো। কখনো সঠিক উত্তর পেয়ে মন ভ'রে উঠতো, কখনো বা মন ভরতো না। ধর্মের দিকে মেয়েটির খুব ঝোঁক ছিলো— এছাড়া গল্প লিখতে, ছবি আঁকতেও সে খুব ভালবাসতো। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে এসব জিনিসে মন দিতো। লেখাপড়ায় সেজন্য তার কোন অবহেলা ছিলো না। লেখাপড়ার অধ্যায় শেষ হয়ে গেলে মিস্ মার্গারেট হলেন শিক্ষয়িত্রী। তোমাদের মত ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুদের তিনি খুব ভালোবাসতেন।

বিলাতের এক ধর্মসভায় আমাদের দেশের স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে তাঁর খুব ভালো লাগে, ভালো লাগে ভারতের আদর্শের কথা। পরে তিনি চলে আসেন এই দেশে এবং স্বামীজীর শিষ্যা হন। তারপরই সুরু হয় তাঁর কাজ। চেষ্টা চলে কেমন করে এই দেশের উন্নতি হয়। তখন আমাদের দেশের ছোট ছোট মেয়েরা স্কুলে পড়তো না। বাগবাজারে তিনি একটি ছোট্ট স্কুল খুলেছিলেন, ছোট ছোট মেয়েদের জন্য। আজও

সেই স্কুল রয়েছে—তারই নামানুসারে সেই স্কুলটির নাম হয়েছে, "নিবেদিতা স্কুল"। এছাড়া দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারেও তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। সেজন্য তখনকার দিনের সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিলো। মাত্র পাঁচ বছর তিনি আমাদের দেশে ছিলেন। এই কয়েকটি বছরে তিনি ভারতের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। সে কাজের তুলনা হয় না। তাই তিনি আজও আমাদের স্মরণীয়া। জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে তাঁর ধর্মভূমি এই ভারতবর্ষে, ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবরের প্রভাতে তিনি চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তির মধ্যে তিনি অমর হয়ে আছেন। এসো, তাঁর এই শুভ-জন্মস্মৃতি বৎসরে তাঁরই গল্প বলে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

খড়দা'র বড়্দা

শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী

খড়দা'র বড়্দা
যদি মারে রদ্দা
ঘাড়ে কিছু হয় না'ক
কানে ফাটে পর্দা!

বড়দা'র কিলেতে
সে বছরে বিলেতে
শুন্‌লাম ছিট্‌কে
হয়ে গেল টিট্‌-কে,
পিঠে কিছু হ'ল নাকো
ফোড়া হ'ল পিলেতে!

শুনি ওর বকুনি
শুনে নাকি তখুনি,
কানে হাত চাপা দেয়
গাছে বুড়ো শকুনি।

বলে তাকে শেষটা
আমাদের কেষ্টা
কি করে এমন হয়
বল করি চেষ্টা!

হেসে কয় বড়দা,
চলে আয় খড়দা
ফ্যাঙ্‌-চ্যাঙ্‌-ল্যাঙ্‌-ব্যাঙ্‌
ধরে এনে কাঁচা ঠ্যাঙ্‌
জলে ভেজে খেয়ে শেষে,
যা যা বলি কর্‌-তা।
তখন তোরা-ও হবি
ছোটখাটো বড়্দা!
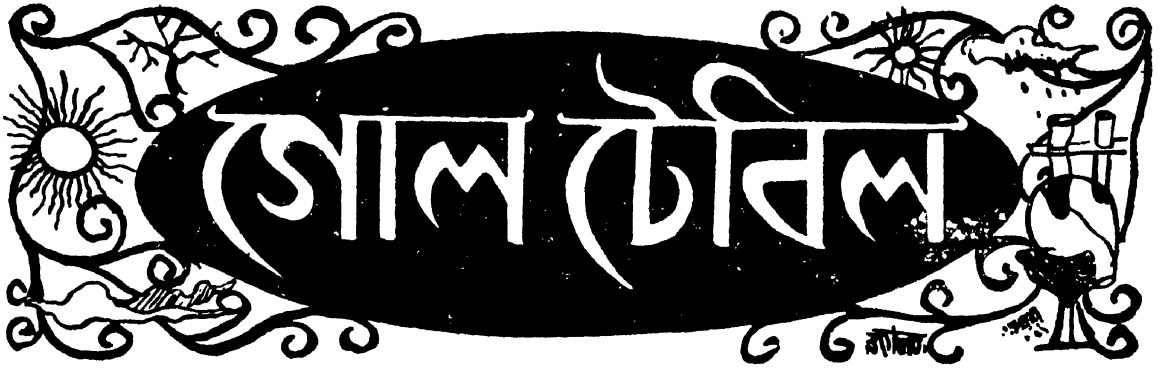
রশিদুল হোসেন

অশুভ ১৩ সংখ্যা

'এক' থেকে 'বারো' পর্যন্ত আমরা সবাই অনায়াসে গুণতে পারি, কিন্তু 'তেরোর বেলায় আমাদের সকলেরই পিলে কেমন যেনো চমকে ওঠে, কোন এক অশুভের আতঙ্কে। বড় বড় আবাসে বা কোনো হোটেলের কোনো ঘরে '১৩' সংখ্যাটা লেখা হয় না, এ সংখ্যাটার প্রতি লোকের মনে এমনি ভয়। মানবপুত্র যীশুখৃষ্টের শেষভোজের সময়ে যে মোট তেরোজন উপস্থিত ছিলেন, এঁদের মধ্যে যিনি সবার শেষে এসেছিলেন তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে এই সংখ্যাটার সঙ্গে কোনো অমঙ্গলজনক ঘটনার কোনো সংস্রব নেই। তেরোটি উপনিবেশ নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীলমোহরে তেরোটা তারা আছে, তেরোটা ডোরাকাটা আছে, তেরোটা তীর আছে, তেরোটা মেঘ আছে, তেরোটা অক্ষর আছে, তেরোটা লরেল গাছের পাতা আছে, তেরোটা বেরী ফল আছে, প্রতি ডানায় তেরোটা করে পাখনা আছে। আমেরিকার সাতজন রাষ্ট্রপতির নামের বানানে তেরোটা করে অক্ষরের দরকার হতো। যেমন:—১। এন্‌ড্রু জ্যাকসন (Andrew Jackson) ২। জ্যাকারী টেলর (Zachary Taylor) ৩। জেমস বুকানন (James Buchanan) ৪। জেমস নক্স পল (James Knox Poll) ৫। এন্‌ড্রু জনসন (Andrew Johnson) ৬। উড্‌রো উইলসন (Woodrow Wilson) ৭। হারবার্ট হুভার (Herbert Hoover).

আমেরিকার দু'জন রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন ও জেনারেল পারসিং-এর জন্ম স্ব স্ব মাসের তেরো তারিখে। উজ্জ্বল ধাতুর তারকা সেলাই করা ব্যানার লেখা হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৮১৪ সালে। ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মিত্রতা হয় ১৩ই জুন, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। যুক্তরাজ্যের নীতিকথা (motto) হচ্ছে মোট তেরোটি অক্ষরে লেখা। "E Pluribus Unum."

জার্মান সংগীত-রচয়িতা ওয়াগনারের কপালে কিন্তু ১৩ সংখ্যাটি খুব শুভ ছিল। তাঁর নাম লিখতে গেলে তেরোটা অক্ষর লাগে, তার উপাধি "Kapellmecster." লিখতে

গেলেও তেরোটা অক্ষরের প্রয়োজন। এমন কি, তাঁর মায়ের নাম লিখতে গেলেও তেরোটা অক্ষরের দরকার হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮১৩ সালে আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সালে। তেরো বছর বয়সে তিনি স্কুল ত্যাগ করেছিলেন, তিনি মোট তেরোখানা গীতিনাট্য লিখেছিলেন।

কেপটাউন থেকে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পথে ২৫০ জন যাত্রীবাহী ফ্রান্সের 'উশান্ত' নামে এক জাহাজ ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তিন মিনিটের মধ্যে ডুবে যায়। এই জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে একজন বেঁচে যান, তাঁর নাম Charles Marquaradt. তিনি ঐ জাহাজের ১৩ নম্বর ঘরের একমাত্র বাসিন্দা ছিলেন।

মাসের তেরো তারিখ যদি শুক্রবারে পড়ে, তাহলে তো লোকের মনে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তেরো তারিখ শুক্রবারে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে :— ১। উত্তর আমেরিকায় প্রথম ভোট নেওয়া হয়। ২। জর্জিয়ায় প্রথম বসতি স্থাপিত হয়। ৩। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ দেওয়া হয়। ৪। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ৫। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বাসভবন (White House) এর নির্মাণকার্য সুরু হয়। ৬। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৭। মিসিসিপি নদীর উৎস আবিষ্কৃত হয়। ৮। হোরেশিও আলগারের জন্ম হয় ৯। আরাকান্‌সরা (Arcans) প্রথম শাসনতন্ত্র গঠন করে।

মনে রাখার মত

"শক্তিশালীকে সকলেই ভয় করে, দুর্বলকে সকলেই পরাজিত করে। দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

"যে সন্তান পিতামাতার মনে আঘাত দেয় না, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করে, পিতামাতার প্রসন্নতা তাহাদিগকে নানা বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে। তাহাদের মঙ্গল যেন ভগবান হাতে করিয়া বিতরণ করেন"

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মেঠুড়ে

ডেভিস কাপ

রমানাথন কৃষ্ণান (অধিনায়ক)
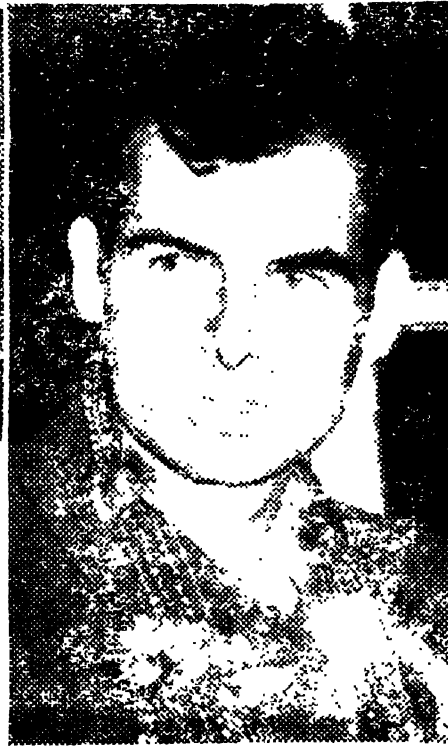
টমাস কচ (অধিনায়ক)

ভারত ডেভিস কাপ টেনিসের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ভারতীয় টেনিসের দীর্ঘ ইতিহাসে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার গৌরব এই প্রথম। ৬ই ডিসেম্বর উডবার্ণ পার্কের ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব লনে ডেভিস কাপ টেনিসের আঞ্চলিক ফাইন্যাল আগের দিনের অসমাপ্ত শেষ ফিরতি সিঙ্গলসের খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক পদ্মশ্রী রমানাথন কৃষ্ণান ব্রেজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস কচের বিরুদ্ধে শেষ দুটো সেট দখল করে ভারতকে ব্রেজিলের বিরুদ্ধে ৩—২ ম্যাচে জয়যুক্ত করেন। কৃষ্ণান বনাম কচের খেলার চূড়ান্ত ফলাফলে কৃষ্ণান ৩—৬, ৬—৪, ১০—১২, ৭—৫, ও ৬—২ সেটে জয়ী হন। মেলবোর্ণে আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর গতবারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
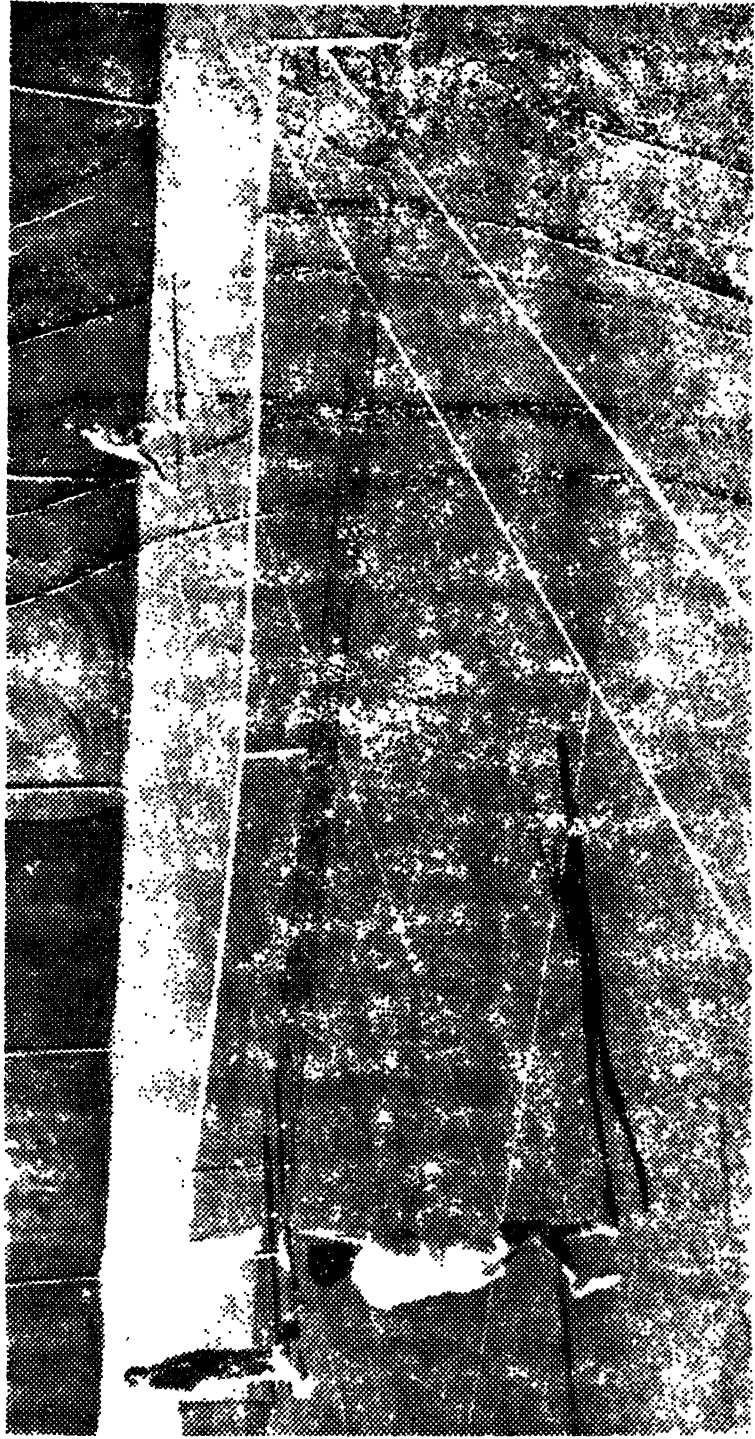
কলিকাতার উডবার্ণ পার্কে বিখ্যাত সাউথ ক্লাবের টেনিস কোর্ট। এইখানে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রেজিলের ডেভিস কাপের ইণ্টার-জোন ফাইন্যাল খেলা হয়।

কলকাতার সাউথ ক্লাব লনে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালের চতুর্থ দিনের শুরুতে খেলার গতি কৃষ্ণা-নের প্রতিকূলে ছিল। ভারতের টেনিস ক্রীড়া রসিকদের মুখ-গুলো ছিল নৈরাশ্যে ম্লান। যাঁরা অতি আশাবাদী তাঁরা স্বীকার করে-ছিলেন যে, কৃষ্ণা-নেরমতন একজন দক্ষ খেলোয়াড়কেও তাঁর দক্ষতা, চমকপ্রদ মারের কায়দা এবং ক্রীড়াকুশলতার পরিচয় দিতে হবে, তা না হলে সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে কোনো মতেই বাঁচা যাবে না। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার ইতিহাসে যা আগে কখনো ঘটেনি তা কৃষ্ণান ঘটাতে চলেছেন। পরাজিতের মনোভাব বর্জন করে জয়লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণান অপূর্ব দক্ষতা ও নিপুণতা দেখিয়ে ভারতের বিজয় পতাকা উচুঁতে তুলে ধরেছেন।

জয়দীপ মুখার্জী　　　　প্রেমজিৎ লাল

পূর্বাঞ্চলিক রাউণ্ডে পরপর সিংহলকে ৫—০, ইরাণকে ৫—০, জাপানকে পূর্বাঞ্চলিক ফাইন্যালে ৪—১, আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীকে ৩—২ এবং আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে ব্রেজিলকে ৩—২ ম্যাচে হারিয়ে, ভারত এই প্রথম ডেভিস কাপ টেনিসের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

এর আগে ভারত চারবার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে উঠে জয়লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫৯ বোস্টনে বঃ অস্ট্রেলিয়া (১—৪); ১৯৬৩ মাদ্রাজে বঃ মেক্সিকো (০—৫); ১৯৬৪ বোম্বাইয়ে বঃ যুক্তরাষ্ট্র (০—৫); ১৯৬৫ বার্সিলোনায় বঃ স্পেন (২—৩)।

মুষ্টিযুদ্ধ

বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লে বিশ্বজয়ী আখ্যা অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সম্প্রতি হাউসটনে ক্লীভল্যাণ্ড উইলিয়ামের সঙ্গে লড়াইয়ে মাত্র এক মিনিটের কিছু বেশি সময়ের ভেতরই চব্বিশ বছরের ক্লে প্রতিপক্ষকে ঘুষির আঘাতে জর্জরিত করে তোলেন। পনেরো রাউণ্ডের লড়াইয়ের ব্যবস্থা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তৃতীয় রাউণ্ডেই রেফারীকে লড়াই বন্ধ করে কেসিয়াস ক্লে-ই জয়ী একথা ঘোষণা করতে হয়।

এবার নিয়ে ক্লে এক বছরের ভেতর পাঁচটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলেন। ক্লে এর পর আনি টোরনের সঙ্গে লড়বেন। প্রতিপক্ষের নাম জানা গেলেও এখনো লড়াইয়ের দিন জানা যায়নি।

ইরাণী কাপ

ইডেন উদ্যানে ১৯৬৫-৬৬ সালের রনজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের সঙ্গে ভারতে অবশিষ্ট দলের খেলাকে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টের স্টেজ রিহার্সাল বলা যেতে পারে অকাল বৃষ্টির জন্যে মাঠ ভেজা থাকায় খেলা খুব জমতে পারেনি। চার-দিনের মধ্যে প্রথম দিন বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ থাকে। এই খেলায় ভারতের বহু বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সমাবেশ হয়েছিল। ইরাণী ক্রিকেটে ভারতের অবশিষ্ট দল রনজি ট্রফি জয়ী বোম্বাই দলকে ছ উইকেটে হারিয়ে দেয়।

ব্রেজিলের অন্য দু'জন টেনিস খেলোয়াড়

কার্লোস কার্ণেণ্ডেজ এডসন ম্যাণ্ডারিনো

টেবল টেনিস

সম্প্রতি চৌরঙ্গী ওয়াই. এম. সি. এ. হলে রাজ্য টেবল টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার খেলাগুলো শেষ হয়েছে। পঁচিশ বছর বয়েসী অজিত বসুর সর্বপ্রথম রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবারকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফাইন্যালে এক নম্বর বাছাই সরোজ ঘোষকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে, অজিত বসু পশ্চিম বাঙ্গালার নতুন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অজিত এবং সরোজের ফাইন্যাল খেলাটি আঠারো মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। ক্ষিপ্র মার এবং ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ ছিল অজিতের খেলার প্রধান অস্ত্র। সরোজের চাপ ডিফেন্স অজিতের পয়েন্ট লাভের প্রতিকূলতা করলেও শেষ পর্যন্ত সরোজকে স্ট্রেট সেটেই হার স্বীকার করতে হয়। মহিলাদের বিভাগে গত দু বছরের চ্যাম্পিয়ন রূপা মুখার্জি ডেইজি কাপাদিয়াকে চার সেটের খেলায় হারিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারিণী হয়েছেন। জুনিয়র বিভাগে নাচ্চু মুখার্জি প্রথম দুটো সেট পাবার পর অসিত মিত্র পায় তৃতীয় সেট। চতুর্থ সেট জয় করে নাচ্চু হয় নতুন জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন।

সুব্রত কাপ

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে কার নিকোবরের গভর্ণমেণ্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনার মধ্যে অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে বিজয়ী দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওয়েলিংটন জলন্ধরের রাজ্য স্পোর্টস স্কুল দলের বিপক্ষে জয়সূচক গোলটা করে। কার নিকোবরের সাফল্যের মূলে এই ওয়েলিংটনের অবদান সবচেয়ে বেশি। দলের প্রায় প্রত্যেকটা খেলায় সে গোল করেছে। তাছাড়া বাঙ্গালোরের করপোরেশন হাই স্কুলের বিপক্ষে কার নিকোবরের রেকর্ড সংখ্যক পনেরটা গোলের ভেতর ওয়েলিংটনের তিনটে হ্যাট্ ট্রিক সমেত দশটা গোল খেলাধুলোর জগতে একক কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সেমি-ফাইন্যালে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপস হাইস্কুলের বিপক্ষে হ্যাট্ ট্রিক লাভ বিশেষ উল্লেখ্য করার মত। কার নিকোবর ছাড়া এ বছর সুব্রত কাপে অপর যে দল দিল্লীর মাঠে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে সে দলটি হ'ল বিহারের ফিলিপস হাই স্কুল। এরা গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী গুর্খা মিলিটারী হাই স্কুলকে প্রাক্-কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায় ৩—২ গোলে হারিয়ে দেয়। এই দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড রাজারাম যাদবের হায়দ্রাবাদের মাদ্রাসা আলিয়রের বিপক্ষে হ্যাট্ ট্রিক সমেত চারটে গোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের সতেরো বছরের কম বয়েসী স্কুল ছাত্রদের সেরা দল নিয়ে সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রায় প্রত্যেকটা স্কুলই তার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবল দল এবং এই সব সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলে শেষ পর্যন্ত যে দল সুব্রত কাপ জয়ী হয়, তার কৃতিত্ব যে বলবার মত সে বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

মটির মানুষ লালবাহাদুর—শ্রীপতিত-পাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা এণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ডি, মেহরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·০০

ছোটদের খ্যাতিমান কবি পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'অমর জহর' নামে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে, কবিতায় ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য সুন্দর একখানি বই লিখে সকলের খ্যাতি অর্জন করেন। আমাদের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লালাবাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনের বিশিষ্ট দিকগুলি নিয়ে কবিতায় লেখা এই বইখানিও ছোটদের শুধু আকৃষ্টই করবে না, এ থেকে তারা মানুষ বড় হলেও যে কি সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং অহামিকা, ঈর্ষা, লোভ, ভয় প্রভৃতি জয় করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাবে। সুন্দর মিলের ভাবব্যঞ্জক এই কবিতাগুলি বড় টাইপে, রঙিন কাগজে আকর্ষণীয় করে ছাপা। প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

স্মরণিকা—শ্রীবলরাম বিশ্বাস। বিদ্যা-ভারতী, ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·০০

'স্মরণিকা' কয়েকটি ছোট ছোট সহজ সুন্দর কবিতার বই। এতে প্রকৃতির বিষয় সম্পর্কেও যেমন কয়েকটি কবিতা আছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, লালবাহাদুর, বঙ্কিমচন্দ্র ও ক্ষুদিরাম প্রভৃতি মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনের উপরও কবিতা আছে কয়েকটি। বইখানি নিচু ক্লাসে ছাত্রদের পাঠ্য হবার উপযোগী। কয়েকখানি ছবিও আছে এতে।

কিরাতী কাহিনী সপ্তক—শ্রীনলিনী-কুমার ভদ্র। কথাশিল্প প্রকাশন, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে অবনীরঞ্জন রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০

গ্রন্থকার অনেক দিন ধরে বাঙলার উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঘুরেছেন। এইসব উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদেরও গল্প আছে, কাহিনী আছে এবং রূপকথা আছে। তারাও ছেলেমেয়েদের গল্প শোনায়। ভারী মজার মজার এই সকল মিকির, কাছাড়ী, গারো, খাসিয়া ও মিনিয়ঙদের কাহিনী। প্রধানতঃ ছোটদের গল্প হিসাবে এগুলি লেখা হলেও বড়রাও এ গল্প পড়ে খুশি হবেন। সচিত্র সাতটি গল্প আছে এতে এবং প্রত্যেকটিই নতুনত্বে ভরা। এ ধরনের গল্পের বই সম্ভবতঃ এর আগে আর কেউ লেখেন নি। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও উপরের বহিরাবরণটি খুবই সুন্দর।
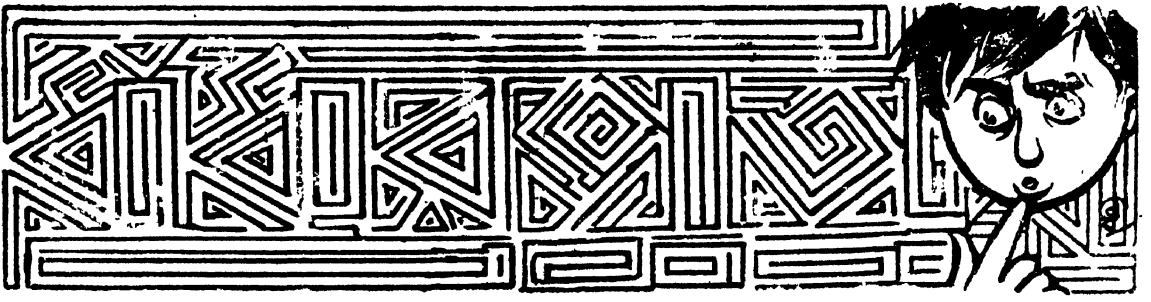
বাজিকর
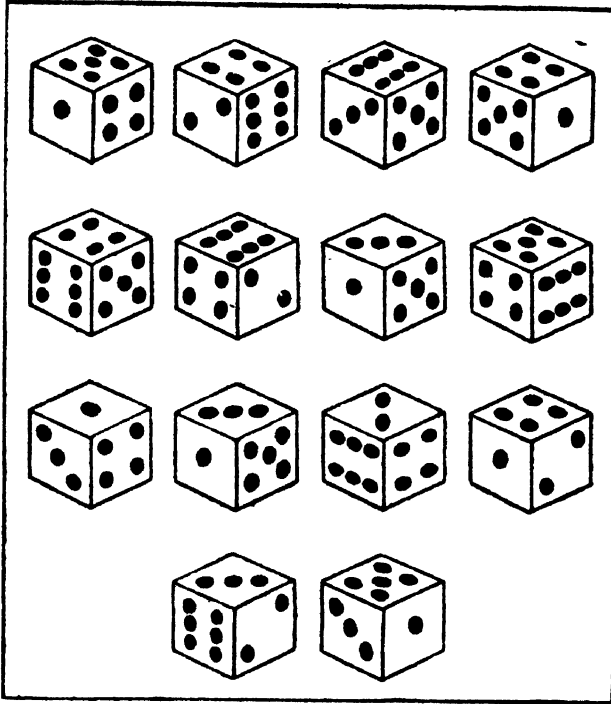
ভুল বার করো

১। পাশের ছবিটিতে লুডোর ঘুঁটির মত কিউব আছে চোদ্দটি। ওর প্রত্যেক-টির ছয়টি তলে এক থেকে ছয় পর্যন্ত ফোঁটা আছে। ঐ সব কিউবের মধ্যে একটির ফোঁটায় কিন্তু ভুল আছে। কোন ঘুঁটিটার ফোঁটায় ভুল আছে বলতে পারো?

ফুল গোনা

২। ডাইনের ছবিটিতে কতকগুলি ফুল দেখতে পাচ্ছ। কে তাড়াতাড়ি বলতে পার, ছবিতে মোট ক'টা ফুল আছে? ঘড়ি ধরে চার-পাঁচ জনে মনে মনে গুণে বলতে হবে এবং কার কয় মিনিট হ'ল দেখতে হবে।
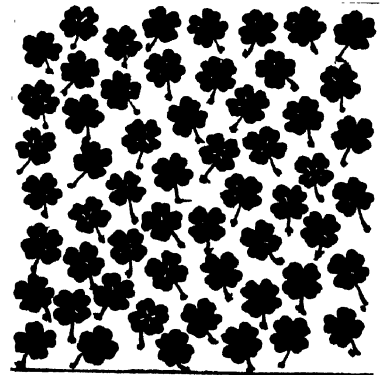
গতবারের ধাঁধার উত্তর

(ক) মোট কিউবের সংখ্যা উনপঞ্চাশ (খ) বাইশটি কিউব দেখা যাচ্ছে না!

(গ) মেঝের উপর মোট পনেরটি কিউব আছে।

কোলকাতায় ডিসেম্বরে হাড় হিম করা হাওয়া বইতে-সুরু করেছে। আর শীতের দিনে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা উৎসব-আনন্দের খেলাধূলোর সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সকলের মুখেই এক কথা : একটি টিকিট দিতে পারেন ?—বৎসরান্তে এই সময়ের সাজ-পোষাক, খেলাধূলা ও আগত বড়দিনের উৎসব-অনুষ্ঠানের আভাস পুরোদমে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু অন্য দিকে চলছে আর এক কাণ্ড—অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। গুরুশিষ্যের মধ্যে যে অসহযোগ দেখা দিয়েছে, তা কোনদিক থেকে শ্রেয় নয়। কিন্তু দিনের পর দিন যে সব ঘটনা ঘটছে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাঙাচোরা তছনছ ঘটছে, এ কী শিক্ষার দান ?

আমরা ছোটবেলায় শুনতাম, 'বিদ্যাদদাতি বিনয়ম্' অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে। লেখাপড়া শিখে কৃতবিদ্য হলে তার অধীত জ্ঞান আর পাঁচজনের মধ্যে বিতরণ করবে, এর ফলে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শিক্ষা এনে দেবে জ্ঞান, এনে দেবে ভব্যতা, এনে দেবে সংযম, এনে দেবে বিনয়—এইসব গুণের অধিকারী হলে তারা সভ্য দেশ ও সমাজের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারবে। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা, বড়দের সম্মান দেওয়া, এসবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজ কি দেখছি ? দেখছি, উচ্ছৃঙ্খলতা দিনের পর দিন নতুন নতুন ভাবে, ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এর কারণ কী ? এর প্রতিকার কি ? কেনই বা এই লজ্জাকর ইতিহাস রচিত হচ্ছে শিক্ষা জগতে ? শিক্ষা জগতেই বা বলি কেন ? সর্বত্রই এই অসহযোগ ও দুর্নীতি। তোমরা যারা ছাত্র, তারা এসবে জড়িত হয়ে পড়ে কেন শিক্ষা জগতে এই পরিস্থিতির সহায়ক হচ্ছো ? বলতো গত দু'তিন মাসের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে কত ছাত্রছাত্রীর কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল ? একবছর তারা পিছিয়ে পড়ল। পড়াশুনার কি নিদারুণ ক্ষতিই না হলো ! তাছাড়া আর যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা যাদের দ্বারাই ঘটুক, তা কি আমাদের লজ্জার কথা নয়, দুঃখের কথা নয় ?

ছাত্র-জীবনে শান্ত ও সংযত হয়ে পাঠ গ্রহণ করার সময়। আগের দিনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করতে হতো ; শিক্ষা শেষ হলে তবে ঘরে ফেরার কথা ভাবা যেতো। সেখানে পাঠাভ্যাস ছাড়াও চরিত্র তৈরী, রীতিনীতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, মানুষের

সঙ্গে যোগ্য আচরণও শিখতে হতো—। কিন্তু সে দৃষ্টান্তের এককণাও কি আমরা মেনে চলছি? এটি আমাদের লজ্জা ও দুঃখের কথা নয়? এর প্রতীকার কি তোমরাই বল?

ভগিনী নিবেদিতা—

তোমাদের কাছে নিবেদিতার গল্প অনেকবার বলেছি, তোমরা যারা একটু বড় হয়েছ, তারা শুধু গল্প শুনেছ তাই নয়—হয়তো বইও পড়েছ।

নিবেদিতা চরিত্র এমনি একটি আদর্শ চরিত্র যা শতমুখে বলেও শেষ হয় না।

সুদূর আয়র্ল্যাণ্ডের একটি মেয়ে।—জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যা মনে মনে ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় ঠাকুমার সঙ্গে কেটেছে অনেক দিন, তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধার্মিকা, তেমনি ছিলেন নিজ দেশ ও জাতির প্রতি আস্থাশীলা, আর তেজস্বিনী মহিলা।

নিবেদিতা তখন মার্গারেট—বাবাকেও তেমনি ভালবাসতেন। বংশের তেজদৃপ্ত স্বভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল। বাবা আর মেয়ের মধ্যে মনের ঘনিষ্ঠতাও কম নয়। মেয়ে বলতো, বাবা ভারতবর্ষ কোথায়? ম্যাপে দেখিয়ে বাবা বলতেন, এই যে মা আঙুল দাও, এই হলো ইণ্ডিয়া—দি ল্যাণ্ড অফ দ্য যোগীজ। মেয়ের মনে তখন থেকেই ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। বাবার সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তুই হতো ভারতবর্ষ।

কল্পনার চোখে দেখতেন মার্গারেট ভারবর্ষকে—মনে মনে লালন করে চলতেন একদিন তিনি ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করবেন-ই।

বড় হলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি শিক্ষিকার কাজ নিলেন—সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের এক সভায় এসে তাঁকে দেখলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন। এরপর আরো কয়েকবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো। স্বামীজী বললেন: দেশকে যে ভালবাসে না তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।

স্বামীজীর ডাকে সুদূর আয়র্ল্যাণ্ড থেকে মার্গারেট এলেন ভারতে। ভারতের সেবাব্রত নিয়ে তিনি কাজ করবেন। ধর্মে ও কর্মে নিষ্ঠাবতী মেয়েটিকে স্বামীজী দীক্ষিত করলেন। বললেন, ভারতের জন্য যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তবে তোমাকে চলনে-বলনে, আহারে-পোষাকে—সব বিষয়ে হিন্দুনারী হয়ে উঠতে হবে। তোমার কাজ ছোট্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকবে না। সমগ্র দেশ ও জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাকে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত দীপ্তিময়ী হয়ে ফুটে উঠতে হবে। সব সুখ ত্যাগ করে ভারতকেই তোমার মা বলে মেনে নিতে হবে—পারবে? মার্গারেট অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, পারবো।

স্বামীজী বললেন, সমস্ত ভারতটাই আমার কাছে তীর্থ। মার্গারেট নতুন নামে দীক্ষিত হয়ে প্রার্থনা জানালেন—হে তেজস্বরূপ আমায় তেজ দাও, হে শক্তিস্বরূপ আমায় শক্তি দাও—জীবনব্রত পালনের। স্বামীজী বললেন, সাহস চাই, সাহস। জনসাধারণের আদর্শের মান উন্নত করতে হবে, শিক্ষার ভার নিতে হবে। কাপুরুষকে ঘৃণা করতে, ও দেশের মেয়েরা পারে, বাঙালী মেয়েরা কবে তাদের মত হবে।

ভারতের সেবায় দীক্ষা নিলেন নিবেদিতা। মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করলেন—নিজে ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর মত কৃচ্ছ্রসাধন করে যেতে লাগলেন।...

এরপরে অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেলেন...তারপর একদিন স্বামীজীর মৃত্যু হলো। গভীর দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন, কিন্তু স্বামীজীর অসমাপ্ত কাজের ভার হাতে তুলে নিলেন। স্বামীজী ছিলেন দেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী —ভারতবর্ষে জাতীয়তা বোধের উদ্গাতা। নিবেদিতা আয়র্ল্যাণ্ডের মেয়ে--বিপ্লবের রক্ত তাঁর দেহে।

তারপর এলো স্বাধীনতার লড়াই—। সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা—মনে মনে স্বামীজীর কথা বলতে লাগলেন—আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস এক আকৃতি আর এক সম্প্রীতি হতে জাতীয় একতার উদ্ভব হয়।

নিবেদিতা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারের কাজ করতে লাগলেন।...ভারতের বহু গুণী-জ্ঞানী ও বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এত জ্ঞানলাভ করেছিলেন যে, তখনকার তাঁর সে সব বক্তৃতা তোমরা বড় হয়ে পড়লে, তাকে জানতে পারবে। তাঁর শেষের দিনে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ বসু ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর কাছে দার্জিলিঙে—রায় ভিলায়।

ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতা কি করেছিলেন, ভারতবর্ষকে তিনি কি রকম ভালবেসে-ছিলেন সুদূর আয়র্ল্যাণ্ড থেকে এসে—তাঁর সেসব কথা তোমরা পড়ো, জানো, এ কথাই আজ বার বার বলি।

তাঁর জন্মের একশো বছর পূর্ণ হলো, সারা ভারতে তাঁর শতবার্ষিকী হচ্ছে—তোমরাও যোগদান করো। নিবেদিতার চরিত্র আদর্শ চরিত্র,—জ্ঞানে, কর্মচিন্তায়, শিক্ষাদীক্ষায়—তিনি ধন্য হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুরূপে পেয়ে। তাঁর গুরুভক্তি তোমাদের আদর্শ হোক—এই কথাই আজ বলি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০·৪৫ প
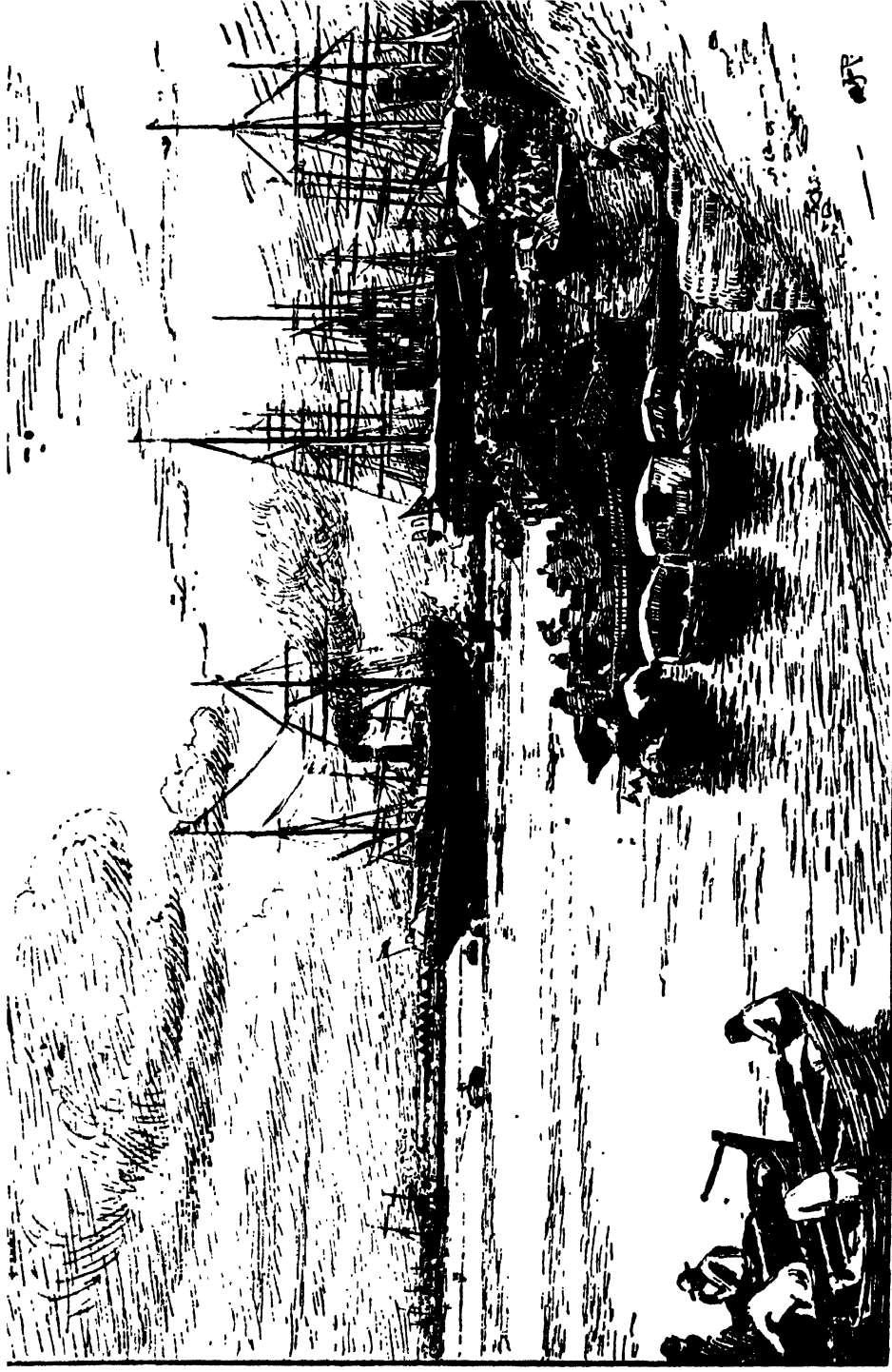
প্রাচীন কলিকাতার জাহাজ ঘাট

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৭শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৭৩ [১০ম সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ফুলবনে ফোটে ফুল কত রঙে গন্ধে,
মৌমাছি গুনগুন পাখার আনন্দে
মৌ লোভে উড়ে যায়, সাথীদের দেয় ডাক,
সে ফুলের মধু দিয়ে গড়ে তার মৌচাক।

অবাক সে মধু-পুরী, মধুপের সংসার :
তাক লাগে রচনার কারিগরি দেখে তার।
খোপে খোপে কত মধু, অলি-গলি, ঘুলঘুলি,
জ্যামিতির ছাঁচে গড়া মোমের মহলগুলি,

সারি সারি ঘর বাড়ী, রাণী-মা'র অন্দর
সকলই গড়েছে সেই মৌমাছি জাদুকর।

আমাদেরও মনো-বনে মনের আনন্দে
কত ফুল ফোটে কত রঙে রসে গন্ধে,
মনের রঙীন অলি এখানেও ঝাঁক ঝাঁক
সে মধুতে রচে কত মাধুরীর মৌচাক।

তাদেরও গোপনে কত অবাকের হাতছানি,
ছবি ছড়া রূপকথা, স্বপনের আমদানি,
কত জানা-অজানার বিস্ময়ে ভরপুর
কত জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরা সেই মধু-পুর।

একবার ঢুকলে সে অবাকের অন্দরে
মৌ-লোভী মশগুল মাধুরীর মন্তরে।

মধুপের চাকে শুধু মধুপেরই অধিকার
এ রসের মৌচাকে সকলেরই অভিসার

"স্বদেশের প্রতি উদাসীন হইয়া যদি স্বীয় পরিবার মধ্যে বসিয়া কেবল পারিবারিক সুখ-শান্তির উপভোগে মত্ত থাকি, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়।"

শিবনাথ শাস্ত্রী—

ভাঙা বোতল

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শহরের গরীব পাড়ায় একখানি পুরানো বাড়ী। তার চিলেকোঠার ঘরে ভাড়া থাকে এক গরীব বুড়ো। তার ঘরের বারান্দায় একটি খাঁচা ঝুলছে। খাঁচার মধ্যে একটি ছোট পাখী। পাখীটি ফুরুৎ ফুরুৎ করে ওড়ে, পিক্‌পিক্ গান গায়। গরীব বুড়ী খাঁচার মধ্যে পাখীর জলখাবার বাটি দিতে পারেনি, একটি বোতলের ভাঙা মুখ ছিপি এঁটে বেঁধে দিয়েছে খাঁচার এক কোণে, মুখটা ওলটানো। তাতেই জল দেওয়া হয় পাখীর জন্য।

বোতলের ভাঙা মুখ পাখীর গান শোনে আর ভাবে—আমার সর্বাঙ্গ ভেঙে আজ শুধু এই মুখটুকুই আছে, ওই পাখীর মত সর্বাঙ্গ আস্ত থাকলে আমিও মনের সুখে গান গাইতে পারতাম। আমার জীবনের ভাল দিন চলে গেছে।

ভাঙা বোতল তার জীবন-কথা ভাবতে থাকে। পাখী গান গায়, ভাঙা বোতল ভাবে। গরম আগুনের ভিতর থেকে সে একদিন বেরিয়ে এলো। তাকে বসিয়ে দেওয়া হলো একসারি বোতলের পাশে। সবাই সেই আগুন থেকে জন্মেছে, সবাই তার ভাইবোন। তারপর তাকে বাক্‌স্-বন্দী করে পাঠিয়ে দেওরা হলো। এক দোকানদার তাকে দিনের আলোয় বের করলো। তাকে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে তার মধ্যে মদ ভরে ছিপি লাগিয়ে দিল। গায়ে সেঁটে দিল কাগজের টিকিট—শ্রেষ্ঠ পানীয়, পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত। খালি হাল্‌কা বোতল এবার ভারী হলো, বোতলের গায় আলো লেগে গোলাপী আভা দেখা দিল। ক'দিন বোতল সাজানো রইল দোকানের সেল্‌ফে। তারপর একদিন তাকে একটি মেয়ে ভরে নিল বাজারের ঝুড়িতে। রুটি মাখন জেলি হলো তার সঙ্গী।

মেয়েটির হাতে ঝুলে ঝুলে কত পথ সে এলো, কত কি দেখলো। রাস্তায় কত রকমারি জিনিস যে আছে, দেখে আর ফুরায় না। মেয়েটি তাকে এনে বসিয়ে দিল টেবিলের রঙীন কাপড়খানির উপর।

খানিক পরে টেবিলের সামনে এসে বসলো একটি ছেলে। তার বাবা ছবি আঁকিয়ে। এবার সে নৌবিদ্যায় পাস করেছে। কাল সে চলে যাচ্ছে জাহাজে চাকরি নিয়ে। ছেলেটি ফিরে এলেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কথাটা পাকাপাকি হয়ে গেল। মেয়েটির বাবা-মা আশীর্বাদ করলেন—সুস্থ দেহে তুমি ফিরে এস।

তারপর খাওয়াদাওয়া হলো। বোতলের ছিপি খুলে সবাইকার গ্লাসে মদ ঢেলে দেওয়া হলো। ছেলেটি বললো এই বোতলে আবার কেউ মদ ভরে বেচুক এ আমি চাই না।

তারপর বোতলটিকে ছেলেটি ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। সেখানে হ্রদের তীরে নলখাগড়ার বনে বোতলটা পড়লো, ভাঙলো না। বোতল সেখান থেকে শুনতে পেল

ছেলেটি ও মেয়েটি গান গাইছে। তবে সেই নলখাগড়ার বন থেকে সে তাদের আর দেখতে পেলে না। গান চললো অনেকক্ষণ।

কোন এক সময় সেখানে দুটি ছেলে এলো। নলখাগড়ার বনে বোতলটি দেখতে পেয়ে তারা সেটি বাড়ী নিয়ে গেল। তাদের বড় ভাই জাহাজে চাকরি করে, সেইদিন জাহাজ ছাড়বে। মা তার জামাকাপড় খাবার গুছিয়ে দিলেন। বোতলটিতে তিনি ভরে দিলেন হজমী মদ। বাবা সব কিছু নিয়ে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল জাহাজ ঘাটায়। বোতল এসে উঠলো জাহাজের কেবিনে। এবার বোতল ছেলেটিকে দেখতে পেল, দেখেই চিনলো। এ সেই ছেলেটি, যার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথা পাকা হলো, বোতলকে যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নলখাগড়ার বনে। সবাই তাকে ডাকে পিটার বলে।

পিটারের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে শুনে সঙ্গীরা ভারী খুশী হলো। জাহাজে সেই রাতে সঙ্গীরা এক ভোজ দিল, বোতল খালি হয়ে গেল সেই রাতেই। তারপর খালি বোতল পড়ে রইল কেবিনের কোণে।

ক'দিন পরে ঝড় উঠলো। জাহাজ দুলতে লাগলো। পাল ছিঁড়ে গেল। জাহাজের গায় ফুটো হয়ে জল ঢুকতে লাগলো। পাম্প করে সে জল আর বের করা যায় না। জাহাজ এবার ডুববে। পিটার একখানি কাগজে লিখলো—আমরা ডুবলাম, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তারপর তার নাম আর জাহাজের নাম লিখে সেই কাগজখানি ভাঁজ করে, খালি বোতলটির মধ্যে ভরে, শক্ত করে ছিপি এঁটে সে ভাসিয়ে দিল জলে। তারপর জাহাজখানি ধীরে ধীরে ডুবে গেল।

ঝড় থামলো। সকালে সূর্য উঠলো। বোতল তখন জলের উপর ভাসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে ভেসে চললো। হাঙরে গিলে খেল না, পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙলোও না।

শেষে জাহাজ এসে পৌঁছল এক দেশে। সেখানকার মানুষ বোতলটিকে জল থেকে তুলে ভিতরের কাগজখানি বের করলো, কিন্তু কেউ সেই লেখা পড়তে পারলো না। কাগজখানি আবার বোতলের মধ্যে রেখে লোকটি বোতলটিকে বাড়ী নিয়ে এলো। রেখে দিল একটা সেল্‌ফের উপর।

বাড়ীতে কেউ এলেই কর্তা সেই কাগজখানি বের করে তাকে পড়তে দেয়, কিন্তু কেউই পড়তে পারে না। পেনসিলের লেখা, দিনে দিনে ঝাপসা হয়ে আসে। বোতল সাজানো থাকে সেল্‌ফের উপর। তারপর সেখান থেকে একদিন মাচার উপর তুলে রাখা হয়, অদরকারী জিনিসের মধ্যে। দেখতে দেখতে বোতলের গায় ধুলো জমে, মাকড়সা জাল বোনে চারিপাশে।

'সেই পাকা দেখার দিন আমি একটা চাঁপার গাছ পুঁতেছিলাম।' পৃঃ ৪৫০

বিশ বছর বোতল পড়ে রইলো সেইখানে। এবার বাড়ী সারানো হবে। মাচা সাফ করতে গিয়ে বোতলটা পাওয়া গেল। এবার তারা কাগজখানিকে ফেলে দিয়েবোতলটিকে পরিষ্কার করে ধুয়েফেললো। তারপর তারা কি একটা ফসলের দানা ভ'রে, বোতলটিকে পাঠিয়ে দিল এক জায়গায়।

এবার যেখানে বোতল এসে পড়লো, সেখানকার মানুষ বোতল হাতে নিয়েই তার ভিতরের দানাগুলি ঢেলে নিলে। তারপর খালি-বোতলটি রেখে দিল এক পাশে।

ক'দিন পরে বাগানে এক উৎসব হলো। গাছে গাছে কাগজের লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। লাল নীল রঙের আলোয় বাগান রঙীন হয়ে উঠলো। তার উপর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। পথের দু'পাশে বোতলের মুখে মুখে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হলো। সেই আলোর মালার পথ দিয়ে এলো বর আর কনে। তাদের পিছনে আরো কত লোক। বর-কনেকে দেখেই বোতলের মনে পড়লো কতদিন আগের সেই পাকা দেখার কথা। এ যেন সেই মেয়ে, আর সে-ই যে বর জাহাজে চলে গেল, সে কি আবার ফিরে এলো নাকি? সে জাহাজ তো ডুবে গেল। সে বর কি প্রাণে বেঁচেছে? সেই বর-কনে এতদিনেও কি এমন বয়সের থাকবে?

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবার শেষে এলো একটি মেয়ে। তার মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু তার মুখ দেখেই বোতল চিনলো, এ সে-ই মেয়ে, সেই প্রথম দিনের পাকা দেখার।

মেয়েটি কিন্তু বোতলকে চিনতে পারলো না। নলখাগড়ার বনে বোতলকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা সে ভুলে গেছে।

অনেক রাতে বিবাহ-উৎসব শেষ হলো। পরদিন সকালে বোতলকে নিয়ে গেল এক দোকানদার। আবার তাতে মদ ভরে বিক্রী করা হলো। এবার তাকে কিনলো এক আকাশ-যাত্রী।

আকাশ-যাত্রী বেলুনে উড়লো। বোতলকে নিল বেলুনের নীচে বাঁধা ঝুড়িতে। তার সঙ্গে নিল একটি খরগোশ। উপরের বেলুনটা ধীরে ধীরে গ্যাসে ভরে উঠলো। আকাশ-যাত্রী ঝুড়িতে উঠে পড়লো। বাঁধন কেটে দেওয়া হলো। নীচে বাজনা বেজে উঠলো। চারিপাশে দর্শকেরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। বেলুন আকাশে উঠতে সুরু করলো।

অনেক উপরে উঠে আকাশ-যাত্রী একটি প্যারাচুট খুলে খরগোশটিকে নামিয়ে দিল। তারপর বোতলটি খুলে সে মদটুকু পান করলো এবং খালি বোতলটা মাথার উপর ছুড়ে দিল। বোতল শাঁ শাঁ করে নীচে নামতে লাগল। খরগোশ তখনও নামছে, বোতল তাকে পার হয়ে গেল। বোতল শূন্যে কয়েকবার ডিগ্‌বাজি খেল। নীচের ঘরবাড়ীগুলি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেলুনটা তখন অনেক উপরে। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে বোতল এসে পড়লো এক ছাদের উপর। পড়েই ভাঙলো। টুকরোগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে। ছাদ থেকে উঠানে পড়ে আবার ভাঙলো। শুধু আস্ত রইল বোতলের গলাটা। সেটা কুড়িয়ে নিল ঝাড়ুদার। বললো—এটা পাখীর জলখাবার গেলাস হয়।

ঝাড়ুদারের পাখী ছিল না। বোতলের ভাঙা মাথাটা সে দিয়ে গেল চিলেকোঠার বাসিন্দা বুড়ীকে। বুড়ী বোতলের মুখে ছিপি লাগিয়ে, উল্টো করে বেঁধে দিল পাখীর খাঁচায়। তাতে জল দিল। পাখী জল খায়, ওড়ে, আর পিকপিক করে গান গায়। ভাঙা বোতল শোনে।

বুড়ীর ঘরে লোক আসে। তার মেয়ের বিয়েতে বুড়ীকে নিমন্ত্রণ করে। বুড়ী বলে, তোমার মেয়েকে আমি দোব, একটা চাঁপাফুলের তোড়া। চাঁপা রঙ আর গন্ধ আমি ভারী ভালবাসি। আমার পাকা দেখার দিন তুমিও আমাকে চাঁপার তোড়া দিয়েছিলে। বিয়ের কথা ছিল, কিন্তু বিয়ে তো হলো না। পিটার সেই জাহাজে গেল আর তো ফিরলো না। সেই পাকা দেখার দিন আমি একটা চাঁপার গাছ পুঁতেছিলাম, সেই গাছ এখন ফুলে ফুলে ভরে গেছে। সেই ফুলের তোড়া দোব তোমার মেয়ের বিয়েতে। সেই গাছের ফুল আমি ফুটিয়েছিলাম বিয়ের দিনে সবাইকে উপহার দোব বলে।

এবার ভাঙা বোতল বুড়ীকে চিনলো। বুড়ী কিন্তু বোতলকে চিনলো না। সে তাকিয়ে রইল উঠানের চাঁপা গাছের পানে। ভাবতে লাগলো পুরানো দিনের কথা।*

---

* হানস্ এণ্ডারসেনের রূপকথা।

পৃথিবী ও বিজ্ঞান

শ্রীঅমরনাথ রায়

কবি বলেছেন : 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'...

কবির এ উক্তির সঙ্গে আশা করি তোমরাও একমত হবে। তাই না?

আচ্ছা, ভাব দেখি একবার আমাদের এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা। যতই ভাববে ততই অবাক হবে। কোথাও দেখবে অতি উচ্চ পর্বতমালা। বরফে ঢাকা তাঁর চূড়াগুলি। রোদ পড়ে সোনার মত দেখাচ্ছে। সূর্য কিরণের তাপে সে বরফ যাচ্ছে গলে। বরফ-গলা জলে সৃষ্টি হচ্ছে নদী। কাচের মত স্বচ্ছ সেই নদীর জল পাহাড়ের বুক বেয়ে তর তর করে নেমে এসে কুলকুল রবে ছুটে চলেছে সমতলভুমির পানে। কত নগর, কত গ্রাম পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল ছোটার পর সে নদী হচ্ছে ক্লান্ত। মিশছে সে সাগরে গিয়ে। কত নদ-নদী আর তাদের শাখানদী উপনদী এমনিভাবে এই পৃথিবীর বুক চিরে অনাদিকাল ধরে ছুটে চলেছে। তাদের জলে পৃথিবীর শুকনো মাটি সরস হয়েছে—উর্বর হয়েছে। তাই তো পৃথিবীর সেই উর্বর মাটিতে আজ এত সবুজের সমারোহ। ফলে-ফুলে-শস্যে পৃথিবী আজ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত।

পৃথিবীর এই শ্রীমণ্ডিত রূপ কিন্তু সর্বত্র তোমরা দেখতে পাবে না। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ মরুভূমি গ্রাস করেছে পৃথিবীর অনেকটা অঞ্চল। সে অঞ্চলে গিয়ে দাঁড়াও একবার। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখ। দেখবে শুধু বালি আর বালি। গাছপালা বিরল, বিরল জল—প্রাণিরাও বিরল সেখানে। প্রকৃতি সেখানে রুক্ষ। তাই তো বলি পৃথিবীর রূপ কোথাও কোমল, কোথাও বা কঠোর। আর এই কোমলে-কঠোরে রূপই পার্থিব সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য।

রূপময় এই পৃথিবীর মাটিতেই আমাদের বাস। কাজেই এই পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত সবার আগে আমাদের জানা দরকার। এসো আজ সেই কাহিনীই প্রথমে শোনাই তোমাদের।

পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিন্তু মতভেদ আছে। তা থাক। অধিকাংশ পণ্ডিতে যে মতটি স্বীকার করে নিয়েছেন, তার কথাই তোমাদের বলব।

সে কোন্ আদ্যিকালের কথা। ইতিহাস তার কোন সাক্ষ্যই দেয় না—দিতে পারে না। যাক সেই আদ্যিকালেও সূর্য ছিল—ছিল আকাশের ঐ অগণিত গ্রহনক্ষত্রের দল। সেই কালের কোন এক শুভদিনে মহাকাশে এক অঘটন ঘটে যায়। মস্তবড় একটা নক্ষত্র মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমাদের অতি-পরিচিত সূর্যদেবের কাছে এসে পড়ে। সূর্যদেব যে বিরাট আকৃতির তা তো তোমরা জানই। তবুও আর একবার বলি। সূর্যের

ব্যাস প্রায় আট লক্ষ ষাট হাজার মাইল। ভাব দেখি একবার—সূর্যের কেন্দ্রবিন্দু বরাবর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের এই বিরাট দূরত্বের কথা! কিন্তু যে নক্ষত্রটির কথা বলছি সেটি সূর্যের থেকেও বহুগুণ বড়। এত বড় যে তার আকৃতিটা কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য।

যাই হোক এই বিরাটাকৃতির নক্ষত্রটি যখন সূর্যের কাছে এসে পড়ল, তখনই ঘটল সেই অঘটন। কি অঘটন বল দেখি? হ্যাঁ—ঐ বিরাট নক্ষত্রটির আকর্ষণে সূর্যের দেহের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, ঐ বিরাট নক্ষত্রটির গতিবেগ ছিল খুব বেশী। তার ফলে কি হলো জান? সূর্যের দেহ থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হতে হতেই বিরাট নক্ষত্রটি সূর্য থেকে বহু দূরে সরে গেল। সূর্যের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হলো, কিন্তু তা ঐ বিরাট নক্ষত্রের আকর্ষণের আওতার বাইরেই রয়ে গেল। তখন উপায়? উপায় আর কি। পিতা সূর্যদেব তো কাছেই রয়েছেন। তাঁর আকর্ষণে তাঁর চারপাশেই সে ঘুরতে আরম্ভ করে দিল। ঘুরতে ঘুরতে সে আবার নয়টি বড় অংশে আর বহু ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ঐ নয়টি বড় অংশের মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী।

যখনকার কথা বলছি তখনও সূর্য ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। এখনও অবশ্য তাই। তাই সূর্যের দেহ থেকে সৃষ্ট পৃথিবীও আবির্ভূত হলো জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডরূপে। তারপর যতই দিন যেতে লাগলো—জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডরূপী পৃথিবী ধীরে ধীরে তার তাপ বিকিরণ করে শীতল হতে থাকলো। তোমরা তো জানই যে, গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হলেই তরল হয়ে যায়। কাজেই পৃথিবীও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে তরল রূপ ধারণ করল। তরল পৃথিবী তখনও কিন্তু প্রচণ্ড গরম। গরম দুধ বাটিতে রাখলে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় তার ওপর যেমন পুরু সর পড়ে, তেমনি পৃথিবীর তরল পদার্থের ওপরেও ক্রমে পুরু একটি স্তর গড়ে উঠলো। আরও পরে ঐ তরল অংশ গোলাকার রূপ ধারণ করে কঠিন পৃথিবীতে পরিণত হলো।

পৃথিবীর ওপরকার এই যে স্তর—এরই নাম ভূপৃষ্ঠ। এই ভূপৃষ্ঠের ওপরেই রয়েছে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, উপত্যকা ও সমভূমি। এই ভূপৃষ্ঠের ওপরেই বসবাস করছি আমরা।

ভূপৃষ্ঠের ওপরে রয়েছে মাটি আর সেই মাটিতেই মানুষের বাস। পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে মাটি ছিল না। তবে হ্যাঁ—পরে জল সৃষ্টি হয়েছিল, আর সৃষ্টি হয়েছিল পাহাড়। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে মাটি সৃষ্টির মূলে আছে পাহাড়।

পাহাড়—শিলাময়। দিনে প্রখর সূর্যতাপে পাহাড়ের শিলা উত্তপ্ত হয়। কঠিন জিনিস উত্তপ্ত হলে আয়তনে বাড়ে—এইটাই সাধারণ নিয়ম। সেই জন্যে পাহাড়ের শিলাও তাপ পেয়ে দিনে আয়তনে বাড়ে, আবার রাতে তাপ বিকিরণ ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তখন শিলার আয়তন কমে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনিভাবে আয়তন বাড়া ও কমার ফলে শিলা যায় ফেটে।

পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক কারণে ওঠে ঝড়। প্রচণ্ড তার শক্তি। প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে পাহাড়ের ঐ ফেটে যাওয়া শিলাখণ্ডের অনেকেই এখান থেকে ওখানে উড়ে যায়। কতক শিলা ধাক্কা খায় পাহাড়ের গায়েই। প্রচণ্ড ধাক্কায় শিলাখণ্ডগুলি ভেঙে যায়—গুঁড়িয়ে যায়। শিলা চূর্ণ কিন্তু থাকতে পারে না এক জায়গায়। জল আর বাতাসের দ্বারা বাহিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আবার শিলার অনেক উপাদান বৃষ্টির জলে ধীরে ধীরে গলে যায়। তাতে শিলার শক্ত বাঁধনটুকু নষ্ট হয়। শিলা নরম হয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ো হয়ে যায়।

এ ছাড়া নদীর স্রোতও অনেক শিলাখণ্ডকে বয়ে নিয়ে যায়। নদীর বুকে ক্রমাগত গড়িয়ে যেতে যেতে সেই শিলাখণ্ডগুলি ঘষা লেগে ক্ষয়ে যায়। ক্ষয় পেতে পেতে তারা পরিণত হয় বালিতে। কাজেই বালি শিলাচূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পাকা গাঁথনির বাড়ী, খুবই মজবুত বাড়ী। তবুও সেই গাঁথনির ফাঁকে অনেক সময় আমরা বট, অশ্বত্থ বা ঐ রকম কোন কোন গাছকে জন্মাতে দেখি। তাতে কি হয় বল দেখি? শক্ত গাঁথনির বাড়ী দুর্বল হ'য়ে একদিন ধ্বসে পড়ে।

শিলাময় পাহাড়ের গায়েতেও আমরা অনেক উদ্ভিদ জন্মাতে দেখি। সেইসব উদ্ভিদ তাদের শিকড় ঢুকিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ের ফাটলের মধ্যে। তার ফলে চাড় পেয়ে পাহাড়ের কঠিন শিলা গুঁড়া হয়ে যায়।

কতরকমভাবে শিলা যে চূর্ণ হতে পারে সেকথা এতক্ষণ বল্লাম। এইসব শিলাচূর্ণের সঙ্গে নানারকম জৈবপদার্থ মিশেই তৈরি হয় মাটি। আর সেই মাটিতেই বাস করি আমরা।

উৎপত্তিস্থান অনুসারে মাটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা—বাহিত মাটি আর প্রাথমিক মাটি। অনেক সময় মাটি তার জন্মস্থান থেকে ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য জায়গায় এসে পড়ে। সেই মাটিকেই আমরা বলি বাহিত মাটি। পৃথিবীতে বাহিত মাটির পরিমাণই বেশী। কিন্তু যে মাটি তার আদি জন্মস্থানে আজও পড়ে আছে, সে মাটি প্রাথমিক মাটি। প্রাথমিক মাটির রং সাধারণতঃ একটু কালো হয়। এই বাহিত মাটি আর প্রাথমিক মাটি দিয়েই গড়া ভূপৃষ্ঠের ওপরটা—আমাদের আবাসস্থলটা।
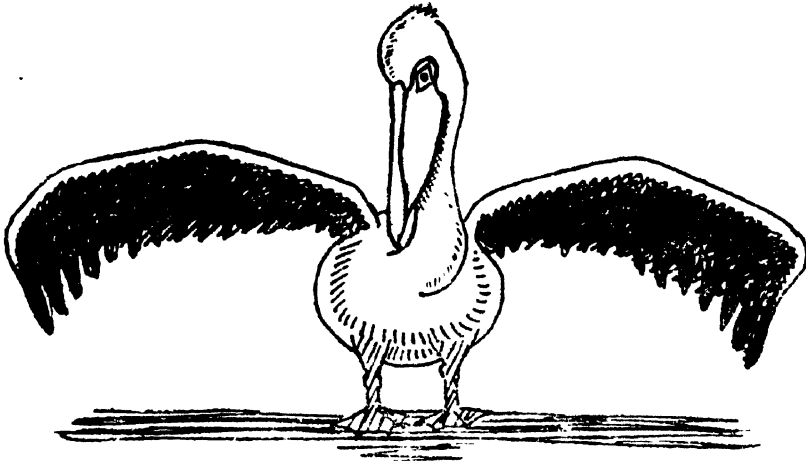
চুহুলিকা আর পেলিক্যান

শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

সেদিনটা ছিল রবিবার, আর সেই দিনই প্রথম ঠাণ্ডা পড়ে বোঝা গেল যে হ্যাঁ শীত এসেছে। ব্যস্‌ আর যায় কোথা? একে ছুটি তায় ঠাণ্ডা, দাদুর আর চুহুলিকার একসঙ্গে মনে হল যে আজ চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। ('চুহুলিক' বইখানা যারা পড়েছ, তারা নিশ্চয়ই জানো, যে কি করে নাতনীর ঐ নাম দিয়েছিলেন দাদু।)

চিড়িয়াখানায় যেতে চুহুলিকা চিরকালই ভালবাসে, কিন্তু যবে থেকে লাহিড়ীমশাই তার ভিতরে আরও একটা ছোটদের চিড়িয়াখানা বানিয়ে দিয়েছেন, তবে থেকে তো আর কথাই নেই, চুহুলিকা পায় যদি তো সেইখানেই থেকে যেতে রাজী! হরিণছানা, ভালুক-ছানা তো আছেই, কিন্তু সব থেকে ভাল লাগে তার ভেড়ার ছানাগুলি, বিশেষ করে যখন তারা বোতলে করে দুধ খায়। আবার লাহিড়ীমশাই একটা হাতির ছানা আনাবার ব্যবস্থা করছেন, সেটা এলে না জানি কি হবে!

সেদিন কিন্তু মঞ্জরী যাবে না সঙ্গে। মামী হলেও আর এম, এ, ক্লাসে পড়লেও চুহুলিকা তাকে সমবয়সীই মনে করে। সে ছেলেবেলায় তাকে 'মঞ্জি' বলে ডাকতো। বড়, মিষ্টি হত শুনতে, কাজেই ঐ নামটার চলন এখনও আছে। চুহুলিকা বলল, 'চলো না মঞ্জি কেন যাবে না তুমি চিড়িয়াখানায়?' মঞ্জি বলল, 'না চুহু, আমার যে পরীক্ষা এসে গেল।' চুহুলিকা বলল, 'বা রে! এই যে মা বলছিলেন যে, কলেজ বন্ধ আছে বলে তোমার পরীক্ষা পেছিয়ে যাবে?' মঞ্জি বলল, 'তা যাবে, কিন্তু আমার যে অনেক পড়া বাকি আছে।' চুহুলিকা জিগেস করল, 'কি পড়া মঞ্জি, Spelling (স্পেলিং)?' তার এই প্রশ্নে সকলে জোরে হেসে ওঠাতে সে আর মঞ্জরীকে যাবার জন্য জোর করতে পারলো না। আবার মঞ্জরী যাবে না বলে, চুহুলিকার মা আর দিদিমাও তাকে বাড়িতে একলা ফেলে যেতে

রাজী হলেন না। শেষ অবধি চুহুলিকা আর তার ছোটবোন চৈতালীকে নিয়ে দাদু একলাই বেরিয়ে পড়লেন।

এর আগের বারে ওঁরা, ক্যাঙারুর দিকটা দেখা হয়েছিল বলে এবার অন্য দিকটায় যাওয়া হল। পথে দুই বোনকে দাদু দুটো 'ক্যাণ্ডি ফ্লস্' কিনে দিলেন। এইটা আর আইসক্রীম খাওয়াটা চিড়িয়াখানায় আসবার আরও একটা মজা।

হিপোপোটেমাসদের (যাকে চৈতালী বলে হিপোট মাছ) কাছে তাঁরা যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাদের খাবার সময় হয়েছে। তাই বোধ হয় দাদুকে দেখে একটা বড় হিপো হাঁ করে খাবার চাইলো। চুহুলিকা আগে হিপোর হাঁ করা দেখেনি বলে আশ্চর্য হয়ে নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'বাপরে বাপ, কত বড় হাঁ দাদুভাই !' দাদু একটা কলা হিপোর মুখে ফেলে দিলেন, কিন্তু সে হাঁ করেই রইলো। চারটে কলা আরও ছিল দাদুর হাতে; তাই থেকে তিন হাতির জন্য তিনটে রেখে, আরও একটা কলা দিলেন হিপোকে। মোটে দুটো কলায় হিপোপোটেমাসের কি হবে ? সে তবুও হাঁ করে রইল! দাদু তখন চৈতালীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চৈ, তোমার 'ক্যাণ্ডি ফ্লস্'টা দেবে হিপোট মাছকে ?' চৈ তার হাতটা হিপোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'একটু কামলে নাও, ছবটা খেও না।' অতবড় মুখ দিয়ে সিকিখানা ক্যাণ্ডি ফ্লস্ থেকে হিপো কেমন করে একটুখানি কামড়ে নেবে তা কল্পনা করতে গিয়ে দাদু আর চুহুলিকা দুজনেই জোরে হেসে উঠলেন।

'বিজলী', 'শাহজাদী' আর 'সম্বারী' এই তিন হাতিকে তিনটে কলা খাইয়ে আর তাদের সামনের 'স্টল' থেকে নিজেরা আইসক্রীম খেয়ে, বাড়ি ফেরবার পথে চুহুলিকা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, তার পকেটে তখনও গোটা কতক চীনেবাদাম আছে। কাজেই কি আর করা, জলের ধারে হাঁসদের কাছে দাঁড়াতেই হল তাঁদের।

সেখানে একটা পেলিক্যান দাঁড়িয়ে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে কেবল নিজের গা চুলকাচ্ছিল। তাকে দেখে চুহুলিকা বলল, 'ঐ পেলিক্যানটাকে দাও না দাদুভাই, ওর খাওয়া আমি কখনও দেখেনি।' দাদু একটা চীনাবাদাম ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু পেলিক্যানটা সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। হয়তো সে দেখতে পায়নি এই ভেবে, দাদু আরও একটা চীনেবাদাম ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। সেটা গিয়ে লাগল পেলিক্যানটার লম্বা ঠোঁটে। সে তো চমকে উঠে এমন ল্যাগব্যাগ করতে লাগলো যে, চুহুলিকা আর কিছুতেই তার হাসি থামাতে পারে না। কিন্তু একটু পরে যেই পেলিক্যানটা তার দিকে কটমট করে তাকালো, অমনি তার হাসি বন্ধ! যেন সে ভীষণ রেগে আছে, এমনি মুখের ভাব আর দেহের ভঙ্গী করে সে পাশ ফিরে দাঁড়ালো যেন চুহুলিকাকে আড়চোখে দেখছে। আরও ক'টা চীনেবাদাম দিলেন দাদু তাকে, কিন্তু সে একটাও খেল না, কেবল কটমটিয়ে তাকালো একবার দাদুর দিকে।

চুহুলিকা জিগেস করল, 'ও খাচ্ছে না কেন দাদুভাই ? আর ও রাগ করছে কেন ?' দাদু জবাব দিলেন, 'ও মাছ খায় বলে ওর মাথায় খুব বুদ্ধি কিনা তাই ও নিজেকে মস্ত পণ্ডিত মনে করে। এ হেন পণ্ডিতের গায়ে চীনেবাদাম ছুড়ে মারা হয়েছে বলে ও চটে গেছে।' চুহুলিকা বলল, 'তুমি তো আর ইচ্ছে করে ওর গায়ে মারোনি, এটা তো ওর বোঝা উচিত ?' দাদু বললেন, 'নিজেকে বড় কি বিদ্বান মনে ক'রে অহংকার করলেই ওই হয়, মানুষ আর কোনও ব্যাপর হাল্কা ভাবে নিতে পারে না আর মন খুলে হাসতেও পারে না।' চুহুলিকা বলল, 'হ্যাঁ দাদুভাই, পেলিক্যানকে আমি কখনও হাসতে দেখিনি, ওর নাম হওয়া উচিত "রামগরুড়ের ছানা"।

দাদু বললেন, 'তা বটে, তবে যখন ওর হাঁসের মতন শরীর আর সারসের মতন ঠোঁট, তখন "বকচ্ছপের" মতন ওর নাম হওয়া উচিত "হাঁসারস"। চুহুলিকা বলল, 'কিন্তু ও যে হাসতে জানে না! তা ছাড়া ওর ঠোঁটটা শুধু লম্বাতেই সারসের মতন, কিন্তু ওর তলায় যে মস্ত থলি আছে তেমন তো সারসের নেই।' দাদু বললেন, 'তাও ঠিক। আর কার থলি আছে ?' চুহুলিকা জবাব দিল, 'ক্যাঙারু।' দাদু বললেন, 'ঠিক বলেছ ভাই, কিন্তু হাঁসারসের সঙ্গে ক্যাঙারুর যোগ হবে কি করে ? "হাঁসারস্ক্যাঙারু" তো আর হতে পারে না ?' চুহুলিকা বলল. 'তা হলে ওর নাম হওয়া উচিত „কিম্ভূত"।' দাদু খুসি হয়ে চুহুলিকার পিঠ চাপড়ে বলেন, 'সাবাস ভাই! আজ সুকুমার রায় থাকলে তিনি তাঁর 'আবোল-তাবোল' লেখা সার্থক মনে করতেন। তুমি মাছ খেতে ভালবাসনা তাতেই তোমার এত বুদ্ধি, পেলিক্যানের মতন মাছ খেলে না জানি কি হবে!'

বাড়ি ফিরে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে চুহুলিকা আর চৈতালীকে তাদের মা ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলেন, আর দাদুও বাগানে গাছের তলায় একটা আরাম চেয়ারে লম্বা হলেন। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু ঘুম তাঁর এলো না, কেবল পেলিক্যানের কথা তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগলো। শেষকালে তিনি খাতা আর কলম টেনে লিখলেন:—

সব পাখিদের থেকে বদরাগী পেলিক্যান
মোরে দেখে রেগে বলে, 'আইসক্রীম খেলি ক্যান ?'
দিনরাত উসখুস ঠোঁট দিয়ে পালকে
শুধু তারা চুলকায়, শিশু, বুড়ো, বালকে।
(সুবিধাও আছে বেশ, গলা তার লম্বা
পাকা তিন ফুট হবে, কিছু বেশী কম বা।)

মনে হয় কামড়েছে ছারপোকা পিস্‌সু,
আসলেতে ওরকম হয়নিক কিস্‌সু।
ঠোঁটের তলায় তার থলি আছে মস্ত
মাছেরা তাহার ভয়ে একেবারে ত্রস্ত।
ডাক শুনে মনে হয় বাজে জগঝম্প
মাছেদের বুকে লাগে থরহরি কম্প।
কখনও সে জলে থাকে কভু থাকে ডাঙাতে
ওস্তাদ তার মত নেই চোখ রাঙাতে।
মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকায় সে আকাশে
ভাব দেখে মনে হয় বুদ্ধিতে পাকা সে।
ভয়ানক গম্ভীর, হাসবে না কিছুতে
ওকে দেখে নিজে থেকে মাথা হয় নিচুতে।
উপদেশ নিতে গিয়ে করি কত চেষ্টা
হাতে পায়ে ধরে তার, খুশী হয়ে শেষটা
শুধু একদিন হেসে বলেছিল, 'বৎস,
বুদ্ধিটা পাকা হবে খাও যদি মৎস্য !'

মনে রাখার মত

"মায়ের চেয়ে ভাববার জন সংসারে আর কেউ নেই। তার দেহ, স্নেহ, মন, তার প্রবৃত্তি, তার ইহ-জীবন, সন্তানের লালনের জন্যই গঠিত। সন্তানের শুভকামনা করেই মায়ের সুখ !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ক্রিসমাস ট্রি

শ্রীঅমল সেন

বড়দিন হয়ে গেল। মহামানব যীশুখৃষ্টের ভক্ত ও খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে বড়দিনের উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোক আছেন, তাঁরা এ উৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে পালন করেন। তাঁদের কাছে বড়দিন সবচেয়ে পবিত্র দিন। কারণ যীশুখৃষ্ট এই পুণ্যদিনে অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দুঃখ-বেদনা, অসাম্য ও অত্যাচার তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন, মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেবার মহৎ ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের জীবনে। কিন্তু মানুষ সেদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিল, তাই তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল কাঁটার মুকুট, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করেছিল। সেদিন যারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, ইতিহাস থেকে তাদের নাম আজ নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। কিন্তু যীশুখৃষ্ট আজও অমর, আজও তিনি বেঁচে আছেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মনে। তিনি আজ শুধু কেবল খৃষ্টানদের কাছেই পূজো পান না, তাঁকে পূজো করে সারা

পৃথিবীর লোক। বড়দিন আজ সকল মানুষের উৎসব, বিশেষ ক'রে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত যারা তারা তাঁকে বেশী ক'রে চায়, অন্তরের শ্রদ্ধা জানায়, ভক্তিনম্র চিত্তে তাঁকে স্মরণ করে।

বড়দিনের উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হলো আলোকমালায় সুসজ্জিত ক্রিসমাশ ট্রি। কবে, কোথায়, কিভাবে প্রথম এর সৃষ্টি হয়েছিল কেউ তা সঠিক বলতে পারে না। কিন্তু ক্রিসমাশ ট্রি'কে যত পুরনো কালের ব'লে আমরা মনে করি, আসলে কিন্তু তা তত পুরনো কালের নয়। ক্রিসমাশ ট্রি'র যে আলো-ঝলমল রূপ আজ আমরা দেখতে পাই তার প্রথম সূচনা হয়েছিল জার্মানীর অন্তর্গত রাইন প্রদেশে। জার্মানী থেকে ক্রিসমাশ ট্রি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে প'ড়ে বড়দিনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং আজও পর্যন্ত খোদ জার্মানীতে বড়দিনের উৎসবে ক্রিসমাশ ট্রি'র স্থান সবার আগে। জার্মানীতে এখনও বড়দিনের উৎসব সবচেয়ে সুন্দর এবং মনোরম। কিন্তু তোমরা শুনে অবাক হবে যে, জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি গ্যেটে অথবা স্বাধীনতার পূজারী কবি শিলার জীবনে কখনো ক্রিসমাশ ট্রি'র নামও শোনেন নি, চোখে দেখা তো দূরের কথা—তাঁদের জীবন-কালে ক্রিসমাশ ট্রি কাকে বলে কেউ জানতোই না। লিসোলেট ফন্ ডার ফাল্জ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সবপ্রথম ক্রিসমাশ ট্রি'র উল্লেখ করেন। ক্রিসমাশ ট্রি'র এই হলো ইতিহাস।

জার্মানীতে ক্রিসমাশ ট্রি সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপকথার গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হলো এই : জার্মানীতে সেবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সারাদিনই প্রায় আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, আর শো শো ক'রে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। মানুষ শীতের দাপটে অস্থির। এমনি এক শীতের সন্ধ্যায় শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় জমে যাবার মতো অবস্থা হ'য়ে একটি ছোট ছেলে এক কাঠুরের ঘরের জানালার কাছে এসে আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়লো। কাঠুরে এসে দরজা খুলে দিল, দেখলো, একটি ছোট ফুটফুটে সুন্দর ছেলে শীতে থরথর করে কাঁপছে। তার গায়ে শীতবস্ত্র কিছু নেই। কাঠুরে ছেলেটিকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপরে বসিয়ে দিল, তারপর গরম কাপড় দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল, আর তাকে পেট ভুরে খাবার খেতে দিল। ছেলেটি ছিল ভয়ানক ক্ষুধার্ত,—বোধ হয় সে সারাদিন কিছুই খেতে পায়নি। ছেলেটিকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ ক'রে তুলে, নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, কাঠুরে তার ছেলে-মেয়ে-বউকে নিয়ে উনুনের কাছে একটা শক্ত কাঠের বিঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটালো।

কাঠুরের জন্য একটা অতিবড় বিস্ময় তখনও অপেক্ষা ক'রে ছিল।

পরদিন।

ভোরবেলায় কাঠুরে আর তার পরিবারের লোকেরা ঘুম থেকে উঠে দেখলো, আগের রাত্রে যে দুঃস্থ ক্ষুধার্ত ছেলেটিকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল, সেই অচেনা-অজানা ছেলেটি কখন ঘুম থেকে উঠেছে কেউ জানে না। ছেলেটিকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল, বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। ছেলেটির সে দরিদ্র চেহারা আর নেই। তার বদলে তার গায়ে এখন রঙীন ঝলমলে সুন্দর আর বহু মূল্যবান পোশাক, সে পোশাক থেকে সোনালী আলোর আভা ফুটে বেরুচ্ছে। একজন দেবদূতের মতো সে ধীর গম্ভীর পায়ে কুটীরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একটা 'ফার' গাছের নীচে দাঁড়ালো, তারপর সেই 'ফার' গাছ থেকে একটা কচি পল্লব ভেঙে এনে সেটি কাঠুরের হাতে দিয়ে বললো, "আমি শিশুরূপে যীশুখৃষ্ট। তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ, ঘুমোবার জন্যে বিছানা দিয়েছ। তোমার আন্তরিক সেবা ও পরিচর্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে আমি এই 'ফার' গাছের পল্লবটি পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে যাচ্ছি। এটি তোমার পরিবারের কল্যাণ করবে। এই পল্লবটি বড় হয়ে একটি মহীরুহে পরিণত হবে এবং এত অজস্র ফল উৎপন্ন হবে এই গাছে যে, তোমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তোমরা নিজেরা সে ফল ভোগ করবে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদেরও দিতে পারবে।" এই বলে সেই দেবমূর্তি অদৃশ্য হলো।

আসলে যা ঘটেছিল তা হলো এই : সেই 'ফার' গাছের পল্লব থেকে একটা অঙ্কুর বের হয়ে সত্যিই বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো। সেই মহীরুহই হলো ক্রিসমাশ ট্রি। সোনালী রঙের আপেল আর রুপোলী বাদামের ভারে সেই গাছ প্রায় মাটির কাছাকাছি পর্যন্ত নুয়ে পড়তো। প্রতি বছরই বড়দিনের উৎসবের সময়ে গাছটিতে ফল জন্মাতো।

কবিরা এই রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত ক্রিসমাশ ট্রি'র জন্ম কথাকেই সগর্বে গানে এবং কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে কবে যে ক্রিসমাশ ট্রি'র প্রথম জন্ম হয়েছে তা কেউই জানে না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও যে বড়দিনের উৎসবে ক্রিসমাশ ট্রি ব্যবহৃত হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গেইলার ফন্ কেইসারবার্গ এবং সেবাস্তিয়ান ব্র্যাণ্ট নামে দু'জন ভদ্রলোক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে ক্রিসমাশ ট্রি দিয়ে ঘরবাড়ী সাজানো হতো বলে জানিয়েছেন। এরা দুজনই হলেন জার্মানীর রাইন প্রদেশের অধিবাসী।

এর একশো বছর পরে রাইন প্রদেশে প্রচলিত এই বড়দিনের উৎসব পালনের পদ্ধতি সুদূর ফ্র্যাঙ্কোনিয়া (ব্যাভেরিয়ার একটি অংশ) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। জনৈক অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর জল-রঙে আঁকা একখানা ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিল্পী তার আঁকা এই ছবিখানিতে দেখিয়েছেন সন্ন্যাসী সেণ্ট ক্রিষ্টোফার শিশুরূপী যীশুখৃষ্টকে পিঠে বহন

করে একটা গভীর ঝরনার জলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন সেই ঝরনা পার হবার জন্যে, তাঁর হাতে তিনি ধরে রয়েছেন সাধারণ রীতি অনুযায়ী কোনো দণ্ড নয়, তার বদলে সুসজ্জিত ও নানান্ উপহারে মণ্ডিত একটা আস্ত গাছ: আর দেবশিশু যীশু আগুনে ঝলসানো একটা রাজহংসীর দিকে তাঁর হস্ত প্রসারিত করে রয়েছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে জার্মানীতে ঝলমলে রূপোলী কাপড়, বাদাম ও আপেলের মতোই আগুনে ঝল্সানো রাজহংসীও সমানভাবে বড়দিনের উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তারপরে এই প্রথা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। গির্জার ধার্মিক গোঁড়া পাণ্ডা-পুরোহিত আর কর্তারা এই প্রথার মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়ে, এই প্রথা বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো, পাছে পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাস আবার মানুষের মন অধিকার করে বসে, এই ভয়েই তারা প্রাণপণে এই প্রথা ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও চিরসবুজ ক্রিসমাশ গাছটি অব্যাহত ভাবে তার অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই চিরসবুজ ক্রিসমাশ ট্রি স্বোয়াবিয়ায় এবং প্যালেষ্টাইনে চিরসবুজ গাছ অথবা ইউ ট্রি (Yew tree) কিংবা বাক্সে বসিয়ে রাখা গাছ হিসাবে স্থান পেয়েছে, এবং চিরহরিৎ হোলি বৃক্ষ (Holy tree) হিসাবে ক্রিসামাশ ট্রি সুইজারল্যাণ্ডে সমাদৃত।

কিন্তু, তারপরে আরও একশো বছর অনায়াসে কেটে যাবার পর, সত্যিকারের আলোকসজ্জায় সজ্জিত ক্রিসমাশ ট্রি'র কথা মানুষ প্রথম শুনতে পেল। যে বিখ্যাত মহিলার নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লিসোলেট ফন্ ডার ফাল্জ পরিণত জীবনে ডাচেস্ অব অরলিন্স হয়ে প্যারিসের ফরাসী রাজসভা থেকে কতগুলো কৌতুককর, বিদ্বেষপূর্ণ ও অতিভষাণদুষ্ট চিঠি লিখেছিলেন। বড়দিনের উৎসবের স্মৃতি বর্ণনা ক'রে একবার তাঁর মেয়ের কাছে তিনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির মধ্যে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "তারা টেবিলগুলো সাজিয়ে নিয়ে প্রতিটি শিশুর জন্যে আনা কাপড়-জামা, রূপোর থালা, খেলার পুতুল ও মিঠাই ইত্যাদি উপহার সামগ্রীগুলো স্তূপাকারে জড়ো ক'রে রাখে। এই টেবিলের ওপরেই তারা বাক্সে বসানো একটা ক্রিসমাশ ট্রি সাজিয়ে তার ডালে ডালে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। দৃশ্যটি বাস্তবিকই যথেষ্ট নয়নাভিরাম ও আনন্দদায়ক। এখনও যদি আমি আবার ক্রিসমাশ ট্রি দেখবার সুযোগ পাই আমার নিশ্চয় ভালোই লাগবে।"

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের রাণী ছিলেন জার্মানীর মেয়ে। বিয়ের পরে তিনি নিজের দেশের প্রিয় স্মারকচিহ্ন হিসাবে ক্রিসমাশ ট্রি সঙ্গে করে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন। জার্মানীর স্বাধীনতা সংগ্রামের (সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্যে পরে

জার্মানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরিবারের লোকেরা দক্ষিণ জার্মানী থেকে উত্তর জার্মানীতে ক্রিসমাশ ট্রি নিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর জার্মানী থেকে ক্রিসমাশ ট্রি'র প্রথা সুইডেনে চলে যায়।

ক্রিসমাশ ট্রি'কে আগে রঙীন কাগজ ও সোনালী কাপড় দিয়ে সাজানোর নিয়ম ছিল। আলো দিয়ে তা সুসজ্জিত করার প্রথা অনেক কাল পরে চালু হয়! প্রথম যুগে ক্রিসমাশ ট্রি'কে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হতো—কালের ব্যবধানে সেই প্রথাই বড়দিনের উৎসবের সময়ে ক্রিসমাশ ট্রি'কে আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করার নিয়মের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। আসল ব্যাপার হলো এই বড়দিনের উৎসবের প্রতীক চিহ্নগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এর জন্য যখনই সম্ভব একটা সবুজ গাছ পছন্দ ক'রে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুধু কেবল ফার কিংবা পাইন গাছকেই ক্রিসমাশ ট্রি হবার উপযুক্ত ও পবিত্র বিবেচিত ক'রে ক্রিসমাশ ট্রি'র মর্যাদা দান করা হতো।

আজকের দিনের এই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির যুগে, যখন দুনিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই ক্রিসমাশ ট্রি সুসজ্জিত করার স্থান মোমবাতির বদলে বিজলী বাতি অধিকার করে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে দেবদারুর গন্ধযুক্ত সুসজ্জিত ফার গাছ আজও পশ্চিম জার্মানীতে পারিবারিক বড়দিনের-উৎসবের পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর জার্মানীর কবি থিয়োডর ষ্টর্ম ক্রিসমাশ ট্রি'র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন: "প্রশস্ত শাখাবিশিষ্ট ১২-ফুট উঁচু ফার গাছ এখনও ঘরের মধ্যে দাঁড় করানো আছে এবং বিগত কয়েকটা সন্ধ্যা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, অনেক কাজ করতে হচ্ছে। রূপকথার সোনালী গাছের ডাল, আঙুর ও দেবদারু ফলের গুচ্ছের মতো থোলো থোলো অ্যাল্ডার গাছের বীজ, সোনালী ও আরও নানা রঙের কাগজে সযত্নে মোড়া চমৎকার শাদা জাল ইত্যাদি সব কিছুই হাতের কাছে তৈরি রাখা হয়েছে এবং আগামী কাল ভোরেই আমি ক্রিসমাশ ট্রি সুসজ্জিত করার কাজে সাহায্য করতে লেগে যাব।" ...

একশো বছরেরও বেশী হলো ক্রিসমাশ ট্রি সুসজ্জিত করা বড়দিনের উৎসবের সুন্দর প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ হিসাবে-গণ্য হয়ে আসছে। মহামানব যীশুখৃষ্টের অমৃতবাণীর সুন্দর পবিত্র এবং ধ্যানগম্ভীর অভিব্যক্তির মতোই ক্রিসমাশ ট্রি সুসজ্জিত করা একটা পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়।

আফ্রিকা মহাদেশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এবং অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রিসমাশ ট্রি আজ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরাও তেমনি বড়দিনের উৎসবে ক্রিসমাশ ট্রি আলোকমালায় সুসজ্জিত করে যীশুখৃষ্টের জন্ম-তিথির উৎসব পালন ক'রে থাকে।

মাল্টা দ্বীপের শিল্পী

শ্রীফাল্গুনী রায়

[আমার বন্ধু শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত মার্চেন্ট-নেভীর একজন দক্ষকর্মী। সে পৃথিবীর অনেক সমুদ্র দেখেছে, দেখেছে অনেক নগর-বন্দর-গ্রাম, আর দেখেছে নানা দেশের নানান রঙের হরেকরকম মানুষ। আমায় সে প্রায়ই তার সমুদ্র-যাত্রার অভিজ্ঞতা গল্পের মোড়কে পুরে উপহার দেয়।

অরুণ আমায় অনেক দেশের অনেক মানুষের কথা শুনিয়েছে, না-দেখা সেই বিদেশী মানুষদের ভেতর সিন্‌টোকেই আমার ভাল লেগেছিল আর ভাল লেগেছিল মাল্টা দ্বীপকে।

আজ আমি অরুণের জবানীতে মাল্টা দ্বীপ আর সে দ্বীপের বৃদ্ধ চিত্রশিল্পী সিন্‌টোর গল্প লিখছি, যাতে তোমরা এই অখ্যাত চিত্রশিল্পীর দেব-প্রতিম মনের খবর পাও।]

জানুয়ারী মাসের এক শীতের সকালে আমাদের জাহাজ নোঙর ফেল্‌ল মাল্টা-দ্বীপে। মাল্টা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের একটি বৃটীশ নৌ-বহরের ঘাঁটি। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ থাকে ওখানে—কেউ ইংরেজ, কেউ ইটালীয়ান, আবার কেউবা স্পেনের লোক। তবে একটা সুবিধে এই যে, ওখানকার কমন-ল্যাংগুয়েজ হচ্ছে ইংরেজী।

সমুদ্র হতে মাল্টাকে দেখলে মনে হয়, কোন নিপুণ চিত্রশিল্পী অঙ্কিত একখানি মনোরম চিত্রপট। বিস্তীর্ণ উপকূলভাগে পাহাড়ের খাড়াই ফাঁকা ফাঁকা আবাসকুঞ্জের মধ্যবর্তী অসমতল আঁকাবাঁকা রাস্তাঘাট আর সবুজ ঘাসের ক্যাক্‌টাসাকীর্ণ উপত্যকা যে-কোন মানুষকেই কিছুটা ভাবপ্রবণ করে তোলে।

প্রাকৃতিক রূপ লাবণ্যের প্রভাব এখানকার প্রতিটি মানুষের দেহে আর মনে। মানুষেরা সবাই স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ আর মেয়েরা সুঠাম ও কর্মিষ্ঠা। তারা সহজেই পরকে আপন করে নেয়, অপরিচিত আগন্তুক হয়ে যায় আপন মানুষ এক নিমেষে।

আমি প্রায় কুড়িদিন ছিলুম মাল্টাতে। এই কুড়িদিনে আমি যে সব মানুষদের সংগে মিশেছি, তাদের মধ্যে আমার সব থেকে ভাল লেগেছে বৃদ্ধ স্প্যানীশ চিত্রশিল্পী সিন্‌টোকে। সিন্‌টোর সংগে আমার আলাপ হয়েছিল এক আলো-ঝলমলে উৎসবমুখর সন্ধ্যায়। সেদিন মাল্টাদ্বীপে ছিল Navy-day উৎসব ; ছোট্ট দ্বীপের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আনন্দ-অনুষ্ঠান।

বৃটীশ নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা দিবস বা Navy-day উৎসব মাল্টার অধিবাসীদের কাছে আমাদের 'দুর্গা পূজা'র মতই আদরণীয়। সেদিন বারে বারে তোপধ্বনি করা হয় বিভিন্ন জাহাজ হতে ঠিক দুপুর বারটায়, আর সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি ধরে চলে হইচই, আমোদ-প্রমোদ।

জাহাজী-মানুষ বলে আমরাও অর্থাৎ 'ভারত-পুত্রম্' জাহাজের নাবিকেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলুম উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। শ্বেত-পাথরের তৈরী বিরাট এক হলঘরে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। ব্যাণ্ড-বাদকদের বাজনার তালে তালে দ্রুতলয়ে নেচে চলছিল জোড়ায় জোড়ায় অসংখ্য নর-নারী। আমি কোলকাতার এক এঁদো গলির ছেলে—ট্যুইষ্ট বা বল্ নাচ দূরে থাক গাজনের নাচ-ই জানি না, তাই কোণের দিকের একটা চেয়ারে বসে নাচ দেখছিলুম, হলঘরের গম্বুজাকৃতি ছাদ হতে নেমে আসা আলোর ঝাড়গুলি দেখছিলুম। আমার এইসব দেখতে ভাল লাগছিল।

এমন সময় আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসলেন একজন দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধ। তাঁর বয়েস মনে হলো আশি পেরিয়ে গেছে, চোখের শানিত দৃষ্টি কিছুটা নিষ্প্রভ, তবুও তাঁর ঋজু দেহ, তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত কপাল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছিল, জানিয়ে দিচ্ছিল তিনি ঠিক আর দশজনের মত নয়, একটু ভিন্ন, কিছুটা বা বিচিত্র।

মোটা একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন: আপনি কি ভারতীয়? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলুম। তিনি বললেন: আমার পিতৃভূমি স্পেন, মাতৃভূমি ফ্রান্স আর আমি থাকি মাল্টায়—আমার নাম এস. এন. সিন্‌টো।

আমি শুনেছিলুম যে ইউরোপীয়ানরা কথা কম বলে, গায়ে প'ড়ে আলাপ জমানো তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ, কিন্তু সিন্‌টোকে দেখে আমার ধারণা পাল্টে গেল। খুশী-মাখানো গলায় বল্লুম: আমার নাম অরুণ সেনগুপ্ত, জাহাজে কাজ করি, এটাই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। সিন্‌টো চুরুটের ধোঁয়ায় নিজের মুখ প্রায় ঢেকে বল্লেন: ভাখো সেনগুপ্ত, একদিন আমিও তোমার মত জাহাজে কাজ করতুম, ঘুরতুম বন্দরে-বন্দরে। সমুদ্রকে আমি বাবা-মা'র থেকে বেশী ভালবাসতুম। অন্ধকারে কালো জলে ফস্‌ফরাসের জ্বলে ওঠা দেখে মনে মনে আমি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতুম—খুব ভাল ছিল সেই দিনগুলো—খুব ভাল ছিল! সিন্‌টো কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন, তারপর পকেট হাতড়ে একটা নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। সদ্য-পরিচিত লোকটির এই ধরণের আচরণে আমি যখন হতবাক, তখন যে মেয়েটি আমার টেবিলে পানীয় সরবরাহ করছিল, সে এসে বল্ল: আপনি আশ্চর্য হবেন না, ভদ্রলোক ওই রকমই, উনি এ শহরের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আমার একটি ছবি এঁকে দিয়েছেন বিনা পয়সায়। কথা শেষ করে মেয়েটি অন্য টেবিলে চলে গেল।

পরদিন সকালে নির্জন শহরতলীর উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ভেঙে সিন্‌টোর বাড়ীর দিকে চল্লুম। কিছু দূর হাঁটবার পর একটা টিলার ওপর একতলা বাড়ী দেখে আমার

মনে হলো বাড়ীটা নিশ্চয় সিন্‌টোর। কারণ বাড়ীর দেয়াল তৈরী হয়েছে বিচিত্রবর্ণ সামুদ্রিক নুড়ি দিয়ে, আর ঈগলের পাখার মত ক'রে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বাড়ীর ছাদ। বাড়ীটার 'নেম-প্লেটে' লেখা নামের সংগে আমার অনুমানের মিল খুঁজে পেয়ে, আমি কলিং-বেলে আঙুল ছোয়ালুম। কলিং-বেলের আওয়াজ সমুদ্র-গর্জনে চাপা পড়বার আগেই দরজা খুলে সিন্‌টো বেরিয়ে এলেন, সোল্লাসে বলে উঠলেন: হ্যাল্লো মিষ্টার ইণ্ডিয়ান! আমি প্রশংসা-ভরা চোখে বললুম: বাড়ীটা আপনার খুবই আকর্ষণীয়। 'শুনে সুখী হলুম, ভেতরে এস।' কথা শেষ করে একপাশে সরে দাঁড়ালেন সিন্‌টো। আমি ঘরে ঢুকেই দেখলুম তিন-রঙা সমুদ্র। ঘরের পেছনের দিকের দেয়ালে নুড়ীর বদলে আছে তিনটি সমান মাপের লাল, নীল আর সবুজ রঙের কাচ। তাই এ ঘর থেকে পরিচিত নীল সমুদ্রকে কখনো লাল, কখনো সবুজ, আর কখনো বা নীল বলে মনে হয়।

সেদিন সিন্‌টোর সংগে আমি অনেক কথা বলেছিলুম, অনেক প্রশ্ন করেছিলুম। সেই আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমি সিন্‌টোর শিল্পী-মনের যে উষ্ণস্পর্শ পেয়েছিলুম, তা আমাকে নতুন প্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি জানতে চেয়েছিলুম: 'আচ্ছা, আপনি তো একজন চিত্রশিল্পী, বলুন তো প্রকৃত সৌন্দর্য বা পবিত্রতা এই চোখে-দেখা জগতে কোথায় রয়েছে? সিন্‌টো বলেছিলেন: ছাখো সেনগুপ্ত, তোমার এই প্রশ্নটার মধ্যেই কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির বীজ নিহিত আছে। সুন্দরকে জানবার জন্যেই শিল্পী হাতে নেয় তুলি, লেখক গ্রহণ করে লেখনী। আমার এই দীর্ঘ জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছি, তা হ'ল প্রকৃত সৌন্দর্য বা পবিত্রতা রয়েছে একমাত্র শিশুদের ভেতর। আমি বললুম: 'শিশু, তার মানে বেবী? মানে, বাচ্চা ছেলে? সিন্‌টো বল্‌লেন: ইয়েস, ইয়েস—ছাখো সেনগুপ্ত, যে সূর্য মেঘ সৃষ্টি করে, আমাদের জল দান করে, সেই সূর্যই আমাদের দিয়ে থাকে প্রচণ্ড তাপ—যে আকাশে এত নক্ষত্র সেই আকাশেই বজ্রের প্রচণ্ড নির্ঘোষ। ঈশ্বর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কখনোই থাকতে পারেন না, কারণ তাঁর বিপক্ষে আছে শয়তান। কিন্তু দেখ, পৃথিবীর বুক ভরিয়ে রেখেছে যে সব আলোর ফুলের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের ভালবাসে না এমন শয়তানও নেই। ফুল, নদী, আলো এরাও সুন্দর ঠিকই, কিন্তু এরা শিশুদের মত কাঁদতে পারে না, হাসতে পারে না, মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়তে পারে না—জানো, আজকাল আমি খালি শিশুদের ছবি আঁকি, সরল নিষ্পাপ সব যীশু-প্রতিম মুখ, আমার তুলির টানে মূর্ত হয় ক্যানভাসে। সিন্‌টো একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে চুপ করলেন। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল, গভীর আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আমায় দু'একটা ছবি দেখাবেন কি? 'নিশ্চই, তুমি একটু ব'স, আমি আনছি কিছু ছবি'—সিন্‌টো ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। কিছু পরে

কয়েকটি ছবি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি দেখলুম, কোন ছবিতে শীর্ণ-শিশুর অন্ন-ক্লিষ্ট মুখ, কোন ছবিতে অসহায় নিগ্রো-শিশুর অঝোরে ঝরা কান্না—এম্নি সব ছবি। প্রতিটি ছবিই বিষাদের।

আমি বললুম: আপনি খালি দুঃখের ছবি এঁকেছেন কেন? শিশুরাও সুন্দর, আর যেখানে সুন্দর সেখানেই তো আনন্দ। সিন্টো আস্তে আস্তে বললেন: সেনগুপ্ত, আমি তোমার কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তুমিই বল, যখন তোমার দেশের বা আফ্রিকার শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগে, উপযুক্ত আহার না পেয়ে, ক্রমে ক্রমে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে, তখন আমি কি করে আঁকি হাসিখুসি স্বাস্থ্যবান শিশুদের মুখ। যখন ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না ভোরবেলাকার পাখীর গানকে বিদ্রূপ করে, তখন আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোর আগমনী গাইতে পারি না, আমার কষ্ট হয়।

আমি সিন্টোর দিকে তাকালুম। হঠাৎ মনে হ'ল আমি যেন ঈশ্বরের সংস্পর্শে এসেছি, পেয়েছি সেই প্রকৃত পবিত্র সুন্দরকে—যাঁর হৃদয়-দুয়ার সকলের জন্যে উন্মুক্ত, যাঁর দৃষ্টি সর্বব্যাপী।

আজ নাবিক-জীবনের প্রান্তসীমায় এসে মনে পড়ে, আমি একবার বৃটীশ নৌ-বহর ঘাঁটি মাল্টা দ্বীপে গিয়েছিলুম, সেখানে একজন সৌম্য শান্ত বৃদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন—যাঁর ঘর থেকে সমুদ্রকে দেখলে মনে হয় কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো বা সবুজ; যাঁর সন্নিধানে এসে আমি অসহায় শিশুদের দুঃখকে বোধ করতে পেরেছিলুম। তাঁকে আমি কোনদিন ভুলব না, কোনদিনও না।

॥ খবর ॥

শ্রীসরল দে

টরে টরে টক্কা।
দিল্লী না মক্কা?
বিল্লিটা কোথা যায়—
বাজে ঢোল-ঢক্কা

হতে পারে হিল্লে
লাড্ডুটা গিললে,
বিল্লিকে 'টেলি' করে
মিস্টার পিল্লে।

ব্যাঙ্ককে ব্যাংটা
বাড়িয়েছে ঠ্যাংটা।
গ্যাংটকে যেতে মানা,
হানা দেবে গ্যাঙ্টা।

ব্যাং গেল ভিয়েনা।
টিয়েটার বিয়ে না?
হংকং দিয়ে গেল,
গ্যাংটক দিয়ে না।

যোগীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শিশু-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় পুরুষ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

আমাদের এই বাংলা দেশ যখন ইংরেজের অধিকারে আসে, তখন পরাধীনতার অভিশাপে আমাদের নানারকম দুর্গতি দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও, একটি বিষয়ে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান। সেটি হচ্ছে এই যে, বিধাতার আশীর্বাদে গত দু'শ বৎসরের মধ্যে এদেশে যতগুলি কীর্তিধর মানুষ জন্মে দেশের কল্যাণ করে গেছেন, এ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তা ঘটেনি। দেশের এই সব মানুষদের কথা ভুলে যাওয়া এক বড় রকমের অপরাধ। কিন্তু এত বেশী লোকদের তো সব সময়ে মনে রাখা সম্ভব নয়। • সে জন্য সব দেশেই কোনও একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে তার সুযোগে এরকম এক এক জনের স্মরণ-সভা করে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর জিইয়ে রাখার রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশে এই রেওয়াজটি সর্বপ্রথম দেখি কবি রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো সেই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের মধ্যে। তারপর কারো পঞ্চাশ, কারো ষাট, কারো সত্তর বা আশি বৎসর পূর্ণ হলে আমরা জয়ন্তী উৎসব করে আসছি এবং একশো বৎসর বাঁচা খুবই দুর্লভ, তাও আমরা দেখে তা স্মরণে উৎসব করেছি -- মহারাষ্ট্রের কর্মবীর কার্ভে ও মহীশূরে বিশ্বেশ্বররায়ের।

যাঁরা বেঁচে নেই, তাঁদের স্মরণের জন্যও জন্ম অথবা মৃত্যু শতবার্ষিকী উৎসব করে, তাঁদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য তাও করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শত বৎসর পরে, শুধু এদেশেই নয়, এই দুনিয়ার অনেক দেশেই সমারোহের সঙ্গে সেই উৎসব পালিত হয়েছে।

আমাদের দেশে 'মৌচাক'-এর পাতা'র পাঠকদের মত যারা শিশু ও কিশোর, তাদের আনন্দ বিতরণের জন্য যাঁরা এদেশে মনোহারি শিশু বা কিশোর-সাহিত্য রচনা করে ছোটদের কাছে খুবই প্রিয়, তাঁদের প্রতিও তোমাদের তরফ থেকে সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালনের আয়োজন হয়েছিল। এবৎসর এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মানুষের কল্যাণের জন্য যে অবিস্মরণীয় কীর্তিস্থাপন করে গিয়েছেন, তা তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে স্মরণ করার যেমন ব্যবস্থা

হয়েছে, তেমনই ব্যবস্থায় আজ তোমাদের মত বয়সীদের আনন্দ বিতরণের অন্যতম পুরোধা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে। আমার বেশ ছেলেবেলাতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং শিশু-চিত্তে আনন্দ বিতরণের জন্য তাঁর লেখা বহু ব্যাপার জানবার সুযোগ হয়েছিল। সেজন্য তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর বিষয়ে তোমাদের কিছু জানিয়ে, তাঁর প্রতি এদেশের শিশুদের কেন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সে বিষয়ে কিছু বলছি।

'হাসিরাশি' বইয়ের 'যমজ ভাই' কবিতার যমজ ভাই-এর ছবি।

এদেশে আগে ছেলেদের ঘুমপাড়ানি গান, ছেলে ভুলানো ছড়া বা রূপকথা ছাড়া অল্পবয়সীদের জন্য কোন সাহিত্য ছিল না। যতদিন এদেশে বই ছাপার কোন ব্যবস্থা হয়নি, এগুলি লোকের মুখে মুখে এবং বিশেষভাবে ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে মুখে চলে

'হাসিরাশি' বইয়ের 'ফড়িংবাবুর বিয়ে' কবিতার ছবি।

এসেছে। ছাপাখানা এদেশে হওয়ার পর অবশ্য সেগুলির অনেকটাই ছাপা বইয়ের আকারে

'হাসিখুসি' বইয়ের বিখ্যাত 'দশটি ছেলে' কবিতার দশটি ছেলের ছবি।

বার হয়ে তোমাদের জানার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু ছাপাখানা হবার আগে শিশু-সাহিত্য বলে কিছু ছিল না।

এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় শিশু মনের আনন্দের খোরাক যোগাবার ব্যবস্থা সর্বপ্রথমে খৃষ্টান মিশনারীরা করেন এবং তারপর কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার কথা ধরা যায়। কিন্তু শিশু-মনে আনন্দের হিল্লোল বহাবার কৌশল তাঁদের রপ্ত ছিল না। এ বিষয় প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় ঠাকুরবাড়ীর সাহায্যে প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী 'বালক' মাসিক পত্রিকার

'খেলার সাথী' বইয়ের 'কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ'র একটি ছবি।

মারফত এবং এজন্য আমরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে ঋণী। তারপরের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। প্রমদাচরণ থেকে এমনি করে শিশু-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার,

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি গুণীজনের সমন্বয়ে এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে বলিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি। এই শিশু-সাহিত্যিকদের তখন বৈঠক হ'ত ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের একটি বাড়ীতে। এই বাড়ীতে তখন আমার ভগ্নীপতি উপেন্দ্রকিশোর ও আমরা থাকতাম। আমার সেজমামা দ্বিজেন বসু ও নরেন বসু, উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমোদারঞ্জনও থাকতেন। প্রতিদিন তাঁদের বৈঠক বসত, আর প্রমোদাচরণ, অন্নদাচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন। তাঁদের রচনাসম্ভারে 'সখা' অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। যোগীন্দ্রনাথ আবার সে সময়ে শিশু-মনোরঞ্জক পুস্তকাদি রচনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির লেখা পুস্তকগুলি সে সময় যত সুন্দর করে প্রকাশ সম্ভব ছিল তা করে, বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে প্রয়াসী হয়ে বাঙ্গালার শিশু ও কিশোরদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন। তাঁর বইয়ের দোকান 'সিটি বুক সোসাইটি' প্রথম শিশু-পাঠ্য প্রকাশনী এবং এ ব্যাপারে তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁর রচনা যে কত অনবদ্য তার পরিচয় তাঁর প্রত্যেকটি ছড়া, কবিতা ও গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সে রসের ভাণ্ডারের তুলনা হয় না।

অ, আ, ক, খ যারা সবে শিখতে আরম্ভ করেছে, সেই নিতান্ত শিশুদেরও তিনি ভোলেন নি। তাই প্রথম ভাগের নাম সহজ ও সরল করার জন্য তিনি 'হাসিখুসি' রেখে, এই ধরণের আরও কয়েকখানি বই রচনা করেছিলেন। আজও সেই 'হাসিখুসি' বইয়ের 'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে; ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখী পাছে ধরে' প্রভৃতি ছড়ার মাধ্যমে অক্ষর পরিচয়ের সহজ পদ্ধতির তুলনা অন্য কোন বইয়ে হয়নি। 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা, ঔষুধ খেতে মিছে বলা'; 'ঠাকুরদাদার শুক্‌নো গাল' প্রভৃতি কত সহজে আমাদের বর্ণপরিচয়কে যে সুগম করে দিয়েছেন তিনি, তা বলে শেষ করা যায় না। সত্যই তাঁর শিশু-মনোরঞ্জন করার প্রতিভা অনন্য। একেবারে শিশু থেকে আরম্ভ করে, কিশোরদের জন্য তিনি রসের সঙ্গে জ্ঞানের সেবা করে গিয়েছেন।

কিশোরদের জন্য 'পশুপক্ষী', 'বনেজঙ্গলে' প্রভৃতি বইগুলি তাদের যে কত প্রয়োজনীয়, তা বুঝিয়ে শেষ করা যায় না। তোমরা নিজেরা এগুলি পড়ে তার রস উপলব্ধি করলে আনন্দলাভের সঙ্গে জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হবে।

আজ সেজন্য তাঁর এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে সকল শিশু ও আমরা অন্যান্য সকলে, এককালে শিশু ছিলাম বলে, আমাদের এই পরম বন্ধুর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানানো অবশ্য কর্তব্য। এই উৎসব বাঙ্গালার সকলের উৎসব।

এবার যোগীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের বিষয় উল্লেখ করে তাঁর পরিচয়-কথা শেষ করব।

বাঙালার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বহু অপূর্ব দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়। এগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য তিনি 'বন্দেমাতরম্' নাম দিয়ে প্রায় ১০০টি জাতীয় সংগীত ও

'হাসিখুসি' ২য় ভাগের 'আমি বড় হয়েছি' কবিতার একটি ছবি।

কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বিগত চীন আক্রমণের সময় যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ সেই বইখানির একটি নূতন সংস্করণ করেন এবং তাতে আমার একটি ভূমিকা সংযোজিত করে আমাকে সম্মান দেন। এই বইখানি চিরদিনের একটি জাতীয় সম্পদ।

এই অশেষ গুণসম্পন্ন শিশু-সাহিত্য স্রষ্টাকে আজ আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।*

* রচনার ব্লকগুলি 'সিটি বুক সোসাইটি'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ময়নার বিয়ে

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১

গয়না পরে ময়না ব'সে
আজ ময়নার বিয়ে,
বরটি হ'ল সবুজ বরণ
টুক্‌টুকে-ঠোঁট টিয়ে।

২

বর আসছে বর আসছে
পড়ল সাড়া যেই ;
ঝিঙে বাজায় শিঙে নিয়ে
বাদক নাকি সেই।

৩

শাল্‌কি পাখীর পালকি থেকে
নামল যখন বর ;
বুলবুলিদের উলুধ্বনি
ভরলো কনের ঘর।
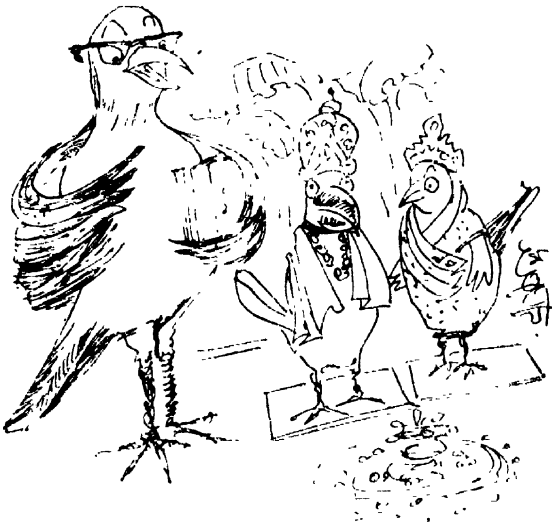
৪

'বউ কথা কও' পাখী এলো
এলো 'ফটিক জল',
কোকিল এলো গায়ক হয়ে
সঙ্গে নাচের দল।

৫

পুরুত এলেন বাস্তু ঘুঘু
সঙ্গে তাঁহার পাঁজি ;
ব্যাপার দেখে, বিয়ে দিতে
হলেন নাকো রাজি।

৬

অবাক তিনি—ডেকে বলেন,
কাণ্ড তোদের কি-এ ;
ময়না সাথে হয় কখনো
টিয়ে পাখীর বিয়ে ?

৭

যাবার পথে এ-সব শুনে
ফিরলো কাকাতুয়া ;
বাঁশ বনেতে শুধোয় শিয়াল—
ক্যা-হুয়া, ক্যা-হুয়া।

প্যারিসের হোটেলে সাহেব ভূত

যাদুকর এস. সি. সরকার

সিঁনর আঁদ্রে স্পেনদেশের লোক। সেবার ফরাসী দেশ সফরকালে এঁর উপরে ন্যস্ত ছিল আমার কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার ভার। কর্মসূত্রে নিয়মিত মেলামেশা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল বন্ধুত্বে। অবসর সময়ে প্রায়ই বসতো আমাদের মজলিস। আঁদ্রে বলতেন তাঁর দেশের নানা কথা। আমি বলতাম তাঁকে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার নানা রকমারি ঘটনার কথা। খুব রসিক লোক এই সিঁনর আঁদ্রে। তার ছিল অদ্ভুত বাতিক। বাসের টিকিট সংগ্রহের বাতিক। নানা দেশের প্রায় দুই লক্ষেরও বেশী বাসের টিকিট ছিল তাঁর সংগ্রহে। আমি তাকে আনিয়ে দিয়েছিলাম কোলকাতার ট্রাম-বাসের টিকিট।

প্যারিস শহরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল অঁপির হোটেলের ছয় নম্বর স্যুইটে। পাশাপাশি আরও দুটো স্যুইট। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন বাসিন্দা আসতো এই স্যুইট দুটোতে। সে সপ্তাহে এলো এক ইতালীর পুতুল নাচের দল—'পিকোলী'। সিঁনর আঁদ্রে থাকতেন একতলার একটা কামরায়।

সেদিন বিকেলে আঁদ্রে এসে ঢুকলেন আমার ঘরে। একথা সে কথায় পরে আঁদ্রে আলোচনা সুরু করলেন ভূত সম্বন্ধে কয়েকটা ভূতের গল্প বলায় পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ভূত বিশ্বাস করি কিনা। নানা রকমের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিয়েই আমার কারবার কাজেই বিশ্বাস করি না একথাটা মুখ দিয়ে বেরুলো না। মাথা নেড়ে জানালাম যে আমি ভূতে বিশ্বাস করি।

আমার জবাবে উৎফুল্ল হলেন সিঁনর আঁদ্রে। তিনি সোৎসাহে বললেন, "মিঃ সোরসার, চলুন আমার ঘরে আমি আপনাকে একটা ভৌতিক কাণ্ড দেখাবো।"

তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে উপস্থিত হলাম তাঁর ঘরে। দোর খুলে আঁদ্রে ঢুকলেন ঘরে। দরজার কাছে রাখা একটা চেয়ারে আমাকে বসালেন তিনি। জানালার ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে আবছা আলো এসে ঢুকছিল ঘরে। আঁদ্রে আলো জ্বাললেন না।

"এমনি ধারা আলো-আঁধারী পরিবেশেই ভৌতিককাণ্ড জমবে ভাল।" বললেন আঁদ্রে।

ঘরের এক ধারের দেয়ালের ব্রাকেটে ঝুলছিল একটা হ্যাঙ্গারে টাঙানো সাদা সার্ট। সিঁনর আঁদ্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ সোরসার, ঐ সার্টটার উপরে ভূত ভর করেছে।
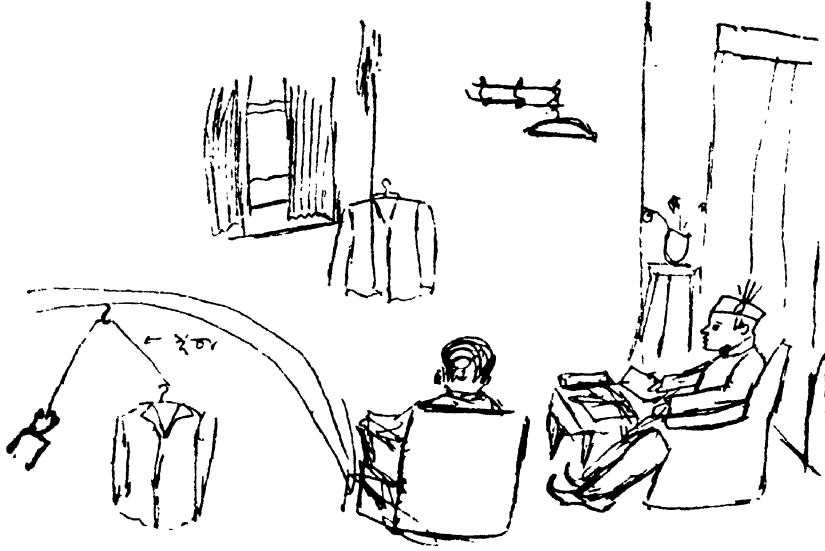
তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই টুক করে হ্যাঙ্গারসুদ্ধ সার্টখানা আপনা থেকে উঠে এলো ব্রাকেট থেকে। শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে সার্টখানা এসে হাজির হলো কামরার মাঝ বরাবর।

আঁদ্রে বললেন, "দেখলেন তো?"

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই আমি সামনের টেবিল থেকে তুলে নিলাম একটা ভারী মাসিক পত্রিকা আর হ্যাঙ্গারের আংটার উপরের দিকটা টিপ করে ছুড়ে মারলাম পত্রিকাখানা। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সার্টসুদ্ধ হ্যাঙ্গারখানা ঠিকরে পড়লো মেঝের কার্পেটের উপরে। হো হো করে হেসে উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলেন সিঁনর আঁদ্রে, "বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর এ, সি, সোরসারের সঙ্গে চালাকীতে পারবে কেন আমার মত একজন সাধারণ লোক!" হাসতে হাসতে আমি বললাম, "তা হঠাৎ এই চালাকী করার বাসনাটা হ'ল কেন বন্ধু?"

"পিকোলীর পুতুল নাচ দেখতে গিয়েছিলাম কাল। ওদের দলে আমার এক পুরনো বন্ধু পুতুল নাচিয়ে আছে। তার কাছ থেকে খানিকটা পাতলা কালো সুতো এনে ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু মজা করবো, তা আর হ'ল কোথায়? বই ছুঁড়ে মেরে তো আপনি আমার সব চালাকী ভেস্তে দিলেন।" হাসতে হাসতে উত্তর করলেন আঁদ্রে।

ধীর কণ্ঠে আমি বললাম, "বন্ধু হে, সরু সুতোর এক মাথা হ্যাঙ্গারের সঙ্গে বেঁধে, আর তার অন্য মাথাটা ছাতে লাগানো আংটার ভেতর দিয়ে গলিয়ে এনে নিজের হাতে টান মেরে তুমি কিস্তি মাৎ করতে চেয়েছিলে। তা সে কথাটা আগেভাগে আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনলেই তো পারতে, আমি অবাক হবার অভিনয় করে তোমার মন রাখতে পারতাম।"

কথা শেষ হতে আমরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। দরজা ঠেলে ট্রে ভর্তি বিস্কুট কেক আর কফির পেয়ালা নিয়ে ঘরে—ঢুকলো হোটেলের পরিচারিকা।

ছিন্নমস্তার মন্দিরে একদিন

শ্রীবাণীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ছিন্নমস্তার মন্দির

দু'ধারে ঘন চির-সবুজের আস্তরণ। দূরে নীল পাহাড় আর মাথার উপর নীল অনন্ত আকাশ—রৌদ্রালোকে আলোকিত। চারিদিকে যেন সবুজের ছড়াছড়ি; যতদূর দৃষ্টি যায় সমস্ত সবুজ জঙ্গল আর বনস্পতির সমাবেশ। তাদের মাথায় সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়ে ঝলমল করছে। এই রহস্য-ভরা প্রাকৃতিক বনরাজীর মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের মোটর গাড়ীখানা :

ভঁক, ভঁক, ভঁক—একটানা আওয়াজ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের গাড়ীখানি যেন কৃত্রিম আবহাওয়া ছড়িয়ে দিতে দিতে চলছে।

সবুজ বনভূমি শেষ হয়ে এল। এবার পাহাড়ের উপর আঁকাবাঁকা সমতল রাস্তা ধরে গাড়ী চলল। বড় সুন্দর এই পথটি। পথের একদিকে উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো খাড়া পাহাড় আর অপর দিকে রয়েছে অতলস্পর্শ খাদ। এই পাহাড়িয়া মনোরম পথটি আমার চিরকাল মনে আঁকা থাকবে।

শেষ হ'ল পাহাড়িয়া পথ। বন্ধুরবনভূমির মধ্যে দিয়ে এবার এগিয়ে চলেছি আমরা। এ পথের শেষ কোথায় কে জানে! মন যেন এই মোটর গাড়ীখানিকে ফেলে রেখে যেতে চায় গহন বনে, সবুজ পাতার অন্তরালে। হাটের যাত্রীরা মোটরের শব্দে পিছু ফিরে থমকে দাঁড়াচ্ছে আর গরু-মোষগুলিকে তাড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে আমাদের।

গাড়ীতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। এরই মধ্যে আমরা পৌঁছে গিয়েছি ছিন্নমস্তার মন্দিরের সম্মুখস্থ বেরা নদীর কাছে। এখানে গাড়ী থামিয়ে আমরা

একটু নেমে পড়লাম। মাটিতে পা দিয়ে যেন কত আরাম পেলাম। অপূর্ব দৃশ্য এখানকার। বেরা নদীর অপর পারে এখান থেকেই দেখা গেল আমাদের গন্তব্যস্থল ছিন্নমস্তার মন্দির। বেরা নদীটি মোটামুটি স্রোতবতী ও বিস্তৃত। জল খুব অল্পই। স্থানীয় লোকের মুখে শুনলাম যে, বর্ষায় নাকি এই নদী ও নিকটের দামোদর নদী প্রবল আকার ধারণ করে; তখন আর মন্দিরে যাবার উপায় থাকে না। পূজার্চনা নদীর এপার থেকেই তখন করা হয়ে থাকে।

চিরসবুজ বনরাজির মাঝে সুদৃশ্য এই মন্দিরটিকে বড়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল। পায়ে হেঁটে আমরা পার হলাম বেরা নদী। ভারী কৌতুক লাগল। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে লালবর্ণের আভা বিকিরণ করছে। দেবদারু আর বটগাছের মাথার উপর তারই ম্লান রক্তাভ আলো এসে পড়েছে। সূর্য এখনই ডুবে যাবে। তারই অপেক্ষায় সে অপেক্ষমান আকাশের পশ্চিম সীমান্তে। এমন সময়ে মন্দিরের সুমধুর ঘণ্টার আওয়াজে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ভারী চমৎকার লাগছিল এই পরিবেশটি।

আশা করেছিলাম, ছিন্নমস্তার মূর্তিটি হয়ত খুব বড়। কিন্তু পরে দেখলাম যে, একটি ছোট্ট পাথরের উপর খোদাই করা এই মূর্তি। আগে ডাকাতরা নাকি এই কালীর পূজা করত আর নরবলি দিত এখানে। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলাম আমরা। তারপর কাছেই দেখলাম দামোদর আর বেরা নদীর সঙ্গমস্থল।

এর পর এল বিদায়ের পালা। সেই মন্দির, ঘণ্টাধ্বনি আর বেরা নদীর জলোচ্ছ্বাস আমাদের বড় ভাল লেগেছিল।

গাড়ী স্টার্ট নিল। মন্দিরের উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানালাম সকলে। ঘণ্টাধ্বনি তখনও তেমনি একটানা সুরে বেজে চলেছে—ঢঙ্, ঢঙ্, ঢঙ্।

হয় না যে সব বাসি

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

'বর্ণ পরিচয়'-এ ভাষায়
সরল ক'রে গড়ি'
বিদ্যাসাগর বাঙালীদের
দিলেন হাতে খড়ি।

শুরু হ'লো সব পড়া, লেখা,
সহজ হলো বোঝা।
তিনিই প্রথম ক'রে গেলেন
বাংলা শেখা সোজা।

তারপরে তায় যোগীন্দ্রনাথ
নানান মজা লিখে
ঝোঁক ধরালেন ছেলেমেয়েদের
লেখাপড়ার দিকে।

ছড়া, ছবি, গল্পে দিলেন
'হাসিখুসি'র রাশি।
'বর্ণ পরিচয়'-এর মতোই
হয় না সে-সব বাসি।
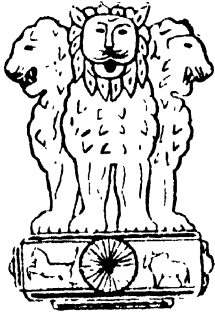
ভারতের সঙ্গে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট

॥ ১ ॥

ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে খেলতে এসেছে। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৬ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে দেয়। খেলা শেষ হয় পঞ্চম বা শেষ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির চল্লিশ মিনিট পরে। দু দেশের এটা ছিল একুশতম টেস্ট খেলা। ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আগের কুড়িটা টেস্ট খেলার ভেতর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে দশটা খেলায় এবং দশটা খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। বোম্বাই টেস্টে জয়ী হবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতের সঙ্গে একুশটা টেস্ট খেলার ভেতর এগারোটাতে জয়ী হ'ল।

বোম্বাইতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়ী হলেও, ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভূমিকা মোটেই অগৌরবের ছিল না। চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলাই যাঁদের জীবনবেদ তাঁদের চেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছেন, বিপদের মুখেও বাড়তি বিক্রম দেখিয়েছেন। মাত্র চোদ্দ রাণে তিনটে উইকেট পড়ে যাবার পরও ভারতীয় দল মারের দাপটে খেলার মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়েও এবং পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁরা বল মারতে পেছপা হননি। অন্য দিকে, বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকোস খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স দু' ঘণ্টায় মাত্র ৫০ রাণ করেন। সোবার্সের দু' ঘণ্টায় ৫০ রাণের পাশে কুন্দরণের ৯২ মিনিটে ৭৯ রাণ নিশ্চয়ই তুলনার যোগ্য। পাতৌদির ৪৪ ও ৫১ রাণের দু' ইনিংস বা চাঁদু বোরদের সেঞ্চুরীর পাশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাগত খেলোয়াড়

চাঁদু বোরদে

ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ফিল্ড করে ফিরছেন।

ক্লাইভ লয়েডের মারমুখী খেলা এবং ডেভিড হলফোর্ডের ইনিংস অবশুই প্রশংসনীয়।

প্রথম টেস্টে সবচেয়ে কৃতিত্বের অধিকারী ভারতের লেগ স্পিন ও গুগলী বোলার চন্দ্রশেখর। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পড়া চোদ্দটা উইকেটের ভেতর চন্দ্রশেখর একাই দখল করেছেন এগারোটা উইকেট তাঁর পরেই যাঁর নাম করা যায় তাঁর নাম গাইড লয়েড। লয়েডের জীবনে এটাই ছিল প্রথম টেস্ট খেলা। দু' ইনিংসে এই নবাগত খেলোয়াড় যথাক্রমে ৮২ ও ৭৮ (নট আউট) রাণ করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্পিনার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস যেখানে প্রথম ইনিংসে একটাও উইকেট পাননি, সেখানে: চন্দ্রশেখর পেয়েছেন প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৭ এবং ৪ টি।

(ভেতরে) ইডেন উদ্যানে হনুমন্ত সিং ও সুব্রহ্মনিয়ম ব্যাট করতে নামছেন। (সামনে) গারফিল্ড সোবার্স—

[আলোকচিত্র : ভোলানাথ দেব]

॥ ২ ॥

কলকাতায় ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের লঙ্কাকাণ্ডের খবর ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা। এমন ঘটনা ইডেন উদ্যানে আর ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। দর্শক সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও পুলিসের আচরণে খেলা বন্ধ হয়েছে। মাঠে ইট, চায়ের ভাঁড়, সোডার বোতলও না পড়েছে এমন নয়, কিন্তু দর্শক-পুলিসে মারামারি, লাঠি চার্জ কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া এবং শেষে গ্যালারিতে আগুন ধরানোর ঘটনা ক্রিকেট ইতিহাসে কখনো ঘটেছে বলে কেউ শোনেনি।

কলকাতার ইডেন উদ্যানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দল অতি শোচনীয়ভাবে হেরে গেছে। তিন দিন সাতষট্টি মিনিটেই খেলার চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও পঁয়তাল্লিশ রাণে জিতে এবারের মতো 'রাবার' অক্ষুণ্ণ রেখেছে। দ্বিতীয় টেস্ট ছিল স্বকীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় নিয়ে সোবার্সে'র ব্যাটিংয়ে, গিবসের বোলিংয়ে কিন্তু এই খেলায় ভারতীয় দল ব্যাটিংয়ে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে। মাঠে উপস্থিত অগণিত দর্শকদের সেই সঙ্গে মনে থাকবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অনুপম ফিল্ডিং আর বোলারদের অমিত পরাক্রম।

দ্বিতীয় টেস্ট উপলক্ষে ইডেনের উইকেট যেভাবে গড়া হয়েছিল, তাতে তার পূর্ব ঐতিহ্য বজায় থাকেনি। উইকেটে সবুজ ঘাসের চিহ্ন ছিল না। জমিও জমাট

উপরে: পাতৌদির নবাব। নীচে: চার্লস গ্রীফিথ। [আলোক চিত্র: ভোলানাথ দেব]

বি, এস, চন্দ্রশেখর

করে বাঁধা হয়নি। ফলে প্রথম দিনের অপরাহ্ণ থেকেই উইকেটে ক্ষতের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এ অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিংয়ের সময় পাতৌদি ভেঙ্কটরাঘবনকে যদি বোলার হিসাবে কাজে লাগাতেন, তাহলে ভারতীয় দলের এরকম শোচনীয় পরাজয় হয়তো ঘটতো না।

হকি : ভারত বনাম পাকিস্তান

হকিতে ভারত চিরদিন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতায় ভারত জয়ী হয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান পেয়েছে, কিন্তু ভারত এতো দিন 'এশীয় হকির শ্রেষ্ঠ'—এ সংজ্ঞায় অভিহিত হতে পারেনি। ব্যাঙ্ককে এবার পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ায় পাকিস্তানকে এক গোলে হারিয়ে, ভারত সেই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে মূল্যবান গোলটা দেন বলবীর সিং। এই গোলের আগে পর্যন্ত খেলা যেভাবে চলেছিল তা দেখে ভারত যে জিতবে এমন ধারণা কেউই করতে পারেনি। সত্তর মিনিটব্যাপী নির্ধারিত সময়ে গোলটা হয়নি, হয়েছে আরো ছ' মিনিট পরে, অতিরিক্ত সময়ের খেলায় বলবীরের কৃতিত্বে। ভারতের অতি ক্ষিপ্র রাইট উইং বলবীর সেদিন মাঠে একাই দলের বাকী খেলোয়াড়দের ভূমিকা নিয়েছিলেন। খাপছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনের যা কিছু ঘাটতি একা বলবীর নিজের সামর্থ্যে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ জয়ের মালা সোনার মেডেলটি ভারতের বুকে ঝুলিয়ে দিয়ে বিশ্বের কাছে ভারত যে হকি খেলায় এখনো শ্রেষ্ঠ এ কথা আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

টেনিস : অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় ভারতকে হারিয়ে দিয়ে পরপর তিনবার এবং মোট একুশবার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। এই খেলাটা ছিল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে পঁয়ত্রিশবারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইন্যাল খেলা; অপর দিকে ভারতের পক্ষে প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা।

ডেভিস কাপে ভারতের সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার ফলাফল কী হবে তা নিয়ে টেনিস ক্রীড়ারসিকরা কল্পনার জাল বুনে চললেও এ বিষয়ে কারু সন্দেহ ছিল না, চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী। ডেভিস কাপের পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাসে একুশবার অস্ট্রেলিয়ার বিজয়ীর সম্মান, চোদ্দবার রানার্স-আপ।

কনরাড হান্ট
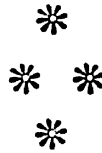
ল্যান্স গীবস্

বিগত কুড়ি বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছরই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জার এবং এর মধ্যে তেরো বছর তাদের অধিকারে ডেভিস কাপ।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার দল গড়া হয়েছিল ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রয় এমার্সন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবারের উইম্বলডন রানার্স ফ্রেড স্টোলে—বিশ্ব ক্রমপর্যায় যাঁর এখন শীর্ষস্থান, বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তৃতীয় স্থানের অধিকারী টনি রোচ, এ বছর উইম্বলডনে বিস্ময় সৃষ্টিকারী ওয়েন ডেভিডসন প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের নিয়ে। ভারতীয় দলে ছিলেন সবার পরিচিত রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল এবং শিব মিশ্র।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলাটা হয় মেলবোর্ণে। প্রথম দিনের দুটো সিঙ্গলস খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং জয়দীপ ডাবলসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুটি টনি রোচ এবং জন নিউকমকে হারিয়ে দেন। তৃতীয় দিনে বাকী দুটো সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়।

বাজিকর

কি সুন্দর মুখখানি
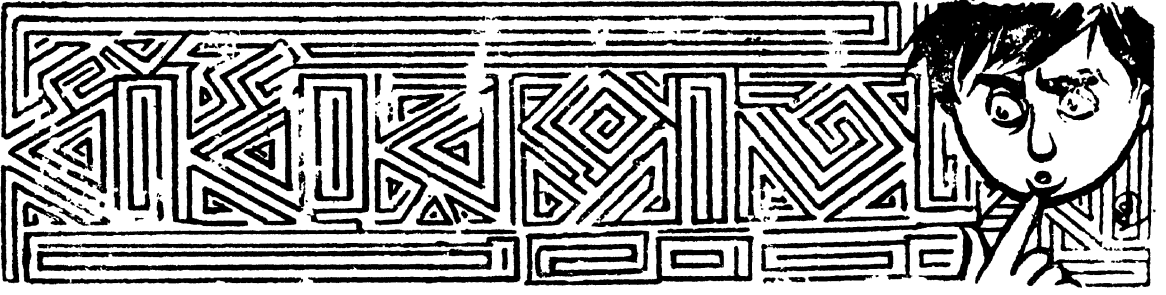
১। একটি জন্তুর কেবল মুখের ছবিটা দেওয়া হয়েছে এখানে। এটা কোন্ জন্তুর মুখ বলতে পারো?

ওজন বার করো

২। পাশের ছবিতে নাসপাতি, কাপ, আপেল ও ডিম আছে।

আপেলের ওজন = ডিম + নাসপাতি

পাঁচটি ডিমের ওজন = নাসপাতি + আপেল

কাপের ওজন = আপেল + ডিম

নাসপাতির ওজন ষাট গ্রাম হ'লে—ডিম, আপেল ও কাপের ওজন প্রত্যেকটির কত?
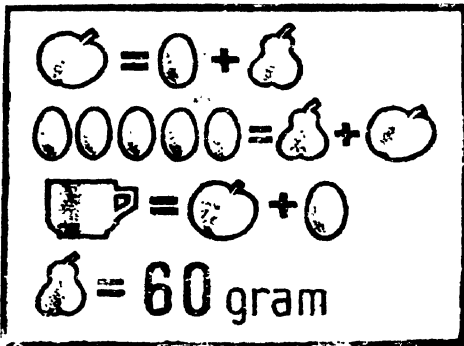
উত্তর আগামী মাসে বেরুবে

গতবারের ধাঁধার উত্তর

১। উপর থেকে তৃতীয় লাইনে বাঁ-দিকের প্রথম কিউবে ফোঁটা ভুল আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি কিউবের বিপরীত তলের ফোঁটার যোগফল সাত। এখানে চার ফোঁটার বিপরীত দিকে তিন ফোঁটা থাকবার কথা, কিন্তু সেটা বাঁ-দিকের তলায় দেওয়া হয়েছে।

২। ছবিতে মোট ছাপ্পান্নটি ফুল দেখা যাচ্ছে।

কোলকাতা শহর আর তার আশেপাশে যারা আছ তারা এই জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই শীতের সঙ্গে বর্ষার রূপ দেখছো। কয়েক দিন ধরে নাগরিক জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। জলবৃষ্টি কাদায় শহরতলী বিপর্যস্ত, শহরের জীবনযাত্রাও ব্যাহত।

ইতিমধ্যে স্কুল কলেজ সব খুলছে, আশার কথা নতুন করে বই, পড়াশুনা, ক্লাস প্রভৃতির জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছো এবং নিয়মিত পড়াশুনার কথা ভাবছো নতুন বছরের গোড়া থেকেই। ছাত্রজীবনে পড়াশুনাই হলো তপস্যা। এসময় অন্য কোন কিছুতে মেতে না ওঠাই তো ভাল। অনেক অভাব-অসুবিধে আমাদের ঘিরে আছে, এরই মধ্যে তোমাদের সুস্থ মন নিয়ে চলতে হবে—তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই নানা অমঙ্গল ঘিরে ধরবে। আশা করি তা তোমরা ঘটতে দেবে না।

একটা গল্প বলি—

কাবুল দেশের বাসিন্দা বসির মহম্মদ। মাথায় লম্বা চুল-পাগড়ীতে সব ঢাকা পড়ে না, চুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা দাড়ি, পরনে ঢিলেঢালা জোব্বা, গায়ে ছোট কুর্তা—হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। পিঠে মস্ত বোঁচকা, ক'জনেই বা তার নাম জানে? সবাই বলে কাবুলীওয়ালা—নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

বয়স হয়েছে বসির মহম্মদের। লম্বা মজবুত শরীরখানা যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। চোখের দৃষ্টিও আগের মত প্রখর নয়। আগে দূর থেকে মাঠ-ভর্তি জনতার মাঝখান থেকে যাঁর খোঁজে অতখানি পথ এসেছে, তাকে খুঁজে পেতে একটুও ভুল হতো না, কিন্তু আজকাল কাছের মানুষকেও চিনতে কষ্ট হয়। তবু বয়সকে গ্রাহ্য করে না বসির মহম্মদ। বর্ষা ঋতু শেষ হতে না হতেই কাবুল থেকে পাড়ি দেয় ভারতবর্ষের দিকে। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে তার কারবার। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়েই সে বছরের পর বছর নিজের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চলে। টাকা বাড়ানোর নেশায় দিনরাত মশগুল।

সেবারও এসেছে বসির মহম্মদ। তখন রেলগাড়ির তেমন চলন হয়নি—দু'খানি পা আর মোটা লাঠিখানার উপর নির্ভর করে ঘুরে বেড়াতো পাঞ্জাবের গাঁয়ে গাঁয়ে। বস্তির

কুকুরগুলো দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে সোরগোল তুলতো—ছেলেরাও খেলা ভুলে তাকিয়ে থাকতো তার দিকে। কারুর চোখে বিস্ময়, কারু ভয়। কেউ বা হেসে গড়িয়ে পড়তো, কারু মুখে চলতো আলোচনা। তাদের কথা বুঝতো না বসির, তবে আলোচনা যে তাকে নিয়েই, সেটুকু তার জানা ছিল। তবু কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার।

সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বসির বেশ ক্লান্তি বোধ করছিল। সন্ধ্যে হতেও আর বাকী নেই, দূরে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে বসির এসে পৌছুল শহরের উপকণ্ঠে বান্নু শহরে। আরো কতবার এসেছে এই শহরে। রাস্তাঘাট বাজারহাট সবই তার চেনা। এইখানেই রাতটুকুর মত বিশ্রাম নেবে স্থির করলো বসির। সঙ্গে সামান্য যা কিছু আহার্য ছিল তার সদ্ব্যবহার করে, এক বাগানবাড়ীর পাঁচিলের বাইরে দেখতে পেলো একটি প্রকাণ্ড গাছ। তার ঘন পাতার মাথার উপর সুন্দর একটি আচ্ছাদন। হোটেলে গিয়ে অনর্থক পয়সা খরচ না করে রাতটুকু এই গাছের তলায় কাটিয়ে দেবে—এই তার ইচ্ছা। ইচ্ছাপূরণে কোনো বাধাই ছিল না, কারণ আরো জনকতক পথিক এ জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিল রাতের আশ্রয় হিসেবে। সুতরাং একলা নির্জন জায়গায় রাত কাটাবার ভয় নেই। সারাদিন খাটুনি আর পথ চলার ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসির মহম্মদ গাছের তলায় শুয়ে পড়লো। একপাশে তার বোঁচকা আর একপাশে লাঠিগাছা। ক্লান্ত শরীর কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমের হাতে সঁপে দিল নিজেকে। রাত শেষ হবার আগেই ঘুম ভাঙ্গলো যখন বসিরের, তখনও সূর্যের আলো ফোটার দেরি আছে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী নয় সে। বেলা বাড়বার আগেই তাকে পৌছতে হবে ছ'মাইল দূরের গ্রাম—যেখানে আছে দু'ঘর দেনদার। দেরি হলে হয়তো বাড়ীর বার হয়ে যাবে তারা। অন্যদের ঘুম ভাঙবার আগেই বসির তার মালপত্তর নিয়ে খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করে স্থান ত্যাগ করলো।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবার পর তার হঠাৎ খেয়াল হলো, তাইতো আসল জিনিসটাই যেন ফেলে এসেছি মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বোঁচকা খুলে দেখলো যা ভয় হচ্ছিল তাই সত্যি হয়েছে। তাড়াহুড়ো করে রওনা হবার সময় টাকার থলিটিই ফেলে এসেছে সেখানে। একটি দু'টি হাজার নয়, পাঁচ হাজার টাকা—মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে উঠলো তার, বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করতে লাগল। গন্তব্যস্থানের দিকে আর না এগিয়ে সে ফিরে চললো বান্নু শহরের দিকে—শরীর মনের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ছুটে চললো বসির মিঞা।

শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে বসির, ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঝাঁকড়া মাথা গাছ, লোকজন সব জেগে উঠেছে, যার যা কাজ তাই নিয়েই সবাই ব্যস্ত। বছর পনেরোর

একটি ছেলে রাস্তার পাশে মাঠে গরু চরাচ্ছিল। শতছিন্ন কাপড় দিয়ে কোনরকমে ঢাকা তার শীর্ণ দেহখানি। কিন্তু চোখে-মুখে তার বেশ সপ্রতিভ ভাব। কাবুলীওয়ালাকে ছুটতে দেখে ছেলেটি বলল: খাঁ সাহেব, ও রকম পড়ি-কি-মরি করে এত ভোরবেলায় ছুটছো কেন? ছেলেটির কথায় একটু সহানুভূতির আঁচ পেলো বসির। দৌড়ঝাঁপ থামিয়ে দাঁড়িয়ে বলল: কী বলবো ভাই আমার নসিবের কথা, ভোর রাত্তিরে ঐ গাছতলায় ফেলে গিয়েছি আমার টাকার থলি—যথা এবং সর্বস্ব তাতে—আর কী পাবো?

ছেলেটির ঠোঁটের কোণে একঝিলিক হাসি। সে বলল: হক্-এর ধন খোওয়া যাবে কেন? তারপর প্রশ্ন করতে লাগলো কী রকম থলে? কত বড়? কি দিয়ে তৈরী সে থলে? কোন রঙ থলের? মনে মনে বিরক্ত হলেও বসির জবাব দিল সব ক'টি প্রশ্নের। ছেলেটি বলল: বুঝতে পেরেছি তুমিই সেই থলের মালিক, এসো আমার সঙ্গে।

গাছের অদূরে ছিল ঝোপঝাড় অঞ্চল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছেলেটি মাটি খুঁড়ে বার করে দিল সেই হারানো থলেটি, পুরো টাকা ভর্তি।

বসিরের মুখে কথা নেই, চোখ ভর্তি জল। ছেলেটি বলল: সকালবেলা যখন গরু নিয়ে যাই তখন গাছতলা দিয়ে যেতে চোখে পড়লো থলেটি—দেখলুম তাতে টাকা ভর্তি। আমি গরীব মানুষ কোথায় রাখবো অত টাকা? কার টাকা তাই বা জানবো কী করে? কার কাছেই বা বিশ্বাস করে অত টাকা গচ্ছিত রাখবো? তাই ভেবে এইখানে মাটির তলায় পুঁতে রাখলাম। যারই হোক, তার দেখা যদি কোনদিন পাই, তাকেই ফিরিয়ে দেব তার জিনিস। তাইতো ওখানে পুঁতে রেখেছিলাম।

এতক্ষণে বসির মহম্মদের মুখে কথা ফিরে এসেছে। ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বলল: বেটা, তোমার জন্যই ফিরে পেয়েছি আজ আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। তোমার ঋণ কী দিয়ে শোধ করবো জানি না, এই পাঁচশো টাকা তুমি নাও, আমার ঋণের বোঝা হাল্কা করো।

ছেলেটি কিছুতেই নেবে না তার দান। খালি বলে, তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেয়েছ এতে আমার বাহাদুরি কি? আমি কেন নেবো তোমার টাকা?

বসিরও কিছুতেই ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত রফা হলো। ছেলেটির কথায় বসির পোটলা খুলে দেখলো, কিসমিস, আঙ্গুর, পুঁতির মালা আরো কত কী।

কোনটাই তার পছন্দ নয়।

ঐ তো ঐ কোণে একটি ঝকঝকে কী দেখছি ?

বসির বার করলো—ঝকঝকে জিনিসটি একটা দু'ফলা ছুরি। আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল ছেলেটির চোখেমুখে, বলল : ঐটা দাও আমায়।

বসির মিঞা খুশী মনে ছুরিটি তুলে দিল ছেলেটির হাতে। অপলক দৃষ্টিতে ছুরির দিকে যতক্ষণ ছেলেটি তাকিয়ে ছিল, ততক্ষণ বসির মহম্মদ ভাবছিল মনে মনে—চার আনা দামের ছুরিটি আজ পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে গেল।

চিঠির উত্তর—

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,টি, রোড, কোলকাতা—তোমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। ববি ও বণি চক্রবর্তী, কোলকাতা (ববি, তোমার নাম 'রবি' হয়ে যাচ্ছে ছাপার ভুলে—? আচ্ছা আর হবে না)। মালা, শ্রাবণী, রণেন, অরিন্দম, অর্পিতা, নূপুর, কোলকাতা—তোমাদের পরীক্ষার ভাল খবরে খুশী হয়েছি।

কুন্তল রায়, হায়াৎ খাঁ লেন ; রাজর্ষি রায়, কোলকাতা ; অম্বরীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী ; তপস্যা রায়, তপস্যা না তাপসী ভাল করে লিখো, রাণীচক ; অনুরাধা শেঠ, কোলকাতা ; নূপুর দত্ত, মৌসুমী ও অনীতা, কোলকাতা। তোমাদের সবার চিঠি পেয়েছি

সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৪৫ প
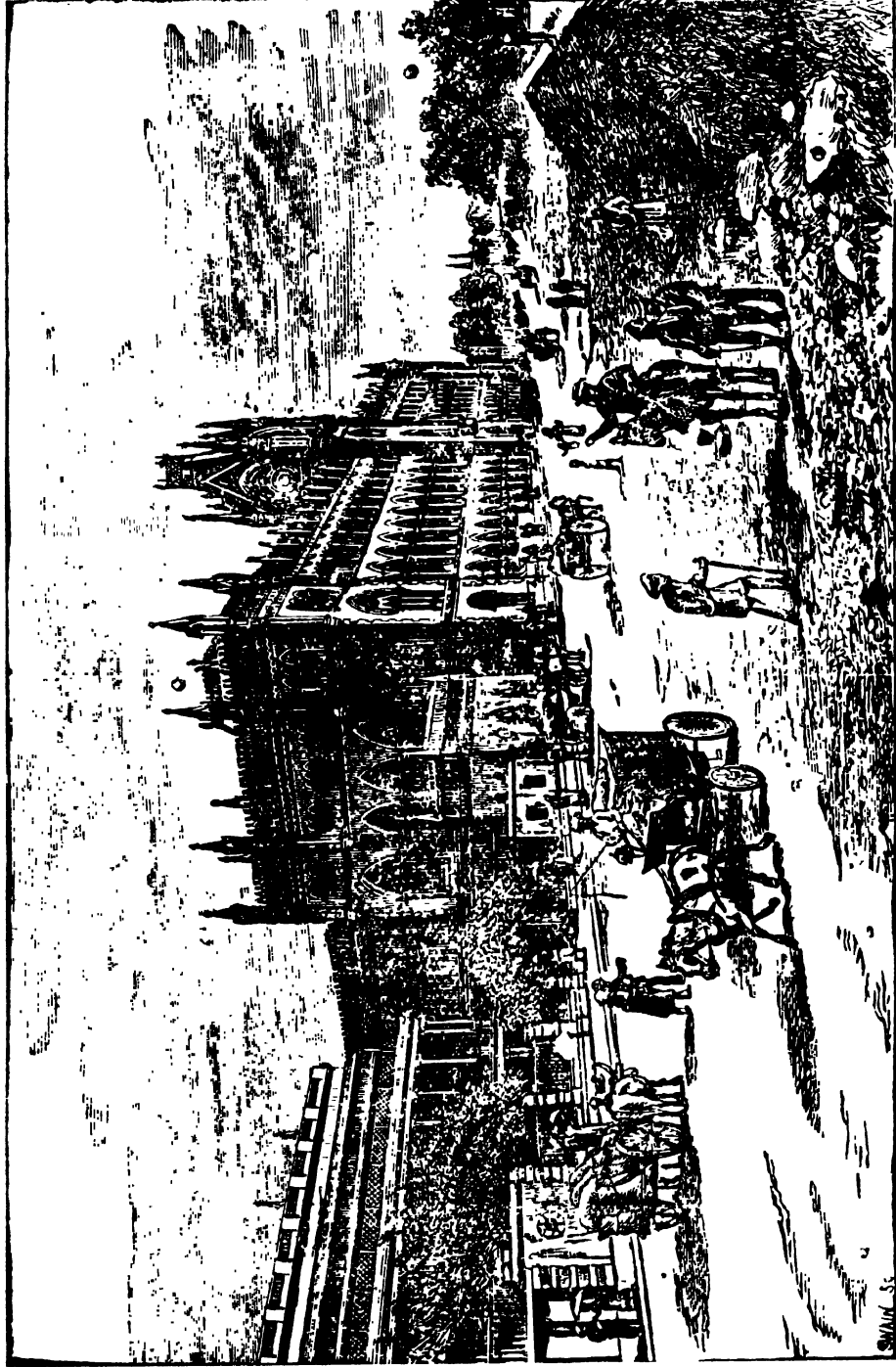
পুরাতন কলিকাতার হাইকোর্ট

✲ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✲

৪৭শ বর্ষ]	ফাল্গুন : ১৩৭৩	[১১শ সংখ্যা

মৌচাক

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মৌমাছি ! মৌমাছি !
হাওয়ায় উড়িয়া নাচি
কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে
একটানা মিঠে সুরে
গেয়ে গুন্‌গুন্‌ গান
ভুলায়ে ফুলের প্রাণ
মধু করো সঞ্চয়,

কাজ তো সহজ নয় ।
অসংখ্য ফুল দলে
ভুলাইয়া কতো ছলে
কুসুম কিঞ্জল চুষে
যত মধু নাও শুষে ;
উড়ে উড়ে সারাদিন
ঘুরিছ বিশ্রাম হীন,

মধু করো সঞ্চয়,
আছে তো চুরির ভয় ;
তাই দেখি দূর বনে
ঝোপে ঝাড়ে এক কোণে
উঁচু ডাল দেখে রাখো,
মোমের খোপেতে ঢাকো ;
পাহারায় থাকে জানি,
তোমাদের মৌ-রাণী !

তবু কি শান্তি আছে ?
'মৌ-চোর' গাছে গাছে
খুঁজে খুঁজে নিয়ে যায়,
বাঘে তাকে ধরে খায়,
তবু এসে করে ফাঁক
মধু-ভরা মৌচাক !

জন্মভূমি

দেশ নারায়ণ। স্বর্গ হইতেও দেশ গরীয়ান্, শ্রেষ্ঠ। স্বর্গ তুচ্ছ, দেশ বড়, জাতি বড়। দেশের পূজায়, জাতির পূজায়, স্বর্গ হইতে বৃহত্তর ফল লাভ হয়। দেশসেবায় চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। ইহাই ভারতীয় অনুশাসনের সারমর্ম।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

এক সাধুর কাহিনী

(রাজস্থানী লোককথা)

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

কোন এক মহাজন দ্বাদশীর পুণ্য দিনে খাবার নেমন্তন্ন করে এক নামকরা সাধুকে। নেমন্তন্ন খাবার ব্যাপারে সাধুরা তো পা বাড়িয়েই আছেন। কমণ্ডলু নিয়ে খড়ম পরে খেতে আসেন ঐ সাধু।

মহাজনের বাড়িতে পা রেখেই রান্নার গন্ধ পেয়ে সাধুর জিভে জল আসে।

পরিবেশন করতে আসে মহাজনের একমাত্র পরমাসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির রূপ-লাবণ্যে সাধু চোখ ফেরাতে পারেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন এ মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ করতেই হবে!

খেতে খেতে ফন্দি আঁটেন আর অন্যমনস্ক হয়ে যান। শেষে হঠাৎ অর্ধেক খাবার পাতে ফেলে রেখেই উঠে পড়েন।

মহাজন ঘাবড়ে গিয়ে সাধুর পা জড়িয়ে ধরে বলেন, প্রভু, খাবার ফেলে উঠবেন না, বলুন আমাদের কি অপরাধ হয়েছে। বলুন, এক্ষুনি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

সাধু গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমার কোন অপরাধ হয়নি। তোমার ভবিষ্যৎ এত অন্ধকার দেখছি যে আমি আর স্থির হয়ে বসে বসে শান্তিতে খেতে পারছি না। আর তোমার এই দুর্ভাগ্যের কারণ তোমার এই মেয়ে।

এর পর শশব্যস্ত হয়ে সাধু কমণ্ডলু তুলে নিয়ে খড়ম পরে রওনা দেন।

মহাজন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, প্রভু, আপনি ঋষি, আপনি যদি একটি পন্থা না বলে দেন তো আমি আর কার কাছেই বা যাব।

সাধু কিছুক্ষণ ধ্যানে বসে, তারপর উঠে বললেন, কোন উপায় দেখছি না। সকলের ভালর জন্যেই এই মেয়েকে তোমার ত্যাগ করতে হবে। সিন্দুকে শুইয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। যে পাবে তার ক্ষতি হলেও তোমার মেয়ে বেঁচে থাকবে ভাল ভাবে; আর তা না হলে তোমার বাড়িতে থাকলে সকলের ক্ষতি হবে। চতুর্দশীর দিন আমি নিজে এসে মন্ত্রপাঠ করে নদীর জলে তাকে ভাসাব—সব তৈরী রেখ। আমি যাচ্ছি।

সাধুর কথা শুনে মহাজনের মাথায় যেন বাজ পড়ে। তাঁর স্ত্রী শুনে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকেন, আর মেয়ে একথা শোনার পর থেকে আড়লে আড়ালেই কেঁদে বেড়ায়।

নিরুপায় হয়েই বাবা মা মেয়েকে নদীর জলে ভাসানোই ঠিক করল। আনা হলো বাক্স।

নির্দিষ্ট দিনে সাধু তাঁর শিষ্যদের বললেন, আমি দু-এক দিনের মধ্যেই ফিরব। ভাল-

কথা, এর মধ্যে যদি আমাদের এই নদী-তীরে কোন বাক্স ভেসে আসে তাহলে সেটাকে সযত্নে তুলে এনে আমাদের এই পর্ণকুটীরের এক কোণে লুকিয়ে রেখ।

চতুর্দশীর দিনে ভোর থেকে মহাজনের বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। সাধু

রাজা ঐ মেয়ের মুখেই আদ্যপান্ত সমস্ত শুনলেন।

এলেন। মেয়েকে বাক্সে শোয়ানো হলো। সাধুর নির্দেশে বাক্স বন্ধ করে মন্ত্রপাঠান্তে তালা লাগিয়ে চাবিটা তালার সঙ্গে ঝুলিয়ে, নদীর জলের মধ্যে সেটা ভাসান হলো।

বাক্স ভাসানোর পর হঠাৎ এলো জোয়ার। দ্রুতবেগে নাগালের বাইরে ভেসে গেল বাক্সটি।

নদীর অন্য তীরে সে দেশের রাজপ্রাসাদের জেলে জাল ফেলতে এসে বাক্সটি ভাসতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ডাঙায় তুলে বাক্সটি নিয়ে গেল রাজার কাছে।

বাক্স খোলবার পর অপরূপ রূপবতী মেয়েটিকে দেখে রাজা তো বিস্মিত হয়ে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তারপর ঐ মেয়ের মুখে আদ্যপান্ত সমস্ত কাহিনী শুনতে পান।

শোনার পর রাজা তাঁর রাজপ্রাসাদেই মেয়েটিকে রেখে দিলেন। মেয়ের বাবা-মা'র উপর যত না রাগ হলো, তার চেয়ে বেশী রাগ হলো রাজার ঐ সাধুর উপর।

তারপর রাজার নির্দেশে ঐ বাক্সেই একটা রাগী বাঁদর পুরে তালাবন্ধ করে, চাবি ঝুলিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। ভাঁটার টানে বাক্সটি ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেল জলের মধ্যে।

ওদিকে ঐ সাধুটি তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে নদীর নানান তীরে বাক্সটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শেষে দেখতে পেলেন সেটিকে। তখন শিষ্যদের সাহায্যে তাঁর পর্ণকুটীরে তুলে আনলেন সেটিকে নদীর জল থেকে।

কিছুক্ষণ পর শিষ্যদের একটু দূরে একটা কাজ সেরে আসার অজুহাতে পাঠিয়ে দিলেন।

কেউ যখন রইল না ঐ কুটীরে, তখন বাক্সটি খুলতেই তাঁর মাথা ঘোরার উপক্রম হলো।

এতক্ষণ আবদ্ধ থাকার ফলে বাঁদরটি ভীষণ রেগে ছিল। সে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধুর ঘাড়ে। তারপর দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে, সাধুর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত করে তুলল। সাধু শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বাঁদর তাকে তখন ছেড়ে পালাল।

একেই বলে কর্মফল। ভালর ফল ভাল আর মন্দের ফল মন্দ হয়। মহাজনের মেয়ে রাজপ্রাসাদে সুখেই থাকতে লাগল আর এদিকে বাঁদরে তখন সাধুকে কাঁদিয়ে ছাড়ল।

'ক'এর কেরামতি

শ্রীজগজ্জীবন জানা

কালীঘাটে কাজ করে কাকা কৃষ্ণকালী
কষ্টেতে কাটায় কাল করিয়া কৌশলী।
কলহ করে না কাকা কভু কোন কালে,
কঠোর কঠিন কটু কেহ কয় কেলে।
কাকার কাজের ক্রম কল-কারখানা,
কত কর্ম করে কাকা কর্ম'ই কামনা।
কুপুত্র কার্তিকেয় কুকর্ম কল্পনা,
কখনও করে না কর্মের কিছু কণা।

কুচকুচে কালো কন্যা কাজল কমলা
কান্নাকাটি ক'রে কেনে কয়েকটি কলা।
কলসী কাঁখে কাজল কহে কানে কানে,
কমলা করে না কাজ কত কি কারণে।
কালো কাচের কাঠি কন্যার কুণ্ডলে,
কেতকী করবী কদম কিছু কণ্ঠমূলে।
কৃষ্ণকালীর কালো কায়া কৃশ ক্রমে ক্রমে
কেমনে করিবে কাজ কহ কি কারণে।

কালি করি কালি করি কপট কপালে
কালক্রমে কৃষ্ণকালী কালের কবলে।

উড়ো-পাখীর ডানা

শ্রীঅশোক দত্ত

এখন একটা পাখি, সে আকাশে উড়ে বেড়ায়, নাচে, গান গায়। একদিন সে উড়তে উড়তে এসে এক গাছের ডালে বসল। অনেকক্ষণ সে কি ভেবে আবার উড়ে গেল। উড়ে উড়ে এসে এক দালান-বাড়ির থামের মাথায় বসল। সেখানে একটা টিকটিকি ছিল। পাখি তাকে বলল—একটা কথা বলব ভাই?

টিকটিকি টিকটিক শব্দ করল—বলো, বলো।

—মাটি ছেড়ে, আকাশে উড়লুম কেন আমরা?…বলতে পার?

টিকটিকি আবার টিকটিক শব্দ করল—আমি তো ভাই তা জানি না, তুমি বরং কুমীরের কাছে যাও, সে তোমাদের কিছু খবর-টবর রাখে বোধ হয়।

পাখি উড়ে চলল আবার। কুমীর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না, ভাবতে ভাবতে উড়ে গেল পাখি। উড়ে যেতে যেতে রাত হোয়ে গেল। রাতে এক গাছে বিশ্রাম নিল। সকালে আবার চলল। যেতে যেতে এক জায়গায় দেখল—একটা কুমীর ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছে।

পাখি তার কাছে গিয়ে বলল—আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কুমীর করাতের মত দাঁতগুলো বের করে বলল—বলো।

—বলুন তো আমরা উড়লাম কেন, মাটিতে থাকতে দোষ কি ছিল?

কুমীর খুব চিন্তায় পড়ল। বলল,—ছাখো বাছা, তুমি ব্যাঙের কাছে যাও। তোমাদের কথা সে কিছু জানলেও জানতে পারে।

ব্যাঙের কাছে এসে পাখি সেই একই প্রশ্ন করে। ব্যাঙ ঘ্যাঙোর-ঘ্যাং ঘ্যাং করে বলল—আমি তোমাদের কথা কিছু জানি বটে, কিন্তু আমার থেকে মৎস্যরাজ তোমাদের ইতিহাস খুব ভাল জানেন। তাঁর কাছেই যাও।

পাখি উড়তে, উড়তে, উড়তে একটা প্রকাণ্ড পুকুরের ধারে গিয়ে বসল। কে জানে কখন মৎস্যরাজের দেখা পাওয়া যাবে। পাখি জলের ধারে বোসেই থাকে।

পাখি দেখল কি একটা মাছ গায়ে রঙিন চিকচিকে একটা জামা পরে তিড়িং তিড়িং করে ডাঙার কাছে আসতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আবার ফিরে গেল।…সেই মাছটা হচ্ছে মৎস্যরাজার দূত। দূত রাজাকে গিয়ে বলল—রাজা মশাই, রাজ্য-সীমানায় একটা পাখি এসেছে। তার মতিগতি কিন্তু ভাল নয়। আজ্ঞা হোক, কি করব এখন।

মৎস্যরাজ চিন্তিত হোলেন। বললেন—দেখ দূত, আমার মনে হচ্ছে সে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এসেছে। যাই হোক তুমি তার সঙ্গে দেখা কর। যাও…। আর হ্যাঁ, শোন, সাবধানে কথা বোলো। সেও আমাদের শত্রু।

রাজ-আজ্ঞা মাথায় নিয়ে মৎস্যদূত পাখির কাছে এলো, এসে দেখে—পাখি একইভাবে বোসে। পাখিকে বলল—আপনি কি চান?

—রাজার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

—আপনার পরিচয়পত্র এবং কি প্রয়োজন লিখে দিন, আমি রাজাকে গিয়ে দিয়ে আসছি।

—আমি আমার কথা কেবল রাজাকেই বলতে চাই—অপরকে নয়।

দূত দেখল—এতো খুব শক্ত প্রাণী। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজাকে গিয়ে খবর দিল। রাজা রেগে গেলেন। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জল তোলপাড় করতে করতে, ডাঙার কাছে এসে, জলে দেহ ডুবিয়ে শুধু মুখটা বাড়িয়ে বললেন—তুমি আমায় স্মরণ করেছ?

পাখি তাকে নমস্কার করে বলল—হ্যাঁ, মহারাজ। আমি আপনার কাছে এলাম—আমার জন্মবৃত্তান্ত এবং আমরা আকাশে উড়লাম কেন, তা জানার জন্যে। অনুগ্রহ করে আমায় নিবেদন করুন।

মৎস্যরাজ হাসলেন। বললেন—বেশ তোমার জন্ম-ইতিহাস এবং তোমরা আকাশে উড়লে কেন বলছি: সমতল ভূমি যখন আবির্ভাব হোল, প্রাণী জলজ জীবন থেকে স্থলে বাস করার সূত্র পেল। বাসভূমির এই পরিবর্তনের ফলে তাদের আভ্যন্তরিক গঠনেরও পরিবর্তন দেখা দিল। যেমন এই ধরো—ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য না চালিয়ে ফুসফুসের উদ্ভব হোল। আঁশের বদলে শরীরের উপরভাগে ত্বক দেখা দিল। যেমন, আমরা মাছেরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করি। আমাদের দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। পরবর্তী উন্নত জীব ব্যাঙ উভচর। এরা জলে এবং স্থলে উভয়েতেই বাস করতে পারে। স্থলের প্রথম জীব হিসাবে উভচরকে আমরা স্বীকার করি।

এরপরে উন্নত ধরণের জীব সরীসৃপ। উভচরের মধ্যে আমরা দেখেছি, তারা জলে সাঁতার কাটতে পারে, আবার ডাঙাতে লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সরীসৃপরাই প্রথম পৃথিবীতে সহজভাবে চলাফেরা করেছে। এই গোষ্ঠীর সভ্য-সংখ্যা কিন্তু প্রচুর। কচ্ছপ, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী হতে আরম্ভ করে হাঙর, কুমীর প্রভৃতি পৃথিবীতে ছড়ানো আছে অনেক। এদের মধ্যে কারোর চলাফেরার জন্য বিশেষ অঙ্গ আছে, আবার কারোর ক্ষেত্রে তার অভাব। তারা সাধারণতঃ বুকে ভর দিয়ে চলে।

সরীসৃপ অধ্যায়ের পর যে জীবের পরিচয় পাই, তারা জল ও স্থল ত্যাগ করে আকাশের দিকে ছুটে চলেছে। তারা হচ্ছ তোমরা।

পাখি বলল—কেন রাজামশাই?

মৎস্যরাজ বললেন—ধৈর্য ধরো, সব বলছি। তোমরা যে আকাশের দিকে ছুটে চলেছ, তার পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আভ্যন্তরিক গঠনের বৈচিত্র্য। যে জীব জল ছেড়ে স্থলে আশ্রয় নিল, তারাই সভ্য। আর আজ যারা আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—উড়বার পেছনে আছে ডানা! সরীসৃপের সামনের অঙ্গ উড়বার প্রয়োজনে ডানায় পরিণত হয়েছে। এই ডানা নাড়বার জন্ত তোমাদের আছে শক্ত মাংসপেশী। অন্ত জীবের সামনের ভাগে যেমন বাহু থাকে, ডানাও সেই জিনিস। তোমাদের হাড়ের আকার ও ওজন ক্রমে হালকা হতে গিয়ে ফাঁপা ও বায়ুপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তখনকার দিনে প্রকৃতির অবস্থা বিচার করলে মনে হয়, তোমাদের আকাশে আশ্রয় নেওয়া ছেড়া উপায় ছিল না। কারণ পূর্বোক্ত সরীসৃপ জাতীয় ডাইনোসরাস বলে একরকম যে জীব ছিল, তা বর্তমান হাতীর একশো গুণের বেশী। এই রকম কয়েক হাজার জীব পৃথিবীতে থাকলে এখানে তিল ধারণের আর স্থান হোত না—এই কথা পাখিকে বলে মৎস্যরাজ তাঁর সদলবল নিয়ে জলে ডুব দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

হালুম

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

ভোঁদড়, বাঁদর, ইঁদুর, বেড়াল, ছুঁচো।
ভেড়া, ছাগল ঘোড়া, ব্যাঙ্, গাধা ও কেঁচো,
আধ-পেটা খেয়ে, জুটে পুটে কহে, "সেলাম
ব্যাঘ্র মশাই, এবার আমরা যে গেলাম।"
এসেছিল তারা মুক্তকচ্ছ, ও হন্তদন্ত।
জরুরি ব্যাপার, তক্ষুনি চাই তদন্ত।
ব্যাঘ্র কহিল, "ডাকলে একটা মিটিং
বক্তিমে দিয়ে ভাঙিব সকল চিটিং।
কণ্ঠে মাখিয়া স্বরভঙ্গের মালিশ।
সালিশী গাহ্রায় হুঙ্কারের পালিশ।"

উহারা কহিল, "ব্যাঘ্র মশাই ধন্য,
মুখ গহ্বর মেলি শার্দুল হাসে বন্য।
গাধা দেয় ঢোল, ছুঁচো ব্যাঙ বয় পোষ্টার
ভেড়া ও ছাগল দু'জনেতে লেখে রোষ্টার!
থমথমে সভা—গমগমে স্বরে ব্যাঘ্র
কহে, "স্বরভঙ্গের মালিশ চাই শীঘ্র।"
কি করা? তারা তোয়াজ করে গর্দভ,
যাও লম্বকর্ণ সব সেরা সভাসদ।
পেট-ভরা ক্ষুধা, ব্যাঘ্র করিল হালুম।
সেলাম ভুলি সবাই চেঁচায়, "গেলুম!"

মহাশ্বেতা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কাশী পর্যন্ত আর পৌছনো হল না বাঁটুলের। কাশীর উলটো দিকে যাকে বলে ব্যাসকাশী সেখান অবধি পৌছবার আগেই সে ধরা পড়ল।

পড়বি তো পড়, একেবারে সেপাইদের হাতে। মাঝিটা অবশ্য বলেছিল, 'বাছা, তোমার বয়স কম, তায় বাঙালী। সেপাইরা, মানুষজন, সব দলে দলে রাতের আঁধারে গঙ্গা পেরিয়ে পালাচ্ছে। ওরা কত টাকা দিচ্ছে জান? যত চাইব তত দেবে, হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম হচ্ছে বলওয়া!'

'বলওয়া!'

'হ্যাঁ বাছা। কাশীতে সেপাইদের সঙ্গে সায়েবদের কি হচ্ছে জান?'

'কি?'

'সায়েব মানে নীল সায়েব এসে, সেপাইদের ধরে কচুকাটা করছে!'

'কেন?'

'আরে, সেপাইরা তো সায়েবদের ওপর মহা খাপ্পা। ওদের বোলবোলাও বাড়ছে, আমাদের দেশের হীরে-মুক্তো নিয়ে গিয়ে ওদের মহারাণী তো নিজের সিন্ধুকে সব পৌটল ভরে রেখে দিয়েছে, জান? আমাদের রাজাদের সব যা অবস্থা! সবাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তাতে সেপাইদের কি?'

'তাও বুঝলে না বোকচন্দর? কাশীর রাজা, অযোধ্যার নবাব, এক-একজনকে রাজ্যি ছাড়া করলে তাদের প্রজাদের রাগ হবে না? রাজার তো রাজ্যি গেল। সেই সঙ্গে "প্রজাদেরও হাল বল, মাঠ বল, ক্ষেত বল, সব জলাঞ্জলি গেল না?"

'সেপাইরা কি সেইজন্যেই ক্ষেপল?'

'আজ্ঞে না। সেপাইদের দাঁতে টোটা কাটতে বললে কেন? টোটাতে শুয়োরের আর গোরুর চর্বি থাকে না?'

'সেই জন্যে?'

'হ্যাঁ বাছা। কাশীতে সায়েবরা তো সেপাইদের ধরে ধরে, সেপাইদের সঙ্গে যাদের যোগসাজস আছে তাদের অব্দি ধরে ধরে গাছের ডালে লটকাতে লেগেছে। হুঁ হুঁ বাবা!'

'তাহলে উপায়?'

'তোমার তো মহামুস্কিল। তুমি বাঙালী, আর বাঙালীদের উপর সেপাইদের ভীষণ রাগ। বাঙালীরা সায়েবদের দলে কিনা!'

'যাঃ!'

'শহর ছেড়ে যারা রাতেভিতে পালাচ্ছে তারা নৌকোর মাঝিদের এত এত টাকা দিচ্ছে। তোমাকে কাশীতে কোন্ মাঝিটা পৌছবে বাপু? আবার এদিক পানেই বা যাচ্ছ কেন? সেপাইরা তোমাকে দেখলে পরে কি লাড্ডু আর পাঁাড়া খাওয়াবে?'

বাঁটুল কথা না বলে চলতে লাগল। মাঝিটা দেখল ছেলেটা বড়ই একরোখা। সে আস্তে আস্তে বলল, 'তার চে' তুমি আমার সঙ্গে চল না কেন?'

'কোন চুলোয়?' আসলে বাঁটুলের এখন কান্না পাচ্ছে।

'আমার গাঁয়ে? ঐ অনেক দূরে আমাদের গাঁ। ওখানে বাপু এখনো বলওয়া ঢুকে পড়েনি। খাওয়াদাওয়া, বাজার-হাট একটু গোলমেলে হয়ে গিয়েছে বটে। এই সর্বনেশে হইচই-এর মধ্যিখানে কি আর সে সব ধীরে-সবুরে হয়? তবু বুধনীর মা তো এত এত মকাই বস্তা ভরে রেখে দিয়েছে, বুঝলে না? মকাই-এর দিব্যি খই হয়, আর সেদ্ধ করে গুড় দিয়ে খেতেও বেশ লাগে। আর আচার, খেসারীর ডাল, বুধনী আর চইতা তো তাই দিয়েই খেয়ে নেয়।'

বাঁটুলের মনে হল এক্ষুণি মাঝির সংগে চলে যায়। বুধনী আর চইতা বোধ হয় ওর ছেলেমেয়ে। আচ্ছা, ওর যদি এমন সুন্দর গাঁ থাকে, আর মকাই-এর বস্তা, মাটির ভাড়ে আচার, ছেলেপুলে, তাহ'লে ও কেন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

'তুমি বাড়ী যাওনা মাঝি, তুমি কেন এমন করে ঘুরছ!'

'শখ করে কি আর!' মাঝি একটু নিঃশ্বাস ফেলল। আসলে এই ক'দিনে ও অনেক টাকা জমিয়েছে। করকরে রুপোর টাকা! ছেলেটাকে সে-কথা বলে কি হবে? কিন্তু বাঁটুলের জন্যে ওর কষ্ট হতে লাগল।

'ব্যাসকাশীতে দেখবে ঘাট ভরা নৌকো। ওদিক থেকে নৌকো এনে দিনমানে এপারে রাখে। রাত হলে তবে ওদিকে নিয়ে গিয়ে যাত্রী আনে। একটা নৌকোতে লুকিয়ে থেকে যেয়ো, কাশী পৌঁছে যাবে।'

বাঁটুল সেই বুদ্ধিই করেছিল। ব্যাসকাশীতে পৌঁছে দেখে সে কি নৌকো, কত নৌকো, তার লেখাজোখা নেই। একটা নৌকো দিব্যি পিপুলগাছের ছায়ায় বাঁধা, তার চালের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে একটা ছোট ছেলে ঘুমোচ্ছে। বাঁটুল গুটিসুটি মেরে সেই নৌকোর পাশে যে বজরাটা বাঁধা ছিল তাতে ঢুকে গেল। বজরাতে একটা বড় ঘর, একটা ছোট ঘর। ছোট ঘরটায় এত এত পাটের শন গাদা করা। বাঁটুল তার ওপর দিব্যি গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে ভাবল চোখটা বুজে থাকি বাবা, তবে কিছুতে ঘুমোব না। ঘুমোলে পরেই সর্বনাশ!

আর সর্বনাশ! যেমন শোয়া অমনি ঘুম। সে কি ঘুম রে বাবা! আঁটুল গাঁয়ে থাকতে বাঁটুল মাঝে মাঝে কুম্ভকর্ণের মত ঘুম লাগাত। এত ঘুমোত যে, কত সময়ে মামীমা মনে ভাবত ছেলেটাকে বুঝি ঘুমের মধ্যেই সাপে খেলে। দুর্গাপুজোর সময়ে, সরস্বতী পুজোর সময়ে, ভোররাত্তিরে ফুল তোলার জন্য উঠতে পারত না বাঁটুল। পরে অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলে মামীমার ওপর সে কি হম্বি-তম্বি—আমায় ডেকে দিলে না, ওরা সব ফুল তুলে নিলে, কত কি!

বাঁটুল তাই মনের সুখে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ, এক রামঝাঁকানি খেয়ে হুড়মুড়িয়ে সে ধপ করে পড়ে গেল।

'কৌন্ বা রে?' কি বাজখেঁয়ে গলা রে বাবা! বাঁটুল হকচকিয়ে জেগে উঠে দেখে কি, চার-পাঁচটা সাক্ষাৎ দুশমনের মত লোক।

'তুই কে? অ্যাঁ? এ যে বাঙালীর বাচ্চা মনে হচ্ছে?' যে লোকটা বললে তার চেহারা ঠিক একটা মস্তবড় মূলোর মত। লম্বা, সিড়িঙ্গে, কানে গোছা গোছা লোম, তার পর গলায় একটা এতবড় মাদুলী। তাতে যা চেহারার খোলতাই হয়েছে, দেখে বাঁটুলের হাসি পেল।

'তুই কে? কেন এসেছিস? আমাদের বজরার খবর তোকে কে দিলে?'

'একজন বললে, 'নির্ঘাৎ রামভরোসের লোক।

বাঁটুল বললে, 'মোটেও না।'

'তবে এখানে এলি কি করে?'

'তোমরা যেমন করে এসেছ। পায়ে হেঁটে?'

'বটে! খুব যে বুলি ছুটছে। বলি নামখানা কি?'

একজন ষণ্ডামত লোক হাই তুলে বললে, 'অতকথায় কাজ কি বাপু! দেখতে পাচ্ছ বাঙালীর ছেলে, একদিকের কান কেটে বের করে দাও। নয় তো আমাকে বল, আমি ঐ ওপাশে নিয়ে গিয়ে...লোকটা তার লম্বা তরোয়ালের ওপর আঙ্গুল আলগোছে বুলিয়ে হাসল।

বাঁটুলের চোখের তারায় ভয় চমকে উঠল। একটি লোক, ওদের চেয়ে অনেক সুন্দর চেহারা, আর গলার ওপর চাদর জড়ানো। সে বললে, 'না, ব্রিজলাল!'

'কেন, বাঙালীরা তো ফিরিঙ্গীদের দলে বাপু! তুমিই তো আমাদের কতবার বলেছ।'

'দেখতে পাচ্ছ না ছোট ছেলে? আর ও যে ব্রাহ্মণ! গলায় পইতে, কানে ফুটো, দেখছ না?'

'হলেই বা বামুন! তুমি তো রাজবাড়ীর ছেলে, তোমায় ওরা ফাঁসীতে লটকে দেয়নি? আমরা তখনি গিয়ে পড়লাম বলে না তুমি বাঁচলে?'

'ওকে মারলে কি আমার গলার ঘা-টা তাড়াতাড়ি সারবে বাপু?' লোকটি গলা থেকে চাদরটা সরাল। বলল, 'এ এক জ্বালা হল বটে! মলম কোথায় পাই! বেটারা ফাঁসা দিবি তো দিব্যি মোলায়েম নরম-সরম দড়ি পরা? তা না একটা খসখসে দড়ি পরিয়ে আমার গলায় ঘা করে দিলে!'

বাঁটুলের চোখ ছানাবড়া। গলা ঘিরে দগদগে লাল ঘা! রক্ত জমে, চামড়া ছিঁড়ে সে কি বীভৎস দেখতে।

'পিদীমের তেল নেই?' বাঁটুল আস্তে বললে।

'তাতে কি হবে?'

'ঘা সেরে যাবে। মাছি বসবে না।'

লোকটি একটু হাসল, বলল, 'তুমি এখানে কেমন করে এলে বল তো?'

'আমি আমার বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'কানপুরে।'

'তোমার বাবার নাম কি?'

'গোপাললাল বাঁড়ুজ্জে।'

'বটে?'

'হ্যা, আমার বাবা খুব বড় কাজ করেন, সবাই তাঁকে চেনে। আমি, আমি তাঁকে চিনি না।'

ব্রিজলাল গর্জন করে বললে, 'তুই বাঁড়ুজ্জে বাবুর ছেলে? তাই বল্! তবে তো আজকে তোকে···তোর বাবাকে আমরা সবাই বলেছিলাম এস, আমাদের দলে এস। বেটা এমন শয়তান, যে সায়েবদের দলে যোগ দেবে বলে কাছে যত টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে পালালো? বললে, সায়েবরা টাকা গচ্ছিত রেখেছে, তাদের হাতে ফিরিয়ে দেব। তোকে যখন হাতে পেয়েছি।'···

কিন্তু সেই লোকটি আবার বলল, 'না ব্রিজলাল।'

'কেন, নয় কেন শুনি?'

'ধর আমি মানা করছি বলে? আমি এখনো তোমাদের সুবাদার, বুঝলে? আমার কথা শুনবে বলে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ। ছেলেটাকে ডাক, ওকে আমি সব জিগ্যেস করতে চাই।'

বাঁটুল সব কথাই বললে। একটি কথাও বাদ দিল না, আর বলতে বলতে একসময়ে ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেললে। আসলে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে কাঁদলে বাঁটুলের মনটা বেশ হালকা হয়।

লোকটি বললে, 'সব কথাই বুঝলাম। কিন্তু এখন আমি যদি তোমায় ছেড়ে দিই, তা' হলে ঐ ব্রিজলালরা তোমায় কচুকাট করতে দেরি করবে না। তোমার বাবা, আমি যদ্দুর জানি, এখনো কানপুরের কাছাকাছিই আছে। তুমি কি সেখানে যাবে?'

'আজ্ঞে।' আসলে, লোকটা কোথাকার রাজা শুনে বাঁটুলের খুব ভক্তি হয়েছে। বাঁটুল কোনদিন রাজরাজড়া চোখে দেখেনি, দেখবে বলে ভাবেও নি।

'যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথে ফিরিঙ্গীরা থাকলে তবু নিস্তার পাবে। আমাদের লোকেরা তো তোমাকে দেখলেই।'...

'কিন্তু আমি যাবই যাব।'

'তা'হলে এক কাজ করতে পারি, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। যেখানে সুবিধে দেখব, সেখানে তোমাকে বরং ছেড়ে দেব। কেমন? তুমি নিজে নিজে চলে যেও। তোমাকে সবসময় সঙ্গে রাখলে যদি ফিরিঙ্গীরা ধরে, তাহলে আমাদের লোক মনে করে ফাঁসীতে চড়াবে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। তোমার চেয়ে আমার খুড়তুতো ভাই দুটোর বয়স তো অনেক কমই ছিল।'

'তাদের দুজনকে ফাঁসী দিয়েছে ?'

'নিশ্চয়। সাধে কি আর ব্রিজলালরা ক্ষেপে আছে ?'

'ফিরিঙ্গীরা তো ওপারেই আছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমরা পালাচ্ছ না কেন ?'

'যত নৌকো সব এপারে রেখেছি দেখছ না ? সন্ধ্যেটি হলেই নৌকো নিয়ে ওপারে গিয়ে যারা পালাতে চায় তাদের এপারে আনব। নিজেরা পালালেই তো হল না, আমাদের লোকজনদেরও তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে ?'

'তোমরা কখন পালাবে ?'

'দেখা যাবে। এখন চুপ করে বসে থাক না, মজাটা শুনতে পাবে।'

কি আর মজা! ফটাফট্ ফটাফট্ গুলীর শব্দ, আর লোকের আর্ত চীৎকার। নদীর ওপারে কাশী শহরের ওপর সে কি আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী! এইসব শুনতে শুনতে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা গঙ্গায় নাইলে, পাথরের উনোন জ্বেলে ফুটন্ত জলে আটার লেচি ফেলে দিয়ে দিয়ে লেট্টিও বানালে কয়েকটা। লেট্টি আর আচার, লবণ দিয়ে দিয়ে ওরাও খেলে, বাঁটুলও খেলে।

আর যেমন না রাত হল, অমনি যত নৌকো ছিল, সব নৌকো ওপারে চলে যেতে থাকল। শুধু এই পারে গাছের তলায় সেই লোকটি বসে রইল। সেই ওদের সুবাদার সাহেব না কে যেন!

সবাই চলে গেলে পর সে বাঁটুলকে বলল, 'তুমি তো রাস্তাঘাট কিছুই চেন না।'

'না!'

'তা দেখ, আমার সঙ্গী-সাথীরা বাপু, লোক তেমন সুবিধের নয়। আমি তোমাকে যখনই বলব, তখনই কিন্তু তুমি পালিয়ে প্রাণ বাঁচিও। ওরা এক-একজন এমন ক্ষ্যাপা, যে আমার কথা মোটেই শুনবে না।

সেদিনই রাত বরাবর ওরা উত্তর দিকে রওনা হল। এদিক দিয়ে ওরা, গঙ্গার ওপার দিয়ে সায়েবরা। দু'দলই উত্তরে যাবে। (ক্রমশঃ)

টপ-সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর নাম শুনেছ? নিশ্চয় শোননি। কারণ দুনিয়ার সবাই জানে যে আমেরিকার স্পাইং-এর আড্ডাখানা হলো সেণ্ট্রাল ইনটেলিজিন্স এজেন্সী। বিদেশের কোথায় কী ঘটছে, সবই সি.আই.এ'র নখদর্পণে। দেশের ভিতর কোন হৈ-হল্লা হলো তো ডাক পড়লো ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন বা এফ. বী. আই দপ্তরের। এককালে সি. আই. এ'র বড়োকর্তা ছিলেন এ্যালান ডালেস। বলতে গেলে তিনিই সি.আই.এ'কে সৃষ্টি করেছেন। আর এফ. বী. আই-এর হর্তাকর্তা-বিধাতা হলেন এডগার লুভার।

কিন্তু ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী বা এন. এস. এ'র নাম তোমাদের জানা নেই। আমেরিকান সরকারকে জিজ্ঞেস করো এন. এস. আই. কী? জবাব মিলবে: এই দপ্তর ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের রিসার্চ এবং ট্রেনিং-এর কাজ করে।

কিন্তু এন. এস. এ'র আসল কাজ হলো স্পাইং। সি. আই. এ'র মতো এই দপ্তরের নাম-ডাক না থাকতে পারে, কিন্তু কর্মচারীর সংখ্যায় এবং পয়সা খরচের ব্যাপারে এন. এস. এ, সি. আই. এ'র চাইতে ছোট নয়।

এন. এস. এ'র আসল কাজ হলো পৃথিবীর বিদেশী গভর্নমেণ্টের কোড ভাঙা। পাকিস্তান সরকার হয়তো কোডে কোন টেলিগ্রাম ওয়াশিংটনে পাকিস্তান এম্বাসীর কাছে গোপনীয় নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। এন. এস. এ'র কর্মচারীরা সেই কোড টেলিগ্রাম ডি-কোড বা ভাঙতে সুরু করলে। এন. এস. আই'র আর একটি কাজ হলো আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট বা আর্মির টেলিগ্রামের জন্যে কোড তৈরী করা। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা হয়তো জানতে পারলেন যে, তাঁদের কোড বিদেশী সরকারের হাতে গিয়ে পড়েছে। এন. এস. আই'র কাছে অনুরোধ গেলো নতুন কোড বানাও। এন. এস. আই'র তৃতীয় কাজ হলো রেডিও মারফত বিদেশী সরকারের সমস্ত সংবাদ 'মনিটর' করা, অর্থাৎ সে সম্বন্ধে অবহিত করা বা সতর্ক করে দেওয়া। চার নম্বর কাজ হলো কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর কোথায় রাডার যন্ত্র বসানো আছে তারই উপর নজর রাখা।

এই রাডার যন্ত্র নিরীক্ষণ করার কাজটি শুধুমাত্র গোপনীয় নয়, বিশেষ প্রয়োজনীয়ও। যেদিন ফ্রান্সিস গাই পাওয়ার রুশ দেশের ওপর দিয়ে উড়তে গিয়ে ধরা পড়লেন, সেই মুহূর্তেই এন. এস. আই'র যন্ত্রে জানা গেলো যে, গাই পাওয়ার বিপদে পড়েছেন। কারণ এন. এস আই'র যন্ত্রে দেখা গেলো, গাই পাওয়ারের প্লেন বিগড়েছে এবং প্লেন ৩৬,০০০ ফিট থেকে ক্রমেই নীচে নেমে আসছে। তারপর কোরিয়ার যুদ্ধে কোরিয়ানদের হয়ে প্লেন চালাচ্ছে

কে? ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর যন্ত্রে দেখা গেলো যে, রুশ পাইলটরা প্লেন চালাচ্ছে। এমনি ধরণের বিস্তর খবর সংগ্রহ করা হলো এন. এস. আই'র কাজ।

এন. এস. আই'র দপ্তরের জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে। এই বছরেই সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী গঠন করা হয়। সরকারী সংবাদে বলা হলো যে, এন. এস. আই'র কাজ হবে আর্মির জন্যে 'সাইফারের' কাজ করা।

কাজকর্মের সুবিধের জন্যে এন. এস. আই'কে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম বিভাগের নাম হলো 'প্রড' (অর্থাৎ প্রডাকসন্ বিভাগ), এই বিভাগের ভেতর আরো কয়েকটি সাবডিভিশন আছে। একটি সাবডিভিশনের নাম হলো 'এডভা'। 'এডভা'র কাজ হলো সোভিয়েত সরকারের 'সাইফার' নিয়ে গবেষণা করা। আর একটি সাবডিভিশনের নাম হলো 'আকম্'। আকম্, এশিয়ার কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর 'সাইফার' এবং 'কোড' নিয়ে কাজ করে। তৃতীয় সাবডিভিশনের নাম হলো 'এ্যালো'। এই দপ্তরের কাজ হলো মিত্র দেশ, এবং যারা তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যে সব দেশ মিত্রও নয় শত্রুও নয়, তাদের কোড এবং সাইফার নিয়ে কাজ করা। চতুর্থ সাবডিভিশনের নাম হলো 'এনপরো'। এই দপ্তরে ইলেকট্রনিক কমপুটার নিয়ে কাজ করা হয়।

এন. এস. অই'র রিসার্চ এবং গবেষণা দপ্তরও বেশ বড়ো। এই দপ্তরের একটি সাবডিভিশনের নাম হলো 'রেম্প'। রেম্প সাবডিভিশনে ক্রিপ্টো. এ্যানালিসিস নিয়ে গবেষণা করা হয়। অন্য সাবডিভিশনের নাম হলো 'রাডে'। এইখানে রেডিও রিসিভার এবং ট্রানস্মিটার নিয়ে গবেষণা করা হয়। তৃতীয় সাবডিভিশনের নাম হলো 'স্টেড'। এইখানে সাইফার মেশিন নিয়ে কাজ করা হয়।

এন. এস. আই'র তৃতীয় দপ্তরের নাম হলো 'কমসেক'। এইখানে আমেরিকান সরকারের সিকিউরিটি এবং সাইফার নিয়ে কাজ করা হয়। চতুর্থ দপ্তরের নাম হলো 'সেক' অথবা 'পার্সন্যাল ডিপার্টমেণ্ট'।

এন. এস. আই'র প্রধানকর্তা হলেন এডমিরাল ফরেন্স ফ্রষ্ট।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপন হবার পরও কেউ এই দপ্তর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। কারণ, এন. এস. আই'র নাম সবার কাছেই অজ্ঞাত ছিলো। কিন্তু হঠাৎ এক দিন দেখা গেলো যে, এন. এস. আই'র কীর্তিকলাপ নিয়ে সবাই আলোচনা শুরু করেছে। তার কারণ এন. এস. আই'র কর্মচারী জোসেফ সিডনি প্যাটারসনকে স্পাইং-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এককালে প্যাটারসন স্কুলে ফিজিক্স পড়াতেন। ১৯৪০ সালে একদিন সিগন্যাল

গোয়েন্দারা প্যাটারসনের বাড়ী খানাতল্লাসী করছে।

কোরের ইনটেলিজেন্স অফিসার কর্ণেল আইকেনের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। ক্রিপ্টো এ্যানালিষ্টের কাজের জন্যে তাঁকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। বছর খানেক ট্রেনিং-এর পর তাঁকে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হলো।

যুদ্ধের সময় প্যাটারসনের ডাচঃ কর্ণেল ভেরকুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। লড়াই শেষ হলো। ভেরকুল দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু যাবার আগে আরো কয়েকজন ডাচের সঙ্গে প্যাটারসনের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১৯৩৭ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপিত হলো। প্যাটারসন এই দপ্তরে যোগ দিলেন। ট্রেনিং দপ্তরে তিনি কাজ করতেন।

এক বছর বাদে প্যাটারসন এক কাণ্ড করে বসলেন। একদিন দপ্তর থেকে চাইনীজ কমার্শিয়াল কোডের বই নিয়ে বাড়ীতে গেলেন।

আশ্চর্য এই চাইনীজ কমার্শিয়াল কোড। দশ হাজার চাইনীজ অক্ষরকে মাত্র চারটি সংখ্যায় পরিণত করা হয়েছে। এর পর থেকে প্রায়ই গোপনীয় কাগজপত্র প্যাটারসন তার বাড়ীতে নিয়ে আসতেন। এর ভেতর হ্যাগলিন বলে ক্রিপ্টোগ্রাফ মেশিন সম্বন্ধে সিক্রেট কাগজপত্র ছিলো। আর একটি দলিলে ছিলো উত্তর কোরিয়ায় সিকিউরিটি ট্রাফিক সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল অবধি প্যাটারসন এই সকল গোপনীয় কাগজপত্র ডাচ এম্বাসীর কম্যুনিকেশন অফিসার গিয়াকমো ষ্টুডের হাতে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একদিন প্যাটারসন ষ্টুডকে বললেন যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী ডাচ এম্বাসীর সাইফারকে ডি-কোড করতে সক্ষম হয়েছে।

অবশ্যি এই সংবাদের পরিবর্তে প্যাটারসন ডাচ এম্বাসী থেকে কোন টাকা নেয়নি। শুধু মাত্র বন্ধুত্বের খাতিরেই করেছিলেন।

তারপর একদিন প্যাটারসন ওয়াশিংটন পোষ্টে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে অভিযোগ করলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বিনা কারণে দোষারোপ করা হয়। এই অভিযোগের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের হয়রানি করা।

এফ. বী. আই'র কর্তারা ওয়াশিংটন পোষ্টে প্রকাশিত চিঠিখানা মনোযোগ সহকারে পড়লেন। তদন্ত সুরু হলো, প্যাটারসন কে? কী তার পেশা?

একদিন এফ. বী. আই'র গোয়েন্দারা এসে প্যাটারসনকে গ্রেপ্তার করলে। এবার জেরা সুরু হলো। প্যাটারসন গোয়েন্দাদের সব প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাবে এফ. বী. আই'র কর্তারা সন্তুষ্ট হলেন না। প্যাটারসনের বাড়ী খানাতল্লাসী হলো। বহু গোপনীয় কাগজপত্র প্যাটারসনের টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া গেলো।

এফ. বী. আই'র প্রশ্নের জবাবে প্যাটারসন বললেন: এই সব কাগজ বাড়ীতে পড়তে এনেছিলাম। ফেরত দিতে ভুলে গেছি।

বিচার শুরু হলো। এফ. বী. আই অভিযোগ করলে যে, প্যাটারসন গোপনীয় দলিলপত্রের নকল করে বাজারে বিক্রী করেছে।

বিচারে প্রকাশ পেলো, যে সমস্ত দলিলপত্র প্যাটারসনের কাছে পাওয়া গেছে সবই গোপনীয় দলিলপত্র নয়। ভুলে সেই সমস্ত কাগজগুলো টপ-সিক্রেট লেখা হয়েছে। আসলে সেগুলো অতি সাধারণ ফাইল।

প্যাটারসনের সাজা হলো সাত বছরের জেল। জীবনে প্যাটারসনকে কোনদিন থানায় হাজিরা দিতে হয়নি। কিন্তু আজ এফ. বী. আই অভিযোগ করলে যে, প্যাটারসন এক দুঃসাহসিক স্পাই। আর শুধু তাই নয়, প্যাটারসন নিজের দোষ স্বীকার করলেন। অতএব প্যাটারসনকে জেলে পাঠাতে এফ. বী. আই'র একটুও কষ্ট হলো না।

কিন্তু আজ অবধি সবার মনে একটা খট্‌কা লেগে আছে যে, সত্যিই প্যাটারসন স্পাই ছিলো, না নেহাৎ মূর্খামি করে গোপনীয় ফাইলগুলো বাড়ীতে এনেছিলো।

আলেয়ার বিভ্রান্তি

ডাঃ বিমলরঞ্জন দে

অনেক দিন হলো, কাছাড় জেলার ডারবি চা বাগান হতে পূর্ণিমার রাত প্রায় ১১টার সময় বায়স্কোপ দেখে নরসিংহপুর রওয়ানা হলুম। ডারবি চা বাগানের ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার বাবুর অসুস্থ কন্যাকে দেখতে হাসপাতালের কাজ শেষ করে দুপুরবেলাই সেখানে যাই। চা বাগানের বন্ধুবান্ধবরা বিকেল বেলা ফিরতে দিলেন না; কি একটা উৎসব উপলক্ষে বাগানে বায়স্কোপ দেখানো হবে। ৩৫ বৎসর পূর্বের বায়োস্কোপ, বাগানসুদ্ধ লোক বিকেল হতে না হতে মাঠে জড়ো হয়ে ছবি দেখার জন্য বসে আছে—তা'ও আবার আরম্ভ হবে রাত্রির খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় ৯টার সময়। আতিথ্য গ্রহণ করে ছবি দেখতে বসে গেলাম। ভারতীয় ছবি—নির্বাক। জানি না সবাক হলে কি হ'ত! রাজা কোন্ এক সেনাপতিকে বন্দী করে রেখেছেন। জেলে থেকে থেকে—নিশ্চয়ই দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদী—সেনাপতির "ঘ্যাইসা মোছ, তেইসা দাড়ি" গজিয়েছে। হাতে-পায়ে ইয়া বড় বড় শেকল বাঁধা। ঐ নিয়েই জেলের চৌহদ্দির মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ান, মানে—একসাসাইজ করেন। সেই যে চৌহদ্দি—তার মাঝখান দিয়ে একটা ঝরনা থেকে জল বাইরে ছুটে চলেছে—তরতর করে। এর মধ্যে রাজকন্যা (রাজবাড়ীটাও আবার কয়েদখানার কাছেই)—স্বয়ংবরা হচ্ছেন। সে সভা কয়েদখানা থেকে দেখাও যাচ্ছে। সেনাপতি অনেক ভেবেচিন্তে শেকল টেনে টেনে ঝরনার পাশে যেয়ে, যেখানে জল স্থির হয়ে আছে, সেখানে জলের মধ্যে মুখের আদলটা দেখে নিলে। তারপর একটা ধারালো পাথর (সব জিনিসই কাছে-কাছেই ছিল) দিয়ে, উপুড় হয়ে, দাড়ি গোফ আর একটা পাথরের উপর রেখে ঠুকে ঠুকে, একেবারে ফ্রেঞ্চকাট করে নিলে। শেষে যা হলো তা আর লিখে কি হবে—! সেই অবস্থায়ই শেকল টেনে টেনে পাহারাদারদের মাথায় শেকল মেরে অজ্ঞান করে—স্বয়ংবর সভায় হাজির—আর মাল্যদান তারই বরাতে লিখা ছিল যে, সে তো বুঝতেই পাচ্ছ। অমন বীরকে মালা না দিয়ে রাজার মেয়ে আর কাকে মালা দিবেন?

অনেক রাত হয়েছে—শেষ দৃশ্য দেখার লোভ ছেড়ে, বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলে রওয়ানা দিলাম। প্রায় ৬।৭ মাইল রাস্তা—অর্ধেক রাস্তা আবার জঙ্গলের পাশ দিয়ে—('পরে জানতে পেরেছি, সেই জঙ্গলে বাগানের ম্যানেজার বাঘ মেরেছেন) শীতের রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাইল পাঁচেক বেশ জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে বাগানের সীমানা পার হলাম। তারপর মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। যেতে যেতে অনেক দূরে—বেশ কয়েকটা আলো যেন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে মনে হলো। বিস্তৃত মাঠ—পাতলা

কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছে। বাঁ দিকে তাকাচ্ছি, ভাবছি, আর সাইকেল চালিয়ে সেই নির্জন রাতে চলেছি। সেই রাস্তা এসে যেখানে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে—সেখানে এসে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম; পাশেই বাবুরবাজার হাট। দোকানীদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—আলোও অনেক দোকানে বন্ধ দোরের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মনে বেশ একটু সাহস এনে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে থেকে যা দেখলাম, তা'তে নিজেই বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। শিলচর শহর থেকে ঐ রাস্তা ধলাই বাজার পর্যন্ত গিয়েছে—রাতে ঐ রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী করে হাটে নানা রকমের জিনিসপত্তর নিয়ে গাড়োয়ানরা যাচ্ছে। নিয়মমাফিক প্রত্যেক গাড়ীর নীচে লণ্ঠনের আলো ঝোলানো রয়েছে। গাড়ীর চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে একবার আলো দেখা যাচ্ছিল, আবার চাকার ভেতরকার আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠের আড়ালে যেতেই, দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাঠের রাস্তা যা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাওয়া বড় রাস্তার সঙ্গে, পশ্চিম থেকে পূব দিকে এসে মিশেছে আর আমি সেই রাস্তা থেকে ঐ আলো-আঁধারের খেলাকে ভৌতিক আলো—আলেয়া বলে মনে কচ্ছিলাম।

এবার সত্যি আলেয়া দেখার গল্পটা বলছি। সেই নরসিংহপুরের হাসপাতাল—বর্ষাকাল—৫ মাইল দূরে পালংঘাট; সেখান থেকে রুক্নী চা বাগান আরো মাইল তিনেক। চা বাগানের ম্যানেজারই আবার হাসপাতালের সেক্রেটারী—সরকারী কাজ নিয়ে সেখানে যেতে হয়েছিল। তারপর যা হয়, বিদেশে বন্ধুবান্ধবদের আদর-আপ্যায়ন অনেকটা অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছয়। পালংঘাট থেকে যখন রওয়ানা হলাম, তখন টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার রাত্রি, তার উপর সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। মাইল তিনেক আবার কাঁচা রাস্তা—রাস্তার মাঝে মাঝে কাদায় সাইকেল ঠেলে যেতে হচ্ছে। সাইকেলের বেশ বড় লুকাস কারবাইড্‌ বাতি জ্বালিয়ে চলেছি। পাকা রাস্তাটা মাইল দেড়েক মাঠের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে—দুই পাশের গ্রাম বেশ দূরে দূরে—এক দিকের গ্রাম তো মাইলখানেকের উপর। মাঠ জলে থৈ থৈ কচ্ছে—কোথাও আবার জল রাস্তার উপর দিয়েই এ-পাশ থেকে ও-পাশে বয়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে দূরে দূরে ছোট বড় গাছ। মাঝে মাঝে দমকা হওয়া বইছে—চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। হঠাৎ কোনো রাতের পাখী কর্কশ স্বরে আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে। মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট গাছগুলি ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঐ অঞ্চলে আবার সাপের ভয়ও বেশ আছে। ব্যাংগুলো সাইকেলের শব্দ শুনে ঝুপ্‌-ঝাপ্‌ করে রাস্তা থেকে পাশে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। এদিকে কারবাইড্‌ শেষ হয়ে যাওয়াতে বাতিটা নিভে গেল। হাওয়াতে

মাথার শোলার হ্যাটের ষ্ট্রাপটা থুতনির সঙ্গে না লাগানো থাকার ফলে, উড়ে গেল। কখনও যেন মনে হতে লাগল কানের পাশে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে—আসলে সে সব কিছুই নয়, ওঠা হাওয়া বইছে—আর টুপী যতক্ষণ মাথায় ছিল ততক্ষণ তা বুঝতে পারিনি। গা ছমছম্ করছে—এর উপর আবার চোর-ডাকাতের ভয়ও আছে। প্রায় যন্ত্রচালিতের মতই যেতে লাগলাম। এমন সময়েই দূরের গাঁয়ের পাশে আলোর খেলা—কখনও নিভছে, কখনও দপ্ করে জ্বলে উঠছে দেখতে পেলাম—সে কী ছুটোছুটি! এ সব দেখতে দেখতে অবসন্নভাবে হাসপাতালের কোয়াটার্সে ফিরে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরের দিন ভোরে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার গল্প শুনে বললেন—"আপনি যেখানে সেই আলো দেখেছেন, সেখানেই সে গাঁয়ের শ্মশান ঘাট!" কিন্তু ওটা যে আলেয়ার আলোর খেলা তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

আলেয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্যি এতদিনে তোমাদের নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে।

সাত সাগরের রূপকথা

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাত সমুদ্দুর তের নদী,　　কাঁকনতলার পারে
থাকত সে এক রাজার মেয়ে,　　অচিন নদীর ধারে
নদীর পারে নিতুই আসি
ঝুলিয়ে কালো কেশের রাশি
ঘুরিয়ে আঁখি, নদীর শোভা দেখত বারে বারে।

অচিন দেশের রাজার কুমার,　　থাকত অচিন গাঁয়ে
আসত সে রোজ নদীর পারে,　　মন-পবনের নায়ে,
হিজল কাঠের বৈঠা বেয়ে,
ফুলের সাজে সেজে নেয়ে,
রাজ বালারে নিয়ে গেল, আপন অচিন গাঁয়ে।

শ্রীসত্যশংকর সুর

কেঁচো তোমরা সবাই দেখেছ। ছোট-বড় নানা আকৃতির যে সব কেঁচো আমরা সচরাচর দেখে থাকি, তাদের মধ্যে বড়গুলিও প্রায় এক ফুট দু'ফুটের বেশী লম্বা হয় না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় এক জাতের কেঁচো এত লম্বা হয় যে, হঠাৎ দেখলে তাদের সাপ বলেই ভ্রম হয়। সময় সময় এই কেঁচোরা লম্বায় প্রায় এগারো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ওদের ওজন হয় প্রায় দেড় পাউণ্ডের মত।

*　　　　*　　　　*

নিউগিনির 'বার্ড উইং' পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার প্রজাপতি। এই জাতীয় স্ত্রী-প্রজাপতিদের প্রসারিত ডানা দুটির পরিমাণ ১২ ইঞ্চি (৩০'৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ থেকেই এদের আসল দেহের দৈর্ঘ্য অনুমান করা সহজ হবে।

মাছের কথা তোমরা অনেকেই হয়ত শুনে থাকবে। এরা এক জাতের সামুদ্রিক মাছ। এই মাছ জল থেকে উপরে উঠে বেশ কিছুটা উড়ে যেতে পারে, এবং দৈর্ঘ্যে মাছগুলি প্রায় ১০।১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এর চেয়েও বড় মাছ কখনও কখনও যে দেখা যায়নি তা নয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই এদের বেশী দেখা যায়। উড়ুক্কু মাছেরা যখন ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকে, তখন ভারী সুন্দর দেখায়। বিজ্ঞানীদের মতে উড়ুক্কু মাছরা একেবারে ৫০০ ফুট পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। এদের কানকোর নীচের পাখনা দুটি খুব চওড়া।· এই পাখনা দুটি এদের ডানার কাজ করে।

*　　　　*　　　　*

বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে কয়েকটি ছাড়া লবণই হচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বাঁচবার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এই প্রাকৃতিক পদার্থটির অভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরাও বাঁচতে পারে না। শত শত বছর আগেও মানুষ জানতো যে, কারুকে নুন খেতে না দিলে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু এখন এমন রোগ আছে, যাতে নুন খেতে ডাক্তাররা সম্পূর্ণ নিষেধ করেন।

ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আজকের দিনে যাঁরা প্রৌঢ়, যাঁরা প্রবীণ, একদা বাল্যকালে তাঁরা সকলেই নিশ্চয় স্বর্গীয় ডাক্তার নীলরতন সরকারের অনুজ যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 'হাসিখুসি' পড়েছেন। তোমাদের মধ্যেও বোধ হয় এমন কেউ নেই যে, 'অ'য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে', 'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি ছেলে হারিয়ে গেল রইলে বাকি নয়।' হারাধনের একে একে সব ছেলে গেল। শেষটি 'কাঁদে ভেউ ভেউ, মনের দুঃখে বনে গেল রইল না আর কেউ', এগুলি পড়নি।

একাধারে ছড়া, ছবি, গল্প ও কবিতার বিচিত্র সংগ্রহ হিসাবে 'হাসিখুসি' যেমন কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্তকে নূতন নূতন রসের উদ্দীপনা যুগিয়েছে, তেমনি অলক্ষ্যে তাদের ভাষা-শিক্ষারও প্রভূত সহায়ক হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ যে দিনের শিশু-সাহিত্য লেখক, সেদিন শিশু-সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমদাচরণ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, বরদাকান্ত মজুমদার, সত্যচরণ চক্রবর্তী প্রমুখ যে কয়জন বিশিষ্ট লেখক দেশের এই অভাব দূর করিতে অগ্রণী হয়েছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। বিস্ময় ও আনন্দের কথা এই যে, এতদিন পরেও তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি সেই আগের মতোই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে— সেই সেদিনের মতো আজকের শিশুচিত্তকেও তা সমভাবেই নাড়া দেয়, যদিও আজকের শিশু-সাহিত্যে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী রচনার ঐশ্বর্য ইতিমধ্যে যথেষ্টই সঞ্চিত হয়েছে। আজকের আলোকোজ্জ্বল নিয়ন লাইটের প্রখর আলোয় শোভিত শিশু-সাহিত্য প্রাঙ্গণে মাটির প্রদীপের মতই যোগীন্দ্রনাথের লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি শিশু-চিত্ত স্নিগ্ধকর।

১৮৯১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি যোগীন্দ্রনাথ আরও অনেক বই লিখে গিয়াছেন। সে সবের প্রায় সবগুলিই ছোটদের আনন্দের খনি।

এ বইগুলোর মধ্যে হাসি ও খেলা, রাঙা ছবি, হিজিবিজি, খেলার গান, হাসিরাশি,

নূতন ছবি, ছড়া ও ছবি, ছবির বই, ছবি ও গল্প, মজার গল্প, হাসির গল্প, ছড়া ও পড়া, খুকুমণির ছড়া, আষাঢ়ে স্বপ্ন, ছোটদের চিড়িয়াখানা, জানোয়ারের কাণ্ড, পশুপক্ষী, বনে-জঙ্গলে, ছোটদের রামায়ণ ও ছোটদের মহাভারত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর এক একটি বইয়ের যে কতগুলি করে সংস্করণ হয়েছে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এক হাসিখুসি বইখানি বর্তমানে ১০৫ সংস্করণ চলছে এবং এর কোন সংস্করণই সাধারণতঃ ১০,১৫ হাজারের কম করে ছাপা হয়নি। প্রায় ৭৫ বছর ধরে এর অনুকরণে কত বই-ই না প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আজও এর প্রচার ও প্রভাব তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে।

আমাদের দেশে যার-তার জয়ন্তী হয়, সম্বর্ধনা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগীন্দ্রনাথের জীবনকালে সাধারণের তরফ থেকে তা হয়নি। অবশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচায প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও প্রসিদ্ধ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ দেশের গুণী-জ্ঞানীরা তাঁর যথাযোগ্য সমাদর করেছিলেন। কাজেই আজকে তাঁর এই শতবর্ষ-পূর্তির উৎসবে আমরা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করছি।

আমাদের শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের বয়স মোটামুটি ১০০ বছর ধরা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে প্রথম দিকে যাঁরা আমাদের এ সাহিত্যকে সহজ করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচায ও 'শিশু' সম্পাদক বরদাকান্ত মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার শিশু-সাহিত্যে রায় পরিবারের দান অসামান্য। এই রায় পরিবারের কর্তা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কে যোগীন্দ্রনাথই শিশু-সাহিত্য লেখায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং উপেন্দ্রকিশোরের যাবতীয় পুস্তক প্রথম দিকে তিনিই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিটি বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। শুধু উপেন্দ্রকিশোরেরই নয়, বাংলার তৎকালীন সকল বিখ্যাত লেখকদের বই তিনিই প্রথম প্রকাশ করে দেশের শিশু-সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

সেই তমসাবৃত অতীত দিনের কথা যোগীন্দ্রনাথের মুখে শুনে বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছি। শিশু-সাহিত্য মুদ্রণ ও রূপদান লেখার চাইতেও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। যোগীন্দ্রনাথ সেজন্য আমাদের পূর্বাচার্য হিসাবে নমস্য।

যোগীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে আমিও আজীবন শিশু-সাহিত্যের সেবা করে দিন কাটিয়েছি। আমার সম্বন্ধে (১৩৩৪, ভাদ্র) যোগীন্দ্রনাথ একবার যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে

কিছুটা আত্ম-প্রশংসা থাকলেও তাঁর লেখা হিসাবে এটুকু প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। তিনি লিখেছিলেন :

"আমার তরুণবন্ধু ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বছর তিনেক আগে—তাঁর লেখা 'মশার যুদ্ধ' বইয়ের ভিতর দিয়ে।

এ বইখানা বুড়ো বয়সে গোলদিঘীর ধারে বসে কতবার যে পড়েছি, তার ঠিক নেই। এতে তাঁর যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

তারপর প্রত্যক্ষভাবে যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো, তখন তার আরো অনেক শক্তির পরিচয় পাই। ক্ষিতীশবাবু শুধু লেখক নন, তিনি একজন শিল্পী ও প্রকাশকও।

তাঁর লেখা 'রঘুনাথ' প্রভৃতি প্রত্যেকখানা বইয়েই তিনি শিশু-সাহিত্যকে অনেক নূতন কিছু দিয়েছেন—প্রত্যেকখানাই শিশু-সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী।

তাঁর পবিত্র মাতৃস্মৃতি-পূত কুলজা সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত প্রত্যেকখানা পুস্তকই সুরুচির পরিচায়ক। শিশু-সাহিত্য সেবা করে কুলজা সাহিত-মন্দির ধন্য হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

৺বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে শিশু-সাহিত্য সেবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করি, জীবনব্যাপী চেষ্টা ও পরিশ্রমেও সে সাধ পুরে নাই, এই তরুণ দলের উৎসাহ-উদ্যম দেখে আজ বড় আনন্দ হচ্ছে।

এঁদের হাতে এ ভার তুলে দিয়ে এবার আমার ছুটি।"

আবার বেণু বনে

শ্রীমতী শান্তি বসু

বকুল বেলি শয়ন মেলে
শুধায় ফাগুন, আজ কি এলে
　　রঙ ছড়িয়ে ভুবনে—
কৃষ্ণচূড়া রাঙায় আকাশ
ফিরে এল দখিন বাতাস
　　আবার বেণু-বনে।

ভ্রমর এলো, ফুল ফোটাতে
পাখি এল, গান শোনাতে
　　জুড়িয়ে গেল প্রাণ—
রাঙা-মনের অনুরাগে
আজি রঙের ঢেউ যে লাগে
　　আনন্দ অফুরান।

কাঁকড়া-মশাই

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

পুরীর বাড়ীর পিছন পানে
দাওয়ার উপর ব'সে,
মাদুর পেতে ভাবতেছিলাম
ঘুমটি দেব ক'ষে।
এমন সময় হাওয়ার চোটে
নিদ্রা গেল উড়ে,
সাম্‌নে শুধু জলের খেলা
রইল হৃদয় জুড়ে।
মন ভেসে যায় অগাধ জলে
ঢেউয়ের টানে টানে,
রইনু বসে অবাক চেয়ে
অসীম নীলের পানে।
আসছে উড়ে জলের গুঁড়ো
আঁশটে গন্ধ তাতে,
লোনা জলের চটচটানি
লাগছে মুখে হাতে।
সাগর-চিলের ডানার ছায়া
বালির উপর পড়ে,
এক নিমেষে মাছ ধরে ফের
জলের উপর ওড়ে।
শামুক-ঝিনুক আসছে ভেসে
ঢেউয়ের দোলার সাথে,
এমন সময় কুটকুটিয়ে
উঠল পায়ের পাতে।

চমকে দেখি কাঁকড়া মশাই
আসেন গুড়ি গুড়ি,
দাওয়ার উপর উঠে পায়ে
লাগান সুড়সুড়ি।
কেমন করে এলেন তিনি
শোন তবে বলি :
ভিজে বালির চড়ার উপর
বেড়াচ্ছিলেন চলি।
এমন সময় শঙ্খচিলে
গেল তারে ল'য়ে,
হেথা-হোথা ঘুরলো অনেক
পায়ের মুঠোয় ব'য়ে।
ত্রিভুবনটি দেখিয়ে শেষে
ফস্‌কেছে মোর দ্বারে,
সেই রাগেতেই কাঁকড়া-খোকন
আমায় কামড় মারে।
চিমটে করে ধরে তারে
পাঠাই জলের মাঝে,
হাঁপ ছাড়লেন নিজের ডেরায়
গিয়ে মায়ের কাছে।

আশ্চর্য জাদুকর ওয়াল্ট ডিজনী

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

ওয়াল্ট ডিজনী তাঁর সাত বামনের মডেল পরীক্ষা করে দেখছেন।

রোজ ভোরে সাত বুড়ো কারিগর সাতটি বামন, খনি শ্রমিকদের মত যন্ত্রপাতি কাঁধে করে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে দূর পাহাড়ে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ত। সারাদিন সেই পাহাড়ে বসে ঠুক ঠুক করে সুদক্ষ স্বর্ণকারের মত তারা হীরা কেটে কেটে নক্ষত্র বানাতো। তারপর সন্ধ্যে হলে সেই নক্ষত্রগুলো আকাশের গায়ে সেঁটে দিয়ে তারা বাড়ি ফিরে আসত।

ওয়ালট ডিজনীর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ারফস্'-এর দৃশ্যটা আজও আমার চোখে ভাসে। মূল রূপকথায় সাত বামনের এই নক্ষত্র তৈরির পেশাটির কোনও উল্লেখ নেই। ওটি ওয়াল্ট ডিজনীর নিজস্ব সংযোজন। সেই ডিজনী এখন নিজেই এই পৃথিবী ছেড়ে নক্ষত্রলোকে প্রস্থান করলেন।

তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে, ধ্যানে ও সৃষ্টিতে এই আশ্চর্য জাদুকরটি এই রকম নক্ষত্রের ফুল অজস্র ফুটিয়েছেন।

সন তারিখের হিসাব জানিনে। নিতান্ত বালক বয়সে ডিজনীর মিকি মাউসের সঙ্গে রুপালী পর্দায় আমার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনেই মিকির সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সেই থেকে এই-সেদিন-দেখা 'স্লিপিং বিউটি' পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের পরিচয় আমার ডিজনীর প্রতিভার সঙ্গে। এর মধ্যে তিনি একটুও পুরনো হননি, একবারও ক্লান্ত করেননি।

সমান কৌতূহল নিয়ে টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছি, সমান বিস্ময় আর আনন্দ বেদনার রঙে রসে মনটাকে চুবিয়ে নিয়ে তাজা হয়ে ফিরে এসেছি। কি তাঁর কার্টুন শর্টস—নেংটি ইঁদুর মিকি, পাতিহাঁস ডোনালড, সার্কাসের উড়ুক্কু হাতী ডামবো, ঘর-পালানো ভালুক ছানা জামবো, নিষ্পাপ হরিণ ছানা ব্যামবি (ব্যামবির বন্ধু প্রেমিক সেই ঘরগোশটির কথা কে ভুলবে, প্রেমিকাকে দেখা মাত্র যার শাদা ফুটফুটে শরীরটি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল)—কি সেই নিগ্রো কথক আংকল রেমুসের উজ্জ্বল গল্পগুলো, কি রূপকথার উপাখ্যানগুলো—স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ারফ্স, পিনোচ্চিও, অ্যালিস ইন দি ওয়ানডারল্যাণ্ড, সিনডারেলা, পিটার প্যান, দি স্লিপিং বিউটি, আর কি তাঁর সেই অমর সৃষ্টি ফ্যানটাসিয়া (যেখানে সুরে আর রঙে তিনি মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন)—কি দি লাইফ অ্যাডভেঞ্চার সিরিজে—দি সীল আইল্যাণ্ড, দি মাইগ্রেটরি বার্ডস, দি ওয়াটার বার্ডস, দি বীভার ভ্যালি, দি বিয়ার কান্ট্রি, দি আফরিকান লায়ন, কুমীরদের জীবন নিয়েও একটি প্রামাণ্য ছবি তুলেছিলেন তিনি, নামটা মনে পড়ছে না, নেচারস হাফ একার, দি লিভিং ডেজার্ট, কি তাঁর দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি পিপ্‌ল সিরিজের আশ্চর্যসুন্দর ডকুমেনটারি ছবিগুলোয় আর কি রক্ত-মাংসের মানুষদের দিয়ে অভিনীত ছবিতে, তাঁর অজস্র কীর্তির কোথাও একবারের তরেও তিনি তাঁর গুণমুগ্ধদের আশাভঙ্গ হতে দেননি।

প্রথম স্তরে আমরা শুধু ডিজনীর কার্টুন শর্টসই দেখতাম। তাঁর সেই যুগের ছবির নায়ক-নায়িকারা সব ছিল কার্টুনে আঁকা পশু-পাখি। কিন্তু সেই সব চরিত্রগুলোকে আমাদের কখনও আঁকা ছবি বা পশু-পাখি বলে মনে হ'ত না। বরং ওদের আমাদের সমাজভুক্ত বলেই মনে হ'ত। আজকালকার চলচ্চিত্র প্রতীকের ভিড়ে ঠাসা। এসব ঝঞ্ঝাট আগে এত ছিল না। মিকি মাউসের কল্পনার পিছনে স্রষ্টার কোনও উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানিনে, তবে নিরীহ অথচ ফন্দীবাজ মিকি যেন সর্বপ্রকার উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ—এটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরে আঁকা ছবির নায়ক-নায়িকা নিয়েই ডিজনী আমাদের রূপকথা শোনাতে এলেন। স্বপ্নের জগৎ, কল্পনার জগৎ যেন অকস্মাৎ সমস্ত দরজা-জানালা খুলে রঙের সুরের সকল ঐশ্চর্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হ'ল।

এই রূপকথা সিরিজের মধ্যে ডিজনী দু'খানা একেবারে আলাদা ধরনের ছবি করলেন। দু'খানাই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। একখানার নায়ক-নায়িকা বনের পশু-পাখি—তার নায়ক সদ্যোজাত এক হরিণ শিশু ব্যামবি। এই পৃথিবীতে সদ্য-আগত হরিণ শিশুটির কাছে প্রকৃতি তার রহস্যের দরজাগুলো একে একে খুলে ধরছে। এই ব্যামবি পথের

আমেরিকায় ডিজনীল্যাণ্ডে পণ্ডিত জহরলাল ও ডিজনী

পাঁচালির অপুর এক আশ্চর্য সহোদর। বনের এবং বনের বাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যামবির যত পরিচয় হচ্ছে, বন্ধুত্বের রাজ্য তত প্রসারিত হচ্ছে। ব্যামবির সুখ যখন চরমে, তখন সেই বনে ভিলেনের আবির্ভাব, শিকারী মানুষের বেশে। মানুষটাকে পুরোও দেখা যায় না, দু'খানা নৃশংস হাত এবং সেই হাত দুটোয় ধরা ততোধিক হিংস্র এক বন্দুক। সেই বন্দুকের গুলিতে ব্যামবির মা লুটিয়ে পড়ে, ব্যামবির সঙ্গে আমরাও যেন পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হতে দেখি। সমগ্র বনের সুষমা, শান্তি অপহৃত হ'ল নিষ্ঠুর মানুষের হাতে। এই নিষ্ঠুরতা আমাদের বুকে বড় বাজে। আর যখন দেখি আমিও ওই মানুষটিরই জ্ঞাতি, তখন বড় লজ্জা পেতে হয়। দ্বিতীয় ছবিখানার নাম ফ্যানটাসিয়া। এর নায়ক-নায়িকা শুধু সুর আর রঙ।

তৃতীয় স্তরেও ডিজনী রূপকথা এবং অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নিয়েই ছবি করেছেন, তবে এবারের নায়ক-নায়িকা সব সত্যকারের মানুষ। রবিনহুড, দি ট্রেজার আইল্যাণ্ড, টোয়েনটি থাউজ্যাণ্ড লীগস আনডার দি সী, দি ওল্ড ইয়েলার প্রভৃতি অনবদ্য ছবিগুলো এই পর্যায়ের।

চতুর্থ স্তরে আসে দি ট্রু লাইফ অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ। আঁকা পশু-পাখির জগৎ ছেড়ে ডিজনী রক্তমাংসের পশু-পাখির জীবনরহস্য আমাদের জানাতে এগিয়ে এলেন। আমরা অনুভব করতে লাগলাম প্রকৃতির সন্তান হিসাবে আমাদের সঙ্গে অন্য জীবদেরও একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। এবং হিংস্রতম পশুদের হৃদয়েও সন্তানের জন্য স্নেহ-ভালবাসা বাসা বেঁধে আছে।

পঞ্চম স্তরে দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিপল পর্যায়ে ডিজনী আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মানুষের জগতে। এই তথ্যমূলক ছবিগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জীবনযাত্রা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। মানুষে মানুষে আত্মীয়তার একটা যোগসূত্র যে রয়েছে, আবার তার প্রতি আমাদের চোখ পড়ল।

ষষ্ঠ স্তরে তাঁর যে সৃষ্টি সেটা আমি নিজে দেখিনি, আমার যে-সব বন্ধু-বান্ধব আমেরিকায় গিয়েছেন তাঁরা সেটা দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, ডিজনী তাঁর ডিজনী-ল্যাণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োগে মানুষের স্বপ্নকে, কল্পনাকে মূর্ত করে রেখেছেন। এ যেন এক স্যাংচুয়ারি। অতিবাস্তবতার আক্রমণে মানুষের যে-স্বপ্ন, যে-কল্পনা, যে-সব সুকুমার প্রবৃত্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল, ওয়ালট ডিজনী তাঁর ছবির মধ্যে ডিজনীল্যাণ্ডে সে-সবকে আশ্রয় দেবার জন্য এক অপূর্ব স্যাংচুয়ারি, এক অবধ্যভূমি তৈরি করে গিয়েছেন।

আর এই কারণেই আমরা এ যুগের এই আশ্চর্য প্রতিভাটির কাছে গভীরভাবে ঋণী।

সাধনা এবং সাফল্য

১৯০১ সনে শিকাগোতে ওয়ালট ডিজনীর জন্ম। তাঁর কৈশোর কেটেছে ক্যানসাসে। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি ফ্রানসে ছিলেন, সেখানে তাঁকে রেডক্রস অ্যামবুল্যান্সের গাড়ি চালাতে হ'ত। যুদ্ধের পর একটি সিনেমা-স্লাইড কোম্পানিতে ডিজনী কার্টুনিস্টের কাজ পেলেন। অবসর সময়ে তিনি জীবন্ত কার্টুন রচনার পরীক্ষা করতেন। ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষাও চলল সেই সঙ্গে। এর পর তাঁর হলিউড যাত্রা। ১৯২৩ সনে তিনি তাঁর ভাই রয়ের সঙ্গে প্রথম ছবি করলেন—"অ্যালিস ইন কার্টুনল্যাণ্ড।"

অন্যান্য তরুণ চিত্রকরের সহযোগিতায় ডিজনী ভ্রাতৃদ্বয় পর পর কয়েকটি রূপকথা-চিত্র করেন কার্টুনের আঙ্গিকে। ১৯২৮ সনে "মিকি"র সৃষ্টি। ক্যানসাস সিটিতে বাসের সময় তাঁর ঘরে ছোট্ট যে-ইঁদুরটা ডিজনীর "বন্ধু" হয়ে গিয়েছিল, তাকেই তিনি অমর করে দিলেন "মিকি মাউস"-এর মাধ্যমে।

"মিকি" হিট হয়ে গেল। শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র পৃথিবীর ছোট-বড় সকল চিত্রামোদীর মন হরণ করে নিল সে। ক্রমে ডিজনীর ছবিতে ধ্বনি এল, তারপর রং। "মিকি"র অনেক বন্ধুকেও পাওয়া গেল তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন চিত্রে—প্লুটো, ডিংগো, ডোনালড দি ডাক, এছাড়া সেই তিনটি শূকর ছানা, দুষ্টু নেকড়ে ইত্যাদি। মিকি মাউস
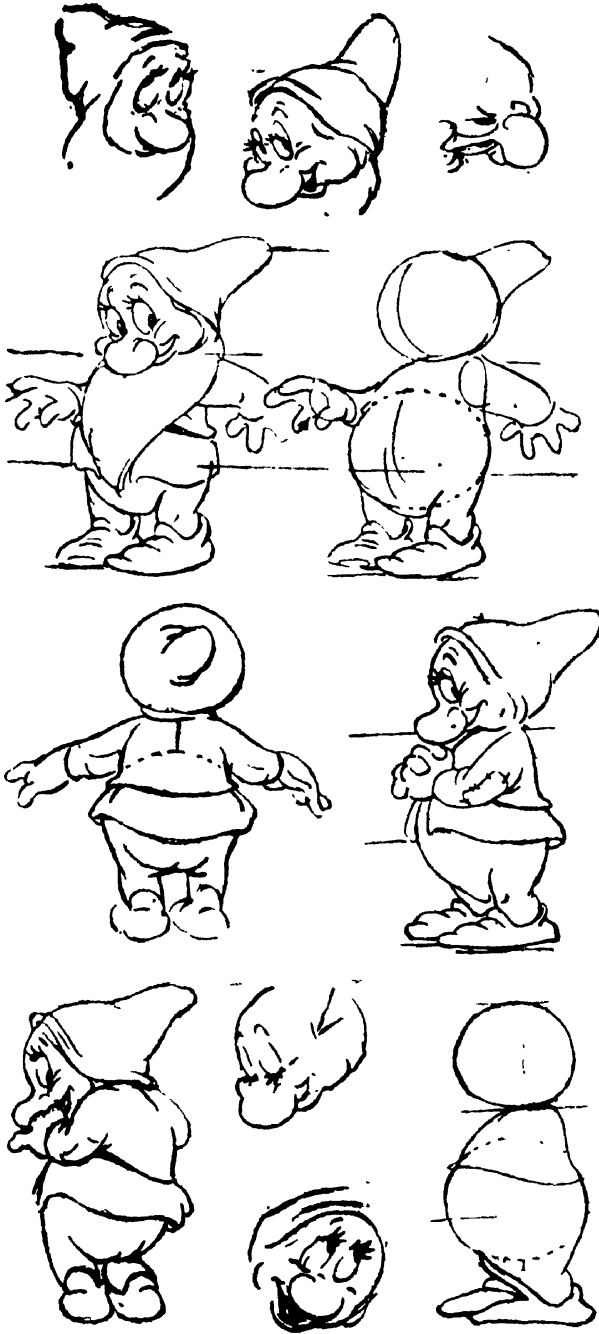
পর্যায় ১৯৩৭ পর্যন্ত চলে। সেই বছর তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রঙিন ছবি তৈরি হয়—"স্নোহোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফ্‌স্‌।"

ডিজনীর চলচ্চিত্র-শিল্পের সাধনা চার দশকেরও কিছু বেশী সময় ধরে বিস্তৃত। এই চার দশক কালে তিনি মোট ৩৯টি 'অসকার' এবং প্রায় ৮০০ অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মানপত্র লাভ করেন। এ-ছাড়া সিনেমা ও টেলিভিশনের 'যে-সাম্রাজ্য' তিনি গড়ে তোলেন তা যেমন বিরাট, তেমনই বিশিষ্ট। জীবন্ত কার্টুন, জল-স্থল-অরণ্য এবং প্রকৃতির নানা রহস্য সংবলিত চিত্র, অ্যাডভেঞ্চার, রূপকথাচিত্র ইত্যাদি সব নিয়ে ডিজনী-কৃত ছবির সংখ্যা ছয় শতাধিক। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার টিকিট-ঘরের বিচারে ১০০টি নামকরা হিট ছবির তালিকায় ডিজনী-কৃত তেরোখানি চিত্র অন্তর্ভুক্ত। এবং তালিকার পুরোভাগেই ওই ১৩টি ছবির নাম।

শিশুদের আনন্দবর্ধনের জন্য তাঁর সৃষ্ট 'ডিজনীল্যাণ্ড' পৃথিবীর একটি বিস্ময়। ১৯৫৫ সনে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি ওই অনন্য উদ্যান গড়ে তোলেন। মৃত্যুর পূর্বে ফ্লোরিডায় তিনি আর একটি—আকারে প্রথমটির দ্বিগুণ—উদ্যান নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে-কাজ অসমাপ্ত।

শিশু-চলচ্চিত্র রচনায় তাঁর সাফল্যের মূলে কী? এই প্রশ্ন তাঁকে একবার করা হয়। উত্তরে ডিজনী বলেছিলেন: "আমি তো ছোটদের জন্য ছবি করি না। আমি এমন ছবি করি যা ছোটদের ভাল লাগে, যা ওদের মনের মত।"*

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত।

মেঠুড়ে

টেস্ট ক্রিকেট : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতকে ৬ উইকেটে এবং কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ৩৫ রাণে হারাবার পর, মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এ টেস্টে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেনি। যখন খেলার ওপর ভারতের পূর্ণ আধিপত্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল হারার ভয়ে ভীত, সেই সময় দুটো ক্যাচ ছাড়া হয়েছে। সোবার্সের ব্যাটে যে ক্যাচ উঠেছিল, ভারতীয় ফিল্ডার সেটা ধরতে পারলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত হয়তো জিততে পারতো। এক কথায় বলতে গেলে ফিল্ডিং-এর গলদই মাদ্রজা টেস্টে ভারতের জয়লাভ না করার প্রধান কারণ।

খেলার শেষ দিন ভারতের রাণ ছাড়িয়ে জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যখন ৩২২ রাণের দরকার, হাতে সময় ২৮৫ মিনিট এবং পুরো দশটা উইকেট, তখন ১৩১ রাণ করতে তাদের পাঁচটা উইকেট পড়ে যায়। ১৬৬ রাণের মাথায় পড়ে ষষ্ঠ উইকেট। ১৯৩ রাণের মাথায় সপ্তম। তখনো খেলার পৌনে দু' ঘণ্টা সময় বাকি। আউট হতে বাকি সোবার্স, গ্রিফিথ, হল ও গিবস—চারজনের ভেতর তিনজন। হল ও গিবসকে ব্যাটই করতে হয়নি। খেলায় যবনিকা পড়ার সময় সোবার্স ৭৪ ও গ্রিফিথ ৪০ রাণে নট আউট থাকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মোট ৭ উইকেটে ২৭০ রাণ করে। সুতরাং খেলায় জয়পরাজয় মীমাংসা না হবার মূলে একদিকে ভারতের বোলার ও ফিল্ডসম্যানের ব্যর্থতা, অন্য দিকে সোবার্স ও গ্রিফিথের দৃঢ়তা। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতে রব্যর্থতার পর মাদ্রাজ টেস্টে ভারতের চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ব্যাটিং ক্রিকেট খেলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তৃপ্তিদায়ক ব্যাটিংয়ে ইঞ্জিনিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১০৯) এবং প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরীর অধিকারী চান্দু বোরদের আবার সেঞ্চুরী (১২৫)। রুসি সুর্তির ৫০ রাণও (নট আউট) যথেষ্ট উপভোগ্য।

মাদ্রাজের এই টেস্ট নিয়ে ভারতের সাতানব্বুইটা টেস্ট খেলা হ'ল। এর ভেতর জয়ের সংখ্যা ১০, ড্র ৫০ এবং পরাজয় ৩০। এই গ্রীষ্মে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফর করবে। সফরসূচী অনুযায়ী তিনটে টেস্টের ব্যবস্থা হয়েছে। এজবাসটন মাঠের শেষ টেস্ট হবে ভারতের শততম টেস্ট খেলা। আমরা সকলেই প্রতীক্ষা করে থাকব ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরে কিরকম ফলাফল করে।

টেবল টেনিস : ভারত বনাম রাশিয়া

ভারত এবং রাশিয়া—দু' দেশের ভেতর পাঁচটা টেস্ট খেলা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল চারটে সিঙ্গলস এবং একটা ডাবলস। কোয়েম্বাটোর এবং বোম্বাই টেস্টে রুশ দল ৩—১ ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে দেবার পর কলকাতার তৃতীয় টেস্টে একই ফলাফলে জিতে 'রাবার' পায়। ডিব্রুগড়ে চতুর্থ টেস্টে তারা একই ফলাফলে ভারতকে হারিয়ে দেয়। দিল্লির পঞ্চম ও শেষ টেস্টে রুশ দলকে ভারতের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

পুরুষদের টেস্ট খেলার সঙ্গে সঙ্গে দু' দেশের মেয়েদের মধ্যেও টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয় এবং ভারতে আয়োজিত মেয়েদের এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঁচটা টেস্টেই ভারত হেরে যায়। যদিও রুশ মেয়েদের ভারতীয় মেয়েদের কাছে একটা করে খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে।

ভারতের খেলোয়াড়রা আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খেললে কলকাতার তৃতীয় টেস্টে এক সময় ভারতের জয়লাভের আশা ছিল! সিঙ্গলসের খেলায় দু' দেশ একটা করে ম্যাচ জেতার পর ডাবলসের প্রথম গেমে ভারত ১৯—১৬ পয়েন্টে এগিয়ে থেকেও ২১—১৯ পয়েন্টে গেমে হেরে যায়। ডাবলসের দ্বিতীয় গেমেও ভারত এক সময় এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১৮—২১ পয়েন্টে হেরে যায়।

ডুরাণ্ড কাপ

এবার এক নতুন দল ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। দলটি ভারতের এক সামরিক ফুটবল দল—গোর্খা ব্রিগেড। ফাইন্যালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল সামরিক দল। গোর্খা ব্রিগেড শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ২—০ গোলে হারিয়ে সর্বপ্রথম ডুরাণ্ড কাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে। ১৯৫৮ সালেও গোর্খা ব্রিগেড ফাইন্যালে উঠেছিল। সেবার মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের কাছে তাদের হার স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে ষোলবার ডুরাণ্ড কাপের খেলা হয়েছে, তার ভেতর তেরো বার কলকাতার একটা-না-একটা দল ফাইন্যালে খেলেছে এবং তেরো বার ডুরাণ্ড কাপ কলকাতায় এসেছে। কিন্তু এ বছর কলকাতার কোনো দলের ফাইন্যালে আসাটাই

না ওঠা খুবই আশ্চর্যের। দিল্লির মাটিতে কলকাতার কোনো দলই এবার তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কলকাতার এরিয়ান ক্লাব প্রথম খেলাতেই হায়দরাবাদের রোড ট্রান্সপোর্ট দলের কাছে হার স্বীকার করে। ইস্টবেঙ্গল তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় ১—০ গোলে সেকান্দ্রাবাদের ই. এম. ই. সেণ্টারের কাছে হেরে যায়। মহমেডান স্পোর্টিং কোয়ার্টার ফাইন্যালে গোর্খা ব্রিগেডের কাছে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে হার স্বীকার করে এবং গত তিন বছরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগানও সেমি-ফাইন্যালে গোর্খা দলের কাছে ২—০ গোলে পরাজিত হয়।

জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারতের তিন নম্বর টেনিস খেলোয়াড় প্রেমজিতলালের সর্বপ্রথম জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দিল্লিতে নর্দার্ন ইণ্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে আয়োজিত জাতীয় টেনিসের ফাইন্যাল খেলায় রমানাথন কৃষ্ণন ও প্রেমজিতলালের খেলার সময় কৃষ্ণন যখন ২—১ সেটে এগিয়ে এবং চতুর্থ সেটে দুজনেরই অবস্থা সমান সমান, তখন পিঠের মাংসপেশীতে ব্যথার জন্যে কৃষ্ণন খেলা ছেড়ে দিয়ে প্রেমজিতকে বিজয়ী বলে স্বীকার করে নেন। প্রেমজিতলাল যেভাবে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ব্রাজিলের এক নম্বর খেলোয়াড় টমাস কুককে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে এবং সেমি-ফাইন্যালে ভারতের দু, নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জিকে পাঁচ সেটের খেলায় হারিয়ে ফাইন্যালে উঠেছেন তা প্রশংসা করার মতন। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পৃথিবীর পয়লা নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত ফ্রেড স্টোলের সঙ্গে জয়দীপ মুখার্জির অপূর্ব সংগ্রামের পর টমাস কক এবং জয়দীপের মতন দু'জন খেলোয়াড়কে পরপর হারানো প্রেমজিতলালের জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা।

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

কলকাতার সাউথ ক্লাবে সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান টেনিসে এবার রুশ খেলোয়াড়দের অভাবনীয় সাফল্য যেমন উল্লেখ করার মতন, তেমনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। রমানাথন কৃষ্ণন অসুস্থতার জন্যে খেলতে না পারলেও জয়দীপ ও প্রেমজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও সিঙ্গলসে তো বটেই, ডাবলসেও তাঁরা ভালো খেলতে পারেননি।

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের চারটে বিষয়ের ভেতর তিনটে বিষয়ের বিজয়ীর পুরস্কার পেয়েছেন রুশ খেলোয়াড়রা। রাশিয়ার এ. মেত্রেভেলি হয়েছেন নতুন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন। মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন অ্যাবজানভাজে মিক্সড ডাবলস ফাইন্যালে বিজয়ীর সম্মান রাশিয়ান জুটি মেত্রেভেলি ও আইভানোভার।
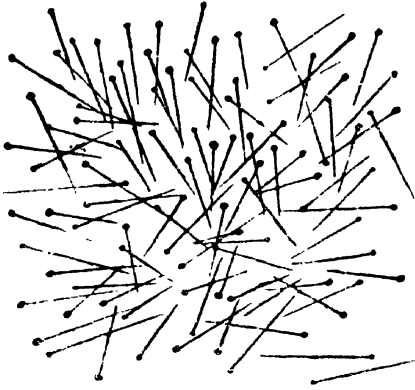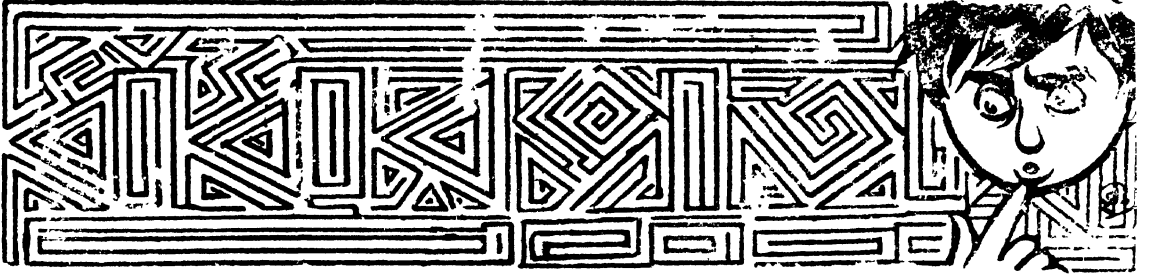
আলপিন গোনো

(১) পাশের ছবিতে কতকগুলি আলপিন ছিটকে পড়ে গেছে মেঝেয়। মোট কতগুলি আলপিন ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত তাড়াতাড়ি তোমরা একদিক থেকে গুণে বলতে পারো দেখ ?
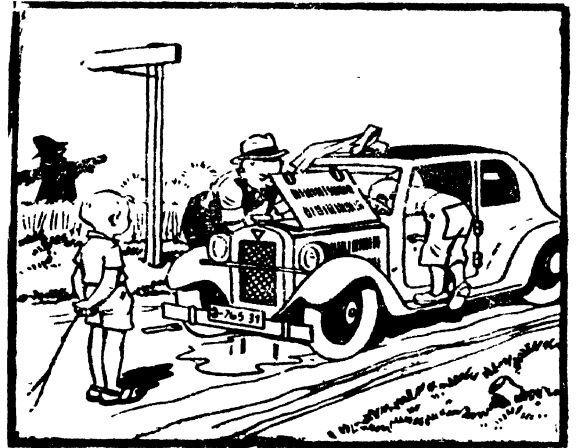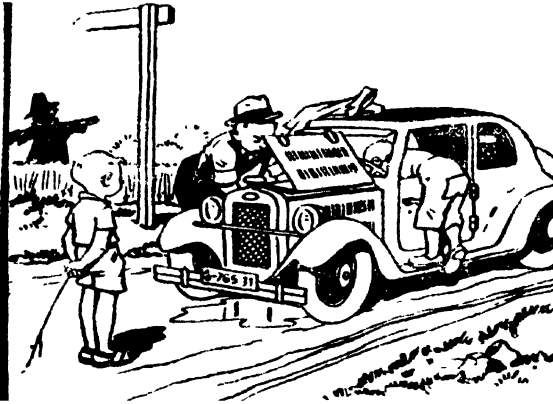
(২) প্রথম ছবিটি দেখে দ্বিতীয় ছবিটি আঁকা হয়েছে ; কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটি সব জায়গায় প্রথমটির মত হয়নি। কোথায় কোথায় ঠিক মিল নেই বলতে পারো ?

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

গতবারের ধাঁধার উত্তর

১। সুন্দর মুখখানি গণ্ডারের ; ২। নাসপাতি ৬০ গ্রাম, কাপ ১২০.গ্রাম, আপেল

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

জীবন জ্যোতি-কথা—ইন্দিরা দেবী। ফাল্গুনী প্রকাশনী, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবিভাস কুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

ইন্দিরা দেবী শিশু-সাহিত্যের জন্য অনেক বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই বইখানি ছোটদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। এখানি পাঠ করলে ছোটরা ইতিহাসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে পরিচিত হবে, যা তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করবে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে।

যুগাবতার গৌতম বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে উক্ত যুগের মহামানব মহাবীর, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, সুদত্ত, এবং প্রিয়দর্শী অশোক, মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, মধ্যযুগের কবি গোবর্ধনাচার্য, লক্ষ্মণ সেন, কবীর, একনাথ, তুকারাম, ঔরঙ্গজেব, রশন, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেপোলিয়ান প্রভৃতিদের জীবনের সঙ্গে জড়িত এই কাহিনীগুলির রচনাভঙ্গী যেমন সহজ তেমনি চিত্তগ্রাহী।

গল্পাকারে লেখা সচিত্র এই বইখানি বাঙলার ঘরে ঘরে প্রতিটি ছেলেমেয়ের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

হুড়ুম ভুড়ুম হালুম—শ্রীসতীকুমার নাগ। পুঁথি-পত্র, ১৩৫, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মধুমঙ্গল জানা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.০০

ছোটবেলায় পশুপাখীর বিষয় নিয়ে ছেলে-মেয়েদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তাদের দেখতে, পুষতে ও সেই সম্বন্ধে গল্প পড়তে তারা খুবই ভালবাসে। সেই পশুপাখীদের নিয়ে লেখক খুব ছোটদের জন্য মজার মজার গল্প বলেছেন এই বইটির মধ্যে। শুধু গল্পই নয়, এর থেকে জীবজন্তুদের আকৃতি-প্রকৃতিরও খবর পাবে ছোটরা। বেশ বড় টাইপে ছবি দিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে সুন্দর করে লেখা হয়েছে বইটি। মলাটের রঙিন ছবিটিও খুব আকর্ষণীয়।

রূপকথার দেশে—ইন্দিরা দেবী সিটি বুক এজেন্সী, ৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে পি, দে কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরাই রূপকথার গল্প ভালবাসে এবং অতি প্রাচীন যুগ থেকেই রূপকথার গল্প লিখিত হয়ে আসছে। এই বইটির মধ্যে ইন্দিরা দেবী ভারী মিষ্টি করে ছোট ছোট করে সাতটি রূপকথার গল্প লিখেছেন। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই ছোটরা পড়ে আনন্দ পাবে। ছবিও আছে প্রত্যেকটি গল্পের আরম্ভের সঙ্গে। নানা রঙের প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

শীতের শেষ আমেজটুকুও চলে গেল—বসন্ত এসেছে, গাছে গাছে অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে সবুজ সমারোহে—আর মাঝে মাঝে গরম হাওয়া বইছে—এবার আসবে গ্রীষ্মকাল—ভাবতেই ভয় লাগে। এখন এই শীত চলে যাওয়ায় বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খুব অসুখবিসুখ দেখা দেয়, তাই যেমন বেশ পরিবর্তন হয়—সেই সঙ্গে আহারের ধরণ ধারণ বদলে সময়োপযোগী করতে হয়, সাবধান না হলেই নানা অসুস্থতা এসে চেপে ধরে। জানা কথা, বলা কথা সত্ত্বেও স্মরণ করাতে হয়, তার কারণ ছোটদের এত সব নিয়মকানুন মানতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ভোগান্তির চেয়ে সাবধান হওয়া ভাল নয় কি?

বন্ধ কলেজ খুলে গেল। পরীক্ষাগুলি পেছিয়ে যেতে যেতে একটি বছর নষ্ট হয়ে গেল—ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরাই—তবু আনন্দের কথা যে বন্ধ দ্বার এতদিনে খুলেছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম, ক্লাস চলতে শুরু করেছে। এখন ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের পরিচালিত করলে ক্ষোভের কারণ ঘটবে না।

আমি যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, তখন দেশের সর্বত্র ভোটের সমারোহ চলেছে। এই উপলক্ষে উড়িষ্যায় যে ঘটনা ঘটেছে তা আমাদের সকলেরই লজ্জা ও দুঃখের কারণ হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, ইন্দিরাজী সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই দুর্নীতি ও লজ্জা স্পর্শ করেছে ও সকলকেই দুঃখিত করে তুলেছে। আশা করি—কোনরূপে দুর্ঘটনা না ঘটে সুস্থভাবে ভোটের কাজ শেষ হবে। তোমরা শান্ত ও সংযত হয়ে কাজ করবে।

কিছুদিন থেকে তোমাদের কাছে প্রতিবেশী বন্ধুর কথা বলতে সুরু করেছি। কি ভাবছো, তোমার কেমন লাগছে বলছো না তো? আর কি কি জানতে চাও তাও জানিও—কেমন?

প্রতিবেশী বন্ধু

বাঙ্গালী পাড়ায় বাড়ী ভাড়া নিয়ে এলেন ওঁরা। বাড়ীটি একতলা, কিন্তু ভারী চমৎকার। বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। সামনের জায়গাটা কেয়ারী করে

আশেপাশে ছোট ছোট ফুলগাছ। বাড়ীর যিনি কর্তা সৌমদর্শন চেহারা, স-গৃহিণী তাঁকে সকালে-বিকেলে এইখানে বসতে, বেড়াতে দেখাতে যায়।

না, ওঁরা বাঙ্গালী নন, সাজ-পোষাক দেখেই বোঝা যায়। মেয়েরা সুন্দর শাড়ী পরেন কিন্তু ধরণ অন্য রকম, পুরুষের মত কাছা দিয়ে। ছেলেদের সাজও চুড়িদার পায়জামা, মাথায় পাগড়ীও আছে। বাড়ীর সকলেই অতি ভদ্র, পরিবেশ শান্ত, স্বচ্ছন্দ। এই বাড়ীটির দিকে তথা পরিবারটির দিকে, প্রতিবেশী সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি।

বাড়ীর খোলা জায়গাটিতে কর্তা-গৃহিণীকে প্রায়ই দেখা যায়—হয় বই পড়তে, না হয় পায়চারি করতে কিংবা ফুলগাছগুলির তদারক করতে।

সেদিনও দু'জনে বসে আছেন—কর্তা নিবিষ্ট মনে একটি বই পড়ছেন। গৃহিণী কাছেই বসে আছেন। সকালের পরিবেশটি মনোরম।

পথ দিয়ে যাচ্ছিল সংবাদপত্র বিক্রিওয়ালা—তাঁদের দেখে ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করলো: কাগজ নেবেন। কর্তা এত গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন যে, কিছুই শুনতে পেলেন না। গৃহিণী দেখলেন—বললেন: বাংলা কাগজ? না দরকার নেই।

কাগজওয়ালা অনেক দূর চলে গেছে। কর্তা বই বন্ধ করে বললেন: কে কি এসেছিল? তুমি কি কথা বলছিলে? গৃহিণী বললেন: হ্যাঁ এসেছিল, খবরের কাগজ-ওয়ালা—এসে বলছিল কাগজ নিতে, বাংলা কাগজ তাই নিইনি।

কর্তা একটু চুপ করে থাকলেন—তারপর বললেন: কেন নাওনি?

—বললাম তো, বাংলা কাগজ নিয়ে কি হবে? পড়বে কে? কর্তা সে সব কথায় কান না দিয়ে লোক পাঠালেন কাগজওয়ালাকে ডাকতে।

গৃহিণী অবাক হলেন, তারপর একটু রাগ করেই বললেন: চলে গিয়েছে তো আবার তাকে ডাকতে লোক গেল এমন কি হয়েছে? বাংলা কাগজ পড়বে কে?

কর্তা শুধু বললেন: বাংলা দেশে থাকো না?

কাগজওয়ালা খুব অবাক হয়েই কাগজ বিক্রী করে চলে গেল—ফিরে, ফিরে দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে গেল ব্যাপারটা কি?

কাগজটি হাতে নিয়ে তিনি উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। গৃহিণী খুবই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছেন—তাই বললেন: কি হলো, পড়তে পারলে?

ধীর শান্তস্বরে কর্তা বললেন: পারছি না, তবে পারতে হবে।

—তার মানে ?

—তার মানে শিখতে হবে। আজ বিকেল থেকেই আরম্ভ হবে। তুমিও শিখবে।

—আমার বয়ে গেছে, ঢের কাজ আছে, সে সব ফেলে এখন বাংলা শিখতে বসবো। সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড সকাল বেলায়।

বিকেল বেলা সেই জায়গায় আবার দেখা গেল—শ্লেট আর অক্ষর পরিচয়-এর বই হাতে বাড়ীর কর্তা এসে বসেছেন—পরিবারের প্রায় সবাই উপস্থিত আছেন। কর্তা গৃহিণীকে ডেকে বললেন : এসো, শিখবে।

তারপর প্রতিদিনই এই ক্লাস বসতো—তৃতীয় দিনে তিনি বাংলায় নিজের নাম লিখে গৃহিণীকে বললেন : দেখো। গৃহিণী অবাক হয়েছেন বই কি। উত্তর দেবেন কি ? ভাবলেন : সত্যি অসাধারণ অধ্যবসায়।

আরো কিছুদিন পরে নিজের কাজকর্ম বা অফিসের যে-সব চিঠিপত্র তিনি লিখতেন—বিশেষ বিশেষ কাজের চিঠি—সব তাতেই দেখা যেত নীচে বাংলা হরফে লেখা আছে : মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে।

ইনি হলেন গোপালকৃষ্ণ গোখেলের গুরু। গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে মহাত্মা গান্ধী বলতেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু।

তোমরা রাণাড়ে'র নাম শুনেছ নিশ্চয়—আরো ভাল করে পড়ো আর একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে স্মরণ করবে মহারাষ্ট্রের এই জননায়ককে।

চিঠির উত্তর—

তোমরা যারা চিঠি লেখো তারা উত্তর দেবার মত কিছুই লেখো না, তাই কেবলমাত্র নাম লিখেই ক্ষান্ত হই। তোমরা যারা নিজেদের লেখা সম্বন্ধে জানতে চাও তারা জেনো, যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পাদক মশাই-এর। লেখা পছন্দ হলে দপ্তরে ভাল করে রেখে দেওয়া হয়—সময়মত প্রকাশ করা হয়। সব সময় লেখার কপি রেখে পাঠাতে হয়। দপ্তরে এসে লেখা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই থাকে—তবে সব সময় তা যত্নে রাখার চেষ্টা করা হয়।

শুধু লিখেই পাঠিয়ে দিও না, দু'একবার পড়বে, ভুল থাকলে সংশোধন করবে। আমাদের সব রকম ইচ্ছা থাকে তোমাদের উৎসাহ দিতে। কাজেই লেখাটার দিকে তোমরাও মন দিও।

চিঠি তোমরা নিশ্চয়ই লিখবে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে (অবিশ্যি সেটা তোমাদের মত হওয়া চাই) উত্তর দেবো, না হলে শুধু নাম ছাপা হলে খুশী হবে কি ? এই আজ যারা লিখেছ—**অনির্বাণ, ইন্দ্রনাথ, অগ্নিপ্রভ, অনসূয়া, অনুরাধা, নন্দিনী, অনীতা, মৌসুমী, কথাকলি, শম্পা,** কোলকাতা থেকে, দিল্লী থেকে।

দেবযানী, উপমন্যু, বীতশোক আর **উদয়ন** কাশী থেকে।

রূপা তেজপুর থেকে।

সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের—

মধুদি'

প্রকৃত বীর

তিনিই প্রকৃত বীর, শত্রুর উদ্যত অসির নিম্নে দাঁড়াইয়াও যিনি বজ্রকণ্ঠে সত্যেরই বিজয় ঘোষণা করেন। নির্জনে যাহার সংযম টুটে না, প্রশংসা যাহাকে স্ফীত করে না, লোকনিন্দা যাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, বাধা যাহাকে হতাশা দেয় না, তিনিই বীর—তিনিই পূজ্য।

—**স্বামী স্বরূপানন্দ**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০'৪৫ পয়সা